
ওয়াসিকা নুযহাত
বৃষ্টিমহল ২

বৃষ্টিমহল ২

ওয়াসিকা নুযহাত

প্রথম প্রকাশ:

একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১,

ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

উৎসর্গ

সাহিত্যপ্রিয় আধুনিক মনস্ক পাঠকের জন্য

‘তুই বন্ধু হয়ে আমার হাতটা ছুঁলে
আমি এ বিশ্ব সংসার যাব ভুলে,
ভুলব সব ভুল অংকের ভুল উত্তর
শত দুঃখ বেদনা আর কষ্টের প্রহর!
তুই বন্ধু হয়ে থাকলে আমার পাশে
আমি কষ্ট গিলে খাই এক নিশ্বাসে!
তুই কাছে আয়, দূরে চলে যাই চল
তোর জন্য গড়েছি স্বপ্নের বৃষ্টিমহল!’

Contents

১

কেউ একজন দুম দুম শব্দে দরজা ধাক্কাচ্ছে। রুদ্রর কাঁচা ঘুমটা ছুটে গেল। চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘কে?’

আগুন্তুক এই প্রশ্নের উত্তরে আরো জোরেসোরে দরজা ধাক্কাতে লাগলো। কারো গলার স্বর শুনতে পাওয়া গেল না ওপাশ থেকে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে উঠে আসল রুদ্র। দরজা খুলতেই সামিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তার চোখ দুটি হাসি হাসি। মুখখানা উজ্জ্বল। সে ঘুম কাতুরে রুদ্রর দিকে চেয়ে বিস্ময় মাখা গলায় বলল,

– ‘দোস্ত ঘুমাচ্ছিলি?’

রুদ্র দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, ‘শালা! ঘুম থেকে ডাইকা তুইলা জিগাইতেছিস ঘুমাইতেছি নাকি? এইটা কোন ধরণের ফাইজলামি?’

– ‘শোন, একটু ড্রইং রুমে আয় তো! কথা আছে।’
– ‘কীসের কথা?’
– ‘আরে আয় না! এত পকপক করস ক্যান?’

রুদ্রর ঘাড় অবধি ঢেউ খেলানো চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে আছে। ক্যাটস আই চোখে দপদপ করছে বিরক্তি। সে হাঁড়িপানা মুখ করে সামির পেছন পেছন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসল। দেখা গেল ড্রইং রুমের সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে আকাশ, অমৃতা আর হৃদি। তিন মূর্তিকে দেখে রুদ্র বিস্মিত গলায় বললো, ‘কী কাহিনী?তোরা সব এত রাত্রে আমাদের বাসায় কী করস?’

অমৃতা বললো, ‘আজকে থেকে ছাব্বিশ বছর আগে এই দিনে একটা প্রথম শ্রেণীর গাধার জন্ম হইছিল। সেই গাধাকে জন্মদিনের উইশ করতে আসছি।’

– ‘মানে কী? কোন গাধা?’

আকাশ বললো, ‘বুয়েট পাশ গাধা।’

রুদ্র এবার একটু ভড়কে যাওয়া গলায় অনেকটা স্বগতোক্তির মতো বলে উঠল, ‘আজকে কত তারিখ?’

সেন্টার টেবিলের ওপরে রাখা কেকের বাক্সটা খুলতে খুলতে উত্তর দিল সামি, ‘ডিসেম্বরের দশ তারিখ।’

শুনে রুদ্র ধপ করে সোফার উপর বসে পড়ল, ‘শালা! জীবন থেকে আরো একটা বছর চলে গেলো!’

– ‘তাহলে কি এখন আমাদের আনন্দ করার বদলে শোক পালন করা উচিত?’ হৃদির বক্র কণ্ঠী প্রশ্ন।

রুদ্র ওর আউলবাউল চুল গুলো হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে উদাস গলায় বললো,’দোস্ত আজকে আমার বার্থডে সেলিব্রেট না করলে হয়না? আজ আমার মনটা খুবই খারাপ।’

রুদ্রর পাশে একই সোফায় কিছুটা দূরত্বে সামি বসে ছিল। বাকি বন্ধুরা অন্য দুটি সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। এই ফ্ল্যাটটায় আসবাব বলতে তেমন কিছু নেই। ড্রইং-কাম-ডাইনিং জুড়ে রয়েছে পাঁচ গদি বিশিষ্ট সেগুন কাঠের পুরোনো আমলের সোফা সেট, আর একটি পারটেক্স এর ডাইনিং টেবিল। তিন চার মাস হয়ে গেল রুদ্র আর সামি বসুন্ধরার এই ফ্ল্যাটে উঠেছে। ভাড়া পঁচিশ হাজার। সামি এদিককার একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও লেভেলের শিক্ষক হিসেবে জয়েন করেছে সম্প্রতি। রুদ্র রহমানেরও চাকরি হয়েছে, একটি স্বনামধন্য ডেভলপার কোম্পানিতে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে। মাসে চল্লিশ হাজার বেতন। এই স্বল্প আয় নিয়ে দুই বন্ধু বলতে গেলে এক রকম দুঃসাহস করেই বাসাটা ভাড়া নিয়ে ফেলেছে। না নিয়ে উপায় ছিলোনা। প্রয়োজনটা এত বেশি ছিল যে বিকল্প কিছু ভাববার সময় পায়নি তারা।

– 'মন খারাপ কেন? মনীষার জন্য?' প্রশ্ন করল সামি।

– 'মনীষার কী হইছে? আমি তো কিছুই জানিনা!' আকাশ বিস্মিত। হৃদিতা বাতাসে রহস্যের গন্ধ পেয়ে উদ্বেগ নিয়ে বলল, 'আমিও তো জানিনা। কী হইছে মনীষার? মরে গেছে নাকি?'

শুনে রুদ্র আগুন চোখে তাকালো হৃদির দিকে। মানুষের চোখ দিয়ে ড্রাগনের মতো আগুন ছুঁড়ে মারা সম্ভব হলে রুদ্র এই মুহূর্তে নির্ঘাৎ অগ্নি বর্ষণ করে হৃদিকে ঝলসে দিত। হৃদি সেই আগুন দৃষ্টির সামনে কাঁচুমাচু হয়ে বললো, 'এভাবে তাকাচ্ছিস কেন?কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে! চুল পাগলের মতো, চেহারা ভূতের মতো!' এটুকু বলে একটু থামলো হৃদি। দু চোখ মেলে রুদ্রকে আগাগোড়া ভারী মনোযোগ দিয়ে দেখলো একবার। তারপর খুব সিরিয়াস ভাবে বললো, 'তোর এই কিম্ভূত চেহারা দেখে ভয়ে পালাইছে নাকি মনীষা? সেই সম্ভাবনা আছে অবশ্য।'

হৃদির বলার ঢঙে বাকি বন্ধুরা হেসে ফেললো।

আকাশ বললো, ‘আসলেই, মনীষার কাহিনী কী?’

বেনসনের বাক্স খুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে চেপে ধরল সামি- ‘আজ সকালের ফ্লাইটে সে তার ছেলেকে নিয়ে মালয়েশিয়া গেছে। ছেলে মালয়েশিয়ায় পড়াশোনা করবে।’

হৃদি বিস্ময় নিয়ে বললো, ‘ওমা!তাতে সমস্যা কোথায়?রুদ্র এমন মরা কান্না কানতাছে কেন?আমি তো মনে করছি মারাত্মক কিছু ঘটছে বুঝি।’

অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে লাইটার জ্বালিয়ে নিল। তারপর মোমবাতিতে আগুন ধরাতে ধরাতে বললো, ‘মরা কান্নার কারণ হচ্ছে, মনীষার ছেলেকে রুদ্রর আজকের পর থেকে আর পড়াইতে হবেনা। এর মানে মনীষার বাসায়ও এরপর থেকে রুদ্রর আর যাওয়া হবেনা। অতএব মনীষার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার রাস্তা আপাতত বন্ধ।’

হৃদি খুব বিশাল কিছু বুঝে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, ‘ও! তাই বল!’

– ‘আরে ধুর, এইটা কোনো কথা হইলো? মনীষা তো ব্যাটা সিঙ্গেল। ছেলেও থাকবো না এখন। তোর রাস্তা আরো ক্লিয়ার। শালা গাধার বাচ্চা গাধা, বুদ্ধি বলতে কিছুই নাই তোর মাথায়।’ বলল আকাশ বিজ্ঞ গলায়।

আকাশের এমন উজ্জ্বল জাঁকালো ভবিষ্যৎ বাণী শোনার পরেও রুদ্রকে খুব একটা তৃপ্ত হতে দেখা গেলো না। পাঁচটা লম্বা লম্বা মোমবাতিতে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে।

অমৃতা উঠে গিয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল, ফ্যান বন্ধ করলো। মুহূর্তের মাঝে আগুন রঙের আলোয় ভরে গেলো সারা ঘর।

রুদ্র বললো, 'পাঁচটা মোমবাতি কী মনে কইরা আনলি? আমার কি পাঁচ বছর বয়স নাকি?'

রুদ্রর প্রশ্ন গ্রাহ্য না করে বন্ধুরা সব সোফা ছেড়ে সেন্টার টেবিলের চারপাশে কার্পেটের ওপর হাঁটু গেঁড়ে বসল, গোল হয়ে। সামি রুদ্রর হাত ধরে টেনে নামাল মেঝেতে। হাতে কেক কাটার ছুরি ধরিয়ে দিয়ে বললো,'নে কেক কাট।'

– 'আগে মোমবাতিতে ফুঁ দে।' আদেশ করলো অমৃতা।

– 'দাঁড়া দাঁড়া!' বাধা আসল হৃদির তরফ থেকে।

বন্ধুরা বিরক্তি প্রকাশ করলো, 'কী হইলো আবার?'

হৃদি সোফার উপর থেকে ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা এক টানে হাতে তুলে নিল। চেইন খুলে বের করল একটা লাল রঙের চিরুনি।

– 'বার্থডে বয়ের চুল দেইখা মনে হইতেছে এই চুলের উপর দিয়া ঘূর্ণিঝড় বইয়া গেছে। চুলটা ঠিক কইরে দেই।' বলে হৃদি খুব যত্ন নিয়ে রুদ্রর মাথার চুল আঁচড়ে দিলো। ব্যাগ থেকে খুঁজে পেতে একটা রবার ব্যান্ড বের করে ঝুঁটিও করে দিল।

ঠিক সেই সময় অমৃতার ফোনে টুংটুং করে একটা বাজনা বেজে উঠলো।

বিভাবরী ফোন করেছে মেসেঞ্জারে। বিভার ফোন দেখে রুদ্রর বিষণ্ণ, ম্লান মুখখানা কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হল। তার মনের ভেতরে এতক্ষণ অবধি চাপা একটা ভয় কাজ করছিল যে বিভা হয়তো তার জন্মদিনের কথা ভুলে বসে আছে। শেষ মুহূর্তের এই কলটা তার বুকের ভেতর থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস নিংড়ে বের করে আনল। মোবাইলের ক্যামেরায় উঁকি দিল বিভা। তার খোলা চুল ছড়িয়ে আছে ঘাড়ময়। সিঁথিতে গাঢ় লাল রঙের সিঁদুর। প্রতিমার মতো টানা দুটি চোখে হালকা কাজল কালো আভাস। মোবাইলের পর্দায় বন্ধুদের মুখ ভেসে উঠতেই সে উচ্ছ্বল গলায় বললো, 'কই, বার্থডে বয় কই?'

অমৃতা ফোনের ক্যামেরা ঘুরিয়ে দিল রুদ্রর দিকে, বললো-'এইযে বার্থডে বয় এইদিকে।

– 'শোন রুদ্র, তোর জন্মদিন উপলক্ষে আমি একটা ছোট ছড়া লিখছি এখন সেই ছড়ায় সুর দিয়ে গান গাবো। তারপর আমরা কেক কাটবো। ওকে?'

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে বললো, 'বিভাবরী লিখছে গান?সূর্য আজকে কোনদিকে উঠছিল?'

বিভা আর কথা না বাড়িয়ে গান গাওয়া শুরু করলো,

'রুদ্র রহমানের আজ জন্মদিন

চারপাশটা তাই খুশিতে রঙিন

বয়স ছাব্বিশ বছর

জন্মদিনের প্রহর

রুদ্র রহমানের হাসি

আমরা ভালোবাসি!’

ছড়াগান শুনে বন্ধুরা সবাই একচোট হাসলো। মনীষার বিচ্ছেদের যাতনায় কাতর রুদ্রর মুখেও একটা চওড়া হাসি ফুটে উঠলো। হৃদি হৈ হৈ করে উঠলো, ‘বিভার বাচ্চি এই গান তুই লিখছস?নাকি রুদ্র লিখছে?অন্যের লেখা গান নিজের বলে চালায় দিচ্ছিস?চুরনি কোথাকার!

বিভা নির্বিকার গলায় বললো, ‘রুদ্র লিখেছে তার প্রমাণ কী?প্রমাণ দে! -’আমরাই প্রমাণ। আমাদের সবার মনে আছে গত বছর তোর জন্মদিনে রুদ্র এই গানটা লিখছিল।’

অমৃতা একটু ধমকের সুরে বললো, ‘আরে রাখতো এইসব প্যাঁচাল এখন! গান শেষ এখন কেক কাটার পালা। আয় কেক কাটি।’

রুদ্র ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভালো। সবগুলো মোমবাতি একে একে নিভে যাবার পর সারা ঘর ডুবল অন্ধকারে। অমৃতা উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালো। কেক কাটার আনুষ্ঠানিকতা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার পর সামি বললো, ‘এবার বল, কী চাই তোর বার্থডে উপলক্ষে?’

– ‘যা চাই তাই দিবি?’ রুদ্রর প্রশ্ন।

– ‘চেষ্টা করে দেখবো।’

রুদ্র মাথা চুলকে, দাড়ি হাতড়ে কয়েক সেকেন্ড খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা ভাবলো, তারপর গম্ভীর গলায় বললো,'দোস্ত এই মুহূর্তে আমি একটা টপলেস মেয়ে দেখতে চাই।'

কথাটা ওর মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র বন্ধুদের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। আকাশ আর সামি হো হো করে উচ্চ স্বরে হেসে উঠলো। অমৃতা ভ্রু কুঁচকে জহুরি চোখে তাকালো রুদ্রর দিকে আর হৃদিতা মুখ ঝামটা মেরে বলে উঠলো, 'ছি ছি ছি! এতো ফাজিল কেন তুই রুদ্র?ফাজিলের গাছ কোথাকার!'

রুদ্র মুখ গোঁজ করে বললো,- 'ফাজিলের গাছ হব কেন? হইলে ফাজিলের মানুষ হব। গাছ হইতে যামু কোন দুঃখে?'

– 'কী মামা?আবোল তাবোল কথা কও কেন?মজা নেও?' অমৃতার প্রশ্ন।

রুদ্র মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো, 'মজা নেওয়ার মুড নাই আমার আজকে। সিরিয়াসলি গাইজ! আই ওয়ান্ট টু সি আ টপলেস গার্ল, ফর রিয়েল!'

বিভাবরী তখনো অনলাইনে। রুদ্রর বলা কথাগুলো তার চারশ স্কয়ার ফিটের লম্বাটে শোবার ঘরে একেবারে বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটাল যেন। অভিজিৎ বিছানার পাশে রাখা একটি ইজি চেয়ারে বসে কোলের ওপর ল্যাপটপ রেখে কাজ করছিল। রুদ্রর বলা শেষ বাক্যটা তাকে নাড়িয়ে দিলো। সে বিস্ফোরিত চোখে তাকালো স্ত্রীর দিকে।

বিভা সোফায় শুয়ে শুয়ে আরাম করে কথা বলছিলো বন্ধুদের সাথে। অভিজিৎ কে ওরকম পিলে চমকে উঠতে দেখে সে উদ্বেগ নিয়ে বললো,

'আপনার আবার কী হল?'

অভিজিৎ কোনো কথা বললোনা। হতচেতন ভাবে চেয়ে রইল শুধু। আর ওদিকে রুদ্র বলেই যাচ্ছে, 'আমার বয়স ছাব্বিশ ঠিক আছে?এত বয়স হয়ে গেলো কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি কোনো সত্যিকারের টপলেস মেয়ে দেখিনাই। চিন্তা করতে পারিস? এইটা কোনো লাইফ হইলো?'

বিভার মুখে একটু হালকা অস্বস্তি খেলা করতে লাগলো। শোয়া থেকে উঠে বসলো সে ধীরে ধীরে। বিরক্তি নিয়ে অভিজিৎকে বললো, 'এরকম ব্যাক্কলের মত তাকিয়ে আছেন কেন? কী হয়েছে আপনার?

অভিজিৎ এবার স্বগতোক্তি করলো যেন, 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ। '

বিভা ফোন কাটলো। এই লোকটা তার জীবনটা একেবারে নরক বানিয়ে ছাড়বে। বন্ধুর জন্মদিনেও দু দণ্ড শান্তিতে কথা বলার জো নেই।

– 'এতো ছি ছি করছেন কেন? সমস্যা কী?'

অভিজিৎ ল্যাপটপের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শীতল অথচ অনুচ্চ গলায় বলল, 'রাত দুপুরে একটা ছেলে একটা মেয়ের কাছে এমন জঘন্য আবদার করতে পারে? ছিঃ'

বিভা একটু অপ্রতিভ হল কথাটা শুনে। রুদ্র যে ফট করে এসব বলে বসবে তা কে জানতো! এই ছেলের কান্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই। আজ দোষটা অবশ্য বিভার নিজের। তার উচিত ছিল অভিজিতের চোখের আড়ালে গিয়ে কথা বলা। কিন্তু এই বাড়িতে আড়াল কোথায়?একান্নবর্তী পরিবার এটা। এক বাড়িতে একত্রে তিনটি পরিবারের বাস। তার ওপর বিভার ছোট দেবরটি গত এক সপ্তাহ যাবৎ টাইফয়েডে ভুগছে। তাকে দেখতে কাছের দূরের সকল আত্মীয় স্বজন বলা নেই, কওয়া নেই যখন ইচ্ছে তখন হাজির হচ্ছে।

বিভা কোনোকালেই ঘরোয়া মেয়ে ছিলো না। সে বাবা মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে। ছিমছাম, ছোট্ট, পরিবার তাদের। সাংসারিক কোনো দায় তার ওপর কখনো চাপানো হয়নি। এ কথা সত্য যে, সব মেয়েদের জীবনেই বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ির তফাৎটা ভারী প্রকট এবং প্রকাশ্য। কিন্তু বিভার ক্ষেত্রে সেই তফাৎটা একেবারে হয়ে গেছে আকাশ পাতাল। বিভার মতো আমুদে, চপল, দুরন্ত এবং সর্বপরি ছটফটে স্বভাবের একটি মেয়ে যেন এ বাড়ির বৌ হিসেবে একেবারেই বেমানান।

এই বেমানান জীবনটার সাথেই আপাতত তার মানিয়ে চলার যুদ্ধ করতে হচ্ছে। সেই সাথে অভিজিৎ এর মতো রসকষ হীন এক জড়পদার্থকে দিনের পর দিন সহ্য করতে হচ্ছে। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন যে কোন জন্মের পাপের শাস্তি ভোগ করছে সে। অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বিভা একটু কড়া গলায় বললো, ‘জঘন্য আবদার বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?’

অভিজিতের চোখদুটোতে অস্বস্তি খেলছে। তার দাড়ি কামানো পরিষ্কার তামা বরণ গালে একটু রাঙা ভাব। চুল পরিপাটি। চোখে একটি মোটা ফ্রেমের চশমা। তার কথা বলার ভঙ্গিটিও ভারী মার্জিত। পুরোদস্তুর ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় আর কি। কিন্তু

ভদ্র হলে কী হবে,বিভা জানে মনে মনে লোকটা ষোল আনা শয়তান। নইলে কেন বিভার ফোনে অমন চুপিচুপি আড়ি পাতা? এই লোকের অভিধানে কি প্রাইভেসি বলে কোনো শব্দ নেই?

অভিজিৎ ল্যাপটপ থেকে চোখ না সরিয়েই বললো, 'একটা এডাল্ট ছেলে একটা এডাল্ট মেয়েকে কী করে এমন অসভ্য কথা বলতে পারে?'

– 'একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আপনি কোথায় পেলেন হ্যাঁ? এটা একটা গ্রুপ কনভারসেশন ছিল। ছয়টা ছেলেমেয়ে একসাথে কথা বলছিল। আপনি বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখছেন কেন?'

– 'এরকম একটা কথা বলতে আপনার বন্ধুর বাঁধলোনা?'

বিভা একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বললো, 'রুদ্র জানতো না যে আপনি আমাদের কথা গিলছেন বসে বসে, জানলে জীবনেও এমন কথা বলতো না আপনার সামনে।'

অভিজিৎ থমথমে গলায় বললো, 'ও এটা রুদ্র ছিল?আমি তো ভেবেছিলাম এ আপনার বয়ফ্রেন্ড।'

বিভা এবার বিরক্ত হলো, 'আপনি কথায় কথায় আমার বয়ফ্রেন্ডকে টেনে নিয়ে আসেন কেন?'

– 'আমি টানার কে? টানবেন তো আপনি। একটু পরেই ফোন কানে নিয়ে ফুসুর ফাসুর শুরু হবে। চলবে সারা রাত।'

– 'হ্যাঁ চলবে। কিন্তু তাতে আপনার সমস্যা হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আপনিই তো অনুমতি দিয়েছেন আমাকে, তাইনা? আপনি তো বলেছেন যে আমার একশোটা বয়ফ্রেন্ড থাকলেও আপনার কিছু আসবে যাবেনা, বলেন নি?

– 'হ্যাঁ বলেছি। আপনাকে আমি এও বলেছি যে এভাবে একটা সম্পর্ক টেনে হিঁচড়ে জোর করে টেনে নিয়ে যাবার মানে হয়না। আমাদের উচিত ডিভোর্স নিয়ে নেয়া।'

– 'হ্যাঁ নেবো। বলেছি তো বাবার শরীর একটু সুস্থ হলেই নেবো। এতো তাড়াহুড়ার কী আছে?'

অভিজিৎ এবার বিভার দিকে সরাসরি তাকায়, অকপট ভাবে বলে, 'আপনি আসলে ভীষণ স্বার্থপর একটা মানুষ। আপনার অনুরোধে আমি আপনাকে বিয়ে করেছিলাম …'

বিভা অভিজিৎকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ঝগড়াটে গলায় বলে উঠলো, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সব মনে আছে। আপনি আমাকে বিয়ে করে আমার বাবার জীবন ভিক্ষা দিয়েছিলেন। আমার মান সম্মান বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু এসব কথা এখন কেন তুলছেন? আমার বন্ধুদের কথা শুনলেই আপনি এমন জ্বলে উঠেন কেন সবসময় বলুন তো? হিংসে হয় ওদের?

অভিজিৎ ল্যাপটপ বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। পায়ে চপ্পল লাগাতে লাগাতে খিটখিটে গলায় বলতে লাগলো, 'চলেই যাচ্ছি আমি। ইচ্ছামতো প্রেম করুন এবার!'

বলতে বলতে অভিজিৎ গায়ে চাদর জড়িয়ে পা বাড়ালো বাইরে। এদিকে সামি ল্যাপটপ চালু করতে করতে বলল, ‘তুই ন্যুড মেয়ে দেখতে চাস? দাঁড়া দেখাচ্ছি।’

রুদ্র বিরক্তিতে কাদা হয়ে গেলো, ‘ধুর শালা, ভার্চুয়াল না। সামনা সামনি, সত্যিকারের! ভার্চুয়াল তো সারাদিনই দেখি।’

হৃদি ফোড়ন কাটল, ‘সারাদিন? লজ্জা শরমও নাই, খুব বাহাদুরির গলায় বলতেছে আবার। আল্লাহ!’

ঠিক সেই সময় রুদ্রর মোবাইলে একটি অচেনা নম্বর থেকে ফোন আসল। রুদ্র একটু দ্বিধান্বিত ভাবে চেয়ে রইলো নম্বরটার দিকে খানিকক্ষণ। ফোন রিসিভ করলো ভ্রু কুঁচকে। বন্ধুরা কেউ কোনো কথা না বলে সকল মনোযোগ ঢেলে দিল তার দিকে। রুদ্র ‘হ্যালো’ বলার পর কয়েকটা সেকেন্ড কাটলো নিভৃতে। ধীরে ধীরে তার কুঁচকে থাকা ভ্রু সহজ হল। বিড়াল চোখের ধূসর তারা দুটি চকচক করে উঠলো। এক অত্যুজ্জ্বল হাসি ফুটে উঠল দাড়ি ভর্তি গালে। সে মোবাইলের স্পিকার হাতের তালু দিয়ে ঢেকে মুখটা একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বন্ধুদের বললো, ‘মনীষা!’

শুনে বন্ধুরা এক চাপা উল্লাসে ফেটে পড়লো। সামি শিস দিয়ে উঠলো আনন্দে। আকাশ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খুব নিচু স্বরে ‘ইয়েস ইয়েস! বলে হাত পা ছুঁড়ে দুই তিনটা লাফ দিলো। রুদ্র ফোন হাতে নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলো বারান্দার দিকে। রেলিং এ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফোন কানে নিয়ে বললো, ‘হ্যাঁ মনীষা, বলুন।’

– ‘কোনো সমস্যা?’ মনীষার প্রশ্ন।

– ‘না সমস্যা নয়। আমার ফ্রেন্ডরা হৈচৈ করছে তো, তাই আপনার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না।’

– ‘ও, তোমরা জন্মদিনের পার্টি হচ্ছে বুঝি?’

– ‘না পার্টি কিছুই না। ওরা কেক নিয়ে এসেছিল। আপনার খবর কী?রাইয়ান কেমন আছে?’

– ‘ভালোই। আজকে ওর এডমিশনের সব ফর্মালিটিস কমপ্লিট হল। নেক্সট উইক থেকেই ক্লাস শুরু।’

– ‘বাহ্ বেশ ভালো। ওর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে?’

– ‘হ্যাঁ হোস্টেলেই থাকবে। যাই হোক, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে ফোন করলাম তোমাকে। তুমি ভালো আছো তো?’

ধুপ ধাপ করে শব্দ হল পেছনে। রুদ্র ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বারান্দার দরজার ওপাশে তার বন্ধুরা নিজেদের মাঝে ধস্তাধস্তি করছে। অর্থাৎ কে কার আগে কান পেতে কথা শুনবে সেই প্রতিযোগিতা চলছে ওদের মাঝে। বিরক্ত রুদ্র হনহনিয়ে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে। দরজাটা আধ খোলা অবস্থায় ছিল। রুদ্র দরজার ফাঁক গলে মাথা বের করতেই সবকটা বান্দর পড়িমরি করে জায়গাটা থেকে সরে দাঁড়ালো। সামি ঝড়ের বেগে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে হৃদিতাকে একটা অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা দিয়ে ফেলল। হৃদি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্পেটের ওপর। পড়েই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘এই হাতির বাচ্চা হাতি!দেখে শুনে চলতে পারিস না? পিষে দিলি তো আমাকে!’

শুনে সামি চোখে মুখে এক অদ্ভুত কায়দা ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘আমি হাতির বাচ্চা? আর তুই কী? আমি হাতির বাচ্চা হইলে তুই হাতির নানী!’

রুদ্র দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। এখন বন্ধুরা কেউ ওর দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করছেনা। ভাবটা এমন দেখানো হচ্ছে যেন রুদ্রর উপস্থিতি তারা টেরই পাচ্ছেনা।

– ‘তোরা কি আমার কথা শোনার চেষ্টা করতেছিস?’ বিরক্তি ঝরে পড়ল রুদ্রর কণ্ঠ থেকে।

অমৃতা তেরছা গলায় বলল, ‘আমাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নাই। বইসা আছি তোর কথা শোনার জন্য।’

– ‘হেই এলেক্সা! প্লে আ সং ফ্রম মাই প্লে লিস্ট।’ ঘরের পশ্চিম কোণে রাখা পারটেক্স এর বুকশেলফটার দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় বলল রুদ্র। এলেক্সা নামক গোলাকার সাউন্ড বক্সটিতে তাৎক্ষণিক ভাবে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো, যান্ত্রিক গলা উত্তর দিল, ‘প্লেইং আ মিউজিক ফ্রম ইওর প্লেলিস্ট।’ তারপর চলতে শুরু করলো গান।

আকাশ বিরক্ত হয়ে বলল, ‘গান বাজনা বাজায় দিলি ক্যান? আমরা তো একটা ইম্পরট্যান্ট কাজ করতাছি দোস্ত! তোর জন্য টপলেস মাইয়া খুঁজতেছি। ডিস্টার্ব করলে তো হবেনা।’

রুদ্র আর কোনও কথা না বলে নিজের মাথাটা টেনে নিয়ে গেল দরজার ওপাশে।

এদিকে এলেক্সা তখন গান শোনাচ্ছে, ‘নক নক নকিং অন হেভেন্স ডোর।

গানের শব্দে এতো জোর যে রুদ্রর ফোনে আড়ি পাতার চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল। অতএব বন্ধুরা রুদ্রকে ছেড়ে দিল এই যাত্রায়। সামি হঠাৎ খুব জরুরি গলায় বলে উঠলো, ‘চল,রুদ্রর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা খুব ফাটাফাটি একটা কাণ্ড করে ফেলি। বিভার বাসায় গিয়ে ওকে সারপ্রাইজ দেই!’

আকাশ আঁতকে উঠে বলল, ‘বিভার বাসায় মানে?ইন্ডিয়া?’

– ‘হ্যাঁ, আমাদের সবার পাসপোর্ট আর ভিসা তো রেডিই আছে।’

– ‘কিন্তু বিভা খুব সম্ভবত দু তিনদিনের মাঝে জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছে। ওর বরের সাথে। অমৃতা বলল।

– ‘আমরা তো জলপাইগুড়িই যাব।’

হৃদি মুখ ঝামটা মেরে বলল, ‘হ, জলপাইগুড়ি যাবা তুমি, অন্যের বউয়ের লগে পিরিত করার জন্য।’

এ কথায় সামির ফর্সা খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা গালে লালচে আভাস লাগলো। হৃদির দিকে স্থির চোখে চেয়ে সে জোরালো গলায় বলল,

– ‘অন্যের বউ আবার কী? ওদের ডিভোর্স তো হয়েই যাচ্ছে কদিন পর। বিভা আমার গার্লফ্রেন্ড, মনে রাখিস!’

– ‘আমি এসবের মধ্যে নাই। তোরা গেলে যা।’ হৃদি মাছি তাড়ানোর মতো উড়িয়ে দিল প্রস্তাবটা।

আকাশ বলল, ‘কেন? আমার তো আইডিয়াটা জোশ মনে হচ্ছে। আর আমরা অনেকদিন ধরেই বিভাকে দেখতে যেতে চাচ্ছিলাম। যাব যাব করে কয়েক মাস হয়ে গেল। আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবেনা।’

–হুম। ঠিক বলেছিস। লেটস মেক আ প্ল্যান।’ মতামত জানাল অমৃতা।

২

কেকের টুকরা মুখে দেয়ার সাথে সাথে রুদ্র বলে উঠলো, ‘এই কেকটা কে কিনছে?’

– ‘কেন কী সমস্যা?’ সামির প্রশ্ন।

– ‘বল না, কে কিনছে?’

– ‘অমৃতা।’

– ‘এই ছেমড়ি, তুই জানোস না আমি চকলেট কেক পছন্দ করিনা? চকলেট কেক কেন কিনছস?’

অমৃতা একটু নিভলো, ‘ওহ ভুইলা গেছিলাম দোস্ত। সরি!’

– ‘সরি বললে তো হবেনা। দে পাঁচশ টাকা দে!’

– ‘মানে কী?’

– ‘মানে কী বুঝোনা?কেক পছন্দ হয়নায় আমার,তাই ক্ষতিপূরণ দিবি এখন।

– ‘ইশ, শখ কত!’

রুদ্র হাত পেতে নাছোড়বান্দা গলায় বললো, ‘দে ট্যাকা দে, একটা কেক ঠিক মতো আনতে পারবি না, টপলেস মাইয়াও দেখার ব্যবস্থা করতে পারবিনা, আবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ট্যাকাও দিবিনা! এইটা তো হয়না মামা!’

– ‘আরে আমরা তো তরে ইন্ডিয়া নিয়া যাইতেছি। এর চেয়ে বড় গিফট কী হইতে পারে?’ সামি বলল।

– ‘ইন্ডিয়া যাওনের খরচ তাইলে ফ্রি?’

– ‘হ ফ্রি!’

রুদ্র কেক চিবোতে চিবোতে উদাস গলায় বলল, ‘আচ্ছা সেইটা তো এক সপ্তাহ পরের কথা, এখন আমারে পাচঁশ ট্যাকা দে।’

– ‘দিমু না।’ অমৃতার দৃঢ় সিদ্ধান্ত।

ওরা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে সোফার ওপর বসে ছিল। হৃদি বসেছে রুদ্রর পাশের গদিতে। সে ছোঁ মেরে রুদ্রর হাত থেকে কেকের প্লেটটা টেনে নিল। ধমকে উঠে বললো, ‘চকলেট কেক তো তোর পছন্দ না। তবুও রাক্ষসের মত গপগপ কইরা খাইতেছিস কেন?’

– ‘তোরা কষ্ট করে কিনে আনছিস। এখন না খাইলে তোদের মন খারাপ হবেনা? তাই জোর করে খাইতেছি।’

রুদ্রর আধখাওয়া কেকটা টুপ করে মুখে পুরে দিল হৃদি। চিবোতে চিবোতে বললো, ‘আমাদের মোটেও মন খারাপ হবেনা। তুই না খাইলে বরং আমাদের ভাগে বেশি পড়বে। আমরা খুশি।’

– ‘তাইলে টাকা দে!’ আদেশ করলো রুদ্র

আকাশ খ্যাঁক দিয়ে উঠে বললো, ‘এই ফকিরের বাচ্চা ফকির! খালি ট্যাকা ট্যাকা করতেছিস, সমস্যা কী তর? মনীষা কী কইছে সেইটা কস না ক্যান?

– ‘দুই তিনদিনের ভিতর ফিরবে দেশে।

– ‘তারপর?’

রুদ্র নির্বিকার গলায় বলল, ‘তারপর আমরা বিয়ে করব।’

এ কথা শুনে বন্ধুরা প্রথমে ওর দিকে চোখ বড় করে চাইল, তারপর ফেটে পড়ল অট্টহাসিতে।

– ‘হাসতেছিস ক্যান? অসম্ভব কিছু বলে মনে হচ্ছে?’ রুদ্রর গলার স্বরে একটু তেজের আঁচ টের পাওয়া গেল।

অমৃতা বললো, ‘অবশ্যই অসম্ভব কিছু।’

রুদ্র এবার কোমর বেঁধে তর্কে নামলো,’কেন?অসম্ভব কেন?’

‘মনীষা তোকে বিয়ে করবে না।’

– ‘কেন করবেনা?’

– ‘কেন করবে?’ কাটখোট্টা প্রশ্ন অমৃতার।

সামি ফ্রিজ থেকে একটা কোকের বোতল বের করে নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখেছে। সাথে পাঁচ টা কাচের গ্লাস। গ্লাসে কোক ঢালতে ঢালতে সে বিজ্ঞ গলায় রুদ্রকে বলল, ‘শোন মামা, পছন্দ হইছে তোমার মহিলারে, এখন প্রেম করার চান্স থাকলে প্রেম কর। কিন্তু বিয়া শাদীর চিন্তা ভুলেও মাথায় আইনো না।’

– ‘বিয়ে করতে না পারলে প্রেমও করব না।’ বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল কথাটা রুদ্র।

শুনে বন্ধুরা সব হৈ হৈ করে উঠল।

– ‘খাইছে! রুদ্র রহমানের মুখে এমন সিরিয়াস কথা! ক্যামনে কী!’ বিস্ময়ে কাদা হয়ে গেল অমৃতা।

হৃদি বললো, ‘মনীষা তো মনে হইতাছে ওরে তাবিজ টোনা করছে।’

'হায় মনীষা!' সামির বুক থেকে যেন বেরিয়ে আসল হতাশা বিদ্ধ এক খেদ। অমৃতা ঠিক সামির সুরটাই নকল করলো, 'ইশ মনীষা!'

– 'উফ মনীষা!' আকাশও ধরল তাল।

রুদ্রর ভ্রু দুটি বেঁকে গেল, 'আজকে আমার একটা জন্মদিন। কোথায় তোমরা নেচে গেয়ে আমাকে বিনোদন দিবা, তা না উল্টা আমারে নিয়াই মজা করতেছ?'

সামি বলল-'তোমারে বিনোদন দেয়ার জন্যেই তো ইন্ডিয়ার প্ল্যান করলাম। আচ্ছা শুনো সবাই, আগামী বৃহস্পতিবার রাতে তাহলে আমরা রওয়ানা হচ্ছি। আমি টিকেট বুকিং দিতেছি কালকেই।'

– 'ঢাকা থেকে কলকাতা নাহয় ফ্লাইটে গেলাম। কিন্তু কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি যাবো কেমনে?' আকাশের প্রশ্ন।

– 'আমি দেখতাছি, তোদের টেনশন নিতে হবেনা।'

অমৃতা বলল, 'তাহলে মাথাপিছু খরচ কত পড়তেছে?'

– 'শুধু টিকেট ভাড়াই তো লাগছে। থাকা খাওয়া ফ্রি। মানে বিভার বাসায়ই তো যাচ্ছি। ও নিশ্চয়ই থাকতে দিবে, আর থাকতে দিলে খাইতেও দিবে। কী বলিস?' আকাশ বলল।

– ‘আহা মনে মনে কত আশা! যাইব, থাকব আবার খাইবও। এই না হইলে বাঙালি, বইতে দিলে শুইতে চায়।’ ফোড়ন কাটলো হৃদি। তারপর উঠে দাঁড়ালো। তাড়া দিয়ে বলল, ‘আমার বাসায় যাইতে হবে। কাজিন আসছে বেড়াতে।’

ঘড়িতে তখন রাত একটা বাজে। হৃদির বাসা থেকে এর মাঝেই বেশ কয়েকবার ফোন এসে গেছে। বাড়িতে বলা আছে যে আজ রুদ্রর জন্মদিন, তাই বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। মূল দরজার চাবিও রাখা আছে সাথে। মাকে বলেছে ফিরতে দেরি হলে যেন ঘুমিয়ে পড়ে। অযথা জেগে থাকার কোনো মানে হয়না। কিন্তু এই মাত্র মায়ের নম্বর থেকে আসা এস এম এস টাই বলে দিল যে তিনি ঘুমান নি এখনো। ঠিক ঠিক জেগে বসে আছেন মেয়ের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায়।

আকাশ বললো, ‘আজকে থাইকা যা, আন্টিরে বল।’

– ‘না না, এখন আর কিছু বলা যাবেনা। তোরা থাক। তাছাড়া আমার কাজিনটাও ওয়েইট করতেছে। আমি যাই।’

– ‘এত রাতে যাবি কেমনে একা একা?’ সামি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘চল, আমি নামায় দিয়ে আসি তোরে।’

উল্লেখ্য, সামির লাল মার্সিডিজ বেঞ্চটি তার মালিকানায় ফেরত এসেছে পুনরায়। নিজের বাবার টাকাকড়ি, সম্পদ এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এই সমস্তই সে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করেছে সত্য, কিন্তু তার মা শেষ পর্যন্ত তাকে এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে পিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত উপহার কখনো পায়ে ঠেলতে হয়না। এই গাড়িটি তার পিতা তাকে চব্বিশতম জন্মদিনে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। মায়ের মত হল যে, পিতৃদেবের কাছ থেকে হাত খরচ না নিলেও উপহার হিসেবে পাওয়া বিশেষ জিনিসটি

কোনোভাবেই অবহেলা করা ঠিক হবেনা। কিন্তু একটা চার চাকার গাড়ির খরচা জোটানোর মতো আর্থিক অবস্থা সামির এখনো হয়ে ওঠেনি। মা সেই সমস্যারও সমাধান করেছেন। ব্যাংকে সামির নামে মোটা অংকের টাকার এফ ডি আর করে রেখেছেন তিনি। প্রতি মাসে ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ইন্টারেস্ট বা সুদের দিয়েই গাড়ির খরচ চালিয়ে নেয়া যায় দিব্যি।

অমৃতা আর আকাশ আজ সামিদের ফ্ল্যাটেই থেকে যাবে। রাত জাগবে, আড্ডা দেবে। কাল শনিবার, ছুটির দিন। কারো অফিস যাবার তাড়া নেই। হৃদিতা সাধারণত উইকেন্ডের এসব রাতজাগা আসর গুলো মিস করতে চায়না। বন্ধুরা সব চাকরি জীবনে প্রবেশ করেছে। তার নিজেরও এমবিএ ক্লাস থাকে সপ্তাহে তিন দিন। ছুটির দিনগুলোতেই যা একটু আড্ডা টাড্ডা দেয়ার সুযোগ হয়। সেই সুযোগটাও আজ হৃদি হাতছাড়া করছে বলে বন্ধুরা বুঝি মনে মনে খানিকটা অসন্তুষ্ট হল। রুদ্র একটু মন খারাপের গলায় বলল,'থেকে গেলেই পারতি।'

– 'কাজিনটা না আসলে থাকতাম। ও আমার সাথে থাকার জন্যেই আসছে, সিলেট থেকে।

হৃদি আর সামি যখন নিচে নেমে গ্যারাজে আসলো তখন বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ঝুমঝুম করা রাত। চারপাশ বড্ড নীরব। রাজপথের উপর আলগোছে মাকড়সার জালের মতো ঝুলে আছে কুয়াশার কৃশকায় এক সাদাটে চাদর। নগর জীবন ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ হঠাৎ শুধু শোনা যাচ্ছে রাত জাগা প্রহরীর হুইসেল আর নিশাচর কুকুরের ঘেউ ঘেউ

হৃদির গায়ে একটা পাতলা শাল জড়ানো ছিল। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে শীতের প্রকোপ তেমন একটা বোঝা যায়নি। এখন বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। সোয়েটার বা জ্যাকেট

সাথে করে না নিয়ে আসাটা বোকামি হয়ে গেছে। সামির পরনে বাদামি রঙা লেদারের জ্যাকেট। সে মনোযোগের সাথে জ্যাকেটের চেইন আটকাতে আটকাতে বললো, 'এ বছর শীত ভালোই পড়ছে। জলপাইগুড়িতে শীত কেমন হবে কে জানে। গরম জামা কাপড় নিয়ে যাইতে হবে ঠিক মতো, বুঝছিস?'

হৃদি হালকা গলায় 'হুম' বলে গাড়ির দরজা খুলে উঠে বসলো। উঠল সামিও।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললো, 'তোর হঠাৎ কী হইলো? ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যানটা পছন্দ হয় নায়?'

চলতে শুরু করতেই ঠান্ডা বাতাস ধাক্কা খেলো চোখে মুখে। খোলা চুলগুলো দুহাত দিয়ে পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে হৃদি বললো, 'জানালার গ্লাস উঠায় দে, ঠান্ডা লাগে।'

সামি জানালার কাঁচ উঠালো, বললো, 'কথার উত্তর দিস না ক্যান?'

হৃদি নিরুত্তাপ গলায় বললো, 'তোর কি ধারণা কাজটা ঠিক হচ্ছে?'

– 'ঠিক হবেনা কেন?'

– 'ভুলে যাস না বিভা এখন অন্য বাড়ির বৌ। তোকে দেখে অভিজিতের রিএকশন কী হবে বুঝতে পারছিস?'

– ‘অভিজিৎ আমার আর বিভার ব্যাপারটা খুব ভালো মতোই জানে।

– ‘ঠিক আছে, যা ইচ্ছে কর। আমি এসবের মধ্যে নেই।’

–’ মানে কী? তুই যাবিনা?’

–’ নাহ!’

সামি গাড়ির স্টিয়ারিং শক্ত করে চেপে ধরে রেখেই হৃদির দিকে তির্যক ভাবে তাকায়। বিভ্রম নিয়ে বলে, ‘সত্যি যাবিনা?’

– ‘না।’

– ‘বলিস কী? ফানিমুন মিস করবি তুই? গাধা নাকি?’

শুনে হৃদি মৃদু হাসলো। ফানিমুন! শব্দটা প্রথম শুনেছিল আকাশের কাছ থেকে। বড্ড অসময়ে!

সেদিন খুব শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। বিভার বিয়ের বয়স তখন এক মাস ও হয়নি। সামি বিভার বিরহে পাগলপ্রায়। অমৃতার বাসায় তার আশ্রয় জুটেছে মাত্র কয়েকদিনের জন্য। বন্ধুরা সবাই সেই পাগল, অসুস্থ সামিকে দেখতে অমৃতার বাসায় গিয়েছে। যাওয়া মাত্রই শুরু হল কালবৈশাখীর প্রলয়ঙ্করী ঝড়। সেই সাথে শিলাবৃষ্টি। ওরা সব জড়ো হল অমৃতার বাসার ঝুল বারান্দায়। এর মাঝেই হঠাৎ বিভা ফোন করল। বন্ধুরা সব বিভাকে পেয়ে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, কেউ দেখলোনা, টেরও পেলোনা যে সামি নীরবে সেই জায়গাটা থেকে সরে গেছে। শুধু টের পেয়েছিল হৃদি। সে পায়ে পায়ে হেঁটে সামির পেছন পেছন নিচে নেমে আসলো। মুষলধার বৃষ্টির মাঝে সামিকে পেছন থেকে ডাক দিল। সামি তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য। তার মুখ দেখলেই বোঝা

যায় প্রথম প্রেমের ব্যর্থতা তার হৃদয় ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। হৃদি ওকে অনেক করে বোঝালো। কিন্তু বুঝল না সামি।

– 'আমার আর হবেনারে, আগের মতো করে আর কিছুই হবেনা!' কথাটা বলেই সামি হনহন করে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল। পেছন পেছন হৃদিও। সামি রাস্তার মোড়ে এসে একটা সি এন জি নিলো। টুপ্ করে ওর পাশে উঠে বসলো হৃদি। তার পরনের কামিজ ভেজা। চুল দিয়ে ঝরে পড়ছে বৃষ্টির জল। সামিও ভিজে চুবচুবু। হৃদির দিকে ফিরেও চাইছে না সে। গাঁট হয়ে বসে আছে। চোখজোড়া এক সর্বনাশা শূন্যতা। হৃদির বুক ধড়ফড় করছিল। এই পাগলটা আবার কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসবেনাতো? কী করবে সে এখন? বন্ধুদের ফোন করে বলবে কি এই পরিস্থিতির কথা? ঠিক সেই সময় মনে পড়লো তার সাথে ফোন নেই। নিচে নামার সময় ফোন ছাড়াই বেরিয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ড টা চলে আসল গলার কাছে। কী হবে এখন?

সামিকে প্রশ্ন করলো, 'সি এন জি নিলি যে?তোর কাছে টাকা আছে?' সামি কেমন রিক্ত চোখে তাকালো, নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, 'না।'

– 'তাহলে সি এন জি নিলি কেন? হায় আল্লাহ! আমিও তো টাকা আনিনাই।'

সামির মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। সে আগের মত তরঙ্গহীন গলায়ই বললো, 'তুই নেমে পড়, রিক্সা নিয়ে বাসায় ফেরত যা।'

– 'আর তুই?'

– ‘আমাকে নিয়ে ভাবতে হবেনা। আমি একটু একা থাকতে চাই।’

– ‘অসম্ভব তোকে আমি একা ছাড়ছিনা।’

– ‘হৃদিতা প্লিজ! বিরক্ত করিস না।’

– ‘একশোবার করব। ফাইজলামি পাইছিস তুই? একা থাকতে হবে কেন?’ ঠিক সেই সময় সামির পাঞ্জাবির পকেটে রাখা সেলফোনটা বিপ বিপ করে শব্দ করে উঠলো। সামি নিজের ফোন পিত্রালয়ে ফেলে এসেছে বলে অমৃতার একটা পুরোনো নকিয়া ফোন তাকে সাময়িক ভাবে ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। সামির পকেট থেকে হৃদিই বের করে নিল ফোনটা। ধরতেই ওপাশ থেকে আকাশ হড়বড় করে বললো, ‘কী মামা কই উধাও হইলা তুমি? হৃদিরেও তো পাইনা,ও কি তোমার সাথে আছে?’

– ‘হ্যাঁ আকাশ আমি হৃদি বলছি।’

– ‘কীরে তোরা হুট কইরা উধাও কেন? ফানিমুনে চইলা গেলি নাকি?’

-‘ফানিমুন আবার কী?

আকাশ হেসে উঠে বললো, ‘ফানিমুন মানে কী জানিস না? ম্যারিড কাপল একসাথে বেড়াতে গেলে বলা হয় হানিমুন আর বন্ধুরা কোন ট্যুরে গেলে তাকে বলে ফানিমুন।’

হৃদি খুব বিরক্ত হয়েছিল সেই মুহূর্তে আকাশের অযথা বকবকানি শুনে। তার বন্ধুরা সত্যিই পরিস্থিতি বুঝে কথা বলতে পারেনা কখনো। শেখেইনি বিষয়টা।

– ‘চুপ করে আছিস কেন?কথা বল!’

হৃদির ভাবন ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। ঘোর ভাঙল। অতীত থেকে বর্তমানে অবতরণ করল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে সামির মুখের দিকে চেয়ে বললো, ‘না দোস্ত, আসলে টাকা পয়সাও নাই হাতে। তাই এখন মনে হয় যাওয়া হবেনা।’

– ‘টাকার চিন্তা করতে হবেনা।’

– ‘টাকার চিন্তা না করলে চলবে কী করে? তোর বড়লোক বাপ তো এখন মাথার উপর ছাতা হয়ে আর নাই। তুই তো শালা এখন আমাদের মতই ফকির।’

– ‘আমার নিজের টাকা আছে ব্যাংকে। টাকা তুলে নিবো।’

– ‘না সামি। ওই টাকায় এখন হাত দিস না। কখন কী দরকার পড়ে বলা যায়না।

– ‘আমারটা আমি বুঝব। জ্ঞান দিতে আসিস না আমাকে।’

হৃদি চুপ করে গেলো। এ কথা সত্য যে বিভাকে তার দেখতে বড়ই ইচ্ছে করে। আগের দিনগুলোকে সে কী ভীষণ ভাবে মিস করে তা কথায় প্রকাশ করবার মতো শব্দ বুঝি তার ভাষার ভাণ্ডারে মজুদ নেই। কিন্তু কেন যেন হুট্ করে না বলে কয়ে অভিজিতের বাড়িতে গিয়ে ওঠার পরিকল্পনাটা তার ঠিক মনঃপুত হচ্ছেনা। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা কুডাক ডেকে উঠছে থেকে থেকে।

রাস্তা খালি বলে পুরানা পল্টনে হৃদিদের বাসায় এসে পৌঁছুতে খুব একটা সময় লাগলোনা। হৃদির আম্মা জেগে বসে ছিলেন বসার ঘরে। সামি দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই সালাম ছুঁড়ে দিলো হৃদির মায়ের উদ্দেশ্যে। তিনি বসা থেকে উঠে আসলেন, কৃতজ্ঞ গলায় বললেন, ‘যাক বাবা তুমি এসেছো সাথে? আমি একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম এত রাতে মেয়েটা একলা বাড়ি ফিরছে বলে।’

সামি হেসে বললো, 'না আন্টি একলা ছাড়তামনা তো ওরে এই মাঝরাতে। আপনি শুধু শুধু টেনশন করেছেন।'

মা বললেন, 'এসেছ যেহেতু ভেতরে এসে বসো একটু। আমি শরবত বানিয়ে দিচ্ছি।
'

– 'না না আন্টি আজকে আসি। অন্য একদিন হবে এসব।'

দরজার কাছে হৃদিতার মামাতো বোন তানিয়া উঁকি দিল। সামি এই মেয়েকে চেনেনা। এর আগে কখনো দেখেনি। কিন্তু মেয়েটা সামিকে দেখামাত্র বলে উঠল, 'আপনি সামি ভাইয়া না?'

সামি একটু অপ্রস্তুত হাসলো, 'হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

হৃদি ফোড়ন কেটে বললো, 'এইটা আমার কাজিন। ছবি দেখছে তোদের সবার। তাই চেহারা মুখস্ত। তুই আসবি ভিতরে? আসলে আয়, না আসলে ভাগ।'

সামি আর কথা না বাড়িয়ে 'চলি এখন।'   বলে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল।

সামি চলে যাবার পর শোবার ঘরে এসে তানিয়া কলকল করে বলে উঠল, 'হৃদিপু, তোর বন্ধুদের মধ্যে সামি ভাইয়াই সবচেয়ে সুন্দর।'

কথাটা হৃদির খুব একটা পছন্দ হলো না। সে বাঁকা ভাবে বললো, ‘কেন অন্যরা কী দোষ করলো?

– ‘না মানে, আকাশ ভাইয়ার চেহারা সুন্দর, দেখলেই মায়া লাগে কিন্তু সামি ভাইয়া হ্যান্ডসাম, বুঝছিস?’

হৃদি খিটখিট করে উঠল, ‘কেন?আমাকে কি তোর কম সুন্দর মনে হয়?

– ‘না তুই তো তুইই। তুই তো আমার বোন। তোকে তো আমি জন্ম থেকে দেখে আসছি।’ এটুকু বলে তানিয়া নিজের চিবুকে হাত রেখে কী যেন ভাবল, তারপর আবার বলল, ‘বিভা আপু জোশ! উনার স্কিনে কী লাগায় আসলে? রুপের রহস্যটা কী? সবসময় এরকম চকচক করে কেন উনার গাল? অমৃতা আপু তো পুরা বিড়াল একটা, উনার পার্সোনালিটি আমার অনেক ভালো লাগে। আর রুদ্র ভাইয়া আস্ত পাগল, দাড়ি, গোফ চুলের জন্য উনার চেহারাই দেখা যায়না… আসলে তোর ফ্রেন্ডসরা সবাই অনেক ইন্টারেস্টিং, আই উইশ আমার যদি এমন একটা ফ্রেন্ড সার্কেল থাকত!’

শেষের কথা শুনে হৃদি উদ্ধত হাসল, ‘এমন বন্ধু সবার ভাগ্যে জোটেনা!’

৩

কর্কশ স্বরে এলার্ম বাজছিল। আবছা এক নরম ভোর তখন অভিজিৎদের সল্টলেকের তিনতলা বাড়ির ঘুলঘুলি পেরিয়ে নেমে এসেছে পায়ে পায়ে। জানালায় পর্দা টানা।

আধো আলো অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে তড়িঘড়ি করে বেড সাইড টেবিলের ওপরে রাখা এলার্ম ঘড়িটার শব্দ বন্ধ করলো অভিজিৎ

আজ সকাল দশটার বাসে ওরা জলপাইগুড়ি যাবে। অভিজিৎ আর বিভা। বিভা এই প্রথমবারের মতো বরের সাথে দূরে কোথাও যাচ্ছে। বিয়ে হয়েছে প্রায় আট মাস হয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক সপ্তাহ পরেই অভিজিৎ চাকরির সুবাদে বাড়ি ছেড়েছিল। বিভা রয়ে গিয়েছিল সল্টলেকের এই একান্নবর্তী পরিবারে। অভিজিৎ কিন্তু নিজ থেকে একবারও বলেনি বিভাকে যাত্রা সঙ্গী হতে। বিভাও চায়নি খুব একটা। বাড়ির লোকেরা একরকম জোর করেই পাঠিয়ে দিচ্ছে তাকে বরের কাছে।

অভিজিৎ শোয়া থেকে উঠে রসে বিভার দিকে চাইল এক নজর। বিভা পাশ ফিরে সোফার ওপর শুয়ে আছে। কোমর পর্যন্ত একটি পাতলা চাদর জড়ানো। সিঁদুর লেপ্টে গেছে কপালে। বালিশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এলো চুল। পরনের নাইটির গলার কাছের হুক খুলে গেছে অসাবধানতা বশত। সেই খোলা অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে তার সাদা কবুতরের মতো বুক দুটির অনেক খানি। নিশ্বাসের সাথে সাথে উঠছে, নামছে। এই সাবান ঘোলা পানি রঙের আবছা আলোতেও ওর শরীরের গাঁথুনি টা অভিজিতের নজর এড়ালনা। বালিশের কাছেই সেলফোন রাখা। গতকাল অনেক রাতে, বিভাকে ফিসফিস করে কথা বলতে শুনেছে সে। প্রায়ই শোনে। শুনে শুনেও না শোনার ভান করে মটকা মেরে পড়ে থাকে। অথচ মাত্র কয়েক হাত দূরে শুয়ে থাকা এই অপ্সরীর মতো সুন্দর দেখতে মেয়েটি কিন্তু সম্পূর্ণ তার নিজের হতে পারতো। আজকের শিশির ভেজা, স্নিগ্ধ, সুন্দর ভোরবেলাটা কাটতে পারত এই নারীর বাহুবন্ধনে, গভীর আলিঙ্গনে, এবং নিবিড় ভালোলাগায়!

বিভা নড়ে উঠল। ঘুমে ডোবা অর্ধনিমীলিত চোখে দেখতে পেল, অভিজিৎ চেয়ে আছে তার দিকে। একদৃষ্টে!

– ‘কী ব্যাপার? অমন হাবলার মতো চেয়ে আছেন কেন? সমস্যা কী?’ ভারী জিভ নেড়ে বলল বিভা কোনো রকমে।

অভিজিৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে একটু অপ্রতিভ হল। চোখ নামিয়ে বলল, ‘কিছুনা,উঠে পড়ুন। তৈরী হয়ে নিন। সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বের হতে হবে।

– ‘যেতেই হবে?’

প্রশ্নটা করল ঠিকই বিভা কিন্তু মনে মনে সে আসলে ভীষণ ভাবে চাইছিল এ বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে। টানা আটটা মাস চার দেয়ালে বন্দি হয়ে একগাদা রসকষহীন ভারিক্কি মানুষজনের সাথে জীবন যাপন করতে গিয়ে রীতিমতন হাঁপিয়ে উঠেছে সে। জলপাইগুড়িতে অন্তত পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্ব বলতে কিছু থাকবে না। নিয়ম করে রোজ একই সময়ে খাবার টেবিলে উপস্থিত হতে হবেনা। খাবার সময় নিজের পাতে নজর না দিয়ে অন্যের পাতে কী কী তরকারি উঠবে তা নিয়ে ভাবতে হবেনা। আর সবচেয়ে বড় কথা হল জলপাইগুড়িতে পাওয়া যাবে অখণ্ড অবসর। যখন তখন সামির সাথে ফোনে কথা বলা যাবে। আড্ডা দেয়া যাবে বন্ধুদের সাথে। মনে মনে তাই এই দিনটার জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল সে। তবুও নিজের ঠাঁট বজায় রাখতে গিয়ে গলায় জোর করে খানিকটা তাচ্ছিল্যের সুর ঢেলে দিয়ে প্রশ্নটা করেছিল সে, ‘যেতেই হবে?’

অভিজিতের চোখে একটি মেদুর ছায়া পড়ল। কেটে কেটে বলল, ‘যেতে না চাইলে যাবেন না। কেউ আপনাকে জোর করছেনা।’

বিভা অভিজিতের গলায় বাজতে থাকা অভিমানের সুরটা টের পেয়ে গেল। অমন ঝুলে যাওয়া মুখ দেখে একটু দুষ্টুমি করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইলনা সে। শোয়া থেকে উঠে বসতে বসতে রসিক গলায় বললো, 'অমন কান্নাকাটির কী আছে?বলেছি তো যাবো!'

অভিজিৎ বিস্মিত, 'কে কাঁদছে?'

– 'আপনি!' বিভা নির্বিকার।

– 'আমি কাঁদতে যাবো কেন? আপনার যাওয়া না যাওয়ায় আমার কিছুই এসে যায়না। আমি তো বাবা, মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আপনাকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য রাজি হয়েছি। '

– 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু আমার যে এখন থেকে রোজ আপনার অমন আলুর মতো মুখখানা সকাল বিকাল না চাইতেও দেখতে হবে? কীভাবে সহ্য করব বলুন তো!'

অভিজিৎ হতভম্ব হয়ে গেল -'আমার মুখ আলুর মতো?'

এই প্রশ্নে বিভা অভিজিতের দিকে তাকায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার ভান করে, গম্ভীর ভাবে বলে, 'একদম আলুর মত।'

– 'মোটেওনা, আমার মুখ লম্বাটে।'

– 'আলু কি সবসময় গোল হয় নাকি? লম্বা আলু কখনো দেখেননি?'

অভিজিৎ বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল বিছানা ছেড়ে। খিটখিটে স্বরে বলল, 'বড্ড বাজে বকেন আপনি সবসময়। ফালতু কথা বলা ছাড়া থাকতে পারেন না।'

বিভা হাসে, 'তা ঠিক, ফালতু কথা বলতে না পারলে আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।'

স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিল বিভা। গোলাপি রঙের একটা লাল আর বাদামির মিশেলের তসর সিল্ক শাড়ি পরল সে। প্রতিমার মতো টানা দুটি চোখে ছোঁয়ালো কাজল। সিঁথি ভর্তি করে আঁকল সিঁদুর। কপাল বরাবর পরল লাল টিপ। লাল টুকটুকে বউয়ের মতো সেজেগুজে বাড়ির সবার সাথে একত্রে বসে নাশতা করল। বেরোবার মুখে শ্বশুর শাশুড়িকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতেও ভুলল না। শাশুড়ি মা তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন-

– 'শোনো বৌমা, আমার ছেলেটাকে দেখে রেখো। সংসারে একটু মন দিও। তোমার তো যা উড়নচণ্ডী স্বভাব! বড্ড দুশ্চিন্তা হয়।'

বিভা একটা বড় শ্বাস ফেলল। এ বাড়ির প্রতি তার আলাদা রকমের কোনো টান নেই। পুত্রবধু হিসেবে তেমন কোনো গুরু দায়িত্ব সে আজ অবধি পালন করেনি। বাড়ির লোক গুলোকে আপন বলেও ভাবেনি কখনো। তবুও এই দুটি বয়স্ক মানুষ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার মনের ভেতরে একটা অন্যরকম জায়গা করে নিয়েছে। জায়গাটা কেমন যেন অস্বস্তির। বিভা না পারে সইতে, না পারে ফেলতে। ভালোবাসা আর স্নেহের অত্যাচারে দম বন্ধ হয়ে আসে তার মাঝে মাঝে। শাশুড়ি মানুষটা ঠোঁটকাটা এ কথা সত্য। কিন্তু বিভা জেনে গেছে কয়েক মাসের মধ্যেই, যে ভেতরে ভেতরে তিনি বড্ড সাদাসিধে, সরল।

– ‘চিন্তা করবেন না মা। সব ঠিক থাকবে।’

– ‘আর হ্যাঁ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। খুব শীঘ্রই যেন একটি সুখবর শুনতে পাই, কেমন? আমরা সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি নতুন অতিথিকে বরণ করব বলে।’

শেষ কথাটি বিভাকে আড়ষ্ট করে তুলল। চোখ মুখ শক্ত হয়ে গেল নিজের অজান্তেই।

– ‘ওমা, কী হল? অমন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা কেন? কিছু বল!’ বিভা এবার চোখ তুলে তাকাল, ‘মা, আপনি আশীর্বাদ করুন।’ শাশুড়ি বিভার মাথায় হাত রাখলেন। প্রসন্ন গলায় বললেন, ‘শতায়ু হও মা। ধনে পুত্রে ভরে উঠুক তোমার সংসার।’

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠতেই অভিজিৎ সন্দিহান গলায় প্রশ্ন করলো, ‘মা কী বললেন?’

‘তেমন কিছুনা।’

– ‘আপনাকে কেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে। দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু বলেছেন কি মা?’

বিভা এবার সরাসরি তাকালো অভিজিতের দিকে, ‘বললেন মন দিয়ে সংসার করতে, আর খুব শীঘ্রই তাঁদেরকে একটি সুসংবাদ দিতে।’

– ‘সুসংবাদ? কীসের সুসংবাদ?’

– ‘নতুন অতিথির।’

অভিজিৎ যেন প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারলনা বিভার বলা কথাটা। কপালে প্রশ্ন চিহ্ন নিয়ে নির্বাক চেয়ে রইল বিভার দিকে। তারপর খানিক বাদে যখন বুঝলো, তখন চকিতে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, ‘ও আচ্ছা।’

.

হৃদি আজ তিন বন্ধুর কাছ থেকে জরুরি ফোন পেয়েছে। অমৃতা, সামি, আকাশ, এরা তিনজনেই ফোন দিয়ে বলেছে, ‘কথা আছে, সন্ধ্যার পর মিট কর।’

হৃদির ক্লাস ছিল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। অমৃতা চেম্বার থেকে বের হয়েছে আধা ঘন্টা আগে। বসে আছে গুলিস্থানের জ্যামে। সামি আর আকাশ রাস্তায়। রুদ্রর অফিস ছুটি হবে সন্ধ্যে ছটায়। অর্থাৎ এখন এই শীতকালের মিষ্টি নরম শেষ বিকেলটায় হৃদিতার একা একা টি এস সি চত্বরে একটি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। অবশ্য সম্পূর্ণ একা বলা যাবেনা। এতক্ষণ অবধি তিতলি নামের একটি মেয়ে তার সঙ্গ দিয়েছে। তিতলি মেয়েটার সঙ্গ অবশ্য তেমন উপভোগ্য নয়। তার বেশিরভাগ গল্পই বড়লোক আপা দুলাভাইকে নিয়ে। দুলাভাই কোন কোন দেশ ঘুরলো, তার জন্য কী গিফট আনল, আপা কত টাকা দিয়ে শাড়ি কিনল এইসব আজেবাজে কথা বলেই সে টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাটিয়ে দিল। ভীষণ বিরক্ত লাগছিল শুনতে। একটা সময় হৃদি হাই তুলতে তুলতে বলল, তোমার আপা দুলাভাই ছাড়া তোমাদের পরিবারে আর কোনো বড়লোক নাই?’

মেয়েটি এই প্রশ্নে একটু থতমত খেয়ে গেলো, ঢোঁক গিলে বলল, 'থাকবেনা কেন? আশ্চর্য তো!'

হৃদি হাসল, 'আরও আছে? ওয়াও! তাহলে তাদের গল্পও একটু করো, শুনি। টাকার গল্প শুনতে কার না ভালো লাগে, বল?'

মেয়েটির মুখ তখন অপমানে থমথম করছে। চট করে বসা থেকে উঠে পড়ে বলল, 'থাক, আরেকদিন বলব। আজকে যাই।'

হৃদি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। পা নাচাতে নাচাতে চায়ের কাপে একটা তৃপ্তির চুমুক দিয়ে বলল 'সাবধানে যেও। ফি আমানিল্লাহ।'

বিকেলের রোদটা গায়ে লাগাতে আরাম লাগছে। বাতাসে ধূলোর গন্ধ। ছাত্রছাত্রীদের হৈচৈ আর কোলাহলে মুখরিত হয়ে আছে টি এস সি চত্বর। সবার প্রথমে আসলো আকাশ। তার পরনে একটা ফর্মাল ফুল হাত সাদা শার্ট। হাতে কনুইয়ে ঝুলিয়ে রাখা খয়েরি উলের সোয়েটার। চুল আঁচড়ানো পাট করে। অমন পরিপাটি আকাশকে দেখে হৃদি প্রথমেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো, 'এত সাজছস ক্যান?বিয়া লাগছে নাকি?

আকাশ হৃদির পাশে ঘাসের উপর বসতে বসতে বললো, 'বিয়া লাগলে তো ভালোই হইছিল।'

– 'তাইলে কী হইছে? হঠাৎ এত মাঞ্জা?'

– 'মাঞ্জা হবে কেন?ভার্সিটি থেকে আসলাম তো।'

– 'এতো সাইজা গুইজা ক্লাস নিতে যাও তুমি? তোমার মতিগতি তো বেশি সুবিধার মনে হইতাছে না। '

আকাশ একটু চিন্তাযুক্ত গলায় বললো, 'দোস্ত একটা ঝামেলায় পইড়া গেছি।'

– 'কী ঝামেলা?'

– 'দাঁড়া সবাই আসুক, একসাথে বলি সবাইরে।'

সামি আর অমৃতা এসে পড়লো আধা ঘন্টার মধ্যেই। গোল হয়ে ঘাসের উপর বসে গেলো সব। সন্ধ্যে নামার মুখে একটু একটু কুয়াশা ভেসে উঠেছিল বাতাসে। ছড়িয়ে পড়েছিল একটা হিমহিম ভাব। অমৃতার গায়ে ঝুলছিল কালো কোট। দেখে আকাশ নাক কুঁচকে বললো, 'এই উকিলের পোশাকটা খুইলা ফ্যাল এখনই। পুরাই ছেলে ছেলে একটা লুক চইলা আসছে তোর ভিতর।'

– 'আসলে আসুক, তোর সমস্যা কী?'

– 'কথা সত্য। আজকে তোকে একটু বেশিই ছেলে ছেলে লাগতেছে। কাহিনী কী?' সামির কৌতূহলী প্রশ্ন।

অমৃতা গমগম করে উত্তর দিল, 'চুল কাটছি গতকাল। এইজন্যে হইতে পারে। তোরা কি এখন এইসব ফালতু প্যাঁচাল পারতে থাকবি নাকি জরুরি কথাগুলা বলবি?'

আকাশ নড়ে চড়ে উঠে বললো, ‘জানিস নাতো ঝামেলা হইছে একটা।’

-’ আমার সাথেও একটা বাজে ঘটনা ঘটছে।’ অমৃতা বললো।

– ‘আমারও একটা জরুরি বিষয় নিয়ে কথা বলতে হবে তোদের সাথে।’ বললো সামি।

.

– ‘প্রথমে অমৃতা বল।’ একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে নেতৃত্ব দেয়ার ঢঙে আঙুল উঁচিয়ে বললো হৃদিতা।

অমৃতা কোটের পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলো। লাইটার জ্বালিয়ে ধরালো আগুন। প্রথম টানটা দিতে যাবে ঠিক তখনই রুদ্র এসে হাজির।

‘আজকে আমি একটা অদ্ভূত প্রশ্নের সম্মুখীন হইছিলাম।’ অমৃতা বলল, চোখ বুজে ভারী আয়েশ করে মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে।

– ‘উফ আল্লাহ এত ঢং না কইরা বইলা ফ্যাল না তাড়াতাড়ি। ঢং দেখলে মনটা চায় একটা লাথি মারি পাছায়।’ বিরক্তিতে কাদা কাদা হয়ে হৃদি বললো।

– ‘বলতেছি তো। আরে আমার চেম্বারে একটা এসহোলের বাচ্চা আছে, যুঁথি নাম। স্যারের নতুন জুনিয়র। ওই শালী আজকে আমারে হুট্ কইরা কী কয় জানোস? কয়

কি, আচ্ছা, মিস অমৃতা আপনার কি ছেলে পছন্দ নাকি মেয়ে পছন্দ?' এটুকু বলে থামল অমৃতা। বন্ধুদের মুখভঙ্গি এক নজর চেয়ে নিয়ে আবার বলল- 'সিরিয়াসলি গাইজ? ক্যান ইউ ইমাজিন? শী জাস্ট আস্কড মি আমার ছেলে পছন্দ নাকি মেয়ে পছন্দ? আই মিন··· হোয়াট দ্যা ফাক! আমার কেন মেয়ে পছন্দ হতে যাবে?'

বন্ধুরা কেউ কিছু বলল না। বোঝা যাচ্ছে অমৃতা প্রশ্নটা ঠিকমতো হজম করে উঠতে পারেনি এখনো। তাই হুট করে বেকায়দায় কিছু বলে বসা ঠিক হবেনা। বন্ধুরা তাই সময় নিলো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল অমৃতাকে। সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে অমৃতা খ্যাঁক দিয়ে উঠে বললো, 'তোরা কিছু বলছিস না যে?'

আকাশ একটু ন্যাতানো গলায় বলল, 'তারপর কী হল? তুই কী বললি?'

– 'আমি বললাম যে এটা কেমন ধরণের প্রশ্ন? অফকোর্স আই এম ইন্টারেস্টেড ইন মেন! বেটি তখন কয় কি, ও! আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম তোমাকে। তুমি আবার মাইন্ড করোনি তো?'

রুদ্রর মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা, 'আসলেই কি তোর ছেলে পছন্দ? মাঝে মাঝে আমারও কেমন সন্দেহ হয়।'

অমৃতা আগুন চোখে তাকালো রুদ্রর দিকে, 'এটার মানে কী? আমারে কি তোর গে মনে হয়?'

রুদ্র বেফাঁস কথা বলে ফেলে অমৃতার রুদ্রমূর্তির সামনে একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, 'না মানে ইউ নেভার হ্যাড আ বয়ফ্রেন্ড, নট ইভেন আ ক্রাশ।'

অমৃতার ভেতরের তেজটা চোখে মুখে ঝিলিক দিচ্ছিল তখন। হৃদি পরিস্থিতি সামলানোর জন্য বললো, 'আচ্ছা থাক, কে কী বলল তাতে কিছু এসে যায় না। আর আমার মনে হয় যুঁথি মেয়েটা আসলে সম। তাই অমৃতাকে পার্টনার হিসেবে চাচ্ছিলো।'

আকাশ এতক্ষণে মুখ খুলল। অমৃতার চোখে চেয়ে কিছুটা গম্ভীর ভাবে বললো, 'দ্যাখ অমৃতা, ওই মহিলা হয়তো নিজের মনের কথাটা তোর সাথে শেয়ার করছে বলে তুই ওরে দোষ দিতেছিস। কিন্তু তুই ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা একটু চিন্তা কইরা দ্যাখ। আমার মনে হয় তোর চালচলন দেইখা যে কেউই এ ধরণের ধারণা করতে পারে।'

হৃদি খুব কড়া একটা ধমক লাগালো আকাশকে, 'চুপ থাকবি তুই? যতসব আজাইরা কথা!'

অমৃতা আকাশের দিকে চেয়ে ছিল বিস্ময় বিদ্ধ চোখে। আকাশের মাত্র বলা কথাটা যেন সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেনা। সামি একটা কৃত্রিম হাসি হেসে ওকে বললো, 'আরে আকাশের বাচ্চা মজা নিতেছে, তুই চেতিস না।'

আকাশ কিন্তু দমল না। সে আগের চাইতেও দৃঢ় গলায় বললো, 'না না আমি মজা নিচ্ছিনা। দ্যাখ আমার কথা হচ্ছে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য, স্বাধীন ভাবে চলার জন্য

তোর তো পুরুষ মানুষের লেবাস নেয়ার দরকার নাই। ট্রাই টু একসেপ্ট ইওরসেল্ফ ফর হু ইউ আর।'

– 'তুই বলতে চাইছিস আমার প্রব্লেম আছে?'

– 'মোটেও আমি এমনটা বলতে চাইছিনা। আমার প্রশ্ন হল আল্লাহ তোকে মেয়ে বানায় দুনিয়ায় পাঠাইছে। তুই হুদাই ক্যান ছেলে সাইজা থাকবি?

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তার চোখ দুটিতে দ্বিধা, কৌতূহল এবং সংশয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চমৎকার সামলে নিলো সে নিজেকে। প্রসঙ্গ পাল্টে বললো, 'যাই হোক, তোদের কথা বল, কী ঘটনা ঘটেছে শুনি?'

আকাশ বললো, 'মামা আমি তো মহা ঝামেলায় পড়ছি। দুইটা সেকশনের পরীক্ষার খাতা হারায় গেছে।'

বন্ধুরা আঁতকে উঠলো।

– 'মানে কী? পরীক্ষার খাতা আবার ক্যামনে হারায়?

– 'ক্যামনে হারাইছে তা আমি জানিনা। বাট আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি আমার অফিস রুমের টেবিলের ড্রয়ারে রাখছিলাম। আজকে সকালে দেখি দুই সেট খাতা গায়েব।'

– ‘ঠিক মতো খুঁজছস তুই সবখানে?’ সামির প্রশ্ন।

– ‘হ, খুঁজছি। ক্যামনে কী হইল আল্লাহ জানে। আমার মাথায় কিছু ঢুকতেছেনা।’

– ‘খাতার কি পা গজাইছে নাকি, যে হাঁইটা হাঁইটা অন্য কোথাও চইলা গেছে?’ হৃদি বললো।

– ‘আমি জানিনা দোস্ত। খাতা খুঁজে না পাইলে খুব ঝামেলা হয়ে যাবে। ফাইনাল সেমিস্টারের খাতা ছিল। পোলাপাইনগুলা আবার পরীক্ষা দিতে চাইবই না। কী যে করি!’ চিন্তিত শোনালো আকাশের গলা।

– ‘আল্লাহ ভরসা। খুঁজে পাবি কাল পরশুর মইধ্যেই। আমার মন বলতেছে।’ হৃদি অভয় দিল।

‘সামি তোর কিছু একটা বলার ছিল। ইম্পরট্যান্ট কিছু।’ স্মরণ করিয়ে দিল অমৃতা।

– ‘ও আচ্ছা হ্যাঁ। শোন তোরা, আমি টিকেট বুকিং দিয়ে ফেলছি। আমরা নেক্সট থার্সডে বিকালে রওয়ানা দিব ইন শা আল্লাহ। কিন্তু ঝামেলা শুরু করছে আমার বাপ। আমি অনেক বড় ভুল করছি আম্মারে ব্যাপারটা জানায়ে। আম্মার পেটে তো কোনো কথাই থাকেনা। আম্মা সোজা গিয়া বইলা দিছে আমার বাপরে। এখন ওই ভদ্রলোক তো মনে কর কোমর বাইন্ধা নামছে আমার ইন্ডিয়া যাওয়ার প্ল্যান ক্যানসেল করার জন্য।’

রুদ্র আফসোসের গলায় বলে উঠলো, ‘শিট··· এখন যদি উনি বিভার বাবাকে ফোন করে বলে দেয়?’

– ‘সমস্যাটা এখানেই। আমার বাপরে আমি আর পাত্তা দেই না। কিন্তু বিভার বাবার কানে যদি কথাটা যায় তাহলে তো খুবই সমস্যা হয়ে যাবে।’

অমৃতার মেজাজ মর্জি আজ এমনিতেই ভালো নেই। সামির কথা শুনে সে দিয়াশলাই কাঠির মতো ভস করে জ্বলে উঠল, ‘তোর বাপ কী বলছে আসলে, খুইলা বল তো!’

– ‘আমারে ডিরেক্টলি কিছু বলেনাই। বাট আম্মারে বলছে ইন্ডিয়া গেলে নাকি আমি আমার চাকরি হারাবো। উনি স্কুলের প্রিন্সিপালকে বলে আমার চাকরি নট করায় দিবে। অর্থাৎ আমারে ইন্ডিরেক্টলি হুমকি দিছে। প্রিন্সিপালের সাথে তার খাতির আছে এটা আমি জানি। আর আমি রিসেন্টলি খবর পাইছি ওই স্কুলের ট্রাস্টি বোর্ডে তার নাম আছে। শালা মাঝে মাঝে মনে হয় পুরা দেশটাই আমার বাপ কিন্না ফেলছে।’

অমৃতা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, ‘ওই লোকটা এত বিরক্তিকর কেন? সামি শোন, তোর বাপ না হইলে আমি লোকটাকে একটা শিক্ষা দিয়েই ছাড়তাম। মনটা চাইতাছে মুখের মধ্যে ঘুষি মাইরা আসি কয়েকটা। মাইন্ড করিস না দোস্ত, বাট সিরিয়াসলি আমার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে।’

– ‘রাগ তো আমারও হচ্ছে। তুই পারলে লোকটাকে একটা শিক্ষা দেন। আমি কিছুই মাইন্ড করবো না।

হৃদি বললো, ‘দ্যাখ, আমার মনে হয় আংকেল ঠিকই বলতেছেন। বিভার সাথে যে সামির অন্যরকম একটা সম্পর্ক ছিল সেটা সবাই জানে। সামির এরকম হুট করে বিভার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হওয়াটা দৃষ্টিকটু দেখাবে।’

– 'তোর সমস্যা কী? সব সময় খালি নেগেটিভ কথা কস ক্যান? হিংসা হয় নাকি?' সামির গলাটা চড়ে গেল আচমকা।

চমকে তাকাল হৃদি সামির দিকে। অপমানে থমথম করে উঠলো মুখ। ভীষণ রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না আবার। চুপ করে গেল।

অমৃতা হঠাৎ শক্ত গলায় বলে উঠলো, 'নাহ, সামির আব্বা লোকটা বেশি ঝামেলা করতাছে। ব্যাটারে একটা শিক্ষা দিতে হবে!'

৪

ডুয়ার্সের যে ছোট্ট গ্রামটিতে আজ বিভাবরীর পায়ের ছাপ প্রথমবারের মত পড়লো, তার নাম 'বিন্দু' । গ্রামটি মূলত ভুটান এবং ভারতের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত একটি পাহাড়ি উপত্যকা। এর গা ঘেঁষে বইছে জলঢাকা নদী। পাথরের ওপর দিয়ে জল বয়ে যায় বলে সর্বক্ষণ জলপ্রপাতের মতো শব্দে মুখরিত হয়ে থাকে সারা গ্রাম।

অভিজিতের ডাক বাংলোর গেইটে যখন গাড়ি এসে পৌঁছুলো তখন সন্ধ্যে পুরোপুরি নেমে গেছে। ধোঁয়াটে এক অতীন্দ্রিয় কুয়াশায় ছেয়ে গেছে চারপাশ। থেকে থেকে ডাকছে তক্ষক আর ঘুরঘুরে পোকা। ঘুরঘুরে পোকার ডাকটা বেশ নূপুরের ধ্বনির মতো শুনতে লাগছিল। কোলাহল রহিত নিশ্চুপ নীরব সন্ধ্যায় প্রকৃতি যেন নূপুরের তালেতালে নৈঃশব্দকেই উদযাপন করছে সদর্পে। সেই সাথে আছে জলপ্রপাতের শব্দ, তিরতির করে বয়ে যাওয়া নদীর ঝিরঝির করা ডাক।

বাস স্টেশনে অফিসের গাড়ি এসেছিল। স্টেশন থেকে এখানে পৌঁছুতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের মত লেগেছে। আসবার পথে অভিজিতের অফিস হয়ে এসেছে ওরা। অফিসে বিভার আগমন উপলক্ষে জল খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অভিজিতের ইমিডিয়েট বস বিভাকে এক জোড়া স্বর্ণের কানের দুল উপহার দিয়েছেন। বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে পারেন নি বলে আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

অভিজিতের অফিস গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের কাছে। একটা বিষয় কিছুতেই বিভার বোধগম্য হচ্ছিলো না যে একজন শহুরে মানুষ কী করে দিনের পর দিন এমন জংলা জায়গায় বাস করতে পারে! তার বুকের মধ্যে একটা চাপ অনুভূত হচ্ছিলো। সে শহরের মেয়ে। জীবনে কখনো গ্রামে গিয়ে থাকেনি। একবার বাবার সাথে খুলনা সুন্দরবন বেড়াতে গিয়েছিল তিনদিনের জন্য। সুন্দরবন তাকে মুগ্ধ করেছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু ভুলেও কখনো সেই বনের মধ্যে গিয়ে বসত গড়ার ইচ্ছে হয়নি তার। বনে মানুষ যাবে বেড়াতে, থাকতে নয়।

সেই সন্ধ্যায় ডাক বাংলোর সম্মুখে গাড়ি থেকে নামবার পর কুয়াশা ঢাকা দোচালা বাড়িটির দিকে তাকিয়ে বিভার মনে হল এখানে বুঝি স্থায়ী ভাবে থাকতে নয়, আসলে বেড়াতেই এসেছে সে। কিন্তু আপন জন ছাড়া একলা একলা কোনোদিন কোথাও বেড়াতে যায়নি সে। গিয়েছে হয় বাবা মায়ের সাথে, নয় বন্ধুদের সাথে। নিজের মনের মানুষদের ছাড়া প্রকৃতির সৌন্দর্য কখনো ষোলো আনা উপভোগ করা যায়না। এবার তার সাথে কেউ নেই। আছে এই রসকষ হীন, স্বল্পবাক এবং অমিশুক অভিজিৎ! ফাটা কপাল বোধহয় একেই বলে। বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পিছলে পড়লো তার। বন্ধুদেরকে বড্ড মনে পড়ছে। ইশ, বান্দরগুলা যদি আজ পাশে থাকত!

দরজার সামনে একজন মধ্যবয়স্ক লোক, একটি যুবতী নারী এবং বছর পনেরোর এক কিশোর দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটির গায়ে মোটা উলের চাদর জড়ানো। মাথা ঢাকা

কান টুপিতে। সে বিভাকে দেখা মাত্র খুশিতে আটখানা হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘বৌদি মণি এসে গেছেন। মা লক্ষী এসে গেছেন আমাদের বাড়িতে!’

শাড়ি পরা মেয়েটি এগিয়ে আসলো। বিভার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্য ঝুঁকতেই বিভা হাত দিয়ে ধরে ফেলে নিরস্ত করলো তাকে।

মেয়েটাএক গাল হেসে প্রগলভ হয়ে বললো, ‘শেষ অবধি আপনার দেখা মিললো। দাদাবাবুকে কতবার বলেচি আপনাকে একটিবার নিয়ে আসতে!’

–এইত এসে পড়লাম।’ বলল বিভা, হালকা হেসে।

‘হয়েছে হয়েছে, এসব ন্যাকামো পরে করলেও চলবে। আগে ঢুকতে দে ভেতরে!’ হাঁক দিয়ে উঠল অভিজিৎ।

মেয়েটি শশব্যস্ত হয়ে বললো, ‘একটু দাঁড়াও।’

শাঁখ বাজিয়ে, উলু দিয়ে বিভার গৃহ প্রবেশ হল। বাংলোটা এক তলা। সাজসজ্জা একেবারে সাদামাটা। আধুনিকতার ছাপ নেই, কেমন একটা পুরোনো পুরোনো ভাব। ঢুকেই সামনে পড়লো হলঘর। তাতে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা সোফা। মাঝের টেবিলে কাচের ফুলদানীতে রাখা কিছু তাজা লাল টুকটুকে গোলাপ। হলঘরের পাশের লাগোয়া লম্বাটে ঘরটাতে খাবার টেবিল বসানো। মেঝে ছাই রঙের। বিভা পায়ের জুতো খুলে প্রথমেই সারা বাড়িটায় একবার চক্কর দিল। মোট তিনখানা বড় বড় ঘর। রান্নাঘর প্রশস্ত। সবচয়ে বড় কথা পেছনের বারান্দা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়

আকাশ ছোঁয়া ভুটান পাহাড়। সব দেখেশুনে বিভার মনটা ভরে গেলো। বুকের চাপ ধীরে ধীরে হালকা হতে শুরু করল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামিকে একবার ফোন করল সে। নেটওয়ার্ক খুব একটা ভালো পাওয়া যাচ্ছেনা। অনেক কষ্টে ফোন লাগলো।

– 'হ্যালো, সামি!'

– 'কী হইছে? তোর গলা এমন শোনাচ্ছে কেন?'

তখন জলঢাকা নদীর আঁশটে গন্ধ বুকে নিয়ে হুহু করে বইছে হিম জড়ানো হাওয়া। দূরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কুহেলিকাময় গম্ভীর পাহাড়। মাথার ওপর এক আকাশ ভরা তারা। বিভা ওই শীত ছোঁয়া মোহময় সন্ধ্যায় আকণ্ঠ ডুবে গিয়ে কেমন অন্যরকম গলায় বললো,

– 'আমি না, তোরে এই মুহূর্তে প্রচন্ড মিস করতেছি।'

– 'তুই তো নাকি সবসময় ই আমারে মিস করস। অন্য সময় তার মানে গল্প দাও, তাইনা?'

– 'আরে না! এখন একটা জোশ সময়। আমি জলপাইগুড়ি আসছি আজকে। ডুয়ার্সে।'

– 'ডুয়ার্স?'

– 'হ্যাঁ ডুয়ার্স। জায়গাটা খুব সুন্দর রে, তার চেয়ে বেশি সুন্দর আমার বাসাটা। বাসার বারান্দা থেকে পাহাড় দেখা যায়। চিন্তা করতে পারিস? সব কিছু একদম স্বপ্নের মতো!'

– 'তাই?'

–' হুম তাই। শোন সামি আমাদের বিয়ের পর আমরা পাহাড়ে হানিমুন করতে যাবো, কেমন?'

– 'ঠিক আছে।' বলে সামি একটু থামে, তারপর আবার বলে, 'আমরা যাব বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়া অসাম।'

– 'আচ্ছা এখন ফোন রাখ, আমি হৃদি আর অমৃতারে ফোন দেই। এক কাজ করি চল, গ্রুপ কল করি। সবাইরে মিস করতেছি খুব।'

ঠিক সেই সময় বিভা লক্ষ্য করলো একটা লম্বা কালো ছায়া তার ঠিক পেছনে বারান্দার দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। চকিতে ফিরে তাকালো সে। অভিজিৎকে দেখতে পেল সন্ধ্যার ধোঁয়াশা আলোয়। বিভা একটু বিষম খাওয়া গলায় সামিকে বললো, 'আচ্ছা এখন রাখি।'

ফোন কেটে নিয়ে একটু ভয়ে ভয়ে, আড়ে আড়ে তাকায় সে অভিজিতের দিকে, আধো গলায় বলে, 'কিছু বলবেন?'

অভিজিৎ তাৎক্ষণিক ভাবে কোনো উত্তর দিল না। কপালে ভেসে থাকা প্রশ্নচিহ্নটা সুতীক্ষ্ণ হল শুধু। অস্বস্তিতে কাঠ হয়ে রইল বিভা। অভিজিৎ কি তার সব কথা শুনে ফেলেছে?হানিমুনের কথাটাও?

'আপনার পাহাড়ে হানিমুন করার খুব শখ,তাইনা?' একটা সময় অভিজিৎ বলল, অনেকটা চাপা গলায়।

বিভা অপ্রতিভ হয়, মুখ নামায় নিচে।

– ‘আসলে আপনাকে আমার ডিভোর্সটা খুব তাড়াতড়িই দিয়ে ফেলা উচিত। আপনি এক কাজ করুন কালকেই চলে যান ঢাকায়। আমার বাবা মাকে কিছুদিন পরে জানালেই হবে। আমি বুঝিয়ে বলব ওদের। ও নিয়ে আপনার ভাবতে হবেনা। আর আপনার বাবা মা কে ম্যানেজ করার দায়িত্ব আপনার। সেই দায়ভার আমি নেবোনা। ’

বলে অভিজিৎ আর দাঁড়ায় না। গটগট করে হেঁটে ভেতরে চলে যায়। বিভা বারান্দা ছেড়ে ঘরে এসে সচকিত ভাবে একবার আশপাশটা দেখে নেয়। চাকর বাকরদের কেউ শুনে ফেললে খুব খারাপ হবে। আসা মাত্র এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পূর্ণ অচেনা কিছু মানুষকে সে জানাতে চায়না।

.

সামি ঘরের বাতি নিভিয়ে লেপের তলায় শুয়ে শুয়ে ফোনে কথা বলছিল। বিভার অমন আকস্মিক লাইন কেটে দেয়া তাকে খানিক বিচলিত করে তুলেছে। সে মুহূর্তের মাঝেই কল ব্যাক করল। উত্তর দিল না বিভা। পাশের ঘর থেকে কিছুক্ষণ পর পর রুদ্রর অট্টহাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। সে প্রতিবার একই তালে,একই সুরে হেসে যাচ্ছে। যেন কোন নাটকের হাসির মহড়া চলছে। এই মাত্র পঞ্চম বারের মতো তার হাসির আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

সামি বিরক্তি নিয়ে শোয়া থেকে উঠে বসল। মেঝেতে পা ফেলার ঠিক আগ মুহূর্তে তার মনে হল হৃদিকে একটা ফোন দেওয়া দরকার। সন্ধ্যা বেলায় সেই কথা কাটাকাটির পর থেকে হৃদি তার সাথে আর একটি কথাও বলেনি। চলে আসার সময় সামি যেচে পড়ে খোদা হাফেজ বলেছে কিন্তু হৃদি প্রত্যুত্তরে নিশ্চুপ ছিল। সামি

তৎক্ষণাৎ হৃদির নম্বরে ডায়াল করল। একবার নয়, গুনে গুনে পাঁচবার। কিন্তু হৃদি লা পাত্তা। ওদিকে রুদ্রর ডাকাতের মতো অট্টহাসি একটু পর পর ঘর কাঁপাচ্ছে। সামি ভাঁজযুক্ত কপাল নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসল। রুদ্র পায়ের ওপর পা তুলে মহা আরামের ভঙ্গিতে সোফার ওপর বসে আছে। হাতে চিপ্সের প্যাকেট। তার চোখ মুখ থেকে উপচে পড়ছে খুশি। সামি ওর হি হি করে হাসতে থাকা মুখটা দেখামাত্র দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'সমস্যা কী তোর?'

রুদ্র মুখে হি হি বজায় রেখেই উত্তর দিল, 'দোস্ত টেভার নোয়াহ দেখতেছি, নতুন শো। দেখলে আয়।'

সামি কোনো কথা না বলে একটা কঠোর দৃষ্টি রুদ্রর মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে করতে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। তার মাথা ধরেছে। এক কাপ চা এখন বাঞ্ছনীয়। এই বাসায় কোনো কাজের লোক নেই। টানাটানির সংসারে কাজের লোক রাখাটা বিলাসিতা বৈ অন্য কিছু নয়। সামির বেড়ে ওঠা অফুরন্ত অর্থবিত্ত এবং প্রাচুর্যের মাঝে। সে ছিল এক 'না চাইতেই সব পেয়েছি' র জীবন। এক গ্লাস পানিও কখনো তাকে নিজ হাতে ঢেলে খেতে হয়নি। বাড়িতে এত এত ঝি চাকরের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি ছিল যে সামি এদের কারো চেহারা ঠিক মতো মনে রাখতে পারতোনা। মনে রাখার চেষ্টাও করেনি কখনো। এ কথা কে জানত, যে বড়লোকের একমাত্র ছেলে সামিউল হককে একদিন উত্তরার সেই বিলাসবহুল, প্রাচুর্যমন্ডিত বাড়ি ছেড়ে এই বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার চোদ্দশ স্কয়ার ফিটের ভাড়া ফ্ল্যাটে নিজ হাতে চা বানিয়ে খেতে হবে। হ্যাঁ, মধ্যবিত্ত জীবন যাত্রার সাথে সে বরাবরই পরিচিত ছিল। তার বন্ধুরা সবাই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়ে। কিন্তু দূর থেকে নদীর স্রোত দেখা, উপভোগ করা এবং জলে নেমে সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে সাঁতার কাটার মাঝে যে আসলে কতটা তফাৎ সামি তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। বিলাসব্যসন বড় কঠিন নেশা। একবার কেউ এই নেশায় আসক্ত হয়ে গেলে, সেই আসক্তি কাটিয়ে

তোলা প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সামি এই অসম্ভব কাজটাকে অনেকাংশেই সম্ভব করে তুলেছে।

চা বানানো হয়ে গেলে সামি ধোঁয়া ওঠা চায়ের মগ হাতে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল। ড্রইং রুম পার হয়ে তার শোবার ঘরে যেতে হয়। যাবার সময় আবারও রুদ্রর সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুখ ভর্তি চিপ্স সমেত হা হা হাসিটা দিতে যাচ্ছিল রুদ্র। সামির কটমটে চোখের সামনে পড়ে গিয়ে সে তার সাধের হাসিটির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটাতে পারল না। চিপ্স গিলে ফিনফিনে গলায় বলল, 'বুন্দু, একা একা চা কাচ্চো?'

সামি বুঝল যে, রুদ্রর এই মুহূর্তে ফাজলামো মুড অন হয়ে আছে। এখন যে কোনো মূল্যে সে কথায় কথায় লেইম জোক ছুঁড়ে মারবে।। কিন্তু সামির এখন লেইম জোকের মুড নাই। সে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা দড়াম করে রুদ্রর মুখের ওপর আটকে দিয়ে খিটখিট করে বলল, 'মর শালা!'

রুদ্র উঠে এসে সামির ঘরের দরজায় করাঘাত করে বললো, 'মামা কী হইছে?সব ঠিকঠাক?'

সামি ভেতর থেকে চিৎকার করে বললো, 'প্যারা দিস না, যা ভাগ!'

– 'কিন্তু হইছেটা কী?'

– 'তোর মাথা হইছে।'

– 'আমার মাথা তো আমার মাথায়ই আছে। তোর কাছে গেল কেমনে।'

– ‘ভাগ শালা!’

বললো সামি কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসলো। তার কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে কপালে এসে পড়েছে। ভ্রু কুঁচকানো, দেখে মনে হচ্ছে কোনো গভীর চিন্তা তাকে গ্রাস করেছে।

সে ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র হুঙ্কার ছেড়ে বললো, ‘হৃদিরে একটা ফোন লাগা তো।’

– ‘তোর ফোনের কী হইছে?’

– ‘পক পক না কইরা যা করতে বলছি কর।’

রুদ্র আদেশ পালন করলো। সামি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসলো সোফার ওপর। রুদ্র বসলো না। দাঁড়িয়েই রইল। তার পরনে হাফ প্যান্ট আর ঘিয়া রঙের টি শার্ট। ঘাড় পর্যন্ত ঢেউ খেলানো চুল ফুলে ফেঁপে আছে। সে ফোন কানে নিয়ে গালের জংলা দাড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করছে। একটা সময় হৃদি ফোন ধরলো।

– ‘কীরে? কী চাই?’

রুদ্র সামির দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো,’ফোন ধরছে!’

সামি চট করে উঠে পড়ে ছোঁ মেরে রুদ্রর হাত থেকে ফোন নিয়ে নিল।

– ‘হ্যালো হৃদি?’

– ‘কে?’

– ‘আমি।’

সামির গলাটা চিনে নিতে হৃদির খুব বেশিক্ষণ লাগলোনা। ওপাশে খানিক নীরবতা। তারপর কান ফাটানো চিৎকার

– ‘সমস্যা কী তোর? সেই তখন থেকে আমারে বিরক্ত করতেছিস কেন?’

– ‘তুই আমার ফোন ধরিস নাই কেন? রুদ্রর নাম্বার দেখে তো ঠিকই ধরলি।’

– ‘তোমার ফোন আমি কেন ধরবো?আমি তো তোমারে হিংসা করি, তুমি জাননা?’

সামি একটু অপরাধীর গলায় বললো, ‘আরে, ঐটা তো এমনিই বলছি।’ —’এমনি বলছ তাইনা? শুনো তুমি মোটেও এমনি বলো নাই। যা বলছ ভাইবা চিন্তাই বলছ। তোমার চেহারা দেইখাই আমি টের পাইছি।’

এ কথা শুনে হঠাৎ করেই সামির গলা থেকে অপরাধী ভাবটা দূর হয়ে গেলো। তার বদলে উড়ে আসলো এক ধরণের গাম্ভীর্য।

– ‘লিসেন, তুই নিজেই এমনটা ভাবতে আমাকে বাধ্য করছিস।’

– ‘আমি বাধ্য করছি?’

– ‘হ্যাঁ করছিস। দ্যাখ হৃদিতা, সেই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তুই একটা মুহূর্তের জন্যেও আমার আর বিভার সম্পর্কটাকে সহজ ভাবে নিস নাই। ইউ নেভার

এক্সেপ্টেড দ্যা ফ্যাক্ট দ্যাট আমি আর বিভা উই আর একচুয়ালি ইন আ সিরিয়াস রিলেশনশীপ।'

– 'মেনে নেই নাই কারণ মেনে নেয়ার মত কোনো সম্পর্ক এটা না। আমি বিভার ভালো চাই, তোর ভালো চাই। এই কারণে তোদের প্রেম কখনো সাপোর্ট করিনাই। বাট আজকে আমি সত্যি অবাক হইলাম, তুই ভাবছস আমি তোদেরকে হিংসা করি বলে সব সময় নেগেটিভ কথা বলি? সিরিয়াসলি? মানে আমি এতটা মিন?'

সামিকে এই পর্যায়ে একটু বিচলিত দেখাল। সে ক্ষীণ গলায় বলল, 'না, ঠিক সেটা না।'

– 'তাহলে কী?'

সামি কথা খুঁজে পায়না। বড় একটা নিশ্বাস ফেলে সময় নিয়ে। ওপাশ থেকে হৃদি অনেকটা ধরা গলায় বলে, 'ইউ নো হোয়াট? তোর মনটা খুব নোংরা।'

লাইন কেটে গেল। সামি ফোন হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল থম ধরে। রুদ্র বলল, 'কাহিনী কী?'

সামি উত্তর দিল না। যেমন ছিল তেমন হয়েই বসে রইলো। তার কপালের ভাঁজ সরছেনা। রুদ্র পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টায় বললো,

– 'বাদ দে এইসব। হৃদি কালকের মইধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। ওরে নিয়ে চিন্তার কিছু নাই।

সামি এবার একটু নড়ে উঠল। ফোন নামিয়ে রেখে চায়ের কাপটা হাতে নিল। চা ঠান্ডা হয়ে গেছে। চুমুক দিতেই মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল।

– 'দাঁড়া তোর মুড় ভালো করতেছি। পর্ন দেখবি? নিউ কালেকশন। লেসবিয়ান পর্ন।' ফূর্তি ঝরে পড়তে লাগল রুদ্রর কণ্ঠ বেয়ে।

– 'আমি কি হৃদিকে কথাটা বলে ভুল করছি?' সামির হতাশা বিদ্ধ প্রশ্ন।

-' অবশ্যই ভুল করছিস। হৃদি কষ্ট পাইছে। কিন্তু ব্যাপার না, বন্ধুদের মধ্যে এসব হয়ই। ঠিক হয়ে যাবে। এতো চিন্তার কিছু নাই।'

সামিও জানে চিন্তার কিছু নেই। জেনে বুঝেও সে ভীষণ চিন্তা করছে ব্যাপারটা নিয়ে। শুধু চিন্তা নয় একেবারে দুশ্চিন্তা!

কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তারা বন্ধুরা অনেক হাবিজাবি কথা বলে সারাক্ষণ। কেউ এসব নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়না। শুধু কান দিয়ে শোনে, মনে লাগায় না। কিন্তু সামির আজকের কথাটা হৃদির হঠাৎ এত মনে লাগল কেন? আর হৃদির মনে লাগাটা বুঝতে পেরে সামিরই বা অমন উচাটন লাগছে কেন সেই তখন থেকে? এইসব মানসিক টানাপোড়েন বন্ধুদের ভেতর মানায়না। নাহ, বিগড়ে থাকা মেজাজটা ঠিক হচ্ছেনা। সামি রেগে মেগে সেলফোন থেকে হৃদিকে টেক্সট করল,

ঢং দেখানোর জায়গা পাস্ না শালী, দূরে গিয়া মর।

একটু বাদে হৃদি টেক্সট ব্যাক করলো, তুই মর হারামজাদা, দূরে কাছে যেখানে ইচ্ছা!

৫

কলিং বেলটা বাজছিল। আকাশ দরজা খুলল। অমৃতা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কালো ট্রাউজার, সাদা টি শার্ট। কপালে জমে আছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

– ‘কীরে? এই সময়?’ আকাশ অবাক।

অমৃতা পানসে গলায় বলল, ‘আইলাম কথা কইতে।’

– ‘কী কথা?’

– ‘ঢুকতে দিবিনা?’

আকাশ দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো, ‘আয়’

রান্না ঘরের দরজায় ঝুমকির গোলগাল মুখখানা উঁকি দিতে দেখা গেল।

– ‘ও, তুমি? এসো খাবে আমার সাথে।’

অমৃতা হেসে বলল, ‘না আন্টি, খেয়ে এসেছি। মা আজ খিচুড়ি রান্না করেছিল। জম্পেশ খানা খেয়ে দৌড় দিতে বের হলাম।’

ঝুমকি অবাক গলায় বলল, ‘ওমা, এই রাতে দৌড়তে বের হয়েছ তুমি?’

– ‘হ্যাঁ। দিনে সময় কোথায়?’

– ‘যাক, এসেছ ভালো হয়েছে। যাবার সময় দেখা করে যেও, কথা আছে।’

আকাশ ঝুমকি আর অমৃতার কথোপকথনটা খুব বেশি উপভোগ করছিল না। ক্রুর চোখে চেয়ে ছিল ওদের দুজনের দিকে।

ঝুমকির সাথে কথা শেষ হলে অমৃতা আকাশের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে আকাশ ত্যাড়া গলায় বলল, ‘আমার বাপের বউয়ের সাথে তোর অত খাতির কীসের রে?’

অমৃতা ঘরে ঢুকে পড়ার টেবিলের পাশে রাখা কাঠের চেয়ারে বসল, ঠান্ডা ভাবে বলল, ‘আছে হয়ত কোনো কথা। তুই সব সময় উনার সাথে এমন রুড বিহেভ করিস কেন? এটা ঠিক না।’

আকাশ ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ে বলল,

– ‘তা কেমন বিহেভ করা উচিত আমার উনার সাথে? কোলে তুইলা নাচব?’

– ‘নাচবি ক্যান? নরমাল থাকবি।’

– ‘আজাইরা কথা বলিস না। ক্যান আসছিস সেইটা বল।’

টেবিলের ওপর আকাশের ছাত্র ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতার বান্ডিল রাখা। অমৃতা হাত দিয়ে বান্ডিলটা নাড়া চাড়া করতে করতে বলল, 'ভাবতেছি সামির আব্বাকে শিক্ষাটা কীভাবে দেয়া যায়।'

– 'কী করতে চাস?'

– 'অপমান করা যায়, ধর ভরা মজলিশে সবার সামনে।

– 'মানে তুই সরাসরি উনারে কথা শুনাইতে চাইতেছিস?'

– 'হ্যাঁ'

– 'আরে না, যা করার আড়াল থেকে করতে হবে। ওই লোকের অনেক পাওয়ার, শেষে দেখা যাবে তোর কোনো ক্ষতি করে দিছে।'

– 'আমার কোনো ক্ষতি সে করতে পারবে না। কারণ আমার ক্ষতি

করলে সামি ওরে জীবনেও মাফ করবেনা।'

কথাটা শুনে আকাশ একটু ভাবল, তারপর বলল,

– 'তা ঠিক।

– 'আর আড়াল থেকে করব কেন? আমি কি ওরে ডরাই নাকি?'

– 'না ডরাবা কেন? তুমি তো বীরপুরুষ! সরি বীরনারী, বীরাঙ্গনা!'

অমৃতা আকাশের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়, কড়া ভাবে বলে, 'সব সময় ফাজলামো করস কেন?'

আকাশ হাসে, ‘ফাজলামো হবে কেন? আচ্ছা শোন, তুই কি সত্যিই এখন থেকে মেয়েদের মত চলবি?’

অমৃতা মুখ বাঁকায়, ‘মেয়েদের মতো চলা আবার কী জিনিস? খ্যাত কোথাকার!’

– ‘মেয়েদের মতো চলা মানে মেয়েদের জামা পরা, সাজগোজ করা, মানে এখন যেমন তোরে দেখলেই হিজড়া লাগে তখন আর সেইটা লাগবেনা।’

কথাটা শোনা মাত্র অমৃতার ফর্সা বেড়ালের মতো আদুরে গাল দুটোতে কিঞ্চিৎ রাগের আভাস পড়ল, ‘আমারে মোটেও হিজড়া লাগেনা দেখতে।’

– ‘লাগে লাগে! বেশভূষা না পাল্টাইলে বয়ফ্রেন্ড পাবিনা।’

– ‘বয়ফ্রেন্ড পাওয়ার জন্য আমার নিজেরে বদলাইতে হবে? হাহ, এমন বয়ফ্রেন্ড আমার লাগবেনা। আমি যেমন আছি তেমনই যদি কেউ আমাকে চায় তাহলে ভেবে দেখা যেতে পারে’ ।

– ‘কেউ চাইবনা।’ হাসে আকাশ, হাসে ওর চোখ।

– ‘দেখা যাবে।’ বলে অমৃতা আত্মবিশ্বাসের গলায়।

৬

মানুষের নাম কখনো বাঁদর হয়? হওয়া কি উচিৎ? হৃদির মনে হল একজন মানুষের বাঁদর নামকরণ সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি চরম অপমানজনক ঘটনা। অবশ্য ডারউইনের থিওরি মোতাবেক মানুষ একদা বাঁদর ছিল। ধীরে ধীরে ইভল্যুশনের

মাধ্যমে মনুষ্যজাতি বাঁদর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই হিসেবে পূর্বসূরিদের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন বাঁদর নামকরণের একটি যুক্তিযুক্ত কারণ হতে পারে। শাহবাগ মোড়ের রাস্তার জ্যামে বসে, গাড়ির এসির বাতাস খেয়ে খেয়ে এইসব অদ্ভুত ভাবনা ভাবছিল হৃদিতা।

এমন ভাবনার কারণ হল তাদের নবনিযুক্ত ড্রাইভারের নাম বাঁদর। বাঁদরের বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। তার শক্তপোক্ত চোয়াড়ে চেহারা। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল তার চেহারায় সত্যিই একটু বাঁদর বাঁদর ভাব আছে। তার আচার আচরণও অন্যান্য ড্রাইভারদের থেকে আলাদা। সে উঠতে বসতে সালাম দেয় না। দেখা হলে বলে, হ্যালো স্যার, হ্যালো ম্যাডাম। রাতের বেলা ডিউটি শেষ করে বাড়ি ফেরার আগে সুর করে টেনে টেনে বলে, হ্যাভ আ গুডনাইট। কথার মাঝখানে থ্যাংক ইউ, আই এম রিয়েলি সরি, ও শিট, ও মাই গড এইসব ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করে সে প্রায়শই বাড়ির লোকজনদের চমকে দেয়। শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে। শুধুমাত্র লোক শব্দটাকে লুক বলা আর ভালো কে ভালু বলা ছাড়া হৃদি এর বাংলা উচ্চারণগত কোনো সমস্যা ধরতে পারেনি।

হৃদির আব্বা আম্মা এই অসম্ভব রকমের স্মার্ট ড্রাইভারের গুণমুগ্ধ ভক্ত। কিন্তু হৃদি জানে লোকটা তাকে লক্ষ্য করে। মেয়েদের মাথার পেছনেও বাড়তি দুটো চোখ লাগানো থাকে। সেই চোখ যে কোনো পুরুষমানুষের নজর পড়ে ফেলে অনায়াসে। লোকটা যে তাকে শুধু বাহ্যিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করে তা -ই নয়। হৃদির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও তার রয়েছে গভীর কৌতূহল। যেমন একটু আগেই সে প্রশ্ন করলো ‘ম্যাডাম কি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করবেন?’

হৃদি মনে মনে বললো, তাতে তোর কীরে হারামজাদা?

মুখে বললো, ‘এখনো ঠিক করিনি।’

নিজের বাবার এই গাড়ি হৃদির খুব একটা ব্যবহার করা হয়ে ওঠেনা। তার বাবার একটু কৃচ্ছতা সাধনের বাতিক আছে। তিনি খুব দরকার না পড়লে ছেলে মেয়েদের গাড়ি ব্যবহার করতে দেন না। ছোট ভাই হৃদয় কলেজে যাওয়া আসা করে বাই সাইকেলে। বাবা নিজে অফিস যান বাসে ঝুলে ঝুলে। আজকাল বয়সের কারণে বাস, রিকশায় চড়ে বেড়াতে কষ্ট হয় বলে মাস ছয়েক আগে তিনি এই সেকেন্ড হ্যান্ড টয়োটা করলা গাড়িটা কম দামে কিনেছেন। দুই হাজার দশের মডেল। বেশ পুরোনোই বলতে হয়। তিন মাস ড্রাইভার হীন অবস্থায় গাড়িটা পড়ে ছিল। ড্রাইভারদের ডিমান্ড আজকাল আকাশ ছোঁয়া। পনেরো হাজারের নিচে তাদের বেতন দেয়া চলেনা। হৃদির বাবা কৃপণ মানুষ। মাস শেষে এতো গুলো টাকা গাড়ি চালকের হাতে তুলে দিতে গিয়ে তার আত্মায় কাঁপন ধরে। বাঁদরের যেতন তেরো হাজার ধার্য করা হয়েছে। এত কম টাকায় একজন পাকাপোক্ত গাড়ি চালক পেয়ে হৃদির বাবা খুশিতে আটখানা। বাবা এখন বাঁদরের যাদুবলে মোহাবিষ্ট। যেকোনো কাজে তিনি বাঁদরকে নিজের সঙ্গী হিসেবে পেতে চান। বাজার করা থেকে শুরু করে ঘরের টিউবলাইট লাগানো পর্যন্ত প্রতিটি কাজে তার বাঁদরকে চাই। আজ বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বাবা নিজেই হৃদিকে ডেকে বললেন, ড্রাইভারটা বসে আছে। তুই বরং গাড়ি নিয়েই যা।

আজ ক্লাস নেই। সে যাচ্ছে টি এস সি। বন্ধুরা সবাই জড়ো হয়েছে সেখানে। আড্ডা দেয়াই মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ক্লাস না থাকার ব্যাপারটা বাবাকে বলা যাবেনা। হৃদি মুখে ইচ্ছাকৃত ভাবে একটা গাম্ভীর্য টেনে এনে ঠিক আছে আমার ক্লাসের দেরি হয়ে যাচ্ছে ’ বলে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো।

.

– ‘আপনার এমবিএ শেষ হচ্ছে কবে?’

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হৃদিকে বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে দিল। কথার ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে ড্রাইভার না, ক্লাসমেট। হৃদি কটমটে চোখে সম্মুখের সিটে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকালো। ঠান্ডা গলায় বললো, ‘বাঁদর সাহেব, আপনার নামটা কে রেখেছে? আপনার বাবা নাকি মা?’

বাঁদরকে বিচলিত দেখালো না। সে স্ফীত একটি হাসি হেসে হালকা গলায় বললো, ‘আমার দাদা।’

– ‘কেন এই নাম রেখেছিলেন তিনি?আপনার চেহারা বাঁদরের মতো দেখতে, সেই কারণে কি?

বাঁদর স্বাভাবিক ভাবে বলল, ‘জি না সে কারণে না।’

– ‘তাহলে কারণটা কী? আপনার স্বভাব বানরের মত এটা কি কারণ হতে পারে?’

– ‘মানুষের স্বভাব বানরের মতো কী করে হয়?

– ‘হতে পারে, কিছু মানুষ বানরের মতো কথায় কথায় অন্যের মাথায় উঠে বসতে চায়।’

বাঁদর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করল, ‘আমার আসল নাম বদরুজ্জামান। বাল্যকালে দুষ্টু ছিলাম বলে দাদা আদর করে নাম রেখেছিলেন বাঁদর।’

জ্যাম ছেড়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করেছে হেলেদুলে। হৃদি আর কোনো কথা বাড়ালোনা। জানালার বাইরে চোখ রেখেও বুঝতে পারলো সামনের সিটে বসে ব্যাক মিররে চোখ রেখে বাঁদর তাকেই পরখ করছে। বাবার সাথে কথা বলতে হবে। এই বেয়াদবি বেশিদিন সহ্য করা যাবেনা।

টি এস সি তে হৃদিকে নামাবার পর বাঁদর বললো, 'ম্যাডাম, স্যার বলেছেন বসে থেকে একবারে আপনাকে নিয়ে যেতে। আমি গাড়ি পার্ক করে রাখছি। আপনার কতক্ষণ লাগবে?

– 'বলতে পারছিনা। আমি ফোনে জানাবো আপনাকে।'

টিএসসির ভেতরে তার বন্ধুরা ঘাসের ওপর গোল হয়ে বসে ছিল। হৃদির মুখে অপ্রসন্নতা দেখে অমৃতা প্রশ্ন করলো, 'কী হয়েছে তোর? কোনো সমস্যা?'

হৃদি স্যান্ডেল খুলে রেখে ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললো, 'আর বলিস না।আমার ড্রাইভারটা একটা আস্ত বেয়াদব।'

– 'লোকটা কম করে হলেও তোর থেকে বয়সে দশ বছরের বড় হবে। ড্রাইভার হয়েছে বলে কি তার মান সম্মান নেই? বেয়াদব বলতেছিস কেন?' আকাশ বললো, অভিযোগের গলায়।

– ‘বয়সে বড় হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে? আজিব কারবার! সে একটা চাকরি করে। তার উচিত ফর্মাল বিহেভ করা। আমি আজকেই এই ব্যাপারে বাবার সাথে কথা বলব।’

– ‘কথা বইলা কী করবি?’

‘কী করবো মানে? এই ব্যাটার চাকরি শেষ। নতুন ড্রাইভার খুঁজতে হইব।’

– ‘বেতন কত দিবি?’ আকাশের প্রশ্ন।

– ‘এই ধর তেরো, চোদ্দ এই রকম।’

এবার আকাশ বেশ সিরিয়াস গলায় বললো, ‘তাই? আরেকটু বাড়ানো যায়?’

– ‘মানে?’

– ‘মানে ষোলো বা সতেরো করা যায়?’

হৃদি চোখ কপালে তুলে বললো, ‘মাথা খারাপ! আমার বাপ্ হার্ট ফেইল করবে। কিন্তু তুই এসব কেন জানতে চাইছিস?’

– ‘না ভাবতেছিলাম ড্রাইভারের চাকরিটা নিব নাকি।’

– ‘তোর তো চাকরি আছেই।’

– ‘ধুর, এই চাকরি ভাল লাগেনা। ছেলেমেয়ে গুলা সব বেদ্দপ, বেত্তমিজ। কতা শোনেনা। তার উপর পরীক্ষার খাতা হারায় ফেলছি। বেশিদিন মনে হয় থাকবনা এই চাকরি।’ আকাশ বললো আফসোসের গলায়।

অমৃতা উদাস ভাবে বললো, ‘আমার চেম্বারে মোক্তারের পদ খালি হইছে। দশ হাজার বেতন। করবি চাকরিটা?’

– ‘মোক্তার জিনিসটা কী?’

– ‘উকিলের সাহায্যকারী।’

– ‘না উকিল টুকিল আমার সহ্য হয়না। অন্য কিছু থাকলে বল।’

অমৃতা গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো, তারপর বললো, ‘আমার এনজিও তে নতুন একটা পদ আসতেছে। একেবারে ইউনিক।’

– ‘কী পদ? বেতন কত?’

– ‘বেতন বিশ হাজার দিয়া শুরু।’

– ‘কামটা কী?’

অমৃতা নড়েচড়ে বসে গম্ভীর গলায় বললো, ‘তুই তো জানিস, আমাদের সংগঠনটা মূলত হিজড়া জনগোষ্ঠীর রাইটস নিয়ে কথা বলে। সো আমাদের এমন কয়েকটা ছেলে মেয়ে দরকার যারা হিজড়াদেরকে একটু সময় দিবে, ধর দিনের পর দিন ওদের সাথে কাটাবে। ফোনে কথা বলবে, রিকশায় চড়ে ঘুরে বেড়াবে, এক সাথে খাওয়া দাওয়া করবে।’

আকাশ ভূত দেখার মত চমকে উঠল, ‘সর্বনাশ! বলতেছিস কী তুই? কেন এইসব করতে হবে?’

– ‘যাতে করে ওদের রিয়েল লাইফটা সম্পর্কে আমরা খুব ভালো মত জানতে পারি। ওদের লাইফ নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার চেষ্টা করতেছি। করতে পারিস চাকরিটা। তেমন কষ্ট নাই। খানা খরচ ফ্রি।’

আকাশ শিউরে উঠল, ‘না মামা, হিজড়া দেখলে আমার ভয় লাগে। দেখলেই কেমন হাত তালি দিয়ে টাকা চাইতে আসে, গায়ের উপর পড়ে। মনে হয় যেন এক কামড়ে চিবায় খায় ফেলবে।’

অমৃতা কথাটা শুনে অপ্রসন্ন গলায় বললো, ‘এইটা কোনো কথা কইলি তুই? মানুষ দেখলে তোর ভয় লাগে?’

– ‘হ্যাঁ এই জগতে মানুষই তো সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাণী।’

সন্ধ্যের বাতাসে খুব একটা শীত ভাব নেই আজ। তবে একটা শান্তির ছোঁয়া আছে। ঢাকা শহরে এখন বছরের শেষের দিকটায়ই যা একটু শীতকালটাকে অনুভব করা যায়। বাকি ঋতুগুলোর কোনো আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনা। তবে এখনো শরৎকালের আকাশে মাঝে মাঝে পাল তোলা নৌকোর মতো মেঘের ভেলা ভাসতে দেখা যায় আর আছে কালবৈশাখী ঝড়ের দাপট। এই এতটুকু ঋতু বৈচিত্রই এখন এ শহরের শেষ মৌসুমী সম্বল।

রুদ্র বাদামের খোসা ছাড়িয়ে মচ মচ শব্দ তুলে বাদাম খাচ্ছিল। খেতে খেতেই বললো, 'ঐসব বাদ দে। এখন বল চান্দা দিতেছিস কবে? পার হেড পঁচিশ হাজার চান্দা।'

হৃদি পানসে গলায় বললো, 'আমি আগেই কইছি। টাকা নাই, পয়সা নাই। এবার আমার যাওয়া হবেনা।'

শুনে রুদ্র ভারী করুণ গলায় বললো, 'কিন্তু আমার গিফটটা? তোদের না আমারে ঢাকা কলকাতা এয়ার টিকেট গিফট করার কথা?'

– 'গিফটের ভাগ দিয়ে দিব। প্রত্যেকের ভাগে তিন হাজার করে পড়ছে।' রুদ্র আশ্বস্ত হল। চীনা বাদাম চিবোতে চিবোতে তৃপ্ত গলায় বললো, 'ও, তাইলে ঠিক আছে।'

সামি রুদ্রের মাথায় একটা গাট্টা মারলো, 'শালা সেলফিশের বাচ্চা। '

– 'কোনো ভাবে কি টাকা ম্যানেজ করা যায়না হৃদি? তোকে ছাড়া খুব খারাপ লাগবে। বিভাও কষ্ট পাবে তোকে না দেখলে।' মন খারাপের গলায় বললো অমৃতা।

– 'মনে হয়না। আমার বাপ তো কিপ্টার হাড্ডি। জীবনেও দিবেনা আর এখন জানিস নাতো উঠতে বসতে খোঁটা দেয়। বলছে এই বছরের মধ্যে চাকরি জোগাড় করতে না পারলে বিয়া দিয়া দিবে।'

আকাশ বললো, 'আচ্ছা তুই চিন্তা নিস না। আমরা কিছু একটা ম্যানেজ করবো।'

সামি হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করে বসলো, ‘তোর কি আসলে যাবার ইচ্ছা নাই?’

গতকাল মেসেজ আদান প্রদানের পর থেকে সামির সাথে আর কোনো কথা হয়নি হৃদির। রাগটা এখনো বুকের ওপর দাঁত চেপে বসে আছে। হৃদি সামির চোখে চোখ না রেখে অন্য বন্ধুদের দিকে চেয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির গলায় বললো, ‘মানে আমার ফ্রেন্ডরে নাকি আমার দেখতে যাওনের ইচ্ছা নাই। কিছু মাইনষের কথা শুনলে মনটা চায় কী যে করতে!’

– ‘প্রশ্ন করছি আমি, উত্তরটা অন্য দিকে তাকায় দিচ্ছিস কেন? এসব ঢং কই থেকে শিখছিস?’

হৃদি সামির কথাটা পাত্তা দিলো না। আকাশকে বললো, ‘তোরা ম্যানেজ করবি মানে কী? তোদের কি টাকা বেশি হইছে? টাকার গাছ লাগাইছিস?’

– ‘হ লাগাইছি। টাকা গাছ থেকে আসবে নাকি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়ে নামবে তা নিয়ে তোর ভাবতে হবেনা। তুই যাওয়ার জন্য রেডি হ।’

– ‘টাকা আসবে কোত্থেকে শুনি?’

– ‘শোনা লাগবে না।’

– ‘না শুনলে আমি যামুনা।’

– ‘যাবিনা মানে? তুইলা নিয়া যামু তরে।’ আকাশ বললো জোরালো গলায়।

৭

পায়রার ডাকে ঘুম ভেঙেছিল বিভাবরীর। চোখ মেলে দেখলো বিমের খাঁজে খাঁজে নবাবী চালে ঘুরছে ফিরছে এক জোড়া ধবধবে সাদা পায়রা। খানিক বাদে বাদে ডানা ঝাপটাচ্ছে। ওগুলো কার কে জানে! অভিজিৎ কি পায়রা পোষে?

বিছানায় তাকিয়ে দেখলো অভিজিৎ নেই। দেয়াল ঘড়ির কাঁটা বলছে বেলা দশটা বেজে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ি মা রোজ সকাল আটটায় দরজায় করাঘাত করে ডেকে তুলতেন তাকে। নাশতার টেবিলে বাড়ির প্রতিটি সদস্যের উপস্থিতি ছিল বাঞ্ছনীয়। আজ অনেক অনেক দিন পর বিভা এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠলো। রাতে ঘুম ভালো হয়েছে। শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। মনটাও চনমনে!

এই ঘরে একটি মাত্র ডাবল খাট। পশ্চিমের মেঝে থেকে উপরে উঠে গেছে প্রায় সিলিং ছোঁয়া লম্বা এবং প্রশস্ত এক মেহগনি কাঠের আলমারি। তার পাশে মাঝারি আকারের ড্রেসিং টেবিল। সাথে বেশ বড়সর এক আয়না। পুরোনো দিনের আসবাবগুলোতে আভিজাত্যের একটা ছাপ আছে। কিন্তু ঘরে কোনো সোফা টোফা নেই। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে এসে অভিজিৎ ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'আপনি বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি মেঝেতে শোবো।'

– 'না না। আপনি কেন বিছানা ছাড়বেন? আমিই শোবো মাটিতে।'

– 'মেঝে খুব ঠান্ডা। আপনার অসুখ করবে।'

বিভা হালকা হেসে বলেছিল, 'আমার অসুখ করলে কোনো সমস্যা নেই। আপনি কাজের মানুষ। আপনার সুস্থ থাকা চাই। অসুখ করলে অফিস করবেন কী করে?

অভিজিৎকে একটু দ্বিধাগ্রস্থ দেখালো। একটুক্ষণ কিছু একটা ভেবে নিয়ে বললো, ‘এত কষ্ট করার কী দরকার? এ বাড়িতে আরো তিনটা বড় বড় ঘর আছে। আপনি যেকোনো একটি নিয়ে নিন। কোনো সমস্যা নেই।’

অভিজিতের কথাটা যথেষ্ট যৌক্তিক এবং তার বলার ধরণটাও বেশ আন্তরিক। কিন্তু বিভার কাছে কথাটা কেন যেন বড্ড অপমানজনক ঠেকলো। তার চোখের তারায় মুহূর্তের জন্য পড়ল একটা গাঢ় কালো ছায়া। একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে সে অপমানের রেশটা কাটানোর চেষ্টা করল, তারপর কঠিন গলায় বললো, ‘আপনি কি মনে করছেন আমি আপনার সাথে এক ঘরে থাকার জন্য মরে যাচ্ছি? মোটেও না। আমি খুব ভালো ভাবেই জানি যে এই বাসায় আরো অনেকগুলো ঘর আছে। তা সত্ত্বেও আমি আপনার সাথে এক ঘরে ঘুমোতে এসেছি লোকলজ্জার ভয়ে। বাড়িতে এতগুলো চাকর বাকর রেখে বসে আছেন। আমি প্রথম দিনই অন্য ঘরে শুতে গেলে ওরা কী ভাববে? খুব সুনাম হবে কি আপনার?’

– ‘কাজের লোক আমি রাখিনি। এরা সব সরকারি লোকজন। যাই হোক আপনি এতটা ম্যাচিওর্ড চিন্তা ভাবনা করতে পারেন, এটা জানতে পেরে অবাক লাগছে।’

– ‘ম্যাচিওর্ড চিন্তা ভাবনা করতে গিয়েই তো আজ আমার এই দশা। সমাজের কথা না ভেবে থাকতে পারলে তো ল্যাঠা চুকেই যেত।’

– ‘তা অবশ্য ঠিক। সামাজিক চাপ না থাকলে আপনি আজ আপনার বয়ফ্রেন্ডের সাথেই থাকতেন। সুখে থাকতেন।’ কথাটা বলে অভিজিৎ একবার চোরা চোখে দেখল বিভাকে, তারপর বিছানার ওপর পা তুলে বসলো।

বিভা অভিজিতের দিকে পলক তুলে চাইলো। এই লোকটার চেহারায় একটা স্থায়ী ভালোমানুষীর ছাপ আঁকা আছে। মোটা চশমার কাচের ভেতর বড় বড় দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। ঋজু চাহনি, শ্যামলা গায়ের রং আর ছিপছিপে গড়নের মানুষটাকে দেখলেই মনে হয় এ ভারী নিরীহ প্রকৃতির। অন্যের ভালো করা ছাড়া এই মানুষের বেঁচে থাকার অন্য কোনো পার্থিব উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু এই পৃথিবীতে বিভাই একমাত্র ব্যক্তি যে কিনা এই লোকটাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। বাইরে থেকে দেখতে তাকে যতটা সহজ সরল মনে হয়, ভেতরটা ঠিক ততটাও সহজ নয়। ঠান্ডা মাথায়, ঠান্ডা গলায় সে প্রতিপক্ষকে আঘাত করে কথা বলে। বলার ভাবটা এমন থাকে যে চট করে প্রতিক্রিয়া দেখানো যায়না। কিছু বলা যায়না, সওয়াও যায় না।

বিভা অভিজিতের মাত্র বলা খোঁচা মারা কথাটা হজম করলো। আলমারির ভারী পাল্লা খুলে ওপরের তাক থেকে ভাঁজ করা একটি চাদর আর দু খানা কম্বল বের করলো। সে টের পাচ্ছিল অভিজিৎ তার দিকেই চেয়ে আছে। অভিজিৎ কিন্তু সচরাচর খুব একটা দেখেনা তাকে। লোকটার এই একটা গুণ আছে বলতে হবে। মেয়েদের মুখের দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকার অভ্যাস নেই।

– ‘কী হল?’

– দেখছি।’

– ‘কী দেখছেন?’

– ‘আপনার গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে আপনি যেন অনেক দিন ধরে এ বাড়িতে আছেন। এ যেন আপনার পরিচিত জায়গা। আলমারিতে স্পেয়ার চাদর রাখা আছে তা কী করে জানলেন? আমিই তো জানিনা!’

– ‘ওমা জানবোনা কেন? ঐযে কাজের মেয়েটা, দূর্গা নাম। সে তো পৌঁছনো মাত্রই সব কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে আমাকে। কোথায় কী রাখা আছে সমস্ত কিছু পই পই করে বলে দিয়েছে।’

– ‘তাই নাকি? অবাক কান্ড তো!’

বিভা মেঝেতে চাদর বিছিয়ে দিল। তার ওপরে মোটা কম্বল। বিছানার ওপর থেকে একটা বালিশ তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলো মেঝেয়। তারপর বললো, ‘অত অবাক হওয়ার কী আছে? আমার সংসারের ভার আমাকে বুঝিয়ে দেবনাতো কাকে দেবে?’

অভিজিৎ চকিতে তাকালো বিভার দিকে। তার চোখে বিস্ময় খেলছে। মেয়েটাকে সে বুঝতে পারছেনা। কিছুক্ষণ অসাড় ভাবে চেয়ে থেকে অস্ফুটে বললো,

–-’আপনার সংসার?

বিভা এ পর্যায়ে একটু বিব্রত বোধ করলো। নিজের বলা কথাটা চিন্তা করে নিজেই যেন লজ্জা পেয়ে গেল। চোখ নামালো নিচে,

– ‘না মানে··· লোকে তো অন্তত তাই ভাবে।’

কথাটা বলে বিভা গায়ে কম্বল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে বললো, ‘ঘুমোবেন না?বাতি নিভিয়ে দিন।’

অভিজিৎ কোনো কথা না বলে চুপচাপ আদেশ পালন করলো। বাতি নেভানোর সাথে সাথে ঘরটা হয়ে গেলো ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও এক রত্তি আলো নেই। পাহাড়ের শীত মানে ভয়ংকর ব্যাপার। ঘরের ভেতর একটা ছোট কম পাওয়ারের হিটার চলছে। তবুও শীত দমন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিজিৎ বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল। বিভাও স্থির হয়ে শুয়ে নেই। নড়াচড়া করে শীতটাকে কাবু করার চেষ্টা করছে সে। বাড়ির ভেতরটা একেবারে নিঃশব্দ। বাইরে ক্রমাগত ডেকে যাচ্ছে ঝিঁঝি পোকা। সাথে আরো কয়েকটি রাত চরা পাখি। বনের মাঝে শুকনো পাতায় সর সর শব্দ তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে কোনো চারপেয়ে জন্তু। হঠাৎ হঠাৎ ডাকছে হাতি। হোউপ হোউপ করে ডাকছে কোনও নাম না জানা জানোয়ার। হনুমান কি? কে জানে! গভীর রাতেও অরণ্য তার নিজস্ব বাসিন্দাদের নিয়ে বুঝি পরিপূর্ণ ভাবে জাগ্রত। বিভা মন দিয়ে বাইরে থেকে আসা শব্দ গুলো শুনছিল। কোনটা কীসের শব্দ তা আলাদা আলাদা করে চেনার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই সময় অভিজিৎ হঠাৎ কেমন অচেনা গলায় বলে উঠলো,

– ‘অনেক ভালোবাসেন ওই ছেলেটাকে, তাইনা?’

প্রশ্নটা বিভার বুকে গিয়ে ঠঙ করে বাজলো। সেই ছেলেটা! সেই কোঁকড়া চুলো, ফর্সা, ছয় ফুট লম্বা, সিগারেট পোড়া কালো ঠোঁটের পাগল, বাউন্ডুলে, ছন্নছাড়া এবং একরোখা ছেলেটা। সাগর সৈকতে স্রোতে ভাসতে ভাসতে যে ছেলেটা ডাকাতের মতো জোর করে চুমু খেয়েছিল তাকে। সেই কিশোর বেলায় প্রথম দেখার দিনটিতে যে ছেলেটি অকপটে বলেছিল, তুমি হিন্দু না হলে তোমার সাথে ঠিক ঠিক প্রেম করতাম। যে ছেলেটা তার বন্ধু, তার প্রেমিক, তার সব কিছু! হ্যাঁ ভালোবাসে বিভা। বড় বেশি ভালোবাসে। কিন্তু আজ অভিজিতের এই আকস্মিক প্রশ্নটা তাকে একটু অস্বস্তিতে ফেললো। একটু থেমে থেমে বললো, ‘হঠাৎ এই প্রশ্ন?’

মাথার কাছে রাখা সেল ফোনটা বিপ করে শব্দ করে উঠলো। অন্ধকার ঘরে ওই একটুখানি মোবাইলের আলো বিদ্যুতের ন্যায় চমকে উঠলো যেন। বিভা মোবাইলটা হাতে নিয়ে দেখলো। সামি লিখেছে, 'লাইনে আছিস?'

চট করে শোয়া থেকে উঠে বসলো সে, অভিজিৎকে বললো, 'আমি একটু আসছি।'

অভিজিৎ প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না। সে জানে বিভা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তার বলার কিছুই নেই।

আজ সকালে নতুন একটা শাড়ি পরলো বিভা। কলাপাতা রঙের তাঁতের শাড়ি। সিঁথিতে আঁকল সিঁদুর। লম্বা চুল গুলো মুড়িয়ে হাত খোঁপা করল। তার খোঁপাটা এখন বেশ বড় হয়। ইন্ডিয়ায় আসার পর থেকে আর চুল কাটা হয়নি। আগে ছ মাস অন্তর অন্তর সে আর হৃদি একসাথে পার্লারে গিয়ে চুল কাটতো। হৃদির কথা মনে পড়তেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কত দিন দেখেনা শয়তান গুলাকে! কত করে বললো একটা বার ঘুরে যা কলকাতা থেকে। আসলোই না! বেশ তো বিভাও ভুলে যাবে ওদের কথা। একদম ভুলে যাবে!

বাইরে ঝকঝকে একটি সকাল। শীতকালের কুয়াশা ভাসা মিঠা রোদ্দুর শুয়ে আছে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে। কিচিরমিচির ডাকছে পাখি। শোবার ঘর থেকে বেরিয়েই চোখে পড়লো বসার ঘরের ফুলদানিতে সাজানো তাজা কয়েকটি লাল গোলাপ। দেখে স্নিগ্ধ এক ঝাপটা এসে লাগলো মনের মাঝে। অনেক দিন বাদে বিভার আজ নিজেকে মুক্ত মনে হচ্ছে, স্বাধীন মনে হচ্ছে! সে রসুইঘরে উঁকি দিল। দূর্গা মেঝেতে বটি নিয়ে বসে মাছ কুটছে। আঁশটে একটা গন্ধে ছেয়ে আছে রসুইঘর। এ ঘরের সাথে একটা

দাওয়া আছে। একটা মোরগ দম্পতি ছানা পোনা নিয়ে সেই দাওয়ায় নিশ্চিন্তে কক কক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিভাকে দেখে এক গাল হেসে দূর্গা বললো, ‘কী গো বৌদিমণি? সকাল হল তোমার? দাদাবাবু বেরিয়েছেন সেই ভোরবেলায়। কত করে বললুম তোমায় একটিবার ডেকে তুলতে। সে শুনলোইনা কতা। বলে কিনা তোমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোটা নাকি উচিত কম্ম হবেনা।’

দূর্গার কথায় বিভা কী বলবে খুঁজে পেলোনা। একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসলো শুধু।

দূর্গা আবার বললো, ‘তুমি কী খাবে? চা করে দিই?’

– ‘আমি নিজেই করে নিচ্ছি। আজ কী রান্না হবে?

– ‘তুমি রাঁধবে? রুই মাছ করব। আর সুক্তোর তরকারি, সাথে বেগুন ভাজা।’

– ‘আমার রান্নার হাত খুব একটা ভালোনা। বাড়িতে রোজ মা’ ই রান্না করতেন। তোমার দাদাবাবুর আমার রান্না খেয়ে অভ্যেস নেই। সে খেয়েছে হয় মায়ের রান্না, নয় তোমার রান্না। তুমিই কর রান্নাটা।’

– ‘ঠিক আছে। আমিই করবো।’ শেষ কথাটা বলার সময় দূর্গাকে বেশ প্রফুল্ল দেখালো।

বিভা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে বসলো। ঘাসের ডগায় ডগায় এখনো শিশির বিন্দু ঝিকমিক করছে। সামনের ঘাস ওয়ালা জমিনটার পরেই জঙ্গলের শুরু।

শাল, পলাশ, জামুন ইত্যাদি গাছের সমাহার। সারি সারি গাছ গুলোর ওপাশে ভারী নিশ্চিন্তে তির তির করে বইছে জলঢাকা নদী। এখান থেকে নদী দেখা যায়না। শুধু শব্দ শোনা যায়। জলের শব্দ, বাতাসের শব্দ। নদীর পরেই সটান দাঁড়িয়ে আছে আকাশ চুম্বি সবুজ আর মাটি রঙের পাহাড়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কয়েকটি বাঁশের তৈরী ঘর বাড়ি। ঘরের সামনে ছুটোছুটি করছে আদিবাসী বাচ্চারা। পাহাড়ের চুড়ো ছুঁয়ে ছুঁয়ে স্বপ্নের মত উড়ে বেড়াচ্ছে ধোঁয়াটে মেঘ। সেই ধোঁয়া ধোঁয়া পলকা মেঘের ওপর স্পষ্ট রুপে ভেসে আছে সূর্য রশ্মি।

সেলফোন হাতেই ছিল। বিভা সামিকে মেসেঞ্জারে ভিডিও কল করতেই সামি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রিসিভ করল। মোবাইলের ক্যামেরায় সামির মুখ ভেসে উঠলো।

– ‘কই তুই?’ বিভার প্রশ্ন।

– ‘ড্রাইভ করি। স্কুলে যাই।’

‘ও রাস্তায় কি অনেক জ্যাম?’

– ‘হ্যাঁ জ্যাম তো থাকবেই। শোন চাকরিটা মনে হয় ছেড়ে দিব।’

– ‘কেনো?’

– ‘বিরক্ত লাগে বাচ্চা পড়াইতে।’

– ‘আগে অন্য কোনো ব্যবস্থা করে নে, তারপর নাহয় ছাড়িস।’

– ‘নাহ, অন্য ব্যবস্থা পরে হবে। এই বালের চাকরি আর করবোনা।’

এটুকু বলে সামি ড্রাইভ করতে করতেই হঠাৎ বিভার কপালের দিকে চেয়ে কড়া গলায় বললো, ‘এই বিশ্রী জিনিসটা কি তোর প্রতিদিন লাগাইতে হয়?এখন তো শ্বশুর, শাশুড়ি নাই।এখন তুই কার ভয়ে এটা পরিস? হ্যাঁ?’

বিভা বুঝলো তার সিঁথিতে পরা সিঁদুর নিয়েই সামির অভিযোগ। সামি কখনোই এই লাল রঙটাকে বিশেষ পছন্দ করতে পারেনি। শ্বশুর বাড়িতে থাকাকালীন সময়ে সিঁদুর উপড়ে ফেলার কোনো উপায় ছিলোনা। শ্বশুর শাশুড়ির দোহাই দিয়ে সামিকে নিরস্ত করা গেছে। কিন্তু কলকাতা শহর ছেড়ে এতদূরে এসেও যে সামাজিক বিধিনিষেধ গুলো বিভার মাথার ওপর থেকে পুরো দমে সরে যায়নি তা এখন সামিকে কে বোঝাবে?

– ‘এখানে কাজের লোক টোক আছেনা? সিঁদুর না পরলে ওরা কী বলবে?’

– ‘সিরিয়াসলি বিভা? আগে বলতি ওই এসহোলটার বাপ্ মা নাকি রাগ করবে, আত্মীয় স্বজন কী বলবে, ব্লা ব্লা ব্লা।… আর এখন তুই আমাকে কাজের লোকের এক্সকিউজ দেখাচ্ছিস?’

বিভা একটু নিভলো। ঠোঁট বাঁকা করে বিরক্তিসূচক চ কারান্ত একটি শব্দ করে বললো,

– ‘সামি তোর সবকিছুতে তাড়াহুড়া। আরে আসছি মাত্র গতকাল। একটু তো সময় দিবি আমাকে, তাইনা?’

– ‘সময় দিতে দিতে প্রায় এক বছর হয়ে গেছে। আর কত সময় চাস তুই? ওই লোকটার বৌ সেজে থাকতে খুব ভাল লাগে তাইনা? লিসেন, আই ক্যান্ট টেক দিস এনিমোর।’

– ‘আর কয়েকটা দিন সময় দে।

– ‘থাক তুই তোর সময় নিয়ে। জাস্ট গো এন্ড ফাক ইওরসেল্ফ।’

লাইন কেটে দিল সামি। বিভা প্রায় সাথে সাথেই আবার কলব্যাক করলো। সামি ধরলোনা। এরপর বিভা মায়ের নম্বরে ফোন করলো। কথা বলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ফোন করল হৃদি আর অমৃতাকে। এভাবেই এর ওর সাথে ফোনে কথা বলে সকালটা কাটলো তার। দুপুরে দূর্গা এসে বললো, ‘বৌদি তুমি কি খেয়ে নেবে? নাকি দাদাবাবুর জন্য অপেক্ষা করবে?’

কঠিন প্রশ্ন। খিদেয় পেটের ভেতর ছুঁচো দৌড়োচ্ছে। এমন অবস্থায় না খেয়ে কারো জন্য অপেক্ষা করে উপোস বসে থাকা কি সম্ভব? বিভা একটু নিস্তেজ গলায় বললো, ‘তোমার দাদাবাবু কখন আসবেন?

– ‘এইতো ঘন্টা খানেকের ভেতরেই চলে আসবেন। দুপুরে খেয়ে নিয়ে আবার ফিরে যাবেন অফিসে।’

– ‘বেশ তো, অপেক্ষা করছি। তিনি আসুক। এক সাথেই খাবো।’

দুপুরে বিছানায় গড়ালো বিভা। একটু ঘুম পেয়ে গিয়েছিল। ঘুম যখন ভাঙলো তখন ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। অভিজিতের কোনো খবর নেই। সকাল থেকে দুটো শুকনো বিস্কুট আর চা ছাড়া কিছুই বলতে গেলে খাওয়া হয়নি। বিভা আর না পেরে দূর্গাকে

বললো, ‘তিনি মনে হয় আজ খেতে আসবেন না। আমাকে খাবার দিয়ে দাও। খেয়ে নিই।’

দূর্গাকে চিন্তিত দেখালো, ‘বুঝলুম না। হঠাৎ কী হল দাদাবাবুর। রোজ ঠিক সময় মত এসে দুপুরের খাবার খেয়ে যান। অনিয়ম করাটা তার স্বভাবেই নেই।’

দূর্গার বলার ধরণে মনে হয় যেন অভিজিৎকে সে কত শত বছর ধরে চেনে। কেমন একটু অধিকার, দরদ আর মায়া মেশানো ওর কথাগুলোতে। বিভা দূর্গাকে ভালো করে লক্ষ্য করে। বয়স কত হবে? বাইশ কি তেইশ। বিভার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে। চোখ দুটো গোল। মুখের ছাঁচটা একটু লম্বাটে কিন্তু মায়া মায়া একটা ভাব আছে। বাদামি গায়ের রং। দেহখানা ভরাট। এরকম একটা যুবতী মেয়ের সাথে অভিজিৎ একই বাড়িতে বছর দেড়েক সময় ধরে আছে। ওদের মাঝে কোনো অন্যরকম সম্পর্ক নেইতো? দূর্গার কি অভিজিতের প্রতি কোনো দুর্বলতা আছে? দাদাবাবু দাদাবাবু বলে অত কেন বাক বাকুম হওয়া? ভাবতেই বিভার কেমন গা গুলিয়ে উঠলো। অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো দূর্গার উপস্থিতি তার এই মুহূর্তে আর ভালো লাগছেনা। সে একটু ধারালো গলায় বললো,

‘দাদাবাবুকে নিয়ে তোমার অত ভাবতে হবেনা। আমি ফোন করে জেনে নেব তার খবর। তুমি যাও কাজ সেরে নাও। আর তোমাদেরও তো খেতে হবে নাকি? সারা দিন কি উপোস থাকবে?

দূর্গা চলে গেলো। ভাতের প্লেট নিয়ে খাবার টেবিলে বসে বিভা বন্ধুদের ফোন করলো। বন্ধুরা তখন টি এস সি চত্বরে। ভিডিও ক্যামেরায় ওদের সব গুলার চেহারা ভেসে উঠতেই বিভা আয়েশ করে বললো, ‘বন্ধুরা, আমি একন বাত কাবো। তোমরা সবাই দেকো। মেকে মেকে বাত কাবো! কুব ট্যাশ।’

৮

গাড়িতে উঠে বসে দরজা দিতেই দেখা গেলো কাচের জানালায় কেউ একজন আঘাত করছে। হৃদি তাকিয়ে দেখলো সামি। জানালার কাঁচ নামিয়ে বললো, ‘কী চাই?’

– ‘দরজা খোল, বসতে দে।’

– ‘কেন তোর রাইড লাগবে?’

– ‘হ্যাঁ লাগবে।’

– ‘সরি, আমি এখন অত দূর যাইতে পারবোনা। রাস্তায় জ্যাম অনেক।’ ড্রাইভার বাঁদর গলা বাড়িয়ে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে বললো, ‘এক্সাক্টলি কোথায় নামাতে হবে উনাকে ম্যাডাম? মনে হয় পারবো।’

– ‘আপনি চুপ থাকেন।’ হৃদি বললো ধমকের সুরে।

সামি ক্রমাগত গাড়ির জানালায় আঘাত করে যাচ্ছে। ওর ঠিক পেছনেই রিক্সায় বসে থাকা বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক দৃশ্যটা হা করে গিলছে। হৃদি সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে দরজার লক খুললো। সামি ঝুপ করে গাড়ির ভেতর ঢুকে হৃদির পাশে বসে পড়লো। বাঁদর বললো,

– ‘ম্যাডাম কোথায় যাবো?’

হৃদি দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বিড়বিড় করে বললো, ‘জাহান্নামে যা!’

– ‘জি ম্যাডাম?’ বাঁদর দ্বিধাগ্রস্থ।

হৃদি হুংকার ছেড়ে বলল, ‘বাসায় যান।’

– 'এই স্যারকে নামাতে হবেনা?'

– 'আপনাকে যা করতে বলেছি তাই করুন। এতো ভাবতে হবেনা আপনার।'

বাঁদর গাড়ি ব্যাক এ নিয়ে পার্কিং লট থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগলো। হৃদি একটা খ্যাঁক দিয়ে উঠে সামিকে বললো,

– 'কী চাই তোর? সমস্যা কী?'

সামি একটু সরে এসে হৃদির গা ঘেঁষে বসলো।

– 'তোর কী হইছে? আমাকে এভয়েড করতেছিস কেন?'

– 'এভয়েড করবো কেন? নিজেকে এতটা ইম্পরট্যান্ট ভাবার কোনো কারণ নাই সামি।'

সামি দিশাহারা ভাবে বললো, 'তুই ইন্ডিয়া যাইতে চাচ্ছিস না কেন? -'আমার টাকা নাই। সিরিয়াসলি অনেক টানাটানির মধ্যে আছি এখন।'

– 'দ্যাখ আমরা সবাইই তো টানাটানির মধ্যেই আছি। কিন্তু অনেক দিন ধরে প্ল্যানটা করা হচ্ছে। সবাই এর মাঝেই টাকা পয়সা সেভ করছে এই ট্রিপের জন্য। তুই করিস নাই কেন?

হৃদি হতাশ একটা নিঃশাস ফেলে ঘাড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, 'উফ, সারাক্ষণ এই এক প্যাঁচাল পারতে ইচ্ছা করতেছেনা।'

– ‘তুই কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছিস? গত দুই দিন ধরে একটা কথাও তুই আমার সাথে ভালো মত বলিস নাই।’

হৃদি সামির দিকে তাকিয়ে নির্বিকার গলায় বললো, ‘তোরে আমার বিরক্ত লাগলে কি আমার কিছু করার আছে? এটাতো মানসিক ব্যাপার। আই ক্যান্ট হেল্প’

সামি বিস্মিত, ‘আমারে তোর বিরক্ত লাগে?’

– ‘হ্যাঁ লাগতেছে কদিন ধরে।’

– ‘কেন?’

হৃদি চোখ মেলে ভালো ভাবে একবার দেখলো সামিকে। তার গায়ে হালকা আকাশি রঙের ফুলহাতা শার্ট। কোঁকড়ানো চুলগুলো এলোমেলো। ফর্সা গালে তিন চারদিনের দাড়ি।

– ‘তোর চেহারা সুরত বদখত হয়ে গেছে। দেখলে কেমন যেন জন্তু জন্তু মনে হয়।’

সামি হেসে ফেললো,–’ফালতু কথা বলিস না হৃদি।’

– ‘ফালতু না সত্যি।’

হৃদি ওর লম্বা চুল গুলো বেণী করেছিল। পিঠের ওপর ঘোড়ার লেজের মতো পড়ে ছিল বেণীটা। সামি লম্বা পুরু বেণীটা হাতে নিয়ে হৃদির গালের ওপর চাবুকের মত হালকা ভাবে মারতে মারতে বললো, ‘আর তোকে দেখতে কেমন লাগে জানিস? বলিউডের নায়িকা কাজলের মতো।’

– ‘কাজলের মতো লাগা মানে বুঝিস তুই, আমি কতটা সুন্দরী?’

সামি হো হো করে ডাকাতিয়া হাসি হাসে, ‘কাজলকে তোর সুন্দর লাগে? ইশ… কাজল? ক্যাটরিনা হইতে পারতি তো তুই, কাজল কেন হইতে গেলি? বিরক্ত লাগে।’

– ‘তোর বিরক্ত লাগলে কিছু এসে যায়না। কাজলের অনেক অনেক ভক্ত আছে। রুদ্র আর আকাশকে জিজ্ঞাসা করে দেখিস। ওরা সব কাজলের ফ্যান।’

গাড়িটা চলছিল ধীরে ধীরে। সন্ধ্যার রাস্তায় অগণিত গাড়ির ভিড়। শুধু প্রাইভেট কারই নয়। তার সাথে পাল্লা দিয়ে সমান তালে চলেছে সি এন জি, রিক্সা, বাস। কালো ধোঁয়ায় সয়লাব চারপাশ। এর মাঝেই হৃদি টের পাচ্ছিল ড্রাইভারটার সমস্ত মনোযোগ পেছনের গদিতে। কান খাড়া রেখে শুনছে তাদের কথোপকথন।

হৃদি একটু সতর্কতার গলায় সামিকে বললো, ‘তুই নেমে যা এখন। বাকি কথা পরে হবে।

– ‘নামব, তার আগে বল, তুই আমার সাথে এরকম করতেছিস কেন?’

– ‘কিছুই করতেছিনা।’

সামি হৃদির একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল।

– ‘দোস্ত প্লিজ, আমি জানি আমার সেদিনের কথাটায় তুই কষ্ট পাইছিস। কিন্তু আমি আসলে অত কিছু ভেবে বলিনাই। আমি জানি বিভা আর আমার রিলেশনটা অনেক বেশি কমপ্লিকেটেড। কিন্তু তুই যখন বার বার ব্যাপারটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় দিস তখন আমার খুব খারাপ লাগে।’

হৃদি স্তিমিত গলায় বললো, ‘ঠিক আছে, আর কোনোদিন কিছু বলবো না।’

– ‘এইযে এইটা তো রাগের কথা।’

– ‘না রাগের কথা না।সত্যি আমি আর কখনো তোদের ব্যাপারে কিছু বলবো না। ’

সামি হতাশ হয়ে বলে, ‘উফ আল্লাহ! তুই এরকমই করতে থাকবি এখন?’ হৃদি বিরক্ত হয়, ‘আমি কী করতেছি?’

সামি করুণ গলায় বলে, ‘আচ্ছা আমি সরি। সেইদিন ওই কথাটা বলা উচিত হয়নায়। রিয়েলি সরি!’

বন্ধুদের ভেতরে তারা খুব একটা সরি টরি বলেনা। এই প্রথম সামি তার কোনো বন্ধুকে এমন অনুনয় বিনয় করে সরি বললো। সে জানে অন্য বন্ধুরা এই খবর জানতে পেলে খ্যাপানো শুরু করবে। মজা লুটবে।

হৃদি হালকা গলায় বললো, 'ঠিক আছে, বাদ দে এসব। আমি শুধু চাই তুই আর বিভা দুজনেই ভালো থাক।'

– 'সেটাতো আমি জানি।'

– 'জানলে ঐরকম করে বললি কেন? যে আমি হিংসা করতেছি?'

– 'এমনি বলছি। কিছু ভেবে বলিনাই।'

হৃদি চুপ করে থাকে। সামি ওর বিনুনীটা ধরে আবার ঝাঁকুনি দেয়, বলে, 'আমরা ঠিক আছি?'

– 'ঠিক আছি।'

খানিক বাদে মৎস্যভবনের সামনে সামি নেমে গেলো। নামতেই বাঁদর বললো,

– 'ম্যাডাম এই ছেলেটা কে?'

বিরক্ত হৃদি পাঁশুটে মুখে উত্তর দেয়, 'বন্ধু।'

বাঁদর অদ্ভুত হাসে। রসিয়ে রসিয়ে বলে, ‘আমি ভেবেছিলাম আপনার বয়ফ্রেন্ড। কেন যেন মনে হচ্ছিল এই ছেলেটার প্রতি আপনি গভীর ভাবে আসক্ত!’

হৃদি চমকে উঠলো। বুকের ভেতর একটা অদ্ভুত অসহনীয় কম্পন অনুভূত হল তার আচমকা। একজন সাধারণ মামুলি বেতনভুক ড্রাইভারের মুখে এত বড় কথা!

হৃদি কাঁপতে কাঁপতে বললো, ‘বাঁদর সাহেব, কাল থেকে আপনি আর আসবেন না।’

– ‘জি? ঠিক বুঝলাম না।’

– ‘আপনার চাকরি এখানেই শেষ। ইউ আর ফায়ার্ড!’

সন্ধ্যের মুখে মুখে ফিরে এলো অভিজিৎ। তার পরনে ফর্মাল সাদা শার্ট, কালো কাপড়ের প্যান্ট। চুল পরিপাটি করে জেল দিয়ে আঁচড়ানো। একেবারে ফিটফাট। তবে চোখদুটি ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। বিভা ড্রইংরুমে বসে একটি ম্যাগাজিনে চোখ বুলাচ্ছিল। অভিজিৎকে দেখতে পেয়েই সে ফিক করে হেসে দিল।

– ‘হাসছেন যে?’ সোফার ওপর বসে জুতো খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলো অভিজিৎ।

– ‘এত সাজছেন কেন?’ বিভা বলে ফিচেল গলায়।

– ‘সাজের কী দেখলেন?’

– ‘এইযে, ফর্মাল ইন করা শার্ট, মাথায় জেল, মানে সেইরাম অবস্থা!’

– ‘ওমা অফিস যাবার জন্য ভদ্র পোশাক তো পরতেই হবে।’

– ‘ভদ্র পোশাক পরা মানে কি ভোদাই মার্কা ড্রেসআপ করা?’

অভিজিৎ ভ্রু কুঁচকে ফেলে, ‘ভোদাই কী জিনিস? আপনি কিন্তু খুব অফেন্সিভ কথা বলেন সবসময়। এটা ঠিক না।’

বিভা নির্বিকার গলায় বলে, -’ওমা, রেগে যাচ্ছেন কেন? আমি সর্বদা সত্য কথা বলার চেষ্টা করি। সত্য কথাগুলো অফেন্সিভ শোনালে আসলে আমার কিছু করার নেই।

– ‘অত সত্য বলার প্রয়োজন নেই। মাঝে মাঝে কিছু অপ্রিয় সত্য কথা চেপে যেতে হয়।’

– ‘ও, তাই বুঝি? তা আপনি আজ দুপুরে খেতে এলেন না কেন? দূর্গা আপনাকে ভীষণ মিস করছিল। আরেকটু হলে কেঁদেই দিত।’

অভিজিৎ আড়চোখে দেখলো একবার বিভাকে। জুতো জোড়া একপাশে সরিয়ে রেখে স্তিমিত গলায় বললো, ‘যাক, কেউ একজন অন্তত আমাকে মিস করেছে শুনে ভালো লাগলো।’

– ‘রোজ দুপুরে নাকি আপনি খেতে আসেন? আজ আসেননি কেন? আমি আছি বলে?’

– ‘ফিল্ডে কাজ ছিল। সময় পাইনি। আপনার দিন কেমন কাটলো?’

– ‘ভালোই। বেশ স্বাধীন স্বাধীন লাগছে নিজেকে অনেক দিন পর। আপনাদের সল্ট লেকের বাড়িটা একটা জেলখানা ছিল।’

– ‘আপনি নিজের ইচ্ছেতেই সেই জেলখানার জীবন বেছে নিয়েছিলেন তাইনা? এখন আমাকে এসব কথা শুনিয়ে তো লাভ নেই।’

– ‘নিজের ইচ্ছায় বেছে নেই নি। নিতে হয়েছে। এই যেমন এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনার মতো ভোদাইয়ের সাথে একই বাড়িতে, একই ঘরে দিন কাটাতে হচ্ছে। সব কপালের খেলা, বুঝলেন?’

অভিজিতের মুখের রং পাল্টাতে বেশি সময় লাগলোনা। সে থম ধরা গলায় বলল,

– ‘মানুষকে অপমান করে কথা বলতে কি আপনার খুব ভালো লাগে?’

– ‘সব মানুষকে নয়। তবে কিছু কিছু মানুষকে অপমান করতে আমার মাইরি, দারুণ লাগে।’

অভিজিৎ একটা হতাশ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো, ‘বিভা, মাঝে মাঝে আপনার কথাবার্তা খুব অসংলগ্ন শোনায়। আমার মনে হয় আপনি এখনো মানসিক ধাক্কাটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। দেখুন আপনাকে আমার সাথে থাকতে কেউ বাধ্য করছেনা। আপনি চাইলে দেশ থেকে ঘুরে আসতে পারেন। কিংবা একেবারে চলে যেতে পারেন। কেউ কিছু বলবেনা।

কথাটা শুনে বিভা একটু গম্ভীর হয়ে যায়। রাগ রাগ গলায় বলে, ‘আপনি আমাকে তাড়াতে চাইছেন কেন? কাহিনীটা কী?’

অভিজিৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘তাড়াতে চাইছিনা। সাহায্য করতে চাইছি আপনাকে।’

বিভা ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বললো, ‘আহা আপনি তো দেখি একজন লাইফ সেভার! কী ভাবেন নিজেকে? দাতা হাতেমতাই? মহাপুরুষ? নাকি দেবতা?’

অভিজিতের বুক থেকে দ্বিতীয় বারের মতো হতাশার নিশ্বাস টা পিছলে পড়লো। সে ধীর স্বরে বললো, ‘আপনার যেমন ইচ্ছে ভাবতে পারেন। আমার কিছু এসে যায়না। সারা দিন অফিস করে এসেছি এখন আমার বিশ্রাম দরকার।’

অভিজিৎ ড্রইং রুম ছেড়ে যাবার পর বিভা অনেকটা সময় থম ধরে বসে রইলো। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। লোকটা কী বলে গেলো এইমাত্র? সে অসংলগ্ন কথা বলে? সে পাগল? অপ্রকৃতস্থ?

সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো নিজের বাবা মায়ের ওপর। ওই দুটা মানুষের জন্যেই আজকে এই হাবাগোবা,রসকষহীন, ছাপোষা, মেনিমুখো লোকটি তাকে পাগল ডাকার সাহস করল। রাগে, ক্রোধে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল তার। কী করবে বিভা? কী করে নিজের বাবা মায়ের কাছে সত্যটা প্রকাশ করবে? কী করে বলবে যে এই আট ন মাস ধরে নিছক একটা মিথ্যে সম্পর্কের বোঝা নিভৃতে বয়ে বেড়াচ্ছে সে? কী করে জানাবে যে এই মানুষটার সাথে আদতে তার কোনো রকম সম্পর্কই নেই। না শারীরিক না মানসিক। শুধু মন্ত্র পড়লেই তো স্বামী স্ত্রী হওয়া যায়না!

ভাবতে গিয়ে বিভার কপালের দুপাশের রগ দপদপ করে ওঠে। বুকটা ভারী লাগে। আজ নয়তো কাল সত্যটা প্রকাশ পাবেই। কী হবে তখন? বাবা মা আঘাতটা সইতে পারবে তো? এত খারাপ হল কেন বিভার ভাগ্যটা? তার তো সুখের একটা পরিবার ছিল! মনের মতো বন্ধু ছিল। বন্ধুর মতো প্রেমিক ছিল। নাচের মতো একটা নেশা ছিল। কী ছিলোনা সেই জীবনটাতে? আহা, ঢাকা শহরের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়লে তার বুক খালি হয়ে যায়। স্বর্গ স্রোতে ভেসে আসা ফুলের মতো

একেকটা দিন ছিল! বিভার গলা ধরে আসে। বাপ্‌ মায়ের ওপর বড় বেশি অভিমান হয়। সুখে আছে তো তারা এখন? বিভাকে এই দূর বনবাসে পার করে দিয়ে জুড়িয়েছে তো তাদের আত্মা? থাকো সুখে থাকো তোমরা। বিভা আর কোন দিন তোমাদের ওই দুনিয়ায় ফিরবেনা। হ্যাঁ ঠিক তাই। দেশে ফিরে গিয়ে কাউকে কিছু না বলেই বিয়ে করবে সে আর সামি। তারপর নিজেদের ইচ্ছে মতো দূরে কোথাও চলে যাবে। কেউ জানবেনা। শুধু জানবে বন্ধুরা।

কতক্ষণ কাটলো কে জানে। হঠাৎ অভিজিতের ডাকেই ঘোর ভাঙলো।

– ‘কী হল? অমন কাঁদো কাঁদো মুখ নিয়ে বসে আছেন কেন?’

বিভা নড়লনা, যেভাবে বসে ছিল সেভাবেই বসে থেকে একটা আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে বললো ‘কিছু হয়নি।’

অভিজিৎ কাপড় পাল্টে ঘরের পোশাক পরেছে। ট্রাউজার, টি শার্ট আর তার উপরে চাদর। সে বিভার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে কিছু একটা খুঁজে নিয়ে বললো, ‘বাইরে এসে বসুন। আপনার জন্য এই পাড়ার বাসিন্দারা একটি বিশেষ আয়োজন করেছে।’

– ‘আয়োজন? আমার জন্যে?’ বিভা অবাক।

– ‘হ্যাঁ আপনার জন্য। আসুন তো। ওরকম দুঃখী দুঃখী ভাব নিয়ে বসে থাকলে লোকে আমাকে দোষ দেবে। মনে করবে আমি আপনাকে মানসিক অত্যাচার করছি।

বিভা বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, ‘লোকের বলা না বলায় কী এসে যায়?’

– ‘আপনার কিছু না এসে গেলেও, আমার একটু একটু এসে যায়। কারণ এই জায়গাটায় আমার মোটামুটি একটা সুনাম আছে। আর গ্রামের লোকজন বেশ নোজি। আমাদের নতুন জীবন সম্পর্কে তাদের সীমাহীন কৌতূহল।’

বাইরে সেদিন আকাশ ভরা তারা আর জমিনের ওপর সফেদ কুয়াশার আস্তরণ। উঠোনের এক কোণে জঙ্গলের কাছাকাছি শুকনো পাতা আর খড়কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। পোড়া পাতার ঘ্রাণে সয়লাব চারপাশ। বিভা একটা লাল রঙের কার্ডিগান জড়িয়েছিল গায়ে। চুল গুলো খুলে দিয়েছিল পিঠময়। তার লম্বা সুগঠিত দেহখানা আর ডাগর দুটি প্রতিমার মতো চোখ সর্বদাই ভারী আবেদনময়। তার গায়ের রং ফর্সা না, পিতলের মত চকচকে। আজকে সে যখন খোলা চুলে নীল তারকাখচিত আকাশের নিচে ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল, তখন উপস্থিত লোকজনের মাঝে নিমেষে একটা কেমন নেশাড়ু আবেশ ছড়িয়ে গেল। সেই অন্ধকার আলোআঁধারির, নিশিপোকা ডাকা, কুহেলিকাময়, গভীর অরণ্যের বনজ ঘ্রাণ ওয়ালা রাত্রিটিতে রূপের দেবী আফ্রোদিতির মতোই আগমন ঘটলো তার।

উঠোনে তিন চারটি চেয়ার পাতা আছে। একটি চেয়ারে অপরিচিত এক যুবক বসে ছিল। বিভাকে দেখে উঠে আসলো সে। হাসিমুখে বললো,’বৌদি আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ।’

বিভা দেখলো শাড়ি পরা পাহাড়ি মেয়েদের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। সাথে আছে দুজন ঢোল বাদক, একজন বাঁশি ওয়ালা। অভিজিৎ ছেলেটিকে ইঙ্গিত করে বিভাকে বললো, ‘এ অসীম। আমার কলিগ।’

তৃতীয় পক্ষের সামনে নিজের স্ত্রীকে আপনি সম্বোধন করাটা উচিত হবে কিনা তা নিয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল অভিজিৎ। পরিচিতির পালাটা তাই খুব সংক্ষেপে শেষ করে সে চেয়ার গুলোর একটিতে গিয়ে বসলো।

অসীম বিভাকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কি বাঙাল ভাষায় কথা বলতে পারেন?'

– 'ওমা পারব না কেন? আমি তো বাঙালই।'

– 'বাঙাল হলেই যে ওই ভাষায় কথা বলতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। আমাকেই দেখুন না। আমার ঠাকুরদা ছিলেন বাংলাদেশী রিফিউজি। দেশ বিভাগের আরো অনেক পরে, সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ছেড়ে ছিলেন।'

– 'তাই বুঝি? বাংলাদেশে কোথায় আপনাদের বাড়ি?'

– 'ময়মনসিংহ। আমি কখনো যাইনি। কিন্তু বাড়ির বয়স্ক সদস্যদের কাছ থেকে অনেক গল্প শুনেছি আপনাদের দেশের।'

এমন সময় দূর্গা হঠাৎ ছুটে এসে বিভার হাত চেপে ধরল। টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললো, 'বৌদি এসো। ওই চেয়ারটায় বসো। ওরা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে।

বিভাকে অভিজিতের পাশের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল দূর্গা। শীত পড়েছে জম্পেশ। মোটা উলের কার্ডিগানের নিচেও হাত পা জমে আসছে। অসীম অভিজিতের পাশের চেয়ারে এসে বসলো। খানিক বাদে ঢোল তবলা বাজতে শুরু করলো। সেই বাজনার তালে তালে পাহাড়ি মেয়েগুলো নাচতে আরম্ভ করলো সারি বেঁধে। নাচের সাথে সাথে গানও গাইছে তারা। নেপালি ভাষার গান। গানের শব্দে, ঢোলের শব্দে জলঢাকা নদীর স্রোতের তির তির করা সুর ঢাকা পড়ে গেলো। বিভা গানের কিচ্ছু বুঝতে পারছিলোনা। এই নাচের ধরণের সাথেও সে খুব একটা পরিচিত নয়। তবুও তার

মনের ভেতর আগের দিনের সেই নাচুনে মনটা আবার অনেক দিন পর ফেরত আসলো। মনে চাইল পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে এখনই নাচতে উঠে যায়।

ভেতরের হাঁসফাঁস করা ভাবটা কেটে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। অভিজিৎ হঠাৎ অসীম কে বললো,

– ‘তোমার বৌদিমণিও কিন্তু খুব ভালো নাচতে পারেন।’

– ‘তাই নাকি? তা আমাদের কি সেই নাচ দেখার সৌভাগ্য হবে কখনো? নাকি সেটি শুধু দাদার জন্যেই বরাদ্দ?’

অভিজিৎ পলক তুলে তাকাল একবার বিভার দিকে। আগুন রঙের হালকা আলোয় ওর মুখের এক পাশ স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। অসীমের কথাটা শোনা মাত্র বিভাও চকিতে তাকিয়েছিল অভিজিতের দিকে। একটু বাদে কাচের গ্লাসে করে পানীয় নিয়ে আসলো সেই প্রথম দিনের প্রৌঢ় লোকটি। অসীম একটি গ্লাস বিভার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ‘বৌদি নিন, সুরের সাথে একটি আকার যুক্ত না হলে আসর জমেনা। ’

অভিজিতের গায়ের ওপর দিয়েই হাত বাড়িয়ে সুরার গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল অসীম। বিভা একটু সংকোচের সাথে গ্লাসটা হাতে নিল। উড়নচণ্ডী মেয়ে হলেও সে এর আগে কখনো মদ স্পর্শ করেনি। তার বন্ধুদের মধ্যে কারোরই মদ গাঁজার নেশা নেই। বিভা দ্বিধা নিয়ে গ্লাসটার দিকে চেয়ে ছিল।

অভিজিৎ বললো, ‘চেখে দেখতে পারেন। পাহাড়িরা নিজেরাই বানায়। ভাত পঁচিয়ে। চোলাই মদ বলে একে।’

বিভা নাকের কাছে নিয়ে দেখল কী বিশ্রী একটা তীব্র গন্ধ! অভিজিৎ বললো, ‘নাক চেপে ধরে এক ঢোঁক খেয়ে দেখুন।

বিভা তাই করলো। প্রথমে বাজে লাগলেও খানিক বাদে কিন্তু ভালোই লাগল। পর পর দু গেলাস খাবার পর তার মাথাটা ভারী ফাঁকা লাগছিল। চারপাশ কী রকম স্বপ্ন স্বপ্ন। শরীর পাখির মত হালকা। মনে হচ্ছে যেন উড়ে যেতে পারবে সে। শিন শিন করে একটা ভারী ঘোর ঘোর ভালো লাগার স্রোত বইতে লাগলো ধমনি দিয়ে। এই জিনিসটা বেশ তো! সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। কে তুমি, কী তোমার পরিচয়, কোথায় তোমার গন্তব্য সব কিছু ভুলে গিয়ে কেবল এক রিমঝিম নেশায় ডুবে থাকা। বাহ্, সারাটা জীবন এমনি ভাবে কেটে গেলে বেশ হত। বিভার ঠোঁটের কোণে একটি চিলতে হাসি ফুটে উঠল। তারপর সেই হাসিটা ঠোঁটে লেগে রইলো অনেকক্ষণ ধরে!

রাতে সে কিছুই খেলোনা। খুব তাড়াতাড়ি শুতে চলে গেলো। নিজের জন্য মেঝেতে বিছানা পাততেও ভুলে গেলো। অভিজিৎ নিজ উদ্যোগে ফ্লোরে চাদর আর ভারী কম্বল বিছিয়ে বিছানা করলো। বাতি নিভিয়ে শুতে যাবার আগে লক্ষ্য করলো বিভার সেলফোনটা ক্রমাগত ভাইব্রেট হচ্ছে। ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলো সামি ফোন করছে। মেসেঞ্জারে। কেটে দিল। সাথে সাথেই আবার আসলো ফোন। আবার কাটলো অভিজিৎ। আবার আসলো। আসতেই থাকলো। অভিজিৎ বিভাকে চোখের কিনার দিয়ে দেখলো একবার। ঘুমোচ্ছে। তার চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে বালিশে। বুজে রাখা ডাগর দুটি চোখের কার্নিশে একটু লেপ্টে থাকা কাজল। ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি।

ফোনটা ধরলো অভিজিৎ।

– ‘হ্যালো!’

ওপাশে নীরবতা। অভিজিৎ আবার বললো, ‘হ্যালো।’

– ‘বিভা কোথায়?’ কাটা কাটা ভাবে একটা পুরুষ কণ্ঠ কথা বলে উঠলো। গলাটা অভিজিৎ চেনে। বাংলাদেশে বিভার সাথে তার বিয়ের আগের রাত্রিটিতে ফোনে কথা হয়েছিল এই কণ্ঠটির সাথে। তারপর আর একবারও না।

অভিজিৎ ঠান্ডা ভাবে বললো, ‘ঘুমোচ্ছে।’

– ‘ঘুমাচ্ছে?’

– ‘হ্যাঁ ঘুমাচ্ছে।’

– ‘এতো তাড়াতাড়ি? ওর শরীর কি খারাপ?’

– ‘না শরীর খারাপ না।’

ওপাশের গলাটা বিভ্রান্তিতে ভোগে। অভিজিৎ টের পায়।

– ‘ঠিক আছে।’ সামি বলে।

– ‘ঠিক আছে।’ বলল অভিজিৎও।

লাইন কাটার সঙ্গে সঙ্গে বিভা নড়েচড়ে উঠল। আচমকা শোয়া থেকে উঠে বসে বললো, ‘সামি ফোন করেছিল?’

– ‘হ্যাঁ।’

বিভা তড়িঘড়ি করে উঠে আসে। তার নেশা টেশা উড়ে ছাই। সামির ফোন এসেছে, এ যেন দুনিয়া উল্টানো ঘটনা। অভিজিতের হাত থেকে ছোঁ মেরে যন্ত্রটা নিয়ে নেয় সে। আফসোসের গলায় বলে, 'ইশ··· .আমাকে ডাকবেন না? আপনি যে কী!'

বলতে বলতে বিভা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। অভিজিৎ একলা দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে। তারপর বাতি নিভিয়ে ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

৯

পরদিন সকালে সামি ফোন করে অমৃতাকে বললো, 'জানোস, আব্বা নাকি এয়ারপোর্টে লোক লাগাইছে, আমরা যাতে ইন্ডিয়া যাইতে না পারি। আমরা এয়ারপোর্টে ঢুকলেই নাকি পুলিশ ঝামেলা করবে। কেমন লাগে বলতো!'

অমৃতা চুপচাপ শুনল সামির কথগুল। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'চিন্তা করিস না। আমি দেখতেছি।'

সেদিন সকালে প্রথমেই জর্জ কোর্টে গেলনা সে। একটা সি এন জি নিয়ে সোজা চলে গেলো উত্তরা, সামিদের বাড়িতে। বাড়ির সামনে একটি ছোট খাটো জটলা। এক নজর দেখলেই বোঝা যায় এটি শহরের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির বাড়ি। অমৃতা খবর নিয়ে জেনেছে দেশের একটি প্রথম সারির নিউজ চ্যানেলে আজ সামির আব্বার ইন্টারভিউ আছে। মিডিয়া এখন সর্বদা তৎপর। যে কোনো বিষয়ে তারা দেশের হোমরা চোমরা লোকদের টিভির সামনে নিয়ে আসে। সামির আব্বা টিভি স্টেশনে যাবেন না। ঘরে বসেই অল্প সময়ে তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন।

অমৃতা বাড়ির পাশের পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। সামির আব্বা রাশেদুল হকের উপর ওদের বন্ধুদের ক্ষোভটা আজকের নয়। বহু দিনের বিরক্তি,ঘৃণা, রাগ জমে জমে এখন মহিরুহর আকার ধারণ করেছে।

একবার অমৃতার বাবাকে সামির আব্বা কথায় কথায় বলেছিলেন, আপনি সরকারি চাকরি করে যত টাকা বেতন পান, তার চেয়ে বেশি অংকের বেতন আমি আমার প্রতিষ্ঠানের সেকেন্ড গ্রেডের কর্মচারীদের দেই।

অমৃতার বাবা শুধু হেসেছিলেন কথাটা শুনে। কিছু বলেন নি। বাবা হয়তো ভুলেও গেছেন। কিন্তু অমৃতা ভুলেনি। অমৃতা জানে সামির বন্ধুদের এই লোক মানুষ বলে গণ্য করেন না। আড়ালে আবডালে বলে বেড়ান সামির নাকি সব ক্লাসলেস মানুষের সাথে ওঠা বসা। শুধু এই নয়, পরিচিত এক স্বনামধন্য উকিল একবার সামির আব্বার কাছে অমৃতার কাজ সম্পর্কে প্রশংসা করায় সামির আব্বা প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, ওই মেয়েটা একটা বেয়াদব। ওই মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করে আমার ছেলেও বেয়াদব হয়ে যাচ্ছে। সেই উকিলের আবার অমৃতাদের চেম্বারে নিয়মিত আসা যাওয়া। একদিন গল্পে গল্পে তিনি জানালেন, অমৃতার বন্ধুর আব্বা অমৃতার প্রতি ঠিক কী ধরণের ধারণা পোষণ করেন।

সিগারেট শেষ করে ঠাণ্ডা মাথায় ভিড় ঠেলে অমৃতা গেটের ভেতর ঢুকলো। কেয়ার টেকার সুলেমান এ বাড়ির বহু দিনের পুরোনো কর্মচারী। সে অমৃতাকে দেখেই চিনতে পারলো। দৌড়ে এসে বললো, ‘আপা আপনি?

– ‘আপনাদের স্যার কোথায়?’

– ‘স্যার তো এখন ব্যস্ত।’

অমৃতা চতুর চোখে আশপাশটা একবার ভালোভাবে দেখে নিল। খানিক দূরেই মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে এক অল্পবয়সী সাংবাদিক দাঁড়িয়ে আছে। অমৃতা একটু চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, ‘কীসের এত ব্যস্ততা উনার?নিজের ছেলের কোন খবর নেয় না। কোন দায়িত্ব পালন করেনা। আর ঘরে বসে বসে দেশ উদ্ধার করেন, তাইনা?’

সুলেমান বিব্রত হয়ে পড়লো। কাছে দাঁড়ানো সাংবাদিকটি অমৃতার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। অমৃতা সুলেমান কে বললো, ‘আমাকে ভেতরে যেতে দিন। উনার সাথে কথা আছে।’

টোপ জায়গা মতোই পড়লো। সাংবাদিক ছেলেটা এগিয়ে এসে বললো, ‘এক্সকিউজমি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?’

– ‘বলুন।’

– ‘এম পি সাহেবের ছেলের ব্যাপারে কী বলছিলেন?’

– ‘উনার ছেলে তো উনার সাথে থাকেনা, জানেন না?’

– ‘ও, তাই নাকি? কেন? থাকেন না কেন?’

– ‘অনেক কাহিনী। সব এখন বলা যাবেনা। শুধু এটুকু জেনে রাখেন একমাত্র ছেলের সাথে উনার কোনো সম্পর্ক নাই। উনি মানুষ বেশি সুবিধার না। ছেলের সাথে বনে না।’

এটুকু বলে অমৃতা আর দাঁড়ালো না। বাড়ির ভেতরে নির্বিঘ্নেই ঢুকে পড়ল। ড্রইংরুমে রাশেদুল হককে পাওয়া গেল। বিশাল আকারের ঘরটি আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত এবং সম্পূর্ণ ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সামির আব্বার মুখোমুখি সোফায় একজন সাংবাদিক বসে আছেন। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে তার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। একটু দূরে ক্যামেরা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন আরো দুজন লোক। ঘরে এই তিনজন ব্যতীত আরো জনা কয়েক মানুষ ক্যামেরার পেছনে জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এরা কেউ অমৃতার দিকে চোখ তুলে তাকাল না। হক সাহেব গম্ভীর স্বরে কথা বলছেন। ঘরে উপস্থিত বাকি লোকজন মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছে। অমৃতা মিনিট দুয়েক সময় দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা অবলোকন করল। লোকটাকে দেখলেই রাগে তার সারা গা রি রি করে। কত হবে লোকটার বয়স? পঞ্চাশ ছুঁয়েছে কি? কে জানে! এখনো বয়সের কোন ছাপই পড়েনি চেহারায়। কলেজের দিনগুলিতে অনেকেই ইনাকে সামির বড়ভাই ভেবে ভুল করত। দীর্ঘকায় শক্ত পোক্ত শরীর। গায়ের রং সামির মতো ফর্সা নয়, তাম্রাভ। তীক্ষ্ণ নাক, বুদ্ধিদীপ্ত গভীর চোখ। জুলপিতে একটু সাদা ছোপ। সামি বাবার গায়ের রং পায়নি। পেয়েছে মায়েরটা। কিন্তু বাবার সাথে তার চেহারার আদল মিলে যায় পুরোপুরি।

– ‘আপনার সমস্যা কী?’

আকস্মিক প্রশ্নটা ভাব গাম্ভীর্য পূর্ণ ঠান্ডা শীতল ঘরটায় একদম বোমার মতো গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাল। ক্যামেরাম্যান এবং উপস্থাপক ভদ্রলোক চমকে তাকাল অমৃতার দিকে। হক সাহেব থমকে গেলেন। স্তম্ভিত চোখে চেয়ে দেখলেন সামনে দাঁড়ানো ছিপছিপে দেহের, পুরুষালি পোশাক পরা, লম্বা, একরোখা, জেদি মেয়েটিকে। তার চোখদুটি দিয়ে প্রথমে ঝরে পড়লো বিস্ময়,তারপর কৌতূহল এবং সবশেষে ক্রোধ! তিনি ব্রিত ভাবে আশেপাশের উপস্থিত লোকজনের দিকে তাকালেন একবার। অমৃতা তখনো নাকের পাটা ফুলিয়ে ক্রুর চোখে তার দিকেই চেয়ে।

– ‘এক্সকিউজ মি, একটু পজ করেন ভিডিওটা।’ হক সাহেব বিনয়ের সাথে বললেন ক্যামেরাম্যানকে।

ক্যামেরা ম্যান ভিডিও বন্ধ করলো। হক সাহেব অমৃতার দিকে চেয়ে হিমশীতল গলায় বললেন, ‘তুমি এখানে?’

– ‘হ্যাঁ আমি এখানে। জানতে এসেছি আপনার সমস্যা কী?’

হক এই মেয়ের সাহস দেখে বিস্ময়ে একেবারে জমে গেলেন। মেয়েটা বরাবরই একটু বেয়াদব গোছের ছিল। কিন্তু সেই বেয়াদবির মাত্রা যে এমন ভয়াবহ ভাবে সীমা অতিক্রম করে ফেলবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আগের শীতল ভাবটা গলায় বজায় রেখেই তিনি কেটে কেটে বললেন,

– ‘ঠিক কী বিষয়ে কথা বলতে এসেছ তুমি?এ মুহূর্তে আমি ব্যস্ত আছি। পরে এসো।

– ‘পরে আসার সময় নাই আমার। আপনি শুনে রাখেন যে আপনি যা করছেন ভুল করছেন। আমরা আগামী পরশু দিন ইন্ডিয়া যাচ্ছি, এবং যাবোই। দেখি কে ঠেকাতে পারে আমাদেরকে।’

হক সাহেব এ পর্যায়ে উপস্থিত লোকজনের সামনে কিঞ্চিৎ বিচলিত বোধ করলেন। অমৃতা ওই বিচলিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে সারা শরীরে আনন্দের এক অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলো। তার বহুদিনের শখ ছিল এই অহংকারী লোকটাকে একদিন

লোক সম্মুখে জব্দ করবে। সে ঠান্ডা গলায় বললো, ‘কোনো ঝামেলা করতে আসবেন না এয়ারপোর্টে। ঝামেলা করতে আসলে আপনার মুখোশ খুলে দিব সবার সামনে।

বলে অমৃতা আর দাঁড়ালো না। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এলো।

হক হতচেতন ভাবে শূন্য চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ অমৃতার চলে যাওয়ার পথটার দিকে। উপস্থিত লোক গুলো থতমত খেয়ে গেছে। কারো মুখে কোন রা নেই। প্রায় মিনিট তিনেক সময় পার হবার পর হক কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, ‘শুরু করুন।’

ইন্টারভিউ ভালো হলনা। হকের কপাল থেকে দুশ্চিন্তার রেখাটি সরল না কোন মতেই।

খুব দ্রুত তিনি মিডিয়ার লোকজনদের বিদায় করলেন। আধা ঘন্টার মাঝেই তাকে সংসদে উপস্থিত হতে হবে। অধিবেশন শুরু হবে বেলা বারোটায়। কিছু প্রস্তুতিরও ব্যাপার আছে। দিন শুরুর এ সময়টায় তিনি স্টাডি রুমে বসে এক কাপ চা পান করতে করতে প্রয়োজনীয় কাজ গুলো গুছিয়ে নেন। সারা দিনে কী কী করতে হবে, কোথায় মিটিং, কার সাথে এপয়েন্টমেন্ট, এসব স্কেজিউল পরখ করে নেন। গেঁথে ফেলেন মগজে। আজকে তিনি স্টাডি রুমের দিকে না গিয়ে দোতলায় সরাসরি নিজের স্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সামির আম্মা গোসল খানায় গোসল করছিলেন। হক বাথরুমের দরজা ধাক্কা দিয়ে স্ত্রীকে বললেন, ‘রোমেলা, এই রোমেলা!’

– ‘বল, শুনতে পাচ্ছি।’

– ‘তোমার গুণধর ছেলের যে একটা টমবয় বান্ধবী আছে তার ফোন নম্বর কি তোমার কাছে আছে?’

দরজার ওপাশ থেকে বেশ খানিকক্ষণ কোনো উত্তর আসলোনা। হক প্রশ্নটি দ্বিতীয়বারের মতো উচ্চারণ করলেন।

রোমেলা এবার ক্ষীণ গলায় বললেন, ‘দেখতে হবে মোবাইলে। আমার ঠিক মনে পড়ছেনা।’

হক সাহেব আর সময় নষ্ট না করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসলেন। স্টাডি রুমে এসে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফোন করলেন। প্রথমেই ডায়াল করলেন উল্লিখিত নিউজ চ্যানেলের একজন কর্মকর্তার নম্বরে। এই কর্মকর্তা তার পরিচিত। ভদ্রলোককে পই পই করে বুঝিয়ে দেয়া হল যে আজ সকালে অনাহুত এক মেয়ে আকস্মিক ভাবে তার বাড়িতে এসে যে কান্ড করে গেছে তা যেন কোনো ভাবেই মিডিয়ায় নিউজ হিসেবে প্রকাশ না পায়। যেকোনো উপায়ে যেন খবরটা এড়িয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয় ফোনটি করলেন তিনি পুলিশের ডি আইজি কে। সামিকে সেদিন কেবল ভয় দেখানো হয়েছিল যেন ভারত যাবার ট্রিপটা তারা ভয় পেয়ে বাতিল করে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু ভয় দেখিয়ে কাজ হবেনা। ঘটনা ঘটানো আবশ্যক। অতএব বিমান বন্দরে পরশু দিন বিকেলে তার ছেলে এবং ছেলের বন্ধুদের পা পড়া মাত্র যেন পুলিশ তাদেরকে আটক করে ফেলে সেই মোতাবেক নির্দেশ দেয়া হল।

তৃতীয় ফোনটি করলেন তিনি তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারিকে। অমৃতা নামের মেয়েটার ফোন নম্বর এবং সমস্ত ডিটেইলস তার চাই। সেই সাথে বলা হল মেয়েটির সমস্ত পদক্ষেপ যেন প্রতিনিয়ত অনুসরণ করা হয়। পাঁচ মিনিটের মাথায় অমৃতার ফোন নম্বর, ঠিকানা এবং পেশা সহ যাবতীয় তথ্যাদি তার কাছে ইমেইল করা হল। তিনি ফোন নম্বরটার দিকে কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। খুব বেশি রেগে গেলে তাঁর শরীরে এক ধরণের কম্পন অনুভূত হয়। ডাক্তার তাকে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। রাগ ছাড়া অন্য কোন শারীরিক ব্যাধি বর্তমানে তার নেই। তিনি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে রাগ প্রশমন করার চেষ্টা করলেন। ডায়াল করলেন নম্বরে।

তৃতীয় বার রিং পড়ার পর ফোনটা ওপাশ থেকে রিসিভ করলো এক নারীকণ্ঠ।

– ‘হ্যালো।’

– ‘হ্যালো, অমৃতা বলছ?’

– ‘হ্যাঁ বলছি। আপনি কে বলছেন?’

– ‘আমি হক। সামির আব্বা কথা বলছি।’

ওপাশে ঝুপ করে নেমে আসল নিশ্ছিদ্র নীরবতা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর অতীব বরফ শীতল গলায় হঠাৎ বলে ওঠা,

– ‘কী চাই?’

– ‘আজ বিকেলে আমার সাথে দেখা করতে পারবে?’

– ‘কেন? আপনার সাথে দেখা করতে হবে কেন?’

– ‘আমি বললাম তাই।’ মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর গলায় টেনে টেনে কথা গুলো বললেন হক।

– ‘আপনি বললেই তো হলো না। আপনার কথা মানতে আমি বাধ্য নই।’

– ‘অবাধ্য ছেলে মেয়েদের কী করে বাধ্য করতে হয় তা আমার জানা আছে।’

অমৃতা শ্লেষের হাসি হাসলো, ‘তাই বুঝি? এ কারণেই তো নিজের ছেলের সাথে আজ আপনার বনিবনা নেই।’

হক এই পুঁচকে মেয়েটির স্পর্ধা দেখে স্তব্ধীভূত হয়ে গেলেন। মিনিট দুয়েক সময় কোন কথা খুঁজে পেলেন না তিনি।

– ‘বিকেল পাঁচটায় তোমার চেম্বারের সামনে আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে উপস্থিত থাকবে। গাড়িতে উঠে সোজা আমার অফিসে চলে আসবে। চালাকি করার চেষ্টা করোনা। অতি চালাকের গলায় দড়ি পড়ে। এটা মনে রেখো।’

১০

বিকেলের একটু আগেই বেরিয়ে গেল অমৃতা চেম্বার থেকে। চেম্বারের শত বছরের পুরোনো ক্ষয়া সিঁড়ি ডিঙিয়ে ইংলিশ রোডের এঁদো গলিতে নামতেই চোখে পড়লো গলির মুখে একটি পাজেরো গাড়ি দাঁড়ানো। অমৃতা গাড়িটা চেনে। সামিদের অফিসের গাড়ি। গাড়িটি দেখতে পেয়ে তার চেহারার রঙের কোন পরিবর্তন হলো না। শুধু ভ্রু দুটি একটু কুঁচকে গেল। সে ভয় খাবার মেয়ে না। তার ভেতরটা শক্ত। যে কোনো পরিস্থিতি বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবেলা কী করে করতে হয় তা তার জানা আছে।

তার হাতে কালো গাউন। গায়ে সাদা শার্ট। কাঁধে ল্যাপটপের ব্যাগ। চোখে রোদ চশমা। হাঁটার ভঙ্গিতে একটি ধারালো ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ। সে নির্বিকার ভাবে হেঁটে গলি থেকে বেরিয়ে আসলো। গাড়িটি রাখা ছিল গলির মুখোমুখি। অমৃতা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে একটি রিকশা ডাকলো হাত নেড়ে। মিনিটের মধ্যেই দুজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক তাকে দুপাশ থেকে ঘিরে ফেললো। তাদের দুজনেরই মাথায় ক্যাপ, চোখে সানগ্লাস। স্বাস্থ্য চমৎকার। একজন বললো, ‘ম্যাডাম, আপনাকে আমাদের সাথে একটু আসতে হবে।’

অমৃতা রোদ চশমা খুলে হাতে নিলো, ধারালো ভাবে বললো, ‘কেন? কে আপনারা?’

লোকটি ভদ্রতা বজায় রেখেই বললো, ‘আমাদেরকে বলা হয়েছে আমরা যেন আপনাকে হক সাহেবের অফিসে নিয়ে যাই।’

অমৃতা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, ‘আর যদি আমি যেতে না চাই? জোর করবেন আমাকে?’

এ কথা শুনে প্রথম লোকটি একটু বিচিত্র হাসলো। দ্বিতীয় লোকটি বললো, ‘সেরকমই নির্দেশ আছে।’

– ‘তাই না? ঠিক আছে। যাবোনা আমি। দেখি কী করে আপনারা আমাকে নিয়ে যান।

কথাটা বলে অমৃতা আর কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটা শুরু করলো। পেছন থেকে লোকদুটোর একজন বলে উঠলো, ‘ম্যাডাম, স্যারের সাথে দেখাটা করে ফেললে কিন্তু আপনার আর কোন ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। না হলে আপনার ক্যারিয়ার সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। আপনার হাই কোর্টের লাইসেন্স কিন্তু এখনো হয়নি। আর বর্তমানে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট পদে যিনি নিয়োজিত আছেন তিনি স্যারের খুব ঘনিষ্ঠ একজন।’

অমৃতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, ‘আপনাদের কি ধারণা আপনাদের স্যার ইচ্ছা করলেই সব করতে পারে? আমি হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করব কি করব না তা এখন উনি ঠিক করে দেবেন?’

অমৃতার গায়ের চামড়ায় এবার শুয়োপোকা কামড়াতে শুরু করেছে। রাগে দম বন্ধ হয়ে আসছিল তার। সে গটগট করে হেঁটে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল, মুখে বলল, ‘চলেন, দেখি আপনাদের স্যার আমার কাছে কী চায়।’

সামিদের অফিস অর্থাৎ হক এন্টারপ্রাইজে অমৃতার এই প্রথম আসা নয়। এর আগে বেশ কয়েকবার সামির সাথে সে এসেছে এখানে। কিন্তু রিসিপশনেই বসে থাকা হয়েছে প্রতি বার। সামি বন্ধুদের নিচে বসিয়ে রেখে ওপর তলায় বাবার সাথে দেখা করতে গেছে। প্রতি বারই এসেছে সে বাপের কাছ থেকে টাকা চাইতে। বন্ধুরা রিসিপশনের লবিতে বসে তার ফিরে আসার অপেক্ষা করেছে। আজকে রিসিপশনে নয়। অমৃতাকে সরাসরি লিফটে করে ওপরে নিয়ে আসা হল। অফিসটি বেশ আধুনিক সাজসজ্জায় সজ্জিত। সাদা টাইলসের ঝকঝকে মেঝে। সিলিং থেকে ঝুলছে বিশাল বড় বড় ঝাড়বাতি। পরিপূর্ণ ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। লোকদুটো সামির আব্বার ঘর পর্যন্ত অমৃতাকে রীতিমত পাহারা দিয়ে নিয়ে আসলো।

হক ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। পরনে অফ হোয়াইট রঙের ফুল হাত শার্ট, কালো টাই, কালো প্যান্ট। তার ঠিক পেছনেই একটি থাই এলুমিনিয়াম গ্লাসের প্রশস্ত জানালা। জানালায় পর্দা নেই। কাচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রাজধানীর ব্যস্ত সড়ক আর পিঙ্গল আকাশ। জানালা গেলে শেষ দুপুরের হলদে আলো এসে ছড়িয়ে গেছে সারা ঘরময়। সূর্যের আলোতেই ঘরটা বেশ ফকফকে। কৃত্রিম আলোর প্রয়োজন হয়নি।

ঘরের মাঝখানে একটি চওড়া কাঠের টেবিল। টেবিলের ওপর মোটা কাঁচ বসানো। দুটা ল্যাপটপ, একটি ট্যাব এবং অগণিত ফাইলপত্রে বোঝাই হয়ে আছে টেবিলখানা। ঘরের দুপাশের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হয়েছে দামি সোফা সেট। মেঝেতে কালো আর সাদা রঙ মেশানো কার্পেট। অমৃতাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে লোক দুজন বেরিয়ে গেল। হক নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলেন। ডান হাতের কনুই টেবিলে ঠেকিয়ে, চিবুকে হাত রেখে, অমৃতার দিকে চাইলেন তিনি কয়েক সেকেন্ডের জন্য, শীতল চোখে। মেয়েটিকে তিনি নিজের বাড়িতে বহুবার দেখেছেন কিন্তু সামনাসামনি কখনও কথা হয়নি। অমৃতার মুখ তখন রুদ্ধ রোষে জ্বলছে অগ্নির ন্যায়। তার নাকের পাটা ফোলা। ফর্সা গাল টকটকে লাল।

হক বললেন, 'বসো।'

– 'কেন ডেকেছেন?' অনুচ্চ অথচ রাগে থমথম করা স্বরে প্রশ্ন করলো অমৃতা।

হক সামনে দাঁড়ানো একরোখা জেদি মেয়েটির দিকে সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলেন। এমন গোঁয়ার মেয়ে তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখেননি। তার একমাত্র পুত্রের খুব কাছের এই বন্ধুটি যে একজন নামকরা বেয়াদব সে বিষয়ে

অবশ্য তিনি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। তবুও আজকে তার বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটতেই চাইছেনা।

তিনি যতটা সম্ভব শান্ত ভাবে বলার চেষ্টা করলেন 'বসো। তারপর বলছি কেন ডেকেছি।

অমৃতা ল্যাপটপের ব্যাগ টেবিলের ওপর রাখলো। হকের দিকে ক্রুর দৃষ্টিটা ছুঁড়তে ছুঁড়তেই বসলো চেয়ারে।

হক অমৃতার চোখে চোখ রেখে নিজের মুখের ছিটে ছিটে দাড়ি হাতড়াতে হাতড়াতে কুশলী কণ্ঠে বললেন, 'অমৃতা চৌধুরী, আসল নাম নূরে নাজনিন নিপা। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে এল এল বি, এল এল এম…'

মাঝপথে অমৃতা হাত তুলে থামিয়ে দিল তাকে। একদম পেশাদার উকিলের গলায় বলে উঠলো, 'আরে রাখেন রাখেন, এইসব সবাই জানে। এসব বলে আপনি আমাকে ইমপ্রেস করতে পারবেন না। অন্য কিছু বলেন।'

হক থতমত খেলেন। মেয়েটা কি একটু বেশি স্মার্ট? বেশি ড্যাম কেয়ার? একেবারে পাড়ার মাস্তান গোছের ড্যাম কেয়ার? এবার বিস্ময় কেটে গিয়ে খুব দ্রুত তার শরীরের কোষে কোষে রাগের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তিনি একটা বড় নিশ্বাস চাপলেন। যে করেই হোক তার ছেলেকে এই মেয়েটার কাছ থেকে দূরে সরাতে হবে। এনাফ ইজ এনাফ। আজকের পর থেকে তিনি সামিকে আর কোনো ভাবেই এই বখাটে দলটার সাথে মিশতে দেবেন না।

– ‘তোমাকে ইমপ্রেস করার জন্য কিছু বলা হয়নি। এটা জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন ছিল।’

– ‘আরে রাখেন আপনার ইন্ট্রোডাকশন। আসল কথা বলেন। সময় নাই আমার। যা বলবেন ফটাফট বইলা ফ্যালেন।’

হক এ পর্যায়ে অপমানিত বোধ করলেন। থমথমে রাগে তার মুখখানা ছাই রঙা হয়ে গেল। মেয়েটি তার চোখে চোখ রেখে উদ্ধত ভাবে কথা বলছে। তার সাথে খুব কম লোকই এমন চড়া গলায় কথা বলার সাহস পায়। তিনি শুধুমাত্র এ দেশের প্রথম শ্রেণীর একজন ধনি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিই নন, বরং একজন দক্ষ রাজনীতিবিদও বটে। সমাজে পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তার সফলতা অবিমিশ্র, নির্জলা এবং নিখাদ। একটা পুঁচকে মেয়ে তার সামনে গলা উঁচিয়ে কথা বলছে এ ঘটনা অবিশ্বাস্য।

– ‘সকালে কেন এসেছিলে আমার বাড়ি?’ গমগমে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন হক।

– ‘আপনি নাকি আমাদের ইন্ডিয়া যেতে দেবেন না?’ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে অমৃতা।

– ‘ঠিক শুনেছ।’

– ‘কিন্তু কেন? আপনার ছেলে এখন প্রাপ্তবয়স্ক। আপনি নিজের ইচ্ছা কোনো ভাবেই আর তার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারেন না।’

হকের তীক্ষ্ণ চক্ষুদ্বয় অমৃতার দুর্দমনীয়, গোঁয়ার মুখখানার ওপরেই নিবদ্ধ ছিল। অমৃতার মাত্র বলা কথাটা তাঁর কপালে একটি অতিরিক্ত ভাঁজের সৃষ্টি করলো। তিনি কঠিন ভাবে বললেন, ‘আমার ছেলেকে আমি কীভাবে ট্রিট করবো তা তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে?’

– ‘তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এতে এত অপমানিত বোধ করার কী আছে? শেখার কোনো বয়স নেই!’

– ‘তুমি কিন্তু সীমা অতিক্রম করছ। আমি তোমার বন্ধুর বাবা। তোমার উচিত আমার প্রতি নূন্যতম সম্মান রেখে কথা বলা। আদব কায়দা কিছুই কি শেখায়নি বাবা মা?’

অমৃতা ঠোঁট টেনে হাসলো, ‘এতকাল বন্ধুর বাবা হিসেবে আদবকায়দা দেখাতে গিয়েই আপনাকে কখনো কিছু বলিনি। কিন্তু এর মানে এই না যে আপনি যা ইচ্ছে তা করে যাবেন। গোটা দেশটা আপনার কেনা নয়। আদতে সীমা আপনি অতিক্রম করছেন। আমি না।’

– ‘আমি সীমা অতিক্রম করছি?’

– ‘ঠিক তাই।

– ‘তুমি যে সকাল বেলা মিডিয়ার লোকজন দের সামনে বলে আসলে যে আমার মুখোশ খুলে দেবে, সেই ব্যাপারটা আসলে কী ছিল? কিসের মুখোশ? আমি কি অপরাধী?’

– ‘জি, আপনি অপরাধী।’

হক এবার কৌতূহল বোধ করলেন। মেয়েটির সাহসিকতা তাকে চমকে দিচ্ছে। ভেবেছিলেন একে ডেকে এনে কয়েকটা ধমক ধামক দিয়ে বিদায় করে দেবেন। তার ধারণা ছিল একটা রাম ধমক খেলে আর ক্যারিয়ার সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টির ভয় দেখালেই এই মেয়ে মুহূর্তের মাঝে সিধা হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা

ক্যারিয়ার নিয়ে সর্বদাই একটু বেশি সতর্ক হয়। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে এই মেয়েটি আসলে পয়লা নম্বরের বদমাশ। লেখাপড়া, চাকরি বাকরি চুলোয় গেলেও বদমাইশি ছাড়বে না।

– 'কী অপরাধ আমার?'

অমৃতা অকপট গলায় বললো, 'আপনি নিজেকে সুপার হিরো মনে করেন। কিন্তু আসলে আপনি একটা জিরো।'

– 'জিরো? আমি জিরো?'

– 'ঠিক তাই। আপনি ভেবেছেন আপনি না চাইলে আমরা দেশের বর্ডার ক্রস করতে পারবোনা, তাইনা?' এটুকু বলে অমৃতা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো। তারপর বললো, 'দেখে নেবো আপনার দৌড় কদ্দূর!'

হকের মুখটা বিস্ময়ে একটু হা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা সেকেন্ড খাবি খাওয়ার পর তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ?'

– 'হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ করছি।'

– 'তোমার মেয়ে অনেক বেশি সাহস। ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হোয়াট ইউ আর আপ এগেইন্সট। আমি চাইলেই তোমার অনেক বড়সর ক্ষতি করতে পারি।'

– ‘আপনি এসবের কিছুই করবেন না। কারণ আমি যে আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি তা সামি জানে। আজকের পর আমার যদি কোনো রকমের ক্ষতি হয়, তাহলে সামি আপনাকে ছেড়ে দেবেনা।’

– ‘ব্ল্যাকমেইল করছ?’

– ‘কিছুই করছিনা। জাস্ট বলছি আমাদেরকে আমাদের মতো থাকতে দিন। প্লিজ আমাদের লাইফে দখল দেয়া বন্ধ করুন। অনেক করেছেন। এটা আমরা কেউ ভুলিনি যে শুধুমাত্র আপনার কারণেই বিভা দেশছাড়া হয়েছে।’

– ‘এসব বোঝার মতো ম্যাচিউরিটি তোমার এখনো আসেনি। যাই হোক আমি কেন কী করেছি সেই কৈফিয়ৎ তোমার কাছে দেবার মতো সময় বা ইচ্ছে কোনোটিই আমার নেই। তুমি শুধু এটা শুনে রাখো যে আমি চাইনা আমার ছেলে তার প্রাক্তন প্রেমিকার স্বামীর বাড়ি যাক। আন্ডারস্টুড?’

অমৃতা একটু সময় চুপ করে রইল। স্বীকার করতে ইচ্ছে হয়না তার, তবুও এ কথা সত্য যে ইনার বাচনভঙ্গি সুন্দর, মার্জিত এবং ঝকঝকে। কথা শুনলে এক বিন্দুও বোঝা যায়না যে লোকটা ভেতরে ভেতরে একটা আস্ত শয়তান।

– ‘কেন এতো কীসের ভয়? আপনার কি ধারণা আপনার ছেলে বিভাকে ওর বরের সামনে থেকে তুলে নিয়ে আসবে?’

মেয়েটির চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে হকের হাতে পায়ে খিল ধরে যাচ্ছিল। এ কেমন মেয়ে জন্ম দিয়েছে এর বাবা মা? কিচ্ছু শেখায়নি? ছিঃ, তার নিজের মেয়ে হলে সকাল বিকাল থাপ্পড়ের ওপর রাখতো।

– ‘অনেক কিছুই হবার সম্ভাবনা আছে। বিভার বাবা মা কি ব্যাপারটা জানেন?’ রাগ চাপা দিয়ে বললে তিনি।

অমৃতার চোখ মুখ এবার শক্ত হয়ে গেলো, ‘আপনি কি আবারো আগের বারের মতো কিছু ঘটাতে যাচ্ছেন? বিভার বাবাকে ব্যাপারটা জানাবেন বলে ঠিক করেছেন?’

– ‘আর কোনো উপায় না থাকলে তাই তো করতে হবে!’

অমৃতা হাতের আঙুল উঁচিয়ে শাসানোর ভঙ্গিতে বললো, ‘লিসেন, মিস্টার হক, খবরদার এই কাজটা আপনি করতে যাবেন না। ভীষণ ভীষণ খারাপ হবে কিন্তু বলে দিলাম।’

হক অমৃতার ওই জাঁদরেল মূর্তি দেখে এবার হেসে ফেললেন। সেদিনকার এক মেয়ে তাকে কিনা আজ আঙুল উঁচিয়ে শাসাচ্ছে!

ওই হাসি দেখে অমৃতার রাগ আরও বেড়ে গেলো, সে দাঁত কিড়মিড় করে বললো, ‘হাসছেন কেন?’

হক হাসি চেপে বললেন, ‘কী করবে তুমি শুনি?’

অমৃতা কিছুক্ষণ শূন্য চোখে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললো, ‘আমি কিছুই করবো না। কেউ কিছু করবেনা। কিন্তু আপনি আপনার ছেলেকে চিরতরে হারিয়ে ফেলবেন।’

হক থমকে গেলেন। হাসির রেখাটা ধীরে ধীরে মুছে গেলো তাঁর ঠোঁট থেকে। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাবে বললেন, 'এর মানে কী?'

– 'সামি আপনাকে কোনোদিন ক্ষমা করবেনা। ওকে ফিরে পাবার যে ক্ষীণ আশাটি আছে আপনার, এবার যদি কোনো ঝামেলা করেন তাহলে সেই আশাটুকুও আর থাকবেনা। আমি লিখে দিলাম।'

– 'ও কি এই ব্যাপারে কিছু বলেছে?'

– 'হ্যাঁ বলেছে।'

– 'কী বলেছে?'

–' বলেছে এবার যদি বিভার বাবা মা' কে কিছু জানানো হয় তাহলে সে আপনাকে ত্যাজ্য পিতা করবে।' এই অংশটা অমৃতার বানানো। কিন্তু সে এত চমৎকার ভাবে মিথ্যাটা বললো যে হক সাহেব বিভ্রান্তি তে পড়ে গেলেন।

একটু সময় গম্ভীর ভাবে তিনি কিছু একটা চিন্তা করে নিয়ে দৃঢ় গলায় বললেন, 'আমাকে ত্যাজ্য পিতা করলে কোনো সমস্যা নেই। আমি যেকোনো মূল্যে আমার পুত্রের ভালো চাই। কোনো ভাবেই ওই মেয়ের বাড়িতে তাকে যেতে দেয়া যাবেনা।'

অমৃতা হুশ করে একটা দীর্ঘ হতাশ নিশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, 'ও গড, ইউ আর ইম্পসিবল।'

হক এবার আদেশ দেবার ঢঙে বললেন, – 'ট্যুরটা ক্যানসেল কর। এই টাকায় তোমরা অন্য কোথাও গিয়ে ঘুরে এসো, থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুর। আমি স্পনসর করব।'

অমৃতা শ্লেষের হাসি হাসে, 'ঘুষ দিতে চাইছেন?'

হক আর না পেরে বলে ফেললেন কথাটা, 'তুমি কি জানো যে, তুমি ভীষণ বেয়াদব একটা মেয়ে?'

– 'সবাই বলে, নতুন কিছু নয়। ন্যায়ের কথা বলতে গেলেই লোকে বেয়াদব বলে। যেন মুখ বুজে অন্যায় সহ্য করার আরেক নাম আদব লেহাজ।'

– 'বেশি সাহস দেখতে এসোনা অমৃতা। তোমার ক্যারিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে। স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে।'

– 'আপনি কি ভেবেছেন আপনি চাইলেই আমার হাইকোর্টের সনদ নিয়ে ঘাপলা করতে পারবেন? করেই দেখুন না।'

– 'আমি কী করতে পারি,কতটুকু করতে পারি তার কোনো ধারণাই নেই তোমার।

অমৃতা উঠে দাঁড়ালো।

– 'করতে থাকুন। নো বডি কেয়ারস।'

১১

দূর পাহাড়ের দেশে বৃষ্টি নেমেছে। ধোঁয়াটে মেঘের গা থেকে নীরবে নিঃসরণ হচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল। দেখলে মনে হয় যেন আকাশটা খণ্ড খণ্ড হয়ে নেমে আসছে পাহাড়ের মাথায়। উত্তরের হাওয়া বুক ভরা হিম নিয়ে হু হু করে তেড়ে আসছে লোকালয়ের দিকে। এদিকের আকাশে এখন শুধুই মেঘ, বৃষ্টি নেই। বিভা অবাক

চোখ মেলে দেখছিলো বৃষ্টিতে আবছা হওয়া পাহাড়ের মাথা। আজ বিকেলটায় পুরো বাড়িতে সে একদম একা। দূর্গা গেছে বাজারে। বলেছে ঘন্টা খানেকের ভেতরেই ফিরে আসবে। বিভার ইচ্ছে ছিল আশপাশটা ঘুরে দেখবে। কিন্তু আকাশের যা অবস্থা। যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একলা একলা এই গাঁও গেরামে ঘুরে বেড়ানো ঠিক হবেনা ভেবে আর বেরোলোনা। বারান্দার গ্রিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল সে। বাতাসে উড়ছিল তার খোলা চুল।

হাওয়া ভারী ঠান্ডা। চাদর গায়ে জড়িয়েও তেমন একটা লাভ হচ্ছেনা। কাছেই কোথাও একটা ঘুঘু ডাকছে। মাথার ওপর টালির ছাদের ফাঁকে ফাঁকে কয়েক জোড়া পায়রা ক্রমাগত বাকবাকুম করছে। প্রকৃতির যে এতো রকম নিজস্ব শব্দ আছে বিভা তা এর আগে কখনো টের পায়নি। টের পাওয়ার মতো অবসরও বুঝি ছিলোনা তার। জীবনে কত জায়গায় বেড়াতে গেছে। কিন্তু প্রতিবারই ছুটির দিনগুলো কেটেছে হৈহুল্লোড় করে। একলা চুপটি করে বসে প্রকৃতির রূপ দেখার অবকাশ ছিলনা কোথাও। এবার জীবনে প্রথম বারের মতো উপলব্ধি করলো সে, প্রকৃতিকে বুঝতে হলে, জানতে হলে, সম্পূর্ণ ভাবে অনুভব করতে হলে আলাদা ভাবে সময় দিতে হয়। একান্তে কিছুটাক্ষণ তার সাথে কাটাতে হয়। যে সময়টুকুতে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি থাকবেনা। শুধু একলা একটা মানুষ আর এই রূপবতী পৃথিবী। বিভা এখন জানে যে, এই বিশ্ব চরাচরও অবিরাম অজগ্র কথা বলে। সেই কথাটুকু, ভাষাটুকু বোঝবার মতো মন থাকতে হয় শুধু। বিভার এই বুঝদার মনটা আগে কোথায় ছিল কে জানে! নিজের ভেতরটাকে সে নতুন ভাবে আবিষ্কার করছে ধীরে ধীরে এত কাল বাদে এই বন পাহাড়ের দেশে এসে!

হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে সে চমকে উঠলো।সবুজ মাঠের পশ্চিম কোণে, পিটিস ঝোপের কাছে একটা ময়ূর নীল সাদা পেখম তুলে দাঁড়িয়ে আছে নাচের ভঙ্গিতে। কী সুন্দর তার পাখনা দুটি! রাণীর মতো মুকুট পরে পাখনা ছড়িয়ে যেন আসন্ন বৃষ্টিকে বরণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। ময়ূর নাচ দেখে সেই মেঘলা মন কেমন করা একলা

বিকেলটায় বিভারও অনেক দিন বাদে খুব নাচতে ইচ্ছে হল। সময় নষ্ট না করে ঘরের ভেতর দৌড়ে গিয়ে আলমারি থেকে ঘুঙুর বের করলো সে। পরলো পায়ে। তারপর ঝুম ঝুম শব্দ তুলে ঘরের মধ্যেই কয়েক পাক ঘুরে নিলো। জানালা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকলো হাওয়া। ল্যাপটপে ছেড়ে দিল গান। চাদর ফেলে রেখে হালকা গোলাপি সুতির শাড়ির আঁচলটা কোমরে নিল গুঁজে।

তারপর তার সারা শরীর জুড়ে ধীরে ধীরে নেমে আসল নাচের নানা মুদ্রা।

‘মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর নমো নম, নমো নম, নমো নম।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর রমঝম রমঝম, ঝমঝম….

বাইরে মেঘের ডাক। বৃষ্টির ঘ্রাণ। আর সারা ঘরময় গানের সুর আর ঘুঙুরের রূমঝুম। বিভা যেন আর তার মধ্যে নেই। এই মেঘলা রুপো রঙের বিকেল যেন এক অচেনা বলিষ্ঠ চিত্তহারী পুরুষের ন্যায় বশ করেছে তাকে। নৃত্যই এখন তার বশীভূত ভালোবাসা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম, একমাত্র ভাষা। জীবনে সে শুধু এই একটি কাজই ভালোবেসে করেছে। নাচের মাঝেই বারে বারে নিজের হারানো সত্তাকে খুঁজে পেয়েছে।

দরজায় একটা ছায়ামূর্তি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। কতক্ষণ কে জানে। গান শেষ হবার সাথে সাথে বিভা নাচ থামালো। তার চুল ঘামে লেপ্টে আছে কপালের সাথে। বুকের কাছ থেকে শাড়ির আঁচল সরে গেছে অনেক খানি। ফোঁস ফোঁস করে পড়ছে নিশ্বাস। কয়েকটা মুহূর্ত পর বিভা ধাতস্থ হল। কোমরে গোঁজা শাড়ির আঁচল খুলে নিয়ে কপালের আর নাকের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, ‘আপনি কখন এলেন?’

অভিজিৎ নিষ্পলক চেয়ে ছিল বিভার দিকে। বাংলাদেশে এক গ্রীষ্মের বিকেলে এই মেয়েটির নাচ দেখার পর সে সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। সে রাতে তার বুকের মাঝে ধিকিধিকি অঙ্গার জ্বলেছিল। ভেতরটায় এমন অদ্ভুত কম্পন অন্য কোনো নারীর জন্য এর আগে কোনো দিন অনুভব করেনি সে। আজকে সেই নারী তার কতটা কাছে, হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। কিন্তু ছোঁবে কী করে? এর কোনো কিছুই যে তার নয়। এ নারীর ভেতর বাহির সমস্তটাই অন্য একজনের দখলে।

অভিজিৎ দরজার কাছ থেকে সরে এসে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। গলায় বাঁধা টাই খুলতে খুলতে বললো, 'আজকে কি কোন বিশেষ দিন?'

বিভা একটু লজ্জা পাওয়া গলায় বললো, 'না, কোনো বিশেষ দিন নয়।'

– 'ও আচ্ছা। কিন্তু আমার কাছে একটা খবর আছে, যে খবরটা শুনলে আপনার দিনটা প্রকৃত অর্থেই বিশেষ হয়ে উঠবে। আরো বেশি করে নাচতে মনে চাইবে।'

– 'কী খবর?'

– 'আপনার বাংলাদেশ যাবার টিকেট করে ফেলেছি। আগামী রবিবার ফ্লাইট। এইতো আর চারটা দিন পরেই।'

– 'তাই নাকি?' বিভা বলে বিস্ময়ের গলায়।

– 'হ্যাঁ তাই।'

– 'আপনার বাবা মাকে কী বলবেন?'

– 'ও নিয়ে আপনার অত ভাবতে হবেনা। আমি বলে দেব কিছু একটা।'

– ‘আমাকে তাড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে? মতলবটা কী? আবার বিয়ে শাদী করবেন নাকি?’

–এখনো সেসব নিয়ে কিছু ভাবা হয়নি।’

– ‘তাহলে আমাকে বিদায় করার জন্য অত উঠে পড়ে নামলেন কেন? হ্যাঁ?’

অভিজিৎ বিভার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ অথচ শীতল গলায় বললো, ‘কেন আপনি যেতে চাইছেন না?’

বিভা অপ্রতিভ হল প্রশ্নটা শুনে। অপমানে লাল হয়ে বললো, ‘যেতে চাইবো না কেন? কী এমন মধু আছে এখানে?’

– ‘নাকি ভাবছেন বাকি জীবনটা এভাবেই কাটিয়ে দেবেন। আমার বৌ সেজে থাকার অভিনয় করে যাবেন আর ওদিকে সারাদিন প্রেমিকের সাথে ফোনে কথা বলবেন। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙলনা।’

বিভার প্রতিমার মতো টানা চোখজোড়ায় অভিজিতের মাত্র বলা কথাটা এক গভীর বিষণ্নতার ছায়াপাত ঘটালো। সে একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললো, ‘মোটেওনা।’

– ‘দেখুন বিভা, রোজ রোজ আপনার বন্ধুবান্ধব আর প্রেমিক নিয়ে এসব বাড়াবাড়ি আমার আর ভালো লাগছেনা। আপনি এখানে আছেন কিন্তু আপনার মন সর্বদা পড়ে আছে বাংলাদেশে। চোখের সামনে এরকম একটা ভীষণ অসুখী, অস্বাভাবিক মানুষ দেখতে কার ভালো লাগে বলুন? আমার এসব আর সহ্য হচ্ছেনা। প্লিজ, আপনি আমাকে মুক্তি দিন।’

কেন কে জানে, বিভার চোখের কোণে দু ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠলো হঠাৎ। সে চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল, অস্ফুটে বললো, ‘ঠিক আছে।’

সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল খুব দ্রুত। এয়ার টিকেট ক্যানসেল করে ট্রেনের টিকেট কাটল ওরা। ঠিক হল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে মৈত্রী এক্সপ্রেসে করে সোজা চলে যাবে নিউ জলপাইগুড়ি। সময় একটু বেশি লাগবে এ কথা ঠিক কিন্তু হক সাহেবের নজর এড়ানোর জন্য এর চেয়ে ভালো কোন পন্থা আপাতত আর নেই।

ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত যাওয়াটাও একটা ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হকের চরেরা সর্বত্র ওঁৎ পেতে আছে। রওয়ানা দেবার আগে ওরা সবাই জমায়েত হয়েছিল রুদ্রদের ফ্ল্যাটে। দেখা গেল অমৃতা নিউমার্কেট থেকে সস্তায় পাঁচজনের জন্য পাঁচটা বোরখা কিনে এনেছে। বোরখা দেখে আকাশ চোখ কপালে তুলে বললো, ‘মানে কী? এখন বোরখা পরে মেয়ে সাজতে হবে?’

– ‘মেয়ে সাজার জন্য না, বোরখা পরবি নিজেকে আড়াল করার জন্য।’

– ‘এইসব করতে পারবোনা।’

– ‘না পারলে মর শালা। যারা বোরখা পরতে পারবে, আমার কথা শুনবে। শুধু মাত্র তারাই যাবে। বাদ বাকিরা পইড়া থাক এইখানে।’ বজ্রকণ্ঠে ঘোষনা দিল অমৃতা।

সামি বললো, ‘মানে? বোরখা পরতে হবে কেন? অবস্থা কি এতই খারাপ? বাবা তোরে আসলে কী বলছে? একটু খুইলা বলবি আমারে?

– ‘তোমার আব্বার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। দেখা যাবে এই বাসার সামনেই লোক বসায় রাখছে। বের হবার সাথে সাথে ফলো করা শুরু করবে। আমাদের এমন ভাবে বাসা থেকে বের হতে হবে যেন কেউ আমাদের চিনতে না পারে। আর আমরা

একসাথে পাঁচজন বের হবো না। আলাদা আলাদা ভাবে বের হব। মিট করবো একেবারে ট্রেনে উঠে।'

রুদ্র এবার হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'সাবাশ সাবাশ, এই না হলে উকিলের মগজ? দারুণ প্ল্যান মামা, দারুণ!'

সবার প্রথমে বের হবে সামি। সে বোরখা পরে নিয়েছে। আকাশ আর রুদ্রও পরেছে। সারা গা জুড়ে কালো বোরখা আর মুখে নেকাব। শুধু চোখ দুটি ছাড়া আর কিচ্ছু দেখা যায়না। সামির উচ্চতা বেশি বিধায় তার বোরখাটা একটু ছোট হয়েছে। শরীরের সাথে লেগে আছে আঁটসাঁট ভাবে, আবার পায়ের দিকেও কিছুটা উপরে উঠে আছে।

বোরখা পরে নেকাবে মুখ ঢেকে, হাতে গিটার নিয়ে রুদ্র পানসে গলায় বললো,

– 'আচ্ছা যদি বাই এনি চান্স ধরা পইড়া যাই, তাহলে কী করবো? আমার গিটার দেখলেই তো লোকে আমারে সন্দেহ করব। জীবনে কোন বোরখা পরা মেয়েকে গিটার নিয়ে ঘুরতে দেখছিস?'

আকাশ নির্বিকার গলায় বললো, 'ধরা পড়লে কী আর করবো? বলবো যে আমরা তো কিছুই জানিনা, সব অমৃতা ম্যাডাম জানে। একচুয়েলি আমাদের চিন্তার কিছু নাই। সামির বাপ ধরলে অমৃতারেই ধরবে। আমরা তো সিনেই নাই।' বলে আকাশ ভারী নিশ্চিন্তের একটা প্রাণ জুড়ানো হাসি দিল।

অমৃতা কথাটা খুব একটা পাত্তা দিলো না। রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললো,'শোন, বের হওয়ার আগে এক কাপ চা খাইতে চাই, কে কে খাবি?'

হৃদি আর আকাশ হাত তুললো। অর্থাৎ তাদের চা চাই। বোরখা আর হিজাব পরিহিতা অমৃতাকে বেশ মেয়ে মেয়ে দেখাচ্ছিল। অমৃতা চলে যাবার পর রুদ্র আফসোসের গলায় বললো,

– 'ধুর, এমনে হয়না। আমাদের তিনজনকে দেখেই বুঝা যাচ্ছে আমরা মেয়ে না। সামনে দ্যাখ কেমন সমান। যে কেউ বুঝবে আমরা জোর কইরা মেয়ে সাজছি।'

শুনে বন্ধুরা হো হো করে হেসে উঠলো। রুদ্র কিন্তু হাসলো না, ভারী চিন্তিত গলায় বললো, 'হাসির কথা না, মামা, আমি সিরিয়াস। এমনে বাসা থেকে বাইর হইলে ধরা খামু শিওর।'

হৃদি বললো,'কেউ তোমার বুকের দিকে তাকাবেনা। বোরখা পইরা আবার শরীর দেখাইতে চাও। এতো খারাপ!'

রুদ্র আগের চাইতেও বেশি গম্ভীর গলায় আকাশ আর সামির দিকে চেয়ে বললো, 'কাম অন গাইজ, অমৃতা হ্যাজ বুবস। উই ডোন্ট! শেইম অন আস!'

সেই মুহূর্তেই অমৃতার প্রবেশ ঘটলো ঘরে। সে সাপের মত ফোঁস করে উঠে বললো, 'অমৃতা হ্যাজ হোয়াট?'

রুদ্র অমৃতার সেই রুদ্রমূর্তির সামনে পড়ে বেশ ভড়কে গেলো। চিঁ চিঁ করে বলে উঠল, ‘না কিছুনা।

অমৃতা তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করতে লাগল রুদ্রকে। রুদ্র কাঁচুমাচু হয়ে আবার বললো, ‘কিছুনা বললাম তো!’

আকাশ ফোড়ন কাটলো, ‘আরে ও বলছে অমৃতা হ্যাজ বুদ্ধি। তোর বুদ্ধির প্রশংসা করতেছিলাম আমরা।’

রুদ্রও তাল মেলালো সঙ্গে সঙ্গে, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ বুদ্ধির কথাই হচ্ছিলো। তুই মামা একটা জিনিয়াস। আমাদের গর্ব। এইসব বলাবলি করতেছিলাম।’

হৃদি আর সামি ঠোঁট টিপে হাসছিল। অমৃতা আর কথা না বাড়িয়ে ফোন হাতে নিয়ে বললো, ‘আসো বের হওয়ার আগে সবাই মিলে একটা সেলফি তুলি।

সামি অমৃতার হাত থেকে ছোঁ মেরে ফোনটা নিয়ে বললো, ‘আমারে দে, আমার হাত সবচেয়ে লম্বা। সেলফি ভালো তুলি আমি।’

বোরখা পরা পাঁচ বন্ধু ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হল। তারপর চা খাওয়ার পালা শেষ হলে সবার আগে বাসা থেকে বের হল সামি। দরজার বাইরে পা রাখবার আগে সে নেকাবের আড়াল থেকে মেয়েদের মতো চিকন গলায় বললো, ‘হেয়ার স্টার্টস দ্যা ফানিমুন, উইশ মি লাক গাইজ!’

বন্ধুরা সব সমস্বরে বলে উঠলো, 'উইশ ইউ আ ভেরি হ্যাপি ফানিমুন দোস্ত!'

কথা মতোই কাজ হল। সবাই স্বতন্ত্র ভাবে স্টেশনে গিয়ে পৌঁছুলো। হৃদি প্রথমে ভুল বগিতে উঠে পড়েছিল। লম্বা চওড়া এক বোরখা ওয়ালি মহিলাকে সে আকাশ মনে করে পেছন থেকে পিঠে থাপ্পড় মেরে বলে উঠেছিল, 'ওই শালা, পাইছি তোরে! আল্লাহ বাঁচাইসে, আমি তো মনে করছিলাম ভুল জায়গায় আইসা পড়ছি।'

বোরখা ওয়ালি থাপ্পড় খেয়ে কোঁ কোঁ করে উঠলো। তার স্বামী পাশেই দাঁড়ানো ছিল। ঘটনা ঘটা মাত্র মোচ ওয়ালা চোয়াড়ে চেহারার স্বামী হৃদিতার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো। মনের হল এক্ষুণি সে হৃদিকে জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে। হৃদি জিভ কেটে, 'ব্রাদার! খুব ভুল হয়ে গেছে। সরি, ভেরি সরি!' বলে পড়িমরি করে জায়গাটা ছাড়লো।

দশটা চল্লিশের ভেতরেই সবাই নির্দিষ্ট বগিতে উঠতে পারলো। বেঞ্চ গুলো মুখোমুখি। প্রতিটি বেঞ্চ আবার দোতলা। দেখা গেল সব গুলো সিট ঠিক ঠাক আছে শুধু আকাশেরটা বাদে। আকাশের সিটে এক মোটা সোটা ভদ্র মহিলা হাত পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসে আছেন। মহিলার নাকের ডগায় চশমা। গায়ে সাদা উলের চাদর।

সবাই ওভার হেড কাউন্টারে মালপত্র গুছিয়ে রাখলো। ট্রেন ছাড়তে তখনো মিনিট দশেক সময় বাকি। বন্ধুরা যার যার জায়গায় বসে পড়েছে। কারো মুখে রা নেই। এই পর্যন্ত কোন ঝামেলা হয়নি ঠিক কিন্তু ট্রেন ছাড়ার আগ পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাচ্ছেনা।

আকাশ গোবেচারার মত মোটা ভদ্রমহিলার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আর না পেরে চিকন গলায় বললো, 'এক্সকিউজমি আন্টি।'

মহিলা চশমার ওপর দিয়ে চোখ তুলে তাকালো। আকাশ মেয়েলি গলাটা ধরে রেখেই বললো, 'এটা আমার সিট। আপনি ভুল জায়গায় বসেছেন। আপনার সিট পাশের আইলে।

ভদ্র মহিলা আকাশের সর্বাঙ্গে একবার নজর বুলালো। সেই সাথে লক্ষ্য করলো বোরখা পরা আরো চার মূর্তিকে। একটু সন্দিহান গলায় বললো, 'আপনার সিট নাম্বার কত?'

আকাশ টিকেট হাতে নিয়ে সিট নম্বর বললো। ভদ্রমহিলা বললো, 'ও আচ্ছা,উঠে যাচ্ছি। এমনিতেও এটা আমার সিট নয়। এটা আমার মেয়ের সিট। ও একটু ওয়াশরুমে গেছে তো তাই এখানে বসে ওর ব্যাগ পাহারা দিচ্ছি আমি।' এটুকু বলে ভদ্র মহিলা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার বললেন, 'ঐতো আমার মেয়ে এসে গেছে।'

ছিপছিপে, লম্বা, স্লিভলেস কামিজ পরা চমৎকার দেখতে মেয়েটার দিকে চোখ পড়া মাত্র আকাশ খুশিতে বাকবাকুম হয়ে তার নিজস্ব গলায় বলে উঠলো, 'ও উনার সিট? আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই। উনি বসুক। আমি পেছনের চেয়ারেই বসব।'

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। আকাশ থতমত খেয়ে মুহূর্তেই গলা পাল্টে মেয়ে হয়ে বললো, 'না মানে, উনি এখানে বসতে পারেন কোনো সমস্যা নেই।'

ভদ্রমহিলা সন্দেহের চোখে আরেকবার ওদের পুরো দলটা দেখে নিয়ে মেয়েকে বললো, 'উর্মিলা, তোর সিট ওপাশে, এদিকে নয়।' বোঝা গেল মেয়েকে তিনি এই বিপদজনক দলের কাছাকাছি রাখতে চাইছেন না।

বন্ধুরা সব কাঠ হয়ে বসে রইলো প্রায় মিনিট পাঁচেক সময়। এই পাঁচ মিনিট যেন পাঁচ যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সময় কাটছেইনা।

ট্রেনটা হুইসেল দিয়ে নড়ে চড়ে উঠতেই আকাশ তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠল। বোরখা খুলতে খুলতে অধৈর্য গলায় বলল, ‘অনেক হইছে। আর না। সামি! এত কিছুর পর তর বাপের কোন চ্যালা যদি আমার সামনে আসে আমি তাহলে এক কোপে তার মাথা দোফালা কইরা দিমু।’

আশেপাশের মানুষজন দৃশ্যটা অবাক চোখে দেখলো। পাশের আইলে বসা রূপবতী উর্মিলা এবং তার মায়ের চক্ষু তখন চড়কগাছ। হা হওয়া মুখ নিয়ে উর্মিলার মা বলে উঠল, ‘এ কী কান্ড!

টেন ঝিকঝিক করে চলতে শুরু করেছে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে বন্ধুরা সব একে একে বোরখা খুলে ফেললো। দুশ্চিন্তা এবং ছদ্মবেশ মুক্ত হয়ে সবাই হৈ হৈ করে উঠলো আনন্দে। রুদ্র কোমর দুলিয়ে শুরু করলো নাচ। বাকিরা হাত তালি দিয়ে গাইতে থাকল,

সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি

নাচো তো দেখি

সোহাগ চাঁদ বদনী ধ্বনি

নাচো তো দেখি

বালা নাচো তো দেখি

বালা নাচো তো দেখি

আশেপাশের লোকজন হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল ওদের দিকে। এমন পাগলের কান্ড তারা এর আগে কোনো দিন দেখেছে কিনা সন্দেহ আছে।

১২

‘আমি যারে বাসি ভালো

কাজলের চেয়েও কালো

হয়না যে তার তুলনা

দিলোনা দিলোনা

নিলো মন দিলোনা

এতো যে নিঠুর বন্ধু

জানা ছিলোনা গো…

রুদ্র গিটার বাজিয়ে গাইছিলো। রাত বারোটা। ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাস কামরায় হলদে একটা মরা আলো জ্বলছে। এসির শীতল বাতাসে চারপাশ কনকনে ঠাণ্ডা। বেশির ভাগ যাত্রী কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর পায়তারা করছে। কিন্তু এই ঘুমকাতুরে যাত্রীদের মধ্যেও কয়েকজন পাওয়া গেলো যারা কিনা সত্যিকার অর্থেই সুরের সমঝদার। বাজনার শব্দ শুনতে পেয়ে তারা নিজেদের জায়গা ছেড়ে পায়ে পায়ে এসে গানওয়ালার কাছে ভিড় করেছে। সংখ্যায় তারা পাঁচজন। দুজন নারী, তিনজন পুরুষ। বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে হবে। নারী দুজনকে বসার জায়গা দেয়া হয়েছে। তারা রুদ্রর পাশে বসেছে। মুখোমুখি বেঞ্চেই পা তুলে একই কম্বলের তলায় চাপাচাপি করে বসেছে আকাশ, হৃদি, অমৃতা আর সামি।

সবার মধ্যেই একটা ফূর্তির ভাব বিরাজ করছিল। পাশের আইলে বসে থাকা উর্মিলার মায়ের মুখেই ছিল শুধু রাজ্যের বিরক্তি। মনে হচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে তিনি ট্রেন ছেড়ে নেমে যাবেন। এই কামরার ভেতরে তার যেন নিঃশ্বাসটা পর্যন্ত নিতে কষ্ট হচ্ছে। উর্মিলা মায়ের পাশের সিটে বসে ঘাড় বাড়িয়ে খানিক বাদে বাদে গান বাজনার দলটিকে দেখছে। তার চোখ মুখের ভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে এই দলটির প্রতি তার ভেতরে একধরণের মুগ্ধতা কাজ করছে। মায়ের কারণে সেই মুগ্ধতার প্রকাশ ঘটানো সম্ভব হচ্ছেনা।

রুদ্রর ঢেউ খেলানো বাবড়ি চুলগুলো খোলা। গান গাওয়ার তালে তালে তার মাথা দুলছে। চোখ দুটি মুদিত। যেন সুরের সাধনায় গভীর ধ্যানমগ্ন কোনো ঋষি। সে মন প্রাণ উজাড় করে দিয়ে গিটারের তারে আঙুল চালাচ্ছে আর গাইছে,

চুল কালো আঁখি কালো··· কাজল কালো আরো···

কাজলের চেয়ে কালো কি বলতে কি কেউ পারো।

আমি যারে বাসি ভালো, কাজলের চেয়েও কালো।

হয়না যে তার তুলনা।

দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষ গুলি ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে হাতে তালি দিয়ে তাল দিচ্ছে। গলা মিলাচ্ছে। গলা মিলাচ্ছে রুদ্রর পাশে বসে থাকা নারী দুজনও। মিনিট দুয়েকের মধ্যে আরো একজন মধ্যবয়স্ক লোক ভিড়ের মধ্যে এসে যোগ দিল।

আকাশ হঠাৎ গায়ের কম্বল সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে নিজের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করলো। এরপর রুদ্রর পায়ের কাছে মেঝেতে বিছিয়ে দিলো রুমাল খানা। মানিব্যাগ থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে রুমালের ওপর রাখলো। বন্ধুদের বললো, 'টাকা পয়সা কিছু দে, ফ্রি তে গান শুনবি শালা?'

ঘটনা দেখে গানের সমঝদার ব্যক্তিরা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলো। হৃদি মৃদু ধমকের সাথে বললো, 'এই আকাশ, এসব কী ধরণের ফাইজলামি?'

সামি মুখে একটা তির্যক হাসি নিয়ে কম্বলের তলা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'ফাইজলামির কী আছে? গান শুনে খুশি হয়ে যার যা দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে দে, বেচারা এত কষ্ট করে গাইতাছে, মাগনা লাগে নাকি? হ্যাঁ? শ্রমের একটা মূল্য আছে না?'

সামিও পাঁচটাকার একটি কয়েন রাখলো রুমালের ওপর। তার দেখাদেখি দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোকদের একজন এগিয়ে এসে দশ টাকার একটি নোট রাখলো। আকাশ খুশিতে গদগদ হয়ে বললো, 'ইয়েস! দেশে গিয়াই চাকরিটা ছাইড়া দিমু। তারপর শুরু করব আমাদের নতুন বিজনেস। রুদ্র রাস্তায় রাস্তায় গিটার নিয়া গান গাইব আর আমি তার পাশে রুমাল ধইরা দাঁড়ায় পয়সা কালেক্ট করবো।'

সামি বললো, 'তুই একা কেন? আমিও থাকবো তর সাথে। আমারও চাকরি করতে ইচ্ছা করেনা।'

আকাশ ঘাড়ত্যাড়া ভাবে বললো, 'জি না মামা, এইসব হবেনা। শুধু আমি আর রুদ্র। যা টাকা কামামু দিন শ্যাষে দুই বন্ধু ভাগ বাটোয়ারা কইরা নিমু। তুই মাঝখান থিকা আইসা কাবাব মে হাড্ডি হইস না প্লিজ।'

দু তিন মিনিটের মধ্যেই শ্রোতাদের প্রত্যেকে এগিয়ে এসে রুমালের ওপর খুচরা টাকা রাখতে রাখলো। তা দেখে সামি আর আকাশ এই দুই বন্ধুর চোখ লোভী ডাকাতের মতো চক চক করে উঠলো। সামি এক হাত বাড়িয়ে আকাশের কাঁধ জড়িয়ে ধরে স্বপ্নালু গলায় বলে উঠলো, 'অসাম আইডিয়া!দোস্ত আজকের পর থেকে আমাদের অভাবের দিন শ্যাষ।'

আকাশ নিজের কাঁধ থেকে সামির হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে মুখ ঝামটা মেরে বললো, 'তুই ভাগ শালা, এসহোলের বাচ্চা। আমার বাড়া ভাতে ছাই দিতে আসছো তাইনা?এই বিজনেস হবে শুধু আমার আর রুদ্রের মইধ্যে।রুদ্রর শ্রম আর আমার মেধা এই দুইয়ের সংমিশ্রণে।'

হৃদি অমৃতাকে চাপা গলায় বললো, 'দ্যাখ না, এই দুইটা কী রকম ফকিরের মত করতেছে! মানে মনে হইতাছে বস্তি থেইকা উইঠা আসছে। ছিঃ!'

অমৃতা বললো, 'ওরা চিরকালই ফকির। সামিটার বাপের টাকা আছে বইলা এক কালে ওর মধ্যে একটা পশ ভাব ছিল। এখন তো বাপের টাকার গরম নাই, তাই ফকির হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। খেয়াল করে দেখিস ওর চেহারায়ও একটা ফকির ফকির ভাব চলে আসছে। এখন দুই ফকির মিলে ভিক্ষা করতে নামছে। এটাই বাকি ছিল।'

রুদ্রর চোখ তখনও বন্ধ। মত্ত হয়ে গাইছে সে,

'বৃক্ষ সবুজ, তৃণ সবুজ, সবুজ টিয়া পাখি।

টিয়া পাখির চেয়ে সবুজ কি আছে কও দেখি।

আমি যারে ভালো বাসি, টিয়ার চেয়েও সবুজ বেশি।

বন্ধু রঙের বাসনা···

দিলোনা দিলোনা, নিলো মন দিলোনা।

এতো যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিলো না গো।

এতো যে নিঠুর বন্ধু জানা ছিলো না।'

গান শেষ করে চোখ খোলা মাত্র রুদ্র একটু চমকে উঠলো। গান গাওয়ার সময়টায় সে পুরোপুরি ডুবে যায়। টেরই পায়নি এত লোক এসে কখন ভিড় জমিয়েছে! করতালির শব্দে ট্রেইনের ঝিকঝিক ঢাকা পড়ে গেলো খানিকক্ষণের জন্য। শ্রোতাদের প্রত্যেকেই রুদ্রর গানের প্রশংসায় একাকার।

মেঝেতে বিছানো রুমালের ওপর রাখা টাকাগুলো দেখে রুদ্র বলল, 'এসব কী?'

আকাশ হাত নেড়ে, চোখে মুখে একটা গুরুগম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুলে বললো, 'এসব নিয়ে তোমার ভাবতে হবেনা। তুমি গান গেয়ে যাও। আরেকটা গান ধরো। ট্রেইনের সব মানুষ যেন এই জায়গায় চলে আসে তোমার গান শুনে এমন ভাবে গান গাও।'

এমন সময় অমৃতা উঠে দাঁড়িয়ে একটু উঁচু গলায় বললো, ‘শুনুন সবাই, প্লিজ আপনাদের পয়সাগুলো ফেরত নিয়ে নিন। আমাদের বন্ধু একটু মজা করেছে জাস্ট। পয়সা দিয়ে আমাদের কে ছোট করবেন না প্লিজ।’

আকাশকে দেখে মনে হল তার ইহজীবনের সমস্ত অর্জনের ওপর এই মাত্র কেউ পানি ঢেলে দিয়েছে। সে হাহাকার করে বলে উঠলো, কেন ফেরত নিবে?ভালোবেসে দেয়া উপহার কখনো…।’

কথাটা বলে শেষ করার আগেই আকাশের হঠাৎ চোখ পড়লো উর্মিলার সুন্দর চোখজোড়ার উপর। হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে সে আকাশের দিকে। সেই দৃষ্টি দেখে আকাশ চকিতে সুর পাল্টে বললো, ‘না মানে, ঠিকই তো, আমরা তো মজাই করছিলাম। এসব খুচরা টাকা দিয়ে আমরা কী করবো? নেন ভাই সবাই যার যার টাকা ফেরত নিয়ে নিন।’

আকাশ নিজেই এবার পয়সা সমেত রুমালটা মেঝে থেকে দুহাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর সামনে মেলে ধরলো,

– ‘নিন ভাই সবাই যার যার টাকা বুঝে নিন।

এটুকু বলে সে উর্মিলার দিকে আড়চোখে তাকালো, তারপর উদার হাসি হেসে বললো, ‘নিয়ে নিন, নিয়ে নিন, আরো লাগলে বলবেন, আমি দেবো আপনাদের। টাকা পয়সা কোনো ব্যাপারই না!’

একজন ভদ্রলোক মুখ ঝামটা মেরে বললেন, 'আরো লাগবে কেন? আর লাগলে আপনার থেকেই বা নেবো কেন? আপনি কে?'

অমৃতা এগিয়ে এসে বললো, 'ভাই রাগ কইরেন না,আমার এই বন্ধুটা একটু পাগল কিসিমের। উল্টাপাল্টা কথা বলে।'

রুদ্রর গান শুনে আগুন্তুকরা যতটা প্রফুল্ল হয়ে এখানে পা রেখেছিল আকাশের আচরণে তার চেয়ে বেশি অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ এবং রাগান্বিত হয়ে জায়গাটা ছাড়লো। আকাশ চোখ থেকে অগ্নি কণা বর্ষণ করতে করতে অমৃতাকে চাপা গলায় বললো, 'তুই কি বললি? আমি পাগল কিসিমের? উল্টাপাল্টা কথা বলি?'

অমৃতা বেঞ্চের উপর বসলো, হাই তুলে নির্বিকার গলায় বললো, 'বলিসই তো।'

সবাই যার যার জায়গায় ফেরত গেছে তখন। দুই আইলের মাঝখানের চলাচলের রাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রুদ্রকে তখনও গাতক ভূতটা ছাড়েনি পুরোপুরি। সে নিবিষ্ট মনে গিটারে টুং টাং করে কী একটা সুর ভাঁজছিলো। জগৎ সংসারের সাথে এখন তার কোনো যোগ নেই। সে এখন অন্য ভূবনের বাসিন্দা।

আকাশ অমৃতার মাথায় একটা গাট্টা দিয়ে বললো,

– 'এরকম একটা কাজ তুই করতে পারলি? ওই মাইয়াটা আমার দিকে কী একটা লুক দিতেছিল! সেটিং কইরাই ফেলছিলাম হান্ড্রেড পার্সেন্ট। তুই শালী দিলি সব বরবাদ কইরা।'

সামি আকাশের কথা শুনে লাফ দিয়ে উঠে বললো, ‘মোটেও তোর দিকে তাকায় নাই মেয়েটা। আমার দিকে তাকায় ছিল সারাক্ষণ।’

আকাশ পারলে সামিকে গিলে খায়। দাঁত কিড়মিড় করে বলে, ‘ফালতু প্যাঁচাল পারার জায়গা পাওনা না?’

অমৃতা বললো,’মেয়েটা মোটেও তোদের দিকে তাকায় ছিলো না। আমার দিকে তাকায় ছিল। আমি যতবার ওর দিকে তাকাইছি, ততবার আবিষ্কার করছি সে মুগ্ধ হয়ে আমারেই দেখতেছে।’

ঠিক সেই সময় রুদ্র ওর গিটার ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। তার মুখ হাসি হাসি। বিড়াল দুটি চোখে ফূর্তির জোয়ার। রুদ্রর উঠে আসা দেখে সবাই তার দিকে প্রশ্ন বিদ্ধ চোখে তাকালো।

রুদ্র ওর কপালে পড়ে থাকা চুল গুলো হাত দিয়ে সরিয়ে নিলো প্রথমে, তারপর হাঁটু গেড়ে বন্ধুদের সামনে বসে গদগদ গলায় বললো,

‘দোস্ত, কাহিনী হইয়া গেছে। উর্মিলা মনে হয় আমার উপর ক্রাশ খাইছে। সেই তখন থেকে দেখতেছি আমার দিকেই তাকায় আছে এক দৃষ্টিতে।’

কথাটা শুনে বন্ধুরা সব ব্যাক্কল বনে গিয়ে একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো।

‘আল্লাহ! আমারে বাঁচাও, একটা মানুষ এক সাথে এত জনের দিকে ক্যামনে তাকায়? জ্বীন পরী নাকি?’ আর্তনাদ করে উঠল হৃদি।

হক সাহেব বাড়ি ফিরলেন ভারী অস্থির এক খানা মন নিয়ে। আজ বিকালের পর থেকে তার ছেলের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার যে ফ্ল্যাটে তার ছেলে থাকে সেই ফ্ল্যাটের গলির মুখেই দুইজন গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছেন তিনি গত দু দিন ধরে। সামিকে আজ তারা সারা দিন বাড়ি থেকে বেরোতে দেখেনি। সন্ধ্যের দিকে তার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল, শুধুমাত্র এ পর্যন্ত খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই বন্ধুদের কাউকেই আর জায়গাটা ছাড়তে দেখা যায়নি। রাত এগারোটার পরেও যখন কেউ বেরোল না বাসা থেকে তখন এপার্টমেন্টের রিসিপশনে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে ফ্ল্যাটে কেউ নেই। দরজায় তালা দেয়া।

হক এই খবর শুনে রীতিমত হকচকিয়ে গেছেন। বিমান বন্দরে তার ছেলে এবং ছেলের বন্ধুদের টিকিটাও দেখা যায়নি। বাসা থেকে বেরোতেও দেখেনি কেউ। তাহলে এই পাঁচ মূর্তি গেলো কোথায়?

তিনি বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর খোঁজ করলেন। রোমেলা তখন মহা ব্যস্ত। একগাদা শাড়ি কাপড় নিয়ে একজন ফ্যাশন ডিজাইনার এসেছেন তার কাছে। এই ফ্যাশন ডিজাইনার নিজেই ড্রেস ডিজাইন করেন এবং সেই ড্রেস চড়া দামে বিক্রি করেন অনলাইনে। এর মাঝেই তার ফ্যাশন হাউজের বেশ নাম ডাক হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে তার এপয়েন্টমেন্ট মিলেছে আজ। রোমেলা দামি কাস্টমার বলেই সময় দেয়া হচ্ছে তাকে। নইলে এই ডিজাইনার এর নাগাল পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাই এমন গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর মাঝখানে স্বামীর ডাকটা পেয়ে বেশ বিরক্ত হলেন তিনি। বিরক্তি নিয়েই উপরে নিজের শোবার ঘরে উঠে আসলেন। হক বললেন,

– 'তোমার ছেলের সাথে কথা হয়েছে?'

– 'হ্যাঁ হয়েছে তো।'

– 'কখন?'

– 'বিকেলে।'

– 'কী বলেছে?'

– 'বিশেষ কিছুই বলেনি। বললো সব ঠিক থাকে আছে।'

হক স্ত্রীর দিকে থমথমে মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ইন্ডিয়া যাবার ব্যাপারে কিছু বলেনি?'

– 'বললো তো ওই যাওয়া ক্যানসেল হয়েছে। প্লেনের টিকেটও ক্যানসেল করে দিয়েছে।

এটুকু বলে রোমেলা চিন্তিত মুখে আবার বললেন, 'কেন? কিছু হয়েছে নাকি?'

হক একটা হতাশার শ্বাস ফেললেন। রোমেলাকে কিছু বলে লাভ নেই। সে সমস্যার কোন সমাধান তো করতে পারবেই না উল্টো চেঁচামেচি করে ঝামেলা বাড়াবে। স্ত্রীর সাথে তিনি জীবনের সুখ, দুঃখ এবং চিন্তা গুলো ভাগ করে নিতে পারেন না কখনওই। তাদের দুজনের মানসিকতায় বিস্তর ফারাক আছে। তিনি ছোট করে বললেন, 'কিছু হয়নি। যাও যা করছিলে তাই কর।'

মুক্তি পেয়ে রোমেলা ছুটে গেলেন ড্রয়িংরুমে অপেক্ষারত ডিজাইনারের কাছে। এদিকে তিনজন দর্শনপ্রার্থী হক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিল স্টাডিরুমে। তিনি ডিনারের টেবিলে যাবার আগে দর্শনপ্রার্থীদের সাথে দেখা করলেন। জরুরি আলাপ সারলেন। পাঁচ ছয়টা গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন করলেন। কিন্তু মাথার ভেতরের এলোমেলো ভাবটা কিছুতেই কাটছিলোনা। ছেলেটা বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে তার বুকের ভেতর একটা স্থায়ী বিষণ্ণতা বসত গড়েছে। বাড়ি ফিরলেই তিনি বিষণ্ণতাটা খুব করে টের পান। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও তার একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে সামি কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায়। কয়েকটা দিন গেলে, অভাবের মুখ দেখলেই সুরসুর করে গোয়ালের গরু গোয়ালে ফিরে আসবে। কিন্তু নিজের পুত্রকে তিনি একটু বেশি অবমূল্যায়ন করে ফেলেছিলেন। সামি অতটা দুর্বল নয়। সে ফেরেনি। আদৌ ফিরবে কিনা কখনো সে বিষয়ে আজকাল তার মনের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে।

খাবার টেবিলে তিনি রোমেলার সাথে খুব একটা কথা বললেন না। রোমেলাও ঘাঁটালেন না। তিনি জানেন তার স্বামী কাজের মানুষ। কাজকে কেন্দ্র করে করেই বেঁচে থাকা এই লোকের। সারা বছর দু তিনবার বিদেশে যেতে হয়, দেশের ভেতর এ শহর থেকে ও শহরে উড়ে বেড়াতে হয়, ব্যবসার কাজে, বিভিন্ন সভা সমিতির কাজে। ইনি সমাজের একজন গুরুতর মানুষ, ভারিক্কি মানুষ। ইনার মাথার ভেতরে সর্বদা গুরুতর বিষয় ঘুরপাক খায়। রোমেলা এসব খটোমটো বিষয়ের আগামাথা কিছুই বোঝেন না। বুঝতেও চান না। তার দুনিয়াটা পয়সা ওড়ানোর রঙিন নেশায় মত্ত। সপ্তাহে দুবার বসুন্ধরা গিয়ে ছেলেকে দেখে আসেন। সাথে করে কিনে নিয়ে যান একগাদা খাবার দাবার। ছেলের বিরোধটা মূলত বাবার সাথে। তার সাথে তো না! তিনি তাই এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে চান না। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যাবার পর হক সাহেব ছাদে উঠে আসলেন। গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়ানো ছিল তার। সন্ধ্যের পর থেকে শীত পড়ছে। হাওয়া ঠান্ডা। তিনি নীরবে হেঁটে এসে সুইমিং পুলের পাশের চেয়ারে বসলেন। তার পুত্র ছিল এই ছাদটার একচ্ছত্র অধিপতি। ছেলের জন্যেই কোটি টাকা খরচ করে ছাদের ওপর সুইমিং পুল করলেন,

ঘাস লাগালেন। এমন কি একমাত্র ছেলের আবদার রাখতে গিয়ে একটা জিম এবং মিউজিক প্যাডও তৈরী করতে হল তাকে এ বাড়িতে। সেই ছেলে এখন মাসের পর মাস পিতার খবর নেয় না। মানুষকে বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায় পিতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ফোন করলে ছেলে ফোন ধরেনা। স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছে তার পিতা যেদিন সমস্ত দোষ স্বীকার করে নেবে শুধুমাত্র সেদিনই সে বাড়ি ফিরবে। অতএব ছেলেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাকে এখন নতজানু হতে হবে, বিসর্জন দিতে হবে নিজের মূল্য বোধ, ব্যক্তিত্ব এবং আত্মমর্যাদা। ছেলের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাকে মাথায় তুলে নাচতে হবে। নিজ পুত্রের প্রতি একটা পুঞ্জীভূত অভিমান, রাগ এবং হতাশা বোধ তার বুকটাকে ক্রমশ ভারী করে তুলল।

তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে অমৃতার নম্বরে ডায়াল করলেন। তার মনে হচ্ছে এই মেয়েটিই আসলে নাটের গুরু। মেয়েটিকে একটি উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে। বড় রকমের শিক্ষা।

১৩

আকাশ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বললো, ‘দ্যাখ রুদ্র, তোর তো মনীষা আছে, সামি, তোর আছে বিভা আর অমৃতা তুই তো মেয়ে, তোর আগে থেকেই কোনো চান্স নাই। প্লিজ হাত জোড় করে বলতেছি আমার উর্মিলার তোরা ছাইড়া দে।’

সামি বললো, ‘এমনে হবেনা। আগে এইটা ফিগার আউট করতে হবে যে উর্মিলা কাকে চায়।’

হৃদি সামির দিকে বড় চোখ নিয়ে তাকিয়ে বললো, ‘তাই না? বলবো নাকি বিভাকে ফোন করে এখন ঘটনাটা?’

সামি মহা বিরক্ত হল, 'আজিব কারবার। বলার সময় তো এখনও আসেনাই, আগে বুঝে নেই উর্মিলার ক্রাশ কে। যদি শিওর হইতে পারি যে আমিই ওর ক্রাশ তাহলে তো বিভারে আমিই বলবো। একটা মেয়ে আমার উপর ক্রাশ খাইছে এটা তো আমার গর্ব! তোর বলা লাগবেনা।'

একটু উঁচু স্বরেই বলে ফেলেছিল সামি কথাগুলো। উর্মিলা এবং তার মায়ের কানে বোধহয় কিছু একটা গেল। তারা দুজনে চকিতে গলা বাড়িয়ে দেখল একবার দলটাকে। উর্মিলার মায়ের চোখ দুটি দেখে মনে হচ্ছে যেন এক্ষুণি কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে। সেই আগুন গরম চাউনির সামনে বন্ধুরা সব কাঁচুমাচু হয়ে গেল। সবাই ভয়ে চুপ। উর্মিলার মায়ের চোখ রগড়ানিতে ভস্মিত হয়ে যাচ্ছে সবাই। রুদ্র পরিস্থিতি হালকা করার নিমিত্তে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে থাকা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের সিটে ফেরত গেলো। তারপর ঠোঁটে একটি অত্যন্ত নিষ্পাপ হাসি ফুটিয়ে টেনে টেনে বললো, 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আন্টি, ভালো আছেন?'

আন্টির নাকের পাটা ফুলে গেল। মোটাসোটা গাল দুটো রাগে হয়ে উঠলো টসটসে। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ঝামড়ে বলে উঠলেন, 'ঐদিকে কী দেখছিস একটু পর পর? হ্যাঁ? ঘুমা, চোখ বন্ধ করে ঘুমা বলছি!'

উর্মিলা মায়ের ধমক খেয়ে সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ফেললো। যে করেই হোক তাকে এখন ঘুমাতেই হবে। উর্মিলার মা এবার বখাটে দলটার দিকে পূর্ণ চোখ মেলে তাকালেন। কিছু বলার আগেই রুদ্র আর আকাশ হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'জি আন্টি আমরাও ঘুমাচ্ছি। এক্ষুণি ঘুমাচ্ছি। আর কেউ কোনো কথা বলবেনা। প্রমিজ।'

আকাশ আর রুদ্র সত্যিই চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর ভান করলো। হৃদি বিড়বিড় করে বলে উঠলো, ‘শালা, কী পাগলের পাল্লায় পড়লাম!’ উর্মিলার মা এ যাত্রায় রাগ হজম করে গেলেন। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে দ্বিতীয়বার একটু এদিকসেদিক হলে তিনি আর ছেড়ে দেবেন না।

অমৃতার সেলফোন বেজে উঠলো ঠিক সেই সময়। নম্বরটা দেখে চিনতে পারলো সে। ধরতেই ওপাশ থেকে এক ভরাট পুরুষালি কণ্ঠ বলে উঠলো, ‘হ্যালো। তোমরা কোথায়?’

– ‘আপনাকে বলতে হবে কেন?’

– ‘আমার ছেলে কোথায়?’ টেইনের ঝিক ঝিক শব্দের তোড়ে কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। ভেঙে ভেঙে আসছে। সামি একটু কৌতূহলের চোখে তাকিয়ে ছিল অমৃতার দিকে। বাকি বন্ধুরাও। অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে দুলতে দুলতে হেঁটে দূরে সরে আসলো বন্ধুদের কাছ থেকে। সামির সামনে সে হকের সাথে কোনো ধরণের বাক বিতণ্ডায় যেতে চায়না। হাজার হোক লোকটা সামির বাবা। কয়েক পা হেঁটে টয়লেটের সামনের প্যাসেজটায় এসে দাঁড়ালো সে। তারপর ঠান্ডা ভাবে বললো, ‘আপনি জানেন না আপনার ছেলে কোথায়?’

– ‘জানিনা বলেই তো প্রশ্নটা করছি।’

অমৃতার ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো, ‘সেকী? আপনার অজানা কিছু আবার আছে নাকি এ পৃথিবীতে? কী করে সম্ভব?’

এ পর্যায়ে হক আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। অনেক ক্ষণ ধরে মনের ওপর জমে থাকা রাগ, ক্রোধ এবং দুশ্চিন্তা এবার ফেটে পড়ল যেন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে। এক বিকট চিৎকার তীরের বেগে ছুটে এসে বিদ্ধ হল অমৃতার কর্ণকুহরে।

– ‘চুপ কর! বেয়াদব মেয়ে! সাহস তো কম না তোমার। সেই তখন থেকে আমার মুখে মুখে কথা বলে যাচ্ছো! বল আমার ছেলে কোথায়?’

অমৃতা আকস্মিক এই চিৎকারে চমকে উঠলো। মুহূর্তের জন্য তার মুখটা একটু রক্তশূন্য দেখালো।

– ‘আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? আপনি জানেন? আমার নিজের বাবাও কখনো আমার সাথে এভাবে কথা বলেনি!’

– ‘এ কারণেই তো এমন উচ্ছন্নে গেছো তুমি। যাই হোক, তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই। আমার ছেলের খবর বল। সে কোথায়? সে কি তোমার সাথে আছে?’

– ‘আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছি।’

– ‘কাজটা তুমি ঠিক করলেনা। পস্তাতে হবে তোমাকে।’

– ‘ফালতু কথা বলেন কেন সবসময় আপনি? দেখলেন তো আমার সাথে এসব বলে কোনো লাভ হয় না। আপনার নাকের ডগার ওপর দিয়ে আপনার ছেলেকে নিয়ে দেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। কোথায় গেল আপনার ক্ষমতা? কিচ্ছু তো করতে পারলেন না!’

হক একটু সময় নীরবতা পালন করলেন, তারপর বরফ শীতল গলায় বললেন, ‘আমার ছেলে কোথায় আছে, কী করছে, তার প্রতিটা পদক্ষেপের খবর চাই আমার। তুমি প্রতিটা নিউজ পই পই করে দেবে আমাকে।’

অমৃতা শেষের হাসি হাসে, ‘যদি না দেই?’

– ‘এক্ষুণি আমি তোমার বাবার কাছে ফোন করছি। ফোন করে বলছি তোমার দুঃসাহসের কাহিনী। তুমি যে আমার ছেলেকে এক রকম কিডন্যাপ করে ইন্ডিয়া নিয়ে যাচ্ছো এই খবর কি তোমার বাবা মায়ের জানা আছে?’

অমৃতা একটু থমকে গেলো। সাবধানী গলায় বললো, ‘তারা জানে।’

– ‘তাই বুঝি? ঠিক আছে তাহলে তো তোমার কর্মফল তাদেরই ভোগ করা উচিত। আমি তোমার বাবা মায়ের একটা ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও।’

– ‘আচ্ছা, আপনি কি একটা মুহূর্তের জন্যেও সামিকে চোখের আড়াল করতে পারেন না? দেশে তো সারাক্ষণ ওর পিছনে স্পাই লাগায় রাখেন, মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে ছেলেটা দেশের বাইরে যাচ্ছে। এখনো আপনি ওকে আপনার নজরবন্দি করে রাখতে চাইছেন? সমস্যা কী আপনার?’

‘আমি শুধু আমার ছেলের খবর জানতে চাই। দেয়ার ইজ নাথিং মোর লেফট টু সে।’

অমৃতা একটা হতাশ নিশ্বাস ফেললো, ‘উফ আল্লাহ! আপনার ছেলে ভালো আছে। বন্ধুদের সাথে থাকলে সে ভালো থাকে।’

– ‘ওই হিন্দু মেয়েটার বাড়িতে যাচ্ছো তোমরা?’

অমৃতা বিরক্তি নিয়ে উত্তর দেয়, ‘হ্যাঁ।’

– ‘আমার ছেলে যদি কোনো অঘটন ঘটায় তাহলে জেনে রেখো, তোমাকে আমি ছাড়বোনা।’

– ‘আমাকে অত ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমি ভয় পাইনা।’

– ‘ফোন করলে ফোন ধরবে, না ধরলে সাথে সাথে তোমার বাবার নম্বরে ডায়াল করবো। তুমি নিশ্চয়ই চাওনা তোমার করা কোন ভুলের কারণে তোমার বাবা মায়ের সমস্যা হোক।’

– ‘ফালতু।’ অমৃতা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলে।

– ‘কী?’ হক বজ্রের ন্যায় গর্জে ওঠেন।

– ‘শুনতে পান না? বয়রা নাকি আপনি? বার্ধক্যজনিত সমস্যা?’ হক হতভম্ব হয়ে বললেন, ‘তুমি আমাকে ফালতু বললে?’

– ‘ঠিক শুনেছেন।’

হক কয়েকটা মুহূর্ত কোনো কথা বলতে পারলেন না। তার মনে হল তিনি আরেকটু হলেই উত্তেজনার বশে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলবেন।

– ‘তুমি কি আমাকে চেনো মেয়ে? তুমি কি জানো যে আমি চাইলেই তোমার অনেক বড় ক্ষতি করে দিতে পারি? আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন আইডিয়া আছে তোমার?’

– ‘আমার কী ক্ষতি করবেন আপনি? মেরে ফেলবেন? নাকি গুম করবেন?’

– ‘ইউ নেভার নো! যে কোনো বিপদ হতে পারে।’

অমৃতা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, ‘শুনুন মিস্টার হক, আমার মনে হয় আমাকে ভয় দেখানো ছাড়াও আপনার আরো অনেক কাজ আছে। দেশের মন্ত্রী উজিরদের সাথে আপনার উঠাবসা। সংসদে যেতে হয়। বড় বড় কথা বলতে হয়। দল নেত্রীর পা ধরতে হয়। আপনি বরং আমার পেছনে সময় নষ্ট না করে ঐসব গুরুত্ব পূর্ণ কাজ গুলো করুন দয়া করে। ফোন ছাড়ছি।’

সন্ধ্যের পর থেকে বিভা তার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছেনা। কেউ অনলাইনে নেই। মোবাইলেও ট্রাই করেছে অনেকবার। কিন্তু সবাই লাপাত্তা। দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে হৃদির আম্মাকে ফোন করল। তিনি বললেন সবাই খুব ভালো আছে। যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। বিভা যেন এই দুদিন ওদের কাউকে বিরক্ত না করে। ওরা কেউ ফোনে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই। শুনে বিভা ভীষণ অবাক হয়েছে। কী এমন রাজকার্য এসে গেলো হঠাৎ যে বিভার সাথে দু মিনিট কথা বলার কেউ সময় পাচ্ছেনা? যে সামি প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় তাকে মেসেজ না করে, তার গলার আওয়াজ না শুনে থাকতে পারেনা, সেই সামি কিনা টানা চার পাঁচ ঘন্টা সময় যাবত উধাও!

বেশ তো, ওরা যদি বিভাকে ভুলে থাকতে চায় তো থাকুক। বিভাও আর বিরক্ত করবেনা ওদের। প্রগাঢ় এক অভিমানে ভেতরটা টলমল করে ওঠে বিভার। বন্ধুদের এই আকস্মিক অদ্ভুত আচরণের পেছনে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা খুঁজে পায়না সে।

– 'আপনি ঘুমোবেন না?' বিভা জানালার ধার ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিজিতের প্রশ্নটায় ঘোর ভাঙলো তার। ঘুরে তাকালো পেছনে। অভিজিৎ একটু উদ্বেগ নিয়ে বললো,

–' কী হয়েছে আপনার? মুখটা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?'

বিভা তার ডাগর দুখানা চোখ স্থির ভাবে অভিজিতের মুখের ওপর রেখে বলল, 'আজকে না ঘুমোলে কেমন হয়?'

অভিজিৎ কথাটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারলোনা। ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, 'মানে? কী বলছেন আপনি?'

বিভা জানালার ধার থেকে সরে আসলো। কোমর অবধি ঝুলে থাকা গোছা ভর্তি কালো চুলগুলি পেঁচিয়ে খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বললো,

– 'না বোঝার কী আছে? চলেই তো যাচ্ছি দুদিন পর। এ কটা দিন নাহয় আপনার সাথে একটু সময় কাটাই। কী বলেন অভিজিৎ বাবু?'

অভিজিৎ চট করে কিছু বললো না। সে জানে মেয়েটি দস্যিপনায় এক নম্বর। এই কথাটিও নিশ্চয়ই সে তামাশা করেই বলছে। খানিক বাদেই মুখ বাঁকিয়ে বলে উঠবে, আপনার মতো ভোদাইয়ের সাথে বেশিক্ষণ কথা বলা যায়না।

অভিজিৎ সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করলো, 'হঠাৎ আমার সাথে সময় কাটাতে চাইছেন কেন?'

– ‘ওমা, বললামই তো, চলে যাবো তাই যাবার আগে আপনার সাথে একটু সুখ দুঃখের আলাপ করে যেতে চাইছি।’

– ‘তা, আমার সাথে সুখ দুঃখের আলাপ করে রাত কাটালে, আপনার বয়ফ্রেন্ডের কী হবে?’

বন্ধুরা যে সব লাপাত্তা সেই খবরটা বিভা ইচ্ছে করেই চেপে গেলো। একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো,

– ‘ওর কাছে তো যাচ্ছিই চিরদিনের জন্য। একটা রাত কথা না বললে কিছু হবেনা।
’

অভিজিতের চোখ থেকে বিস্ময় রেখাটি সরেনি তখনও। তার ভেতরে একটা বড় সর প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠতে চাইছিলো। সে প্রাণপণে চিৎকার করে বলে উঠতে চাইছিল, আপনি চাইলেই তো হবেনা। আমারও আপনার সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছে থাকতে হবে। নিজেকে কী ভাবেন আপনি? আপনি যা চাইবেন তাই হবে? অন্যের মন নিয়ে খেলা করার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?

কিন্তু অভিজিৎ এসব কিছুই বলতে পারলোনা। বরং অবাক হয়ে আবিষ্কার করলো যে, তার ভেতরে প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গটা ঠিক মতো জ্বলে ওঠার আগেই কেমন নিভু নিভু হয়ে আসছে।

বিভা শাড়ির ওপর চাদর জড়িয়ে নিয়ে বললো, ‘চলুন, বাইরে থেকে হেঁটে আসি!’

অভিজিৎ নড়লোনা। দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে। বিভা আলমারির দরজা খুলে হ্যাঙ্গারে ঝুলে থাকা অভিজিতের চারটা জ্যাকেটের মধ্যে থেকে কালো রঙের জ্যাকেটটি বের করে নিলো। অভিজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'নিন, পরে নিন। খুব ঠান্ডা।'

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা ক্ষয়া চাঁদ জেগে আছে ঠিকই কিন্তু মেঘের দাপটে তার উপস্থিতি বড় ম্লান। বাসা থেকে বেরিয়ে উঠোনের ওপর একলা দাঁড়িয়ে ছিল বিভা। বাতাসে তখন বৃষ্টির ঘ্রাণ। শাল, জাম আর শিমুল গাছের বনে কুয়াশা ঝুলে আছে মাকড়সার জালের মতো। রাতচরা পাখিরা ডাকছিল থেকে থেকে। আর হাওয়ায় ভেসে ভেসে উড়ে আসছিল তিরতির করে বয়ে যাওয়া জলঢাকা নদীর ঝিরঝির করা স্রোতের শব্দ।

অভিজিৎ দরজায় তালা দেয়ায় ব্যস্ত। এদিকটায় বেশ ডাকাতের উৎপাত আছে। বছর দেড়েক আগে, একবার এই বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, গভীর রাতে। তখন অভিজিতের পরিবর্তে অন্য এক সরকারি অফিসার থাকতেন এখানে। ডাকাত দল টিভি থেকে শুরু করে কয়েক হাজার নগদ টাকা এবং অফিসারের স্ত্রীর দশ ভরি স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। সে ঘটনার পর থেকে এই এলাকার সিকিউরিটি কড়া হয়েছে, তবে একেবারে শঙ্কা মুক্ত হয়নি এখনো। এছাড়া গ্রামে ছিঁচকে চোরেরও অভাব নেই। শহর থেকে মানুষ এসেছে শুনলেই গ্রামের চোরদের ভেতরে এক ধরণের ছোঁকছোঁকানি শুরু হয়। তারা ওঁৎ পেতে থাকে কখন সাহেব কর্তা রা একটু অসাবধান হবেন এবং তারা সেই অসাবধানতার সদ্ব্যবহার করবে। অতএব অসাবধান হওয়া যাবেনা। অভিজিৎ খুব সতর্কতার সাথে দরজায় তালা দিল।

– 'এতক্ষণ লাগে আপনার? বাড়িতে তো দূর্গা আছে।' বিভা ক্যাট ক্যাট করে বলল কথাগুলো।

– ‘দূর্গা ঘুমোচ্ছে। চোর ডাকাত আসলে টের পাবেনা।’

উঠোনের পরেই লাল মাটির ধূলো ধূসরিত পথ। উঁচুনিচু পাহাড়ি পথটি অসংখ্য পাথর কুঁচিতে ভরপুর। দুধারে জঙ্গল। চারিদিকে এক রাত্রিকালীন গা ছমছমে গুরুগম্ভীর আমেজ। জঙ্গলের একটু কাছে আসতে বোঝা গেল এর ভেতরকার বাসিন্দারা কেউ কেউ এখনো ঘুমোয়নি। জন্তুর পায়ের শব্দ, পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ, শুকনো পাতার খস খস আর কত রকমের যে ফিসফাস! অভিজিৎ একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিল। বিভা ঘাড় ঘুরিয়ে বললো,

– ‘এমন পিঁপড়ার মত হাঁটছেন কেন?’

বিভা দাঁড়িয়ে পড়ায় দূরত্বটা অতিক্রম করতে অভিজিতের মিনিট লাগলোনা। পাশে এসে থেমে বললো, ‘এই অন্ধকারে আপনার ভয় লাগছেনা?’

– ‘নাহ, ভয় লাগবে কেন? আমি ভীতু নাকি?’

– ‘এখন যদি আমি আপনাকে ফেলে রেখে চলে যাই। চিনে চিনে বাড়ি ফিরতে পারবেন?

বিভা একটু দমল কথাটা শুনে। অন্ধকারে অভিজিতের অস্পষ্ট মুখখানা ভালো মতো একবার দেখে নিয়ে বললো, ‘চলে যাবেন কেন?’

– ‘যাব বলিনি, বলেছি যদি যাই তবে আপনি কি ফিরতে পারবেন বাড়ি?’ – ‘পারব।

– ‘বেশ তো, দেখা যাবে। চলুন সামনে চলুন।’

– ‘চলুন।’ বললো বিভা, কিন্তু তার বুকের ভেতর একটু কেমন খচখচ করতে লাগলো। সত্যিই কি লোকটা তাকে এই অন্ধকারে ফেলে রেখে চলে যাবে নাকি? পথ চিনে চিনে বাড়ি সে ঠিকই ফিরতে পারবে। কিন্তু একদম একলা একলা এই জঙ্গলের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার কথা চিন্তা করেই তার বুক ধড়ফড় করছে। যদি কোন হিংস্র জানোয়ার এসে তাকে আক্রমণ করে? যে জন্তুগুলোর পায়ের আওয়াজ আর ফোঁস ফোঁস তেজি নিশ্বাস রোজ রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পায়, আজ যদি সেই হিংস্র হায়েনারা তাকে বনের মধ্যে একলা পেয়ে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে কামড়াতে আসে, বিভা তখন কী করবে?

ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছাকাছি চলে এসেছিল। কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে নদীর ওপরের ব্রীজ। বাতাসে আঁশটে গন্ধ। পাথরের ওপর দিয়ে কুলকুল করে বইছে পানি। এই নদীটি মূলত তিনটি নদীর মিলনস্থান। এখানেই তৈরী হয়েছে বিন্দু ব্যারেজ বা বাঁধ। ঝালং এর জলঢাকা হাইডেল প্রজেক্টে পানি সরবরাহ করাই এই বাঁধ সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য। নদীর গা থেকে খাড়া হয়ে উঠে গেছে ভুটান পাহাড়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয় হিমালয়ের বরফ শৃঙ্গ।

একটা পাথরের ওপর বসলো বিভা। অভিজিৎ ওর পাশে এসে দাঁড়াল নিঃশব্দে।

স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা পায়ে ধাক্কা খাচ্ছে নদীর স্রোত। ঠাণ্ডা জল শিরশিরে এক অনুভূতির সৃষ্টি করছে। মাথার ওপরের মেঘাচ্ছন্ন অন্তরীক্ষ, জলজ বাতাস, নদীর স্রোতের কুলকুল ধ্বনি, তক্ষকের ডাক, শিশিরের টুপটাপ, এই সমস্ত কিছুই বিভার মনকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল দূর থেকে দূরান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে! একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভূত হচ্ছিল তার বুকের ভেতর। একটা সীমাহীন একাকিত্ব! এই একাকিত্বের কোনো ব্যাখ্যা তার কাছে আপাতত নেই। ভেতরটা এমন ফাঁকা ফাঁকা

কেন লাগছে? কয়েক ঘন্টা টানা সামির সাথে কথা হয়নি। এজন্যে কি? সামি কি জানেনা তার সাথে কথা না বললে, তার গলার আওয়াজ শুনতে না পেলে বিভার কী রকম মরে যাবার মতো অবস্থা হয়? সব জেনে বুঝেও সে কেন ইচ্ছাকৃত ভাবে এই দূরত্ব রচনা করছে? শুধু সামি নয়, অন্য বন্ধুরাই বা হঠাৎ সব একসাথে উধাও হয়ে গেলো কেন? এর কারণ কী হতে পারে?

অভিজিৎ বিভাকেই দেখছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। বিভার মনটা যে বিভার মধ্যে নেই এ মুহূর্তে, বিষয়টা বুঝতে খুব একটা সময় লাগলোনা তার। সে বিভার পাশাপাশি আরেকটি পাথরের ওপর বসলো।

– 'কী ভাবছেন?' চমকে তাকালো বিভা। সামলে নিয়ে বলল,

– 'তেমন কিছুনা।'

একটু থেমে কিছু একটা ভাবল সে। তারপর কিয়ৎ আড়ষ্ট গলায় বলল 'অভিজিৎ বাবু, আপনার কাছে সিগারেট হবে?'

অভিজিৎ থমকালো, সরু চোখে চেয়ে বললো, 'স্মোক করেন নাকি আপনি?'

– 'সব সময় না,অকেশনালি।'

– 'আজ হঠাৎ এমন কী অকেশন পড়ে গেলো জানতে পারি কি?'

– 'নির্জন রাত, তার ওপর শীত পড়েছে জব্বর। এখন একটু বিড়ি টিরি না টানলে কি হয়?'

অভিজিৎ কিছু বললো না। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বিভা বললো, ‘চুপ হয়ে গেলেন যে? আমি মেয়েটা কতটা খারাপ সেটাই ভাবছেন তো? আমি খারাপ হই, ভালো হই, আপনার কী এসে যায় বলুন? আমি তো আপনার সত্যিকারের বৌ নই। আপনি বড়ই ভাগ্যবান যে একটা খারাপ মেয়ের হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছেন।’

অভিজিৎ ধীরে ধীরে বললো, ‘আমি সিগারেট খাইনা।’

– ‘কিন্তু আপনার জ্যাকেটের পকেটে একটা সিগারেটের বাক্স আছে। আমি দেখেছি

– ‘কী করে দেখলেন?’

– ‘জ্যাকেটটা আলমারি থেকে নামাবার সময়ই হাতে লেগেছিল কিছু একটা। পরে বুঝেছি ওটা সিগারেটেরই বাক্স। সাথে ম্যাচের বাক্সও আছে। আপনি স্মোক না করে থাকলে ওগুলো আপনার কাছে কী করছে?’

– ‘এক কলিগ উপহার দিয়েছিল। বিদেশী সিগারেট। কখনো খেতে ইচ্ছে হলে খাবো ভেবে রেখে দিয়েছিলাম।’

– ‘বেশ তো, আর ফেলে রেখে লাভ কী? দিয়ে দিন আমাকে। অত ভাবতে হবেনা

অভিজিৎ জ্যাকেটের পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করলো। বিভার হাতে তুলে দিয়ে বললো, ‘আপনার আজকে কিছু একটা হয়েছে।’

– ‘কিছুই হয়নি।

অভিজিৎ ম্যাচের বাক্সে কাঠি ঘষে আগুন ধারালো। কমলা আলোয় চারপাশটা হঠাৎ রহস্যময় ভাবে ঝলক দিয়ে উঠলো। সেই আলোয় বিভার মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্য। তার দুটি ভ্রুর মাঝখানে লাল টিপ, কপাল ভর্তি সিঁদুর। ডাগর

চোখজোড়ায় কাজল রেখা টানা। অভিজিতের মাথায় এই প্রথমবারের মতো প্রশ্নটা এসে বাড়ি খেলো। বিভা কেন রোজ রোজ অমন যত্ন করে সিঁদুর দেয়? ওটা যে কেবল মাত্র প্রসাধনই নয়, বরং এক বৈধ, দাম্পত্য বন্ধনের স্বীকৃতির চিহ্ন এবং পরিচায়ক এ ব্যাপারটা কি ওর জানা আছে?

বিভা সিগারেটে আগুন ধারালো। একটা বড়সড় টান দিয়ে হালকা ভাবে বললো, 'আমার বন্ধুদের মধ্যে চেইন স্মোকার হচ্ছে সামি আর অমৃতা। অন্য কারো ওরকম নেশা নেই।'

অভিজিৎ ছোট করে বললো, 'বেশ।

– 'তারপর অভিজিৎ বাবু? হাও ইজ লাইফ? বনবাস কেমন লাগছে?'

প্রশ্নটা শুনে অভিজিৎ নিজের অজান্তেই একটু হাসলো। হাও ইজ লাইফ কিংবা কেমন আছেন এই প্রশ্নটার মতো অমূলক প্রশ্ন পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রশ্নকর্তা খুব ভালো ভাবে জানে যে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবেনা,অন্যদিকে উত্তরদাতাও জানে সঠিক উত্তর তার নিজেরই জানা নেই তবুও মানুষ এই অহেতুক প্রশ্নটাকে নিজের সার্বক্ষণিক সঙ্গী বানিয়েছে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে মিথ্যে প্রশ্ন মিথ্যে উত্তরের আশায়।

তবে আজকের এই প্রশ্নটি বাস্তবিকই একটু অন্যরকম গুরুত্ব বহন করল অভিজিতের কাছে। কারণ বিভা, এর আগে কোনো দিন জানতে চায়নি যে অভিজিৎ কেমন আছে!

– ‘মন্দ লাগেনা। প্রথম প্রথম অবশ্য খুব খারাপ লাগতো। কিন্তু ধীরে ধীরে, সময়ের সাথে সাথে, আমিও সত্যচরণের মতো প্রকৃতির জারক রসে জীর্ণ হয়েছি। হয়েছি প্রকৃতির ভক্ত সেবক ও উপাসক।’

অভিজিতের ভাব গাম্ভীর্য পূর্ণ কথা শুনে বিভা ওর স্বভাবসুলভ খিক খিক হাসিটা হেসে ফেললো। হাসতে হাসতেই বললো, ‘সত্যচরণটা আবার কে?’

ঠেসমারা হাসিটা অভিজিতের বুকে একটু হালকা জ্বালার উদ্রেক করলো, সে চোখা ভাবে বললো –’হাসছেন কেন? এখানে হাসির কী হল? সত্যচরণকে চেনেন না আপনি? বিভূতি বাবুর আরণ্যক পড়েন নি? আপনাকে দেখেই অবশ্য বোঝা যায়, যে আপনি একেবারেই বই পড়ুয়া মেয়ে নন।’

বিভা একটু থতমত খেয়ে বললো, ‘আরণ্যক পড়েছিলাম ছোট বেলায়। অত মনে নেই আমার।’

– ‘তাই বলুন।’

বিভা চুপ করে আড়চোখে অভিজিৎকে দেখে নিলো একবার। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কিছু একটা ভাবলো গভীর ভাবে। তারপর বললো,

– ‘আমাকে আপনার বই পড়া মেয়ে মনে হয়না, তা বুঝলাম। কিন্তু ঠিক কী রকম মেয়ে বলে মনে হয় তা একটু বলবেন?’

অভিজিৎ উত্তরটা দেবার আগে খুব বেশি সময় নিল না। অকপটে বললো, ‘আপনি উড়নচণ্ডী। অস্থির, অপরিপক্ক, এবং অগভীর।

– ‘অগভীর?’

– ‘আমার তো সেরকমই মনে হয়।’

হিম জড়ানো ঠান্ডা এক হাওয়ার ঝাপটায় বিভার সিগারেটের আগুন গেল নিভে। সে হাত বাড়িয়ে বললো, ‘ম্যাচের বাক্সটা দিন।’

অভিজিৎ ম্যাচের বাক্স এগিয়ে দিল। দেবার সময় আঙুলে আঙুল লেগে গেলো হালকা ভাবে। বিয়ের পর থেকে আজ অবধি অভিজিৎ কখনও ভুল করেও বিভার হাত ধরেনি। অথচ বিভা সেই ফ্রক পরার সময় থেকে জানে যে সে সুন্দর। পুরুষ মানুষের চোখে নিজের প্রতি মুগ্ধতা দেখেই অভ্যস্ত সে। কিন্তু এই মানুষটা··· সত্যি এই মানুষটা কি কখনোই তাকে দেখে মুগ্ধ হয়নি? এই তো মাত্র বললো বিভার মাঝে নাকি কোনো গভীরতা নেই। বিভাকে সে কী ভাবে? খুব ঠুনকো, বাজে আর ফালতু?

দূর পাহাড়ে কেউ সুরেলা কন্ঠে একটা আসামিয়া গান গাইছে। রাত মোহনার নীরব চরাচরে সেই গান উড়ে উড়ে এসে একদম বুকের মধ্যখানে গিয়ে বাজতে লাগল ঝন ঝন করে। সুর মানুষকে চিরদিন দুর্বল করে তোলে। প্রকৃতি আর সুরের মধ্যে কোথায় যেন এক রহস্যময় সংযোগ আছে। দুইয়ের কাছাকাছি আসলেই মানুষের অন্তর্জগতে কিছু একটা তোলপাড় হয়ে যায়। বিভার ভগ্নহৃদয়, ছিদ্রিত, বিষণ্ণ ভাবনা গুলো ওই সুরের সাথে মিশে, মাঘ মাসের হিম-গন্ধী খরশান বাতাসে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে একটু কেমন আবছা হয়ে আসছিল। বিভা হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠল, খিক খিক করে নয়, এবার তার হাসিটা রহস্যময়।

– ‘হাসছেন কেন?’

– ‘আচ্ছা অভিজিৎ বাবু, এইযে একটা মেয়েকে আপনি বিয়ে করলেন, এতদিন কাছ থেকে দেখলেন। একটা বার তাকে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করলো না?’

অভিজিৎ অপ্রতিভ হল। এ ধরণের প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত ছিল না একেবারেই।

– ‘ছুঁতে চাইলেই কি আপনি আমাকে ছুঁতে দিতেন?’

বিভা আবার হাসে, ‘তাও বটে। কিন্তু চান নি তো! কেন বলুন তো? আপনার কি মনে হয়না আমি যথেষ্ট সুন্দর?’

অভিজিৎ একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। চিন্তাগুলো খাপছাড়া।

– ‘সুন্দর হলেই কি? জোর করে কিছু হয় নাকি?’

– ‘মনের ওপর জোর হয়না, শরীরের ওপর তো হয়!’

– ‘আমার জোর করে কিছু পেতে ইচ্ছে করেনা।

– ‘আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন?’

অভিজিৎ চুপ। গানের সুরের সাথে এখন তবলার তাল যুক্ত হয়েছে। জাম শিমুলের জঙ্গলে কয়েকটা পাখি কিচির মিচির শব্দে জেগে উঠেছে গানের সুর শুনে।

– ‘কিছু বলছেন না যে?’

অভিজিৎ একটা বড় শ্বাস ফেলে অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবল, তারপর গভীর গলায় স্বগতোক্তি করল,

– 'Let there be spaces in your togetherness, And let the winds of the heavens dance between you.

বিরক্ত বিভা মুখ ঝামটা মেরে বলে উঠল, 'কী সব ছাই পাশ বলেছেন?' অভিজিৎ আবার বললো- 'Love one another but make not a bond of love, Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.'

– 'বাল, আমি কী প্রশ্ন করি আর ওই কী কয়!

অভিজিৎ হাসে, 'আপনি ভীষণ বাঙ্গাল!'

– 'আর আপনি ভীষণ আঁতেল।'

– 'বলেছি না, আপনার ভেতরে গভীরতা বলতে কিচ্ছু নেই।'

বিভা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো, তীক্ষ্ণ গলায় বললো, 'আমার ভেতরের গভীরতা উপলব্ধি করবার মত গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আপনার নেই।'

– 'ওরে বাবা!'

– 'হ্যাঁ, ওরে বাবা।'

– 'আপনার জিবরান ভালো লাগেনা?'

– ‘ওগুলো কাহলিল জিবরানের কোট ছিল?’

– ‘কবিতা।’

– ‘আপনি কবি নাকি?’

– ‘আমি কবি কে বললো?’

বিভা আফসোসের গলায় বলল- ‘কে আবার বলবে। ভাব সাব দেখে তো কবি বলেই মনে হচ্ছে। হায় ভগবান শেষ মেশ কিনা আমার ভাগ্যে এক কবি এসে জুটল!’

হঠাৎ একটি অন্যরকম দৃশ্যের ওপর তার চোখ আটকে গেল। খুব কাছেই একদল হরিণ অন্ধকারে নদীর পাড়ে এসেছে জল পান করতে। সংখ্যায় তারা দশ কি বারো। নিঃশব্দে এসেছে, নিঃশব্দে জল পান করছে। বিভার হাতে তখনো আধখাওয়া সিগারেট। সে আঙুলের ফাঁকে ধরে রাখা সিগারেট সমেত হাতটা অভিজিতের হাতের ওপর রেখে আতঙ্ক গ্রস্থ ভাবে বলে উঠলো,’দেখেছেন? সামনে কী হচ্ছে?’

জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা খেয়ে অভিজিৎ একটি চাপা আর্তনাদ করে উঠলো। শব্দ শুনে হরিণ দল সচকিত হল। তাকালো মানুষ দুজনের দিকে। বিভা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘চলুন চলে যাই, ভয় লাগছে!’

– ‘ভয়ের কী আছে? হরিণ আপনাকে কী করবে?’

– ‘যদি মারতে আসে?’

অভিজিৎ হাসে, ‘আপনি মাইরি, একটা ফার্স্ট ক্লাশ চিড়িয়া।’

বিভা নিজের আধখাওয়া সিগারেট জলের ওপর ছুঁড়ে মারলো। তারপর অভিজিতের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললো, ‘চলেন চলেন!’

কয়েক কদম চলার পর বিভার যেন বোধোদয় হল। আকস্মিক দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, ‘আপনার হাত পুড়ে যায়নি তো?

– ‘না।’

– ‘শিওর? দেখি কোথায় পুড়ছে?’

অভিজিৎ ছেঁকা খাওয়া হাতটা বিভার দিকে এগিয়ে দিল। বিভা ওর ঠান্ডা মজবুত, সবল হাতটা নিজের পেলব হাতের মুঠোয় ধরে হালকা গলায় বললো, ‘সরি, আমি আসলে একটা ক্যালাস।’

মোবাইলের আলো জ্বেলে অভিজিতের হাতটা ভালো, মত পরখ করল বিভা, ‘কিছু হয়নি তো!

অভিজিৎ গাঢ় চোখে দেখছিলো বিভাকে। ওরকম দেখতে দেখতেই বললো, ‘হয়েছে কিছু একটা।’

‘কই? দেখিনা তো!’

অভিজিৎ হাত ছাড়িয়ে নিলো। হাঁটতে শুরু করে বললো, ‘ও আপনি দেখতে পাবেন না। সব কিছু দেখা যায়না।’

তখন গানের আওয়াজ থেমে গেছে। বাতাসে মহুয়া ফুলের কী মিষ্টি গন্ধ! পাকদন্ডী পথ বেয়ে বেয়ে হাঁটছিল ওরা। বিভা একটু পিছিয়ে পড়েছিল।

– 'অভিজিৎ বাবু, আপনি গান জানেন?'

– 'না।'

– 'আমার বন্ধুদের মধ্যে রুদ্র খুব ভালো গান গায়। রুদ্রর গান শুনে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন।

অভিজিৎ ঘুরে দাঁড়ালো, 'বন্ধু দের ছাড়া আপনি অন্য কিছু ভাবতে পারেন না কখনো, তাইনা?'

বিভা নিভলো। স্তিমিত গলায় বললো, 'না, তা কেন হবে?'

অভিজিৎ আবারও হাঁটে। বিভা নিজের গতি বাড়িয়ে দিয়ে অভিজিৎ এর কাছাকাছি চলে আসে। হাঁটতে হাঁটতে একটু হাঁপিয়ে ওঠা গলায় বলে,

– 'লাইনগুলো সুন্দর ছিল।'

– 'কোন লাইন?'

– ‘জিবরানের কবিতার। Love one another but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. আপনি কথাগুলো বিশ্বাস করেন?’

– ‘হ্যাঁ করি। ভালোবাসায় বন্ধন আবশ্যক নয়।’

– ‘তাই বুঝি? আচ্ছা ধরুন, আমি আপনাকে ছেড়ে কোথাও গেলাম না। সারাজীবন আপনার সাথেই থাকলাম। কিন্তু সামির প্রতি আমার ভালোবাসাটাও ঠিক আগের মতোই রইল। কারণ আপনি এইমাত্র বললেন যে সব ভালোবাসায় বন্ধন আবশ্যক নয়। এর মানে সামিকে বিয়ে না করেও ওকে আমি ভালোবাসতেই পারি তাই না?’

অভিজিৎ থমকে দাঁড়ালো।

– ‘এ কথা কেন বলছেন? আপনার কি যাবার ইচ্ছে নেই?’

– ‘যাবার ইচ্ছে আছে ষোল আনাই। এমনিই প্রশ্ন করলাম।’

– ‘আপনার কি ভয় হচ্ছে যে আপনি দেশে ফেরার পর আপনার বয়ফ্রেন্ড আপনাকে গ্রহণ করবে না?’

– ‘বয়ফ্রেন্ড গ্রহণ করবে না কেন? কী আশ্চর্য!’

– ‘তাহলে কীসের ভয়? সমাজের?’

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে পড়ল বিভা। তার মাথা নত, সর্বাঙ্গে একটা আড়ষ্ট ভাব। অভিজিৎ দু পা এগিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল।

– ‘আপনি যেতে চাইছেন না?’

বিভা ওর ডাগর দুখানা চোখ মেলে অভিজিতের ভালোমানুষীতে ভরপুর মুখখানার দিকে নির্বাক চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলে,

– 'সামিকে আমি ভালোবাসি ঠিক। কিন্তু আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছেনা। এরকম কেন হচ্ছে বলুন তো?'

রুদ্র দোতলার সিটে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ঘুমোনোর আগে ভারী জিভ টেনে টেনে একবার তাকে বলতে শোনা গেল,'ট্রেইনে ঘুমানোর শালা মজাই আলাদা। মনে হয় যেন ছোটবেলার মত কেউ দোল দোল দোলনি গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে।'

আকাশকে হাজার বার বলার পরেও ওপরের সিটে পাঠানো গেলনা। সে নিচেই থাকবে উর্মিলার কাছাকাছি। অতএব অমৃতাকেই ওপরে উঠতে হল।

উর্মিলা তখন ঘুমে কাদা কাদা। আকাশের খুব ইচ্ছা উর্মিলা যেন ঘুম ভেঙে চোখ মেলার সাথে সাথে তার চাঁদ বদন খানাই দেখতে পায়। সে তাই ঘুমোচ্ছেনা। মোবাইলে অনলাইন লুডু খেলছে। আকাশের পাশে হৃদি বসে ছিল। আর ওদের মুখোমুখি সিটেই সামি। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে সে। তার চোখ দুটো বোজা কিন্তু সেখানে ঘুমের উপস্থিতি নেই। সে একটু পর পর এপাশ ওপাশ করছে।

আকাশ লুডু খেলতে খেলতে হঠাৎ বললো, 'তোর কি মনে হয়? উর্মিলা আজকে রাতে ঘুম থেকে উঠবে? নাকি উঠবেনা?'

হৃদি কপাল কুঁচকে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে বললো, শোন আকাশ, উর্মিলার ঘুম বিষয়ক গবেষণা করা ছাড়াও আমার জীবনে আরো কাজ আছে।'

– ‘বল না দোস্ত। এইযে আমি তখন থেকে ওর জন্য জাইগা বইসা আছি, সে তো একটাবারের জন্যও চোখ মেইলা দেখলোনা।’

– ‘আজাইরা’

–আমার মনে হয় কি জানিস, ওর মা ওরে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় দিছিল। ও তো সেইরকম ক্রাশটা খাইছিল আমার উপর। চোখের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়ার মতো ক্রাশ! ঘুমের ওষুধ না খাওয়াইলে এই মেয়ে ঘুমাইতনা আজ রাইতে।’

– ‘তোর কেন সবসময় মনে হয় যে দুনিয়ার সব মেয়ে তোরে দেইখা ক্রাশ খায়?’

– ‘এটাই বাস্তব সত্য কথা।’

আকাশ কথাটা বলে আর দেরি না করে ঝুপ করে হৃদির কোলে মাথা রেখে সটান শুয়ে পড়ল। বললো,

– ‘আমি একটু শুই দোস্ত। উর্মিলা মনে হচ্ছে আজকে আর উঠবেনা।’ হৃদি বললো, ‘এইটার মানে কী? তোমরা সবাই শুয়ে শুয়ে আরাম করবা আর আমি সারা রাত পাহারা দিব তোমাদের?’

– ‘হ্যাঁ দে, মানুষের উপকার কর একটু। সওয়াব পাবি।’

হৃদি আকাশের ছোট করে ছাটা ঘাসের মত চুলগুলোর ওপর একটা হাত রাখলো, বললো, ‘দোস্ত, আন্টি আংকেলকে বলে আসছিস তো আসার আগে, তাইনা?’

আকাশ ফোনে লুডু খেলতে খেলতেই বললো, ‘আরে ধুর, বলা না বলায় কিছু আসে যায়না।’

– ‘তুই আন্টিকে বলে আসিস নাই?’

– ‘কাউরেই কিছু বলিনাই।’

– ‘কী আশ্চর্য, কেন?’

– ‘বইলা কী করবো। আমি শিওর এখন এই মাঝরাতে আমার মাতাল বাপ্ তার গাধা বৌরে ধইরা বেদম পিটাইতেসে।’

– ‘ইশ আকাশ! তুই এত নিষ্ঠুর কেনো?’

ঠিক সেই সময় সামি হঠাৎ শোয়া থেকে উঠে বসে জরুরি গলায় বললো, ‘আমার মনে হয় বিভারে কিছু জানানো উচিৎ। ও নিশ্চয়ই খুব টেনশন করতেছে।’

আকাশ বললো, ‘শুনো রোমিও, এখন মটকা মাইরা পইড়া ঘুমাও। আর কয়েকটা ঘন্টা পরেই তোমার জুলিয়েটের সাথে দেখা হবে ইন শা আল্লাহ। এখন জুলিয়েটরে একটু টেনশন করতে দাও। একটু টেনশন করলে কিছু হবেনা।’

সামির চোখে খেলছে দুশ্চিন্তা আর বিষণ্ণতা। সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অস্থির গলায় বললো, ‘টাইম কেন কাটতেসে না? আর কতক্ষণ?’

শুনে আকাশ সুর করে গাইতে লাগলো, ‘কত দূর··· আর কত দূর ...’

‘তোর কেমন লাগতেছেরে? এতদিন পর বিভাকে দেখবি। হাও ডু ইউ ফিল?’ হৃদির প্রশ্ন, সামির উদ্দেশ্যে।

সামি হৃদির দিকে ঘুরে তাকালো। উষ্ণ গলায় বললো, ‘আই ক্যান্ট এক্সপ্লেইন দোস্ত।

একটু থেমে, একটা বড় নিশ্বাস চাপা দিয়ে সে আবার বললো, ‘ঘুমাতে পারছিনা!’

হৃদি হঠাৎ সেই প্রশ্নটা করে ফেলল যা সে এর আগে কোনো দিন করেনি, ‘বিভার মধ্যে বিশেষ কী আছে দোস্ত? যার জন্য তুই ওরে ভালোবাসলি?এমন কী আছে যা অন্য কারো নাই?’

সামি খুব অবাক হল প্রশ্নটা শুনে। হৃদির কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকা আকাশও বিস্ময় নিয়ে তাকালো হৃদির দিকে। ওদের ওরকম চমকে ওঠা দেখে হৃদি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলো। চট করে অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বললো, ‘না মানে, এমনিই জানতে চাইছি।’

সামি একটু হাসলো, ‘কী আছে তা আমি সঠিক জানিনা। তবে কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে!’

হৃদি সামির হাসিটা ফিরিয়ে দিল নিঃশব্দে এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই আবিষ্কার করল যে তার কেন যেন কিছু ভালো লাগছেনা। এবারের ট্রিপটায় আগের দিনগুলোর মতো আনন্দ মিশে নেই। এর কারণ কী? সে কি বড় হয়ে গেছে? তার মন কি পাল্টে গেছে? ট্রেনে বসে তার থেকে থেকে নিজের বাবা মায়ের কথা মনে পড়ছে। ছোট

ভাই হৃদয়ের কথা মনে পড়ছে। নিজের এমবিএ ক্লাসের কথা মনে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন অসমাপ্ত কোনো কাজ পড়ে আছে পেছনে। কোথাও কিছু একটা হওয়ার কথা ছিল। হয়নি এবারের যাত্রাটা যেন ঠিক তার জন্য নয়। সে এখানে অবাঞ্চিত, অনাহূত। অথচ এরকম মনে হওয়ার পেছনে কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। বন্ধুরা তার জান, প্রাণ এবং সর্বস্ব! বিভাকেও তো কতদিন দেখেনা! বিভা চলে যাওয়ার পর থেকে তার কেবলই মনে হত যে শরীরের অর্ধেকটা বুঝি কেউ কেটে ইন্ডিয়া পাঠিয়ে দিয়েছে। বিভাকে ছাড়া সে অপূর্ণ, আংশিক এবং খণ্ডিত। বিভা তার বেস্ট ফ্রেন্ড!

তার বুক থেকে একটা বড় নিশ্বাস বেরিয়ে আসলো। আকাশের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে স্বগতোক্তির মত বললো, 'কোথায় কী যেন একটা ঠিক হচ্ছেনা।'

আকাশ মুখের সামনে থেকে ফোন সরিয়ে হৃদির দিকে উল্টো চোখে তাকালো,

– 'কী কস?'
– 'কিসু কই না।'
– 'কইলি তো।'
– 'না কই নাই।'

ইমিগ্রেশন পার হয়ে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছুলো ওরা পরদিন বিকেলে। স্টেশন থেকে ভাড়া নেয়া গাড়ি করে রওয়ানা দেয়া হল বিন্দুর উদ্দেশ্যে। মাঝ পথে পড়ল ঝালং এর জলঢাকা হাইডেল পাওয়ার প্রজেক্ট, চোখ জুড়ানো রঙিন কাঠের বাড়িঘর আর রাস্তার ধারের কমলা লেবুর বাগান। ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম বিন্দু। উঁচু নিচু কুয়াশাঢাকা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেক দূর, যেখানটায় বিভাবরী আছে উতলা হয়ে বন্ধুদের বিরহে। আর তার বন্ধুরা সেই বিরহ ব্যথার টানে টানে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এই এলো বলে!

১৪

কাল রাতে বিভার কথাটা শোনার পর অভিজিৎ আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করেনি। চুপচাপ বাড়ি ফিরেছে। বিভা ঘুমোতে যাবার আগে শুধু একবার অনুচ্চ স্বরে বলেছে, ‘আপনি চিন্তা করবেন না। আমি চলে যাবো।’

অভিজিৎ তখনো নিরুত্তর। বিভার কথাটা যেন সে শুনতেই পায়নি 1 পরদিন খুব সকালে অভিজিৎ অফিসের জন্য বেরিয়ে গেল। বিভার ঘুম ভাঙল বেলা এগারোটায়। বন্ধুরা তখনও লাপাত্তা। সারাটা দিন কাটল অস্থিরতায়। একলা বিষণ্ণ অস্থির মনটাকে বোঝার মত লাগছিলো। দুপুরে কিছু খেতেও ইচ্ছে করলোনা। চুপচাপ ঘরে বসে থেকে কাঁদলো খানিকক্ষণ। মায়ের সাথে ফোনে কথা বললো। জানিয়ে দিল শীঘ্রই সে দেশে আসছে বেড়াতে।

সন্ধ্যায় অভিজিৎ যখন অফিস থেকে ফিরল, বিভা তখন তাকে দেখামাত্র বলে উঠল, ‘আপনি এরকম করছেন কেন?’

– ‘আমি আবার কী করলাম?’

– ‘কাল রাত থেকে আমার সাথে কথা বলছেন না কেন?’

অভিজিৎ বিভার দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, ‘আপনি কি আমাকে ভালোবাসার চেষ্টা করছেন?’

কথাটা শোনামাত্র বিভার সুন্দর মুখখানায় একটা আক্রোশের ছায়া কেঁপে উঠলো, সে ভীষণ উত্তেজিত ভাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দূর্গা দৌড়ে এসে

খবরটা দিল, 'বৌদি, তোমার কাছে কজন লোক এসচে শহর থেকে। দেখা করতে চায়। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।'

– 'আমার সাথে দেখা করতে চায়?' বিভা বিস্মিত।

– 'হ্যাঁ।'

কপালে একটা প্রশ্ন বোধক চিহ্ন নিয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে আসলো বিভা।

.

একটু আগে ঝুপ করে নেমে গেছে সন্ধ্যা। নীড়ে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির পুরোপুরি থামেনি তখনও। দূর্গা উঠোনের মাঝখানে পোতা তুলসী গাছের গোড়ায় ধূপ জ্বালিয়েছিল। ধূপ জ্বালা গন্ধে ম ম করছে চারপাশ। বিভাবরী ত্রস্ত পায়ে সদর দরজায় এসে দেখতে পেলো আবছা ধোঁয়াটে কুয়াশার মাঝে পাঁচজনের একটি দল দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই তার চোখ পড়লো ছিপছিপে লম্বা ছেলেদের মত ছোট করে চুল ছাটা মেয়েটির দিকে। তার পাশে লম্বা চুলের একটি ছেলে। ওদের প্রত্যেকের কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ। মুখগুলো ঝাপসা।

বিভার হৃৎপিণ্ড কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্পন্দিত হতে ভুলে গেল। এক মহাসমুদ্রের ফেনীল জোয়ার এসে যেন ভিজিয়ে দিয়ে গেলো তাকে। তার বুক খালি, মাথাটা ফাঁকা, সারা শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক শিহরণ!

পাঁচ মূর্তি ওর দিকে নির্বাক চেয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছেনা কারো। চোখের পলক পড়ছেনা বিভারও। সময় যেন থমকে গেছে। পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আটকে গেছে তার নিজস্ব কক্ষপথে।

একটা সময় বিভা ধপ করে দরজার চৌকাঠের ওপর বসে পড়লো। লম্বা চুলের ছেলেটি এগিয়ে আসলো ধীরে ধীরে কুয়াশার চাদর ভেদ করে। বিভার কাঁধ ধরে ওকে টেনে তুলল বসা থেকে, দাঁড় করালো। বিভার ঠোঁট কাঁপছিল থরথর করে। হাত পায়ে শিরশিরানি। চোখের কোণে চিকচিক করছে কয়েকফোঁটা অশ্রুবিন্দু। ঝাপসা নয়নে রুদ্রর দিকে চেয়ে রইল সে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর ডুকরে কেঁদে ওঠার আগে রুদ্রর বুকে মুখ লুকিয়ে শুধু একবার কোনো রকমে বলতে পারল, 'আমি কি স্বপ্ন দেখতেছি?'

রুদ্র ওর মাথাটা শক্ত করে বুকে চেপে ধরে বললো, 'স্বপ্ন নয়, আমরা সত্যিই এসে গেছি।'

আকাশ, হৃদি আর অমৃতা ছুটে এসে বিভাকে জাপটে ধরলো। বিভার আনন্দে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কী যে বাঁধনহারা এক সুখ তার বুকের ভেতরটায় দাপাদাপি করতে লাগলো তা আর ভাষায় প্রকাশ করার মত না। সে কি মরে যাবে নাকি খুশিতে? হৃদিতা ফিচফিচ করে কাঁদছিল। বিভা কাঁদতে কাঁদতে হৃদি আর অমৃতার মুখে চুলে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলো। কী দেখলো কে জানে। যেন ওদের নাক মুখ চোখ সব ঠিক জায়গায় আছে কিনা তাই পরখ করতে লাগলো।

উঠোনের ওপর, একটু দূরে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল সামি। কাঁধে ব্যাগপ্যাক নিয়ে দু হাত প্যান্টের পকেটে পুরে বন্ধুদেরকেই দেখছিল সে। খানিক

বাদে বিভার চোখ পড়লো ওর দিকে। কতদিন পরে দেখল সে তার ভালোবাসার মানুষটিকে। ক-ত-দি-ন পর!

ওই চোখে চোখ পড়তেই যেন সমস্ত সত্ত্বা জুড়ে শিউলি ফুলের বৃষ্টি ঝরতে লাগলো। তার সুখের, তার দুঃখের, তার স্বপ্নের,তার সমস্ত জীবনের,সব চাইতে প্রিয় মানুষটি এখন চোখের সামনে। পৃথিবীতে আজ আর কোন ক্লেশ নেই, মৃত্যু নেই, জরা নেই। সারা দুনিয়া জুড়ে বাজছে শুধু অবিরাম রিমঝিম এক সুখময় বাজনা। বিভা আর একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে ঝড়ের গতিতে ছুটে গিয়ে সামির বুকের ওপর পড়ল। এই দৃশ্য দেখে রুদ্র সিটি বাজিয়ে উঠল আনন্দে। আকাশ ফিচেল গলায় বললো, ‘মামা তোমাদের কি আজ আমি কোথাও যাবোনা সিনেমাটার কথা মনে আছে?’

বন্ধুরা সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। তাদের মনে আছে।

ঠিক সেই সময় অভিজিৎ নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো দরজার চৌকাঠে। সামি তখন বিভাকে জড়িয়ে ধরেছে। ওর সুগন্ধি চুলে নাক ডুবিয়ে ক্ষীণ গলায় বলছে,’কেমন আছিস? আমার বিভাবরী? অভিজিৎ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা অবলোকন করলো। বাকি চার বন্ধুকে অভিজিতের উপস্থিতিতে একটু অপ্রস্তুত দেখালো। অমৃতাই এগিয়ে আসল প্রথমে, ‘আরে জামাইবাবু, কেমন আছেন?’

অভিজিতের চোখ আটকে গিয়েছিল সামি আর বিভার দিকে। তার মুখ থমথমে, গম্ভীর। সে অমৃতার কথাটা শুনে একবার তাকালো অমৃতার দিকে। কোনো উত্তর দিলো না। তার চোখ জোড়া চুম্বকের মত টানছে সম্মুখে অন্ত রঙ্গ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক যুবতী। অমৃতা চট করে সামি আর বিভার দিকে দৌড়ে গেলো। বিভাকে সামির বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করতে মিনিটও লাগলোনা তার। বিভার কনুই টেনে ধরে বললো, ‘কীরে বাইরে দাঁড়ায় থাকব নাকি? ভেতরে নিবিনা আমাদের?’

বিভার চোখ পড়ল দরজায় দাঁড়ানো অভিজিতের দিকে। অপ্রতিভ হল সে। চট করে চোখের জল মুছে নিয়ে সামির কাছ থেকে একটু দূরে সরে আসল। বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভেতরে আয়।'

অভিজিৎ কিন্তু কারো সাথে একটি বাক্য বিনিময়ও করলো না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো তেমন নিঃশব্দেই প্রস্থান করলো।

বসার ঘরে এসে কার্পেটের ওপর ব্যাগগুলো ছুঁড়ে ফেললো সবাই। অনেক লম্বা জার্নি ছিল। ক্লান্তিতে প্রত্যেকের চোখ ছোট হয়ে এসেছে। বিভা একদম পাকা গৃহিণীর মত প্রথমেই রান্নাঘরে ছুট দিল। দুর্গাকে বললো, 'চট করে লেবুর শরবত বানিয়ে দাও। আমার বন্ধুরা অনেক দূর থেকে এসেছে। আর রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে।'

বললো ঠিকই কিন্তু শরবত বানালো সে নিজের হাতে। বিভাকে এত খুশি হতে এর আগে কখনো দেখেনি দূর্গা। সে তখন বিস্ময়ের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ কী রকম মেয়েছেলেগো বাবা, নিজের স্বামীর জন্য একটা কিছু যত্ন করে রান্না করেনা কোনোদিন কিন্তু এখন বন্ধুরা এসেছে তো খুশিতে বাক বাক হয়ে শরবৎ বানাচ্ছে!

মিনিট দশেকের মধ্যেই ট্রেতে শরবৎ সাজিয়ে বসার ঘরে আসলো বিভা। তার পরনে কলাপাতা রঙের শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর, দুহাতে শাঁখা। তাকে দেখতে বেশ বউ বউ লাগছে। সবাই সোফায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়েছিল। হৃদি চারপাশটা দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, মনোযোগ দিয়ে। বিভা ঘরে ঢুকতেই বললো, 'এই তোর সংসার?'

বিভা এক গাল হাসলো, 'হ্যাঁ, এই আমার সংসার।'

– 'আমার বিশ্বাস হইতেছেনা যে আমরা বিভার বাসায় আইসা পড়ছি!' ট্রে থেকে শরবতের গ্লাস তুলে নিতে নিতে বলল রুদ্র।

আকাশ বললো, 'আসলেই, সব কিছু কেমন যেন অদ্ভুত লাগতেছে। মানে বিভা, আমাদের বিভা এখন ঘর সংসার করে। গেস্ট আসলে শরবত টরবত বানায় দেয়। বিশ্বাস হয়?'

ঘর সংসার বিষয়ক আলোচনা সামির খুব একটা ভালো লাগছিলোনা 1 সে ক্যাট ক্যাট করে বলে উঠলো, 'আজাইরা কথা বলিস নাতো। এটা ওর সংসার হইতে যাবে কেন? শি ইজ নট পার্মানেন্ট হিয়ার।'

বিভা একটু চাপা গলায় বলে উঠলো, 'ইশ সামি আস্তে কথা বল। কাজের মেয়েটা শুনতে পাবে।'

সামি আগের চাইতেও জোরালো গলায় বললো, 'তোর কাজের মেয়েরে কি আমি ডরাই?'

– 'আমাদের জামাইবাবু কই? আমাদের দেইখা তো মনে হয় ছোটখাটো হার্ট এটাক হয়ে গেছে বেচারার। গিয়া দ্যাখ বাঁইচা আছে নাকি।' শরবতের গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিতে যাবার আগে আকাশ অনেকটা ঠাট্টার গলায় বলে উঠল কথাগুলো।

বিভা ভ্রুক্ষেপ করলোনা। তার মুখ থেকে হাসি সরছেইনা। বন্ধুরা চলে এসেছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এখন সারা দুনিয়া চুলোয় যাক তার কিচ্ছু এসে যাবেনা। সে বন্ধুদের সবাইকে চোখ ভরে,মন ভরে দেখতে লাগল।

অমৃতাটা আগের মতোই আছে। ছোট করে ছেলেদের মতো চুল ছাটা। গায়ে জিন্সের জ্যাকেট। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। তবুও ওর গায়ের রংটা দেখার মত। একেবারে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ! ছোট চোখ আর ছোট চোখা নাকের মুখটা বিড়ালের মতো আদুরে। পুতুলের মতো সুন্দর। বিভার ইচ্ছে হল গাল টেনে অমৃতাকে একটু আদর করে দেয়। আকাশের চোখদুটো এখনো আগের মতোই আকাশময়। ঠোঁট টিপে হাসছে আর সাথে হেসে যাচ্ছে ওর চোখ। ওর হাসিটা বিভার এত ভালো লাগে! আজ কত্তদিন বাদে দেখলো প্রিয় হাসিটা! রুদ্র আগের মতোই পাগল আছে। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, দাড়ি গোফের জঙ্গল। কে বলবে এই ছেলে বুয়েট পাশ ইঞ্জিনিয়ার? ওদের বন্ধুদের মধ্যে সবচাইতে ভালো ছাত্র রুদ্র এবং সবচাইতে এলোমেলোও রুদ্র। আর ঐযে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকা ছেলেটা! পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটা! পৃথিবীর সবচেয়ে পাগল ছেলেটা! একটা কালো পুলওভার তার পরনে। দাড়ি কামিয়েছে বলে ফর্সা গাল আরো বেশি ফর্সা লাগছে। আরও বেশি সুন্দর লাগছে।

হৃদি আগের চাইতে শুকিয়ে গেছে। চেহারায় অন্যরকম ধার এসেছে একটা। শ্যামলা গায়ের রংটা চকচক করছে। বিভা হঠাৎ বলে ফেললো,

– ‘কিরে হৃদি, তোরে এত সুন্দর লাগতেছে কেন? প্রেমে ট্রেমে পড়ছিস নাকি?’

হৃদি চমকে তাকালো বিভার দিকে। অথচ চমকানোর মত তো কোনো কথা বিভা বলেনি। বন্ধুদের মধ্যে এসব কথা হরহামেশাই হয়। আজকে নিজের চমকটা নিজের কাছেই বিশ্রী লাগলো তার কাছে। একটু বিব্রত ভাবে ঢোঁক গিলে বললো, ‘আর কাম

নাই। প্রেম জীবনে একবারই করছি। রবিনই আমার শুরু আর শেষ। আর হবেনা।
’

অমৃতা হঠাৎ জরুরি গলায় বললো, ‘বিভা। তুই প্লিজ অভিজিতের সাথে একটু কথা বলে আয়। আমরা তো উনার বাসায় আসছি তাইনা? উনি যদি এরকম ব্যবহার করে তাহলে আমাদের এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছা হবেনা।’

কথাটা শুনে বিভার মুখে অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকা হাসিটা সরল। একটা বিষণ্ন ছায়া টলমল করলো চোখে। বললো, ‘আচ্ছা আমি দেখছি। তোরা এসব নিয়ে চিন্তা করিস না। সে মানুষ ভালো। তোদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেনা।’

বিভার মুখে অভিজিতের প্রশংসা শুনে সামি একবার চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। কী একটা যেন বলবার জন্য মুখ খুলল, কিন্তু বলল না শেষ পর্যন্ত। চেপে গেল।

বিভা নিজের ঘরে এসে দেখলো অভিজিৎ বিছানার পাশের ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে দোল খাচ্ছে। তার মুখ ভার। চোখে প্রলয়ের আভাস। বিভা ঘরে ঢুকতেই সে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলো। থমথমে দৃষ্টি রাখলো বিভার চোখে। বিভা থমকাল। অভিজিতের ভালোমানুষী চোখদুটোতে এমন কঠোরতা সে এর আগে কখনো দেখেনি।

‘অভিজিৎ বাবু, আমার বন্ধুরা এসেছে।’

– ‘কেন এসেছে ওরা?’ অভিজিতের গলার স্বরে তার ভিতরকার জ্বলন্ত

আগুনের গনগনে আঁচটা টের পাওয়া যাচ্ছে।

বিভা চোখ নামিয়ে বললো, 'আমাকে দেখতে।'

অভিজিৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে বিভার সারা মুখে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করলো খানিকক্ষণ। তারপর বরফ শীতল গলায় বললো, 'আপনি আবারও আমাকে ইউজ করলেন, তাইনা?'

– 'মানে?'

– 'গতকাল থেকে আপনার বন্ধুরা আউট অফ নেটওয়ার্ক ছিল। তাই অন্য কিছু করার না পেয়ে আপনি আমার সাথে কথা বলে সময় কাটিয়েছেন। জাস্ট টাইম পাস্ করেছেন, তাইনা?'

বিভা অপরাধীর গলায় বললো, 'ঠিক তা না।'

– 'তাহলে কী?'

বিভা বিব্রত ভাবে হাতের আঙুলের নখ কামড়াতে কামড়াতে স্তিমিত গলায় বললো, 'ও আমি এমনিই আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাইছিলাম। ভাবছিলাম চলে যাবো যখন….

– 'চলে যাবেন যখন?'

– 'বাদ দিন না ওসব।'

অভিজিৎ কাটা কাটা গলায় বললো, ‘আপনার বন্ধুদের চলে যেতে বলেন।’

চমকে উঠলো বিভা, ‘বলছেন কী?’

– ‘হ্যাঁ ঠিকই বলছি।’

– ‘আপনি এতটা অভদ্র তা আগে জানা ছিলনা।’

– ‘এ দেখি ভূতের মুখে রাম নাম! কিছু না বলে দুম করে কারো বাড়িতে চলে আসাটা কোথাকার ভদ্রতা শুনি? চলে যেতে বলুন ওদের, এখুনি।’

– ‘না চলে যেতে বলব না। এটা কি শুধু আপনার একার সংসার?’

– ‘অবশ্যই আমার একার সংসার। আপনি কে? আপনি তো চলেই যাচ্ছেন দুদিন পর।’

– ‘এখনো যাই নি। ডিভোর্সও হয়নি এখনো। এ সংসারে আমার অধিকার এখন অবধি আছে ষোল আনা।’

– ‘ঠিক আছে, তাহলে আমিই গিয়ে বলছি ওদের, এখানে থাকা যাবেনা।’ বলে অভিজিৎ পা বাড়ালো। বিভা পেছন থেকে ওর ডান হাতটা ধরে ফেলে আকুলিবিকুলি হয়ে বললো, ‘প্লিজ এরকম করবেন না। ওরা কত দূর থেকে এসেছে। আপনার মনে কি একটু দয়া মায়া নেই?’

– ‘ঠিক আছে, তাহলে আপনারা থাকুন। আমিই চলে যাচ্ছি অন্য কোথাও।’ অভিজিতের গলার স্বরে ঝনঝন করে ছেলেমানুষী অভিমান বেজে উঠল।

– ‘আপনি কোথায় যাবেন?’

– ‘যেখানে ইচ্ছা।’

বিভা অভিজিতের সামনে করজোড়ে দাঁড়ালো, আকুল হয়ে বলল, ‘প্লিজ এমনটা করবেন না। একটু ভালো ব্যবহার করুন ওদের সাথে। আপনার পায়ে পড়ি। আর কোনোদিন কিচ্ছু চাইবো না আপনার কাছে।’

– ‘খুব পায়ে পড়তে শিখেছেন আপনি! এরকম হাতজোড় করে একদিন আপনাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন, আপনার মনে আছে?’

বিভার চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল চিকচিক করছিল। ভারী গলায় বলল, ‘মনে আছে।’

– ‘সেদিনও আপনি আমাকে ইউজ করেছিলেন। গতকাল রাতেও করেছেন। আজকেও করছেন। রূঢ় শোনালো অভিজিতের কণ্ঠস্বর।

– ‘কখনোই আমি আপনাকে ইউজ করিনি।’

– ‘সর্বদাই করেছেন। আপনি খুব স্বার্থপর।’

বিভার চোখ থেকে টপ টপ করে কয়েক বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ল।

– ‘বন্ধুদের দেখে আপনার রূপ পাল্টে গেল ভেলকি দিয়ে। কী তাজ্জব ব্যাপার!’

– ‘প্লিজ, ওদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না। প্লিজ!’

অভিজিৎ একটা বড় নিশ্বাস নিলো। গম্ভীর ভাবে বললো, ‘ঠিক আছে। থাকুক ওরা। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমার চোখের সামনে ওই ছোকরাটার সাথে অত মাখামাখি করবেন না। রাগের মাথায় কিছু একটা করে বসতে পারি।’

বিভা চোখভর্তি কান্না নিয়েই কেন যেন হেসে উঠল, ‘আচ্ছা।’

– ‘হাসছেন কেন? আপনার কাছে তামাশা মনে হচ্ছে আমার কথা গুলো?’

– ‘হাসছিনা।’

– ‘এইতো হাসছেন।’

– ‘আপনি আমার বন্ধুদের সাথে হেসে কথা বলবেন, সেটা ভেবেই আনন্দে হাসছি।

– ‘আপনি স্বার্থপর, আপনি তা জানেন?’

– ‘জানি।’

– ‘আমি আপনার বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করলে বিনিমিয়ে আপনি আমাকে কী দেবেন?’

– ‘যা চাইবেন, তাই দেবো।’

– ‘কথা দিচ্ছেন?’

– ‘কথা দিচ্ছি।’

রান্নাঘরে উঁকি দেবার আগে বিভার মেসেঞ্জার শব্দ করে উঠল। সামি লিখেছে, আমি উঠোনে আছি। তুই একবার আয়। বিভা মেসেজের রিপ্লাই দিল, ‘এখন বাইরে গিয়ে দেখা করা কি ঠিক হবে?’

সামি লিখল, একশ বার ঠিক হবে।

বিভা লিখল, আচ্ছা আসছি। একটু দাঁড়া।

দূর্গা ফ্রিজ থেকে আস্ত মোরগ বের করেছে। লুচি বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। অসময়ে রান্না করতে হচ্ছে বলে তার মুখ ভার। বিভা বলল, ‘দূর্গা, ওসব লুচি টুচি দিয়ে হবেনা। তুমি ভাত চড়াও। আমার বন্ধু গুলো বিশাল পেটুক, ওই ছোট ছোট লুচি খেয়ে ওদের পেটের এক কণাও ভরবেনা।’

দূর্গা একটু বিরক্তি নিয়ে বলল, ‘ও বৌদি, পেঁয়াজ আর লঙ্কা কেটে দাওনা গো। দিলে একটু উপকার হয় আমার।’

বিভা চোখ তুলে দূর্গাকে দেখলো একবার। মেয়েটি তাকে আদেশ করছে। রান্নার কাজের দায়িত্ব তো তার। বিভা কেন পেঁয়াজ কাটতে যাবে? মনে মনে রাগ হলেও মুখে কিছু বললোনা সে। ছুরি আর চপিং বোর্ড নিয়ে পেঁয়াজ কাটতে শুরু করলো। ওদিকে সামি অপেক্ষা করছে তার জন্য। দ্রুত পেঁয়াজের ওপর ছুরি চালাতে লাগলো সে। সামিকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে নির্ঘাৎ রেগে যাবে। ইশ! জ্বালার শেষ নেই তার জীবনে।

হৃদি গরম জল দিয়ে গোসল সেরে একটা হালকা সবুজ সুতি শাড়ি পরেছে। চুল ধুয়েছে বিভার শ্যাম্পু দিয়ে। তার চুল ভর্তি এখন বিভার চুলের মতোই সুগন্ধ ম ম করছে। আগে বিভা আর সে সবসময় এক সাথে শাড়ি পরতো। বিভা শাড়ি পরেছে কিন্তু হৃদি পরেনি এমনটা কখনো হয়নি। আজকেও হল না।

অমৃতা শাওয়ার নিচ্ছিলো। হৃদি তৈরী হয়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে দেখলো ছেলেদের ঘরের দরজা দেয়া। সে কয়েক পা হেঁটে সদর দরজার কাছে আসল। দরজা খুলতেই হিম হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো নাকে মুখে। সেই সাথে ধূপের গন্ধ। উঠোনটা কুয়াশায় সাদা। পশ্চিম কোণে পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা একজন মানুষ। হাতের আঙুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের আগুন উঠছে,নামছে। ভালো মতো তাকাতেই সিগারেটের আগুন আলোয় আবছা ভাবে সামির মুখটা দেখতে পেলো হৃদি।

চারপাশ একদম নীরব। শুধু হাওয়া চলাচলের শব্দ, আর একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। শাল, শিমুলের গাছের পাতায় শর শর আওয়াজ তুলে ইচ্ছে মতো চড়ে বেড়াচ্ছে বুনো হাওয়াটা। জমাট বাঁধা অন্ধকারের ওপর সাদা কুয়াশা আঠার মতো লেগে আছে। সব কিছু ধোঁয়াশা, সবকিছু আবছা। সামির এক হাতে সিগারেট অন্য হাতে বিভার জন্য আনা উপহার। হোয়াইট গোল্ডের আংটি। হীরের কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাকাপয়সার টানাটানিতে কেনা গেলোনা। সে পায়চারি করছিল চিন্তিত ভঙ্গিতে। এত দেরি করছে কেন বিভা? দশ মিনিটের বেশি হয়ে গেল।

কুয়াশার ভেতর দিয়ে কেউ আসছে। শুকনো ঝরা পাতায় মড়মড় শব্দ তুলে। শাড়ি পরা, চুল খোলা একটি নারী মূর্তি। সামি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো, শেষ পর্যন্ত আসলো বিভা! হাতে ধরা আংটিটা পুলওভারের পকেটে পুরে নিল সে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল পাশের জঙ্গলে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে যেতে লাগল মেয়েটির দিকে। তার বুকের ভেতর বড্ড তোলপাড়। কত দিন হয়ে গেল সে তার প্রিয় মানুষটাকে ছুঁয়ে দেখেনা! নারী মূর্তিটির কোমরে সবল দুখানা হাত রেখে সে চট করে নিজের খুব কাছে টেনে নিয়ে আসল। কোনো কথা না বলে অন্ধকারাচ্ছন্ন নারীর ঠোঁটে তৃষ্ণার্তের মতো এঁকে দিল একটি নিবিড় চুম্বন। তারপর পকেট থেকে আংটি বের করে মেয়েটির ডান হাতের আঙুলে পরিয়ে দিল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে

বলল, ‘জীবনের সবচেয়ে সঠিক কাজটা এইমাত্র করলাম। মনে হচ্ছে এরচেয়ে সঠিক কোনো কিছু আমার জীবনে এর আগে হয়নায়!’

কেউ একজন গুণগুণ করে গান গাইতে গাইতে হাতে টর্চ নিয়ে পাশের রাস্তাটা দিয়ে আসছিল। সেই আলোতে সম্মুখে দাঁড়ানো মেয়েটির মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মেয়েটির চোখ ভর্তি জল। ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। সামির বুকে একটা প্রবল ভয় খেলে গেল। মুখ হয়ে গেল কাগজের মত সাদা। চমকে উঠে দু পা পিছিয়ে গেল সে। আর্তনাদ করে বলে উঠল,

‘হৃ দি-তা বিনতে জামিল! হোয়াট দ্যা ফাক আর ইউ ডুইং হেয়ার?’

হৃদি অন্ধকারে স্থিরচিত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছেনা। কয়েকটা মূহর্ত কেটে যাবার পর সে খুব ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো। সামি পেছন থেকে বললো, ‘কই যাচ্ছিস, শোন হৃদিতা, কথা শুনে যা।’

হৃদি থামলোনা। কিছু বললও না। ভূতগ্রস্থের মতো হেঁটে হেঁটে মিশে যেতে লাগলো কুয়াশা ঢাকা আঁধারে। হৃদি চলে যাবার পর অনেকটা ক্ষণ সামি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ভেতর মড়মড়িয়ে উঠছে এক তীব্র ব্যথা। হৃদযন্ত্রের গতি অস্বাভাবিক। কী হবার ছিল আর কী হয়ে গেল? কী আশ্চর্য, কী অদ্ভুত! ঘটনা ঘটানোর সময় একটা বারও তার মনে হয়নি যে সামনে দাঁড়ানো মেয়েটি বিভা নয়, অন্য কেউ। অথচ বিভাকে সে কতদিন ধরে চেনে! তার তো উচিত ছিল ঘোর অন্ধকারেও হৃদি আর বিভার মধ্যে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পার্থক্যটুকু চিনে নেয়া। এখন মনে পড়ছে একটু একটু করে। অন্ধকারে হেঁটে আসা মেয়েটি হুবহু বিভার মতো দেখতে ছিলোনা। আবার হৃদির মতোও নয়। অথচ মেয়েটিকে দেখামাত্র মনে হয়েছিল এই যেন তার আজন্ম অপেক্ষার সেই কাঙ্খিত নারী। আর সে নারী তো বিভা ছাড়া অন্য কেউ নয়!

তাই বিভা ভেবেই মেয়েটির কাছে এগিয়ে গেছে সে। তাছাড়া ঠিক এ সময় বিভারই তো আসার কথা ছিল এখানটায়। তাহলে দোষটা কি শত ভাগ সামির ওপর বর্তায়? আর হৃদিই বা কেন তাকে বাধা দিলো না? হৃদি কি পারতোনা ধাক্কা দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে? সামি নাহয় বিভা মনে করে ভুল করেছিল কিন্তু হৃদি তো জানতো এটা সামিই 1

সামির বুকের ভেতরের বিবেচক মনটি বড্ড বেশি ঠোকর কাটতে লাগলো। গতবার কক্সবাজারে বিভার সাথে একটা কাণ্ড ঘটেছিল। এবার না চাইতেও হৃদির সাথে। কী ভীষণ বাজে ব্যাপার ঘটে গেলো। বন্ধুদেরকে মুখ দেখাবে কী করে সে? বিভা জানতে পারলে কিভাবে নেবে ব্যাপারটাকে? বুক দুরুদুরু করতে থাকে। আর হৃদি··· হৃদি যদি তাকে ভুল বোঝে?

সামি দ্রুত পায়ে বাড়ির দিকে হেঁটে গেল। হৃদির সাথে কথা বলা দরকার। বন্ধুদের কিছু বলার আগে তাদের দুজনের মধ্যকার ঝামেলাটা মিটমাট করে নেয়া খুব জরুরি।

১৫

রোজ বাড়িতে কেউ না কেউ দর্শন লাভের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। আজকেও আছে। হক নিজের গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জে পিতার নামে একটি হাসপাতাল তৈরির প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। সে ব্যাপারে উকিলের সাথে একটা মিটিং হওয়ার কথা রাত দশটায়। সারাদিন সময় পান না বলে মিটিংটা এমন অসময়ে ধার্য করা হয়েছে। উকিল সাহেব রাত দশটা বাজার আগেই চলে এসেছেন। এছাড়াও গ্রামের বাড়ি থেকে তার ফুপাতো ভাই এসে বসে আছে সকাল থেকে। আজকাল নিজের আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করতে তিনি খুব একটা তৃপ্ত বোধ করেন না। এরা সবাই আসে নানা প্রয়োজনে এবং মতলবে। মনের টানে কেউ আসেনা।

বেডরুমে ঢুকতেই রোমেলা বললেন, ‘খবর পেয়েছ? তোমার ভাই এসে বসে আছে।

হক গলায় বাঁধা টাইয়ের গিঁট খুলতে খুলতে বললেন,’দেখেছি।’

রোমেলার চোখ মুখ দুশ্চিন্তায় ডোবা। তার মুখে সবসময়ই কিছু না কিছু প্রসাধন থাকে। আজকে কোনো প্রসাধন নেই। চুল আলুথালু। শাড়ির আঁচল মাটিতে গড়াচ্ছে। তাকে ভীত এবং বিষণ্ন দেখাচ্ছে। হক স্ত্রীর এমন নাজেহাল অবস্থা দেখে প্রশ্ন করলেন, ‘তোমার কী হয়েছে?’

রোমেলা অনুচ্চ স্বরে বললেন, ‘বাচ্চাটার কোনো খবর পাচ্ছি না গতকাল থেকে। ফোন দেই ফোন বন্ধ। ওর ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম। তালা দেয়া। কেউ নেই সেখানে!’

– ‘ওরা ইন্ডিয়া গেছে।’

– ‘তুমি খবরটা জানতে?

– ‘হ্যাঁ জানতাম।’

– ‘সেকী! আমি তো ভেবেছি তুমি জানোই না। সামির বন্ধু, রুদ্রর আম্মার কাছে ফোন করে জানতে পারলাম যে ওরা দেশ ছেড়েছে গতকাল। আমি আরো তোমাকে ভয়ে ভয়ে জানাই নি তুমি রেগে যাবে বলে। কী আশ্চর্য! আমার বাচ্চাটা আমাকে কিছু না বলে চলে যেতে পারল?’

– ‘তোমাকে বললে যে কথাটা আমার কানেও চলে আসতো! তাই তোমাকে না জানিয়েই সব কিছু করা হয়েছে। কিন্তু তোমার গুণধর পুত্র এটা জানে না যে তার কোনো বিষয়ই আমার কাছ থেকে লুকোনো থাকে না।

রোমেলা আগের চাইতেও ভীত গলায় বললেন, 'আচ্ছা ওরা কি ওই মেয়েটার শ্বশুর বাড়ি গেছে? ওদের কি কান্ড জ্ঞান বলতে কিছু নেই?'

– 'তোমার ছেলের কান্ড জ্ঞান কোনো কালেই ছিল না। তার বন্ধু গুলাও হয়েছে একটার চেয়ে একটা মাথা মোটা বেকুব। আর ওই বেয়াদব মেয়েটা ঐযে অমৃতা নাম। ওই মেয়েটাকে আমি সামনে পেলে নির্ঘাৎ কষে চড় বসাবো। সত্যি আমি এই জেনারেশনটাকে একদম বুঝতে পারিনা।'

হক কথাটা বলে উঠে পড়লেন। অনেক কাজ বাকি। প্রথমেই তিনি তার ফুপাতো ভাইকে ডেকে পাঠালেন। সে এসেছে একটি দুঃসংবাদ নিয়ে। ফুপু আম্মার ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসার জন্য টাকা দরকার। অর্থ সাহায্যে হকের কার্পণ্য নেই। কিন্তু এখন শুধু টাকার ব্যবস্থা করলেই হবেনা, চিকিৎসা সমেত থাকা খাওয়ার সমস্ত দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। ফুপু আম্মার থাকার ব্যবস্থা এ বাড়িতেই করতে হবে। স্ত্রী রোমেলা গ্রামের আত্মীয়-স্বজন খুব একটা পছন্দ করেন না। বাড়িতে গেঁয়ো লোকজন ঘুরে বেড়ালে তাঁর নাকি অস্বস্তি হয়। আত্মীয় স্বজনদের নানারকম অফেন্সিভ কথাবার্তা শুনিয়ে দিয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই তাড়ানোর ব্যবস্থা করে ফেলেন তিনি। কিছু কূটচাল তার রক্তের সাথে মিশে গেছে। তিনি হাজার চাইলেও এখন আর এই ঘোরপ্যাঁচযুক্ত কূটিল মনোভাব থেকে বেরোতে পারছেন না।

রোমালাকে তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু জানালেন না হক সাহেব। স্ত্রীর সাথে মনের কথা খুলে বলায় খুব একটা অভ্যস্ত নন তিনি। রোমেলা তাঁর মানসিকতা আজ অবধি বুঝে উঠতে পারেননি, গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেননি তাঁর কোন ব্যক্তিগত মতামতকে। ভ্যাকেশনে তাঁর পছন্দ নির্জনতা, পাহাড় কিংবা সমুদ্র। অপরদিকে রোমেলার প্রকৃতির প্রতি কোন টান নেই। জগত দর্শনে আগ্রহ নেই। তাঁর সমস্ত মনোযোগ এবং আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে বিলাসিতা, কেনাকাটা এবং লোক দেখানোতে।

ঠিক হল এক সপ্তাহের মধ্যেই ফুপু আম্মা এ বাড়িতে এসে উঠবেন। চিকিৎসায় যেন কোনো অযত্ন না হয় সে ব্যবস্থা হকই করবেন। ফুপাতো ভাইয়ের সাথে কথোপকথন সেরে তিনি লইয়ারের সাথে বসলেন। ঘন্টা খানেক সময় ধরে চললো আলোচনা। মানুষ যত বড় হয়, উঁচুতে ওঠে, তত বেশি সে নিজস্ব গন্ডি ছাড়িয়ে সর্ব সাধারণের হতে থাকে। তার নিজের জন্য বরাদ্দকৃত সময়টা হয়ে যায় সংকীর্ণ। এত কাজ, এতো দায়িত্বের ভারে প্রাণ খুলে নিশ্বাস নেয়াই দায় হয়ে ওঠে। তার ওপর নিজের ছেলেটাকে তিনি চোখ ভরে কতদিন দেখেন না! একটা সময় রোজ রাতে খাবার টেবিলে ছেলের সাথে আলাপ হত। ওই পারিবারিক অল্প একটু সময় তিনি প্রাণ ভরে উপভোগ করতেন। ছেলের বন্ধু রুদ্র অনেক দিন যাবৎ টানা এ বাড়িতে থেকেছে। সেই সময় বাড়িটা সারাক্ষণ কম বয়সী ছেলেমেয়েদের ভিড়ে ঝুম ঝুম করতো। এখন বাড়িটা হয়েছে মরা বাড়ির মতো। হক ডিনারের পর গায়ে শাল জড়িয়ে ছাদে এসে বসলেন। সুইমিং পুলের পাশে। সারা দিনের মধ্যে ঘুমোতে যাবার আগের এই সময়টুকুই শুধুমাত্র তার নিজের। এই অল্প সময়টাতে তিনি কাজের বাইরের জগৎটাকে নিয়ে ভাবতে বসেন। প্রাণ খুলে নিশ্বাস নেন। রাত বাজে এগারোটা। সব কিছু ঠিক থাকলে তার পুত্রের এতক্ষণে ভারত পৌঁছে যাবার কথা। তিনি পাঞ্জাবির পকেট থেকে মোবাইল বের করে অমৃতাকে ডায়াল করলেন।

পাঁচ ছয়বার রিং পড়ার পর ওপাশ থেকে অমৃতার গলার আওয়াজ ভেসে আসলো।

– ‘কী ব্যাপার?’

মেয়ের কথা বলার ধরণ দেখো! বন্ধুর বাবার সাথে কেউ এই টোনে কথা বলে? তিনি কিছু না বলে বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে রাগ হজম করলেন। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমৃতা বললো,

– ‘আপনি কি আমাকে মিস করছেন?’

হক দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, ‘অমৃতা, পাকামো করোনা!’

– ‘আপনি যেভাবে সকাল বিকাল আমাকে ফোন দিতে দিতে পাগল বানায় ফেলতেছেন। মনে হচ্ছে আমাকে ভীষণ ভাবে মিস করতেছেন।

– ‘তুমি কি সবার সাথে সব সময় এরকম বেয়াদবের মতো বল?’

– ‘না, সবার সাথে না। প্রয়োজনে বলি।’ অমৃতা ফোন কানে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসেছিল। হক ফোনের ভেতর দিয়ে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন। সেই সাথে বাতাস চলাচলের শব্দ। তিনি বললেন,

– ‘তোমরা যে জায়গায় গেছ, সেটা কি গ্রাম এলাকা?’

– ‘তাতে আপনার কী?’

– ‘মুখে মুখে তর্ক করোনা। প্রশ্নের উত্তর দাও।’

– ‘কতবার বলতে হবে আপনাকে? যে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই?’

– ‘তুমি কি চাও আমি তোমার বাবার কাছে ফোন দিয়ে তোমার নামে কমপ্লেইন করি?’

– ‘কী কমপ্লেইন করবেন শুনি?’

হক একটু সময় চুপ থাকলেন। তারপর ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘তুমি যে একজন চেইন স্মোকার এই খবরটা কি তোমার বাবা মা জানেন?’

অমৃতা থমকে গেল। বিস্মিত ভাবে বলল, 'এটা আপনি জানলেন কী করে?'

– 'আমি তো আগেই বলেছি, আমার সব খবর রাখতে হয়। আরেকটা কথা শোনো। তুমি যদি আমাকে প্রতি নিয়ত তোমাদের আপডেট না দাও তাহলে কিন্তু আমি বিভার বাবাকে ফোন করে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বলবো। তুমি তো জানো বিভার বাবা হার্টের রোগী। '

রাগে সারা শরীর রি রি করে উঠল অমৃতার। জ্বলতে জ্বলতে বললো, 'কী জানতে চান আপনি?'

– 'তেমন কিছুই না, আমার সিম্পল কয়েকটা প্রশ্নের সিম্পল উত্তর দিলেই কিন্তু ঝামেলা চুকে যায়। তুমিই পানি ঘোলা করছ বেশি কথা বলে।

অমৃতা এবার মুখ ঝামটা মেরে বলে উঠলো, 'আরে বলেন না কী জানতে চান? আমার অত সময় নেই!

– 'ঠিক মত পৌঁছে গেছো?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'কয়দিন থাকছো?'

– 'এখনো ঠিক নেই।

– 'সামি কী করছে?'

– ‘আই ডোন্ট নো! আপনার ছেলের ওপর নজরদারি করা ছাড়াও আমার আলাদা একটা লাইফ আছে!’

– ‘ও তাই নাকি?’

– ‘ঠিক তাই।’

– ‘ওই হিন্দু মেয়েটা, ও যেন আবার আমার ছেলের লেজ ধরে দেশে চলে না আসে। এ ব্যাপারটা তুমি খেয়াল রাখবে।’

– ‘আমার বয়েই গেছে!’

– ‘কী বললে?’

– ‘কিছুনা, আর কিছু বলবেন?’

– ‘সামিকে বলবে সে যেন তার মায়ের সাথে ফোনে কথা বলে নেয়। তার মা দুশ্চিন্তা করছে। আর আমি যে তোমার কাছ থেকে ওর খবর নিচ্ছি এ ব্যাপারটা যেন তার অজানা থাকে। ফোন ছাড়ছি।’

বাড়ি ফেরার মুখে সদর দরজার সামনে অমৃতাকে পাওয়া গেল। তার হাতে সেলফোন। বোধহয় কারো সাথে ফোনে কথা বলছিল। সামিকে দেখতে পেয়ে সে বললো,’দোস্ত, বিড়ি খাবি?’

সামি পাশ কাটানো গলায় বললো, ‘নারে, এখন না।’

ড্রইং রুমে অভিজিতের সাথে আকাশ,রুদ্র বসে আছে। তিনজনকেই বেশ হাসিখুশি, স্বাচ্ছন্দ্য দেখাচ্ছে। সামির উপস্থিতিটা তাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ অস্বস্তির উদ্রেক করলো। ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত ভাবে একবার তাকালো সে দুই বন্ধুর দিকে। অভিজিৎ কিন্তু চোখ

তুলে একটিবারের জন্যেও চাইলোনা সামির দিকে। সামির উপস্থিতি যেন সে টেরই পায়নি এমন ভাবে রুদ্রকে বললো, 'আপনি শুনেছি অনেক ভালো গান করেন। তা সেই গান শোনার সৌভাগ্য কি হবে একবার?'

রুদ্র গদগদ হয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই হবে, নিশ্চয়ই হবে। আজকে রাতেই গানের আসর জমবে।ডোন্ট ওরি।'

আকাশ ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে থাকা সামির দিকে তাকিয়ে বললো, 'তর কী হইছে?সব ঠিক?'

সামি খুব ছোট করে বললো, 'হুম ঠিক।'

কথাটা বলে আর দাঁড়ালোনা সে। মেয়েদের ঘরের দরজায় এসে টোকা দিল। সামি জানে ভেতরে এখন শুধু হৃদিই আছে। বিভা রান্নাঘরে। অমৃতা উঠোনে। অতএব এই ঘরের মালিক এখন হৃদি একা। একটু চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেলো। সামি নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে ঢুকলো। হৃদি বিছানায় শুয়ে আছে পাশ ফিরে। তার চোখ দুটি বন্ধ। মুখ জুড়ে কেমন এক বিষণ্ণ অস্থিরতা। ইশ ওই মুখের দিকে চাইতেও এখন সামির লজ্জা করছে। বুকের ধুকধুকানি টা কমছে না। সব মিলিয়ে একটা বিশ্রী অনুভূতি। বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে হৃদির বাহুতে আলতো ভাবে একটি হাত রাখলো সামি চমকে উঠে চোখ খুললো হৃদি। সামিকে দেখা মাত্র শোয়া থেকে উঠে বসে তড়িঘড়ি করে হাতের আঙুলে পরে থাকা আংটিটা খোলার চেষ্টা করতে লাগলো। যেন সামি এই আংটি ফেরত নেবার জন্যেই এসেছে এখানে।

সামি বিছানায় হৃদির পাশে বসলো। কিছু না বলে আড়ষ্ট ভাবে চেয়ে দেখতে লাগলো হৃদিকে। আংটিটা খুলতে গিয়ে কী শারীরিক কসরৎই না করতে হচ্ছে তাকে। দুনিয়ার সব বাজে ঘটনা কি একই দিনে ঘটাটা জরুরি ছিল? আজকের দিনের দ্বিতীয় বাজে, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রিয় ঘটনাটি ঘটে গেল হৃদিতার সাথে সেই মুহূর্তে। আংটিটা বের করা যাচ্ছেনা। হৃদি শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জিনিসটা আঙুল থেকে খুলে বের করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছেনা। সামি নির্বাক হয়ে বেশ খানিকক্ষণ এই কান্ড দেখে নিয়ে একটা সময় নিস্তরঙ্গ গলায় বললো, 'থাক না! এত তাড়াহুড়া করতেছিস কেন?'

– 'থাকবে কেন?এটা কি আমার জিনিস নাকি?' বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তির্যক গলায় বলল হৃদি।

বাথরুমে বেসিনের সামনে গিয়ে সে হাতে সাবান লাগালো। তারপর শুরু হল সাবান দিয়ে হাতের আঙুল পিচ্ছিল করে আংটিটা বের করে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা। সামি বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে বললো, 'তুই এসব বন্ধ করবি? কথা বলতে আসছিলাম তোর সাথে।'

হৃদি আগুন চোখে তাকালো সামির দিকে, 'কী কথা?'

ঠিক সেই সময় অমৃতার আগমন ঘটলো ঘরের ভেতর। সে একটু অবাক গলায় বললো,

– 'কীরে তোরা দুইটা বাথরুমে কী করস?'

সামি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'না কিছুনা, হৃদির নাকি মাথা ব্যথা। ওরে বললাম মাথায় একটু ঠান্ডা পানি দিতে।'

মিথ্যেটা বলে খারাপ লাগলো সামির। তাদের বন্ধুদের মধ্যে কোনোরকম রাখঢাক করার নিয়ম নেই। তারা একজন আরেকজনের কাছ থেকে কোনো কথা লুকোয়না। মিথ্যে বলেনা। কিন্তু আজকে নিয়তি এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে এই মুহূর্তে মিথ্যে না বলে উপায় নেই।

অমৃতা বললো, 'খেতে আয়। বিভা ডাকছে।'

সামি হৃদিকে দেখলো একবার। হৃদি তখনও আংটি নিয়ে ব্যস্ত। তার হাতের আঙুল লালচে বরণ ধারণ করেছে। আংটি দাঁত চেপে বসে আছে আঙুলের চামড়ায়। তবুও আংটি তার এই মুহূর্তেই খোলা চাই।

সামি সরে আসলো জায়গাটা থেকে। অমৃতাকে বললো, 'চল আমরা যাই, ও পরে আসবে।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিভা টেবিল সাজিয়ে ফেলেছে। সাদা ভাত, মুগের ডাল দিয়ে সবজি,কৈ মাছ ভাজা,মুরগির মাংস আর লুচি। অভিজিৎ হাসি মুখে অতিথিদের আপ্যায়ন করছিল। বিভাকে দেয়া কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। বিভার বন্ধুদের সাথে হেসে কথা বলছে, ভদ্র ব্যবহার করছে!

আকাশ, রুদ্র কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। বিভা, অভিজিৎ তখনো শুরু করেনি। খালি দুটি চেয়ারে সামি আর অমৃতা এসে বসলো।

সামির মুখোমুখি চেয়ারটাই অভিজিতের। লোকটার চোখে চোখে তাকাতে সামির কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। অস্বস্তি হচ্ছে বিভারও। অভিজিতের সামনে সামির উপস্থিতি তাকে আড়ষ্ট করে তুলেছে। এতক্ষণ যে স্বাচ্ছন্দ্য ভাবটা তার মধ্যে বিরাজ করছিল সামি আসার পরপর সেই ভাবটা উবে গেছে।

অমৃতা বললো, 'আপনাদের এখানে ট্যুরিস্ট স্পট কী কী আছে? এসেছি যখন সবটা দেখে যেতে চাই।'

অভিজিৎ নিজের প্লেটে খাবার তুলতে তুলতে বললো, 'আছে কয়েকটা ভালো ভালো জায়গা। তবে এ জায়গার মূল আকর্ষণ হল বন বনানী আর বন্য জন্তু। গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের ভেতরে গেলে বেশ কিছু জন্তু জানোয়ার দেখতে পাবেন। চাইলে হাতির পিঠেও চড়ে দেখতে পারেন।'

– 'ওয়াও। সাউন্ডস ইন্টারেস্টিং। কিন্তু দুলাভাই, আপনি আমাদেরকে আপনি আপনি করে বলছেন কেন? তুমি বলাতে কোনো পানিশমেন্ট নেই।'

বিভা ফোড়ন কাটলো, 'উনি আবার একটু বেশি ভদ্র কিনা, তাই উনার মুখ দিয়ে তুমি বের হয়না।'

অমৃতা হাসতে হাসতে বললো, 'আমরা সবাই কিন্তু খুব বেশি অভদ্র। এটা আপনার জানা আছে তো? প্রিপারেশন নিয়ে রাখেন। নইলে আচমকা আমাদের অভদ্রতা দেখে আবার মূর্ছা যেতে পারেন।'

হৃদি এসে গেছে ততক্ষণে। তার মুখ ভার। এসে কারো সাথে কথা না বলে সে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো। সামি আড়চোখে দেখলো হৃদিতাকে। তার হাতের আঙুলে এখনো আংটিটা রয়ে গেছে। খোলা যায়নি। হাপুস হুপুস করে খেতে খেতে রুদ্র খুব জরুরী গলায় বিভাকে বললো, 'এই বিভা খুব গরম লাগতেছে। কাজের মেয়েটাকে বল 'ই' করতে।'

বিভা বুঝতে না পেরে বললো, 'কী বলিস?'

রুদ্র মাংস চিবোনোতে বিভোর হয়ে মাথার উপরের ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'গরম লাগতেছে ওই মেয়েটাকে বল ইটা একটু ই করে দিতে।'

বিভা মহা বিরক্তি নিয়ে রুদ্রর দিকে একটু সময় তাকিয়ে থাকলো। কথাটা বলেই রুদ্র আবার খাওয়ায় ব্যস্ত হয়ে গেছে। বিভা চেঁচিয়ে ডাকলো, 'দূর্গা, এই দূর্গা!'

দূর্গা দৌড়ে আসলো। বিভা বললো, 'ই' টা একটু ই করে দাও।'

দূর্গা থ বনে গিয়ে চেয়ে রইল বিভার দিকে।

– 'ফাজলামো করিস?' চোখ গরম করে বলল রুদ্র, বিভাকে।

– ‘ফাজলামোর কী আছে? তুইই তো বললি মেয়েটাকে বলতে ই টা একটু ই করে দিতে।’

রুদ্র মুখ গোঁজ করে বলল, ‘ফ্যান ছাড়তে কইছি গাধী।’

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এমন কি শান্তশিষ্ট, সুশীল অভিজিৎও ওদের কান্ড দেখে না হেসে থাকতে পারলনা। হাসতে পারল না শুধু সামি। তার কেন যেন নিজেকে এ মুহূর্তে বড় বেশি অবাঞ্চিত বলে মনে হচ্ছে। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে, ঘেন্না হচ্ছে, কোন আক্কেলে সে এই লোকটার বাড়িতে যেচে পড়ে আসতে গেল? বিভাকে এক নজর দেখবার আকাঙ্খা তাকে হিতাহিত জ্ঞানশুন্য করে তুলেছিল। পুরো বিষয়টা যে কতটা দৃষ্টিকটু দেখাতে পারে তা একবারের জন্যও ভেবে দেখেনি সে।

সামি বিধ্বস্ত চোখে বিভার দিকে চাইল। বিভা কেন আসবে বলে কথা দিয়েও আসলো না? বিভা যদি সময়মত জায়গাটায় পৌঁছুতে তবে তো এই বিশ্রী কান্ডটা তার আর হৃদিতার সাথে ঘটতো না। অভিজিতের পাশে বসা হাসি মুখের বিভার দিকে চেয়ে সামির বুকের ভেতরটা আচমকা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠলো। এই বিভাকে সে বুঝতে পারছেনা, চিনতে পারছেনা। তার প্লেট প্রায় শূন্য ছিল। সে অনেক ক্ষণ ধরে একটা লুচি আর অল্প একটু ডাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। অভিজিত সবার পাতেই এটা সেটা তুলে দিচ্ছিল শুধু সামি বাদে। বিভাও আগ বাড়িয়ে অভিজিতের সামনে সামিকে কিছু সাধতে পারছিল না। কে জানে অভিজিৎ আবার কীভাবে নেয় ব্যাপারটা

অভিজিৎ চোরা চোখে ফর্সা, কোকড়া চুল ওয়ালা ছেলেটাকে দেখছিল। এর আগে বাংলাদেশে যখন এর সাথে দেখা হয়েছিল তখন ঠিক সেরকম ভাবে খেয়াল করা হয়নি। তখনো অভিজিৎ জানতো না যে এই যুবকটি বিভার কাছে বিশেষ কেউ। তাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করাও হয়ে ওঠেনি এই যুবক নিঃসন্দেহে সুদর্শন। উচ্চতায়

অভিজিৎকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আচার আচরণে একটা উদ্ধত ভাব আছে যেটা খুব সহজেই চোখে পড়ে। কিংবা কে জানে হয়তো ওর আচরণের এই উদ্ধত দিকটা শুধুমাত্র অভিজিতের জন্যই বরাদ্দ! সে শুনেছে এর বাবা বিরাট বড় শিল্পপতি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতেও একজন পরিচিত মুখ। মেয়েরা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরণের ছেলেদের প্রেমে পড়ে। দেখতে ভালো, বাবার অঢেল টাকা, আর কী চাই? ধর্মের ফারাকটা না থাকলে বিভার বাবা মাও হয়ত খুশিতে আট খানা হয়ে একেই জামাতা হিসেবে বরণ করে নিতেন। অভিজিতের বুকে একটা অদ্ভুত, সূক্ষ্ম ব্যথা হচ্ছিল। অথচ তার তো খারাপ লাগার কথা ছিল না। দু দিন বাদেই বিভা চলে যাচ্ছে। তার চলে যাবার টিকেট অভিজিৎ নিজ উদ্যোগেই করেছে। এই যুবকটির সাথে তার নাম কা ওয়াস্তে স্ত্রীর প্রেমের খবরটা তার কাছে কখনওই অজানা ছিলনা। সব কিছু জেনে শুনে বিভাকে বিয়ে করেছিল সে শুধুমাত্র বিভার বাবার হার্ট টা বাঁচাতে, তাও আবার বিভারই অনুরোধে। অভিজিৎ বরাবরই বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ। কোনো কিছু নিয়েই আবেগের বাড়াবাড়ি করাটা তার ধাতে নেই। কিন্তু আজকে তার সেই যুক্তিশীল মনটা কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে! এই ছেলেটাকে কেন সহ্য করতে পারছেনা সে? কেন এত দিন বাদে এসে তার অন্তরের অন্তরাত্মা না চাইতেও এমন প্রবল ভাবে বিদ্রোহ করে উঠছে?

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকেবুকে যাবার পর দেখা গেল সবাই কম বেশি ক্লান্ত। গানের আসরটা সে রাতে আর বসলোনা। রুদ্রই সবার আগে বিছানায় গেল। বাকিরা বসার ঘরে সোফার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। হৃদি গুম হয়ে নিজের মোবাইল ঘাঁটছিল। সামি সবার সামনেই ওকে আচমকা বললো, ‘হৃদি, একটু এদিকে আয় তো, কথা আছে তোর সাথে।’

হৃদি ফোঁস করে উঠল,’কোন দিকে আসবো?’

– ‘মানে অন্যদিকে, একটু প্রাইভেসি লাগবে।’

আকাশ হাহাকার করে বলে উঠলো, ‘মানে কী? ফ্রেন্ডদের মধ্যে আবার কীসের প্রাইভেসি?’

– ‘পরে বলবো তোদেরকে।’ ঠান্ডা গলায় বললো সামি।

– ‘আমি এখন কোথাও যাইতে পারবোনা। বিরক্ত লাগতেছে।’

সামি হঠাৎ দুম করে উঠে দাঁড়ালো বসা থেকে। দ্রুত হেঁটে হৃদির সামনে গিয়ে ওর হাত টেনে ধরে বলল, ‘ফাইজলামি করিস? বলতেছি কথা আছে। বাংলা বুঝিস না?’

হৃদিকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে হৃদির হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে।

অভিজিৎ একটু বিস্ময় নিয়ে বিভাকে বললো, ‘উনি কি সব সময়ই এরকম? একটু উদ্ধত? এরোগ্যান্ট?’

বিভার অভিজিতের কথাটা ভালো লাগলো না। সামিকে নিয়ে কেউ খারাপ কিছু বললে তার ভালো লাগেনা। সে স্তিমিত গলায় বললো, ‘মোটেও না। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।’

অমৃতা আর আকাশ সমস্বরে প্রশ্ন করে উঠলো, ‘কিন্তু কী হয়েছে?’

হৃদির হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে ভেতরের ঘরে নিয়ে এসে বিছানায় এক ধাক্কায় ফেলে দিল সামি। তারপর ভারী কাঠের দরজাটা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়াম শব্দ তুলে বন্ধ করল।

তাল সামলাতে না পারা হৃদির শরীরটা ছিটকে পড়েছিল, বিছানার ওপর। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল এক আর্ত চিৎকার।

কোঁকাতে কোঁকাতে লুটিয়ে পড়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে বসল সে। তার খোলা চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ফুলেফেঁপে আছে। শাড়ির আঁচল গেছে দুমড়ে মুচড়ে। হাতের কব্জি ডলতে ডলতে সে বাঘিনীর মতো গর্জে উঠে বললো, 'কী ব্যাপার? তামশা করিস হারামজাদা?'

সামি তীব্র ভাবে তাকালো হৃদির দিকে। তার চোখে ধকধক করছে তেজ। সে দাঁতে দাঁত পিষে বলল,

– 'ঢং করার আর জায়গা পাস না?'

– 'সমস্যা কী তোর?'

– 'তোর সমস্যা কী? তোরে আমি সেই তখন থেকে বলতেছি উই নিড টু টক! তুই আমার কথা কানেই নিচ্ছিস না। মানে মানুষের সহ্যের একটা সীমা থাকে।

– 'কী কথা বলবি তুই আমার সাথে? বাল, তোর সাথে কোনো কথা বলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই।'

– ‘তোর সাথে কথা বলার জন্যেও আমি মইরা যাইতেছিনা বুঝছস? বাট উই নিড টু টক এবাউট আওয়ার কিস।’

হৃদির চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলো। ফুঁসতে ফুঁসতে বললো, ‘আওয়ার কিস মানে? আই ডিড নট কিস ইউ এসহোল! ইউ ডিড।’

সামির মুখখানায় আক্রোশের তীব্র রেখা দগদগ করে ওঠে। প্রচন্ড ঝাঁঝ নিয়ে বলে, ‘ওকে ফাইন। আই ডিড। বাট আমি জানতাম না এটা তুই। আমি তোকে বিভা ভাবছিলাম।’

– ‘দ্যাটস নট দ্যা পয়েন্ট!’

– ‘দ্যাট ইজ সো পয়েন্ট! আরে আজব কেন আমি তোকে শুধু শুধু কিস করতে যাবো। মানে আমাকে তোর এতটাই ফালতু মনে হয়?

– ‘ফালতুই তো তুই। লাস্ট টাইম কক্সবাজারে বিভার সাথে যা করেছিস এবার আমার সাথেও তাই করলি। মানুষ একই ভুল বার বার কীভাবে করে? বিভার সাথে ঘটনা ঘটার পর আচমকা তুই বিভাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলি। কে জানে কোন দিন হুট্ করে বলে বসবি আমাকেও তোর বিয়ে করা চাই।’

কথাটা মাটিতে পড়ার আগেই সামির ফর্সা গাল লাল টকটকে হয়ে গেলো। অপমানে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো কান। সে দিশাহারা হয়ে বলে উঠলো, ‘হ্যাঙ্গ অন, তুই কি ভেবেছিস আমি কাজটা ইনটেনশনালি করছি? সিরিয়াসলি? আই মিন হাও কুড ইউ ইভেন থিংক এবাউট ইট? আল্লাহ! তোকে?... মানে তোকে?’

হৃদি মুখ ঝামড়ে উঠে বলে, ‘করতেই পারিস। তোর কোনোকিছুর ঠিক আছে নাকি?’

সামি এবার খুব কঠিন ভাবে বললো, ‘ফালতু কথা বলিস না হৃদি, আমি কখনোই তোর সাথে এমন কাজ করব না, আর তোকে কখনো বিয়েও করতে চাইবো না।’

হৃদি কেটে কেটে শব্দ গুলো উচ্চারণ করলো, ‘তুই আমাকে কখনোই বিয়ে করতে চাইবি না?’

– ‘কখনোই না! মাথা খারাপ!তুই আমার জাস্ট ফ্রেন্ড।’

হৃদি অদ্ভুত হাসে, ‘আর যদি কোনো দিন হুট্ করে তুই আমাকে বিয়ে করতে চাস? তখন কী হবে? কী করবি তুই?’

সামির মুখটা আকস্মিক কেমন সন্দেহ প্রবণ হয়ে ওঠে। সে চোখ সরু করে প্রশ্ন করে, ‘তুই চাচ্ছিসটা কী বল তো?’

– ‘আমার প্রশ্নের উত্তর দে, যদি··· ধর যদি তোর কোনো দিন আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা হয়, তখন তুই কী করবি?’

– ‘কী করবো আবার। যা, কান কাইটা ফেলবো। সামিউল হক থেকে হইয়া যাবো কান কাটা সামি। খুশি?’

– ‘অকে, ইটস আ ডিল।’

সামি তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে, হেল ইয়াহ, ইটস আ ডিল! তুই কী যে ভাবছিস আমাকে হৃদি! মানে লুক এট ইওরসেল্ফ, ইউ আর নট মাই কাপ অফ টি। আর সেবার কক্সবাজারে বিভাকে আমি জেনেশুনে সজ্ঞানে চুমু খাইছিলাম। হ্যাঁ হঠাৎ করে হয়ে গেছিল এটা ঠিক, কিন্তু আমিতো জানতাম ওটা বিভাই। এবারও তো বিভা মনে করেই……

হৃদি হাত তুলে সামিকে থামিয়ে দিল, ‘ইউ আর নট মাই কাপ অফ টি এটার মানে কী?’

সামি অধৈর্য গলায় বললো, ‘মানে তোর প্রেমে পড়াটা আমার পক্ষে কোনোদিনই সম্ভব না। তুই ওরকম প্রেমে পড়া টাইপ মেয়ে না। আর তাছাড়া তুই আমার খুব ভালো বন্ধু। কাছের বন্ধু। আকাশের পর পর, তুইই আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। তোকে নিয়ে অন্য কিছু চিন্তা করাও পাপ!’

হৃদি ডগডগে চোখদুটো মেলে ধরলো সামির মুখের ওপর। চেয়ে রইল একদৃষ্টে কয়েকটা মুহূর্ত। তার চোখের তেজটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। তার বদলে চিকচিক করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো কয়েক বিন্দু জল। সামি সেদিকে লক্ষ্য করলো না। সে তড়িঘড়ি করে পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে নিয়ে মেসেঞ্জার খুলে বিভার সাথে কথোপকথনের বক্সটা বের করল। হৃদির চোখের সামনে ফোন মেলে ধরে বললো, ‘এই দ্যাখ, বিভাকে আমি আসতে বলছিলাম বাইরে উঠানে। ঠিক ওই সময় বিভার আসার কথা ছিল। আল্লাহর কসম দোস্ত,অন্ধকারে তুই যখন হেঁটে আসতেছিলি তখন আমি ধরেই নিছিলাম এটা বিভা।’

হৃদি ঝাপসা চোখে মেসেজগুলো দেখলো। তার চোখ থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা জল।

সামি দু পা এগিয়ে এসে হৃদির একটা হাত ধরার চেষ্টা করলো। হৃদি এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিলো। ধমকে উঠে বললো, 'সামি প্লিজ, দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে।'

১৬

বিভা আর অমৃতা ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলো, 'হৃদি, কী হইছেরে? তোর আর সামির মধ্যে কাহিনীটা কী?'

হৃদি লেপের তলায় গুটিশুটি হয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ছিল বিবশ হয়ে। এক তীব্র জ্বালা আর উত্তাপ তার ভেতরটাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। কানে বারংবার বাজছে সামির মাত্র বলে যাওয়া কথাগুলো। নিজের সাথে একটা ভালো বোঝাপড়া দরকার তার। নিজেকে দেয়া দরকার বিস্তর সময়। কিন্তু সেই সময়টা কোথায়? সে একটুও না নড়ে পাথরের মতো গলায় উত্তর দিল, 'কালকে বলবো, আজকে না। প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে। ঘুমাইতে দে। লাইট বন্ধ কর।'

অমৃতা আর বিভা একজন আরেকজনের মুখের দিকে চাইলো। কোনো কথা না বলে বিভা হেঁটে গিয়ে সুইচ টিপে বাতি নেভালো। নেভানোর সাথে সাথেই ঘরের ভেতর ঝুপ করে নামলো এক নিকষ কালো অন্ধকার। এই ঘরে কোনো হিটারের ব্যবস্থা নেই। বেশ ঠান্ডা। জানালা বন্ধ থাকার পরেও বাইরে থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝি পোকার নিরবিচ্ছিন্ন ডাক। ভেসে আসছে শুকনো পাতার ওপর জন্তু চলাচলের শব্দ। হঠাৎ হঠাৎ ডাকছে হাতির দল। অন্ধকার চোখে সয়ে আসার পর বিভা আস্তে আস্তে

হেঁটে অমৃতার কাছে এগিয়ে আসলো। তারপর কোনো ভূমিকা ছাড়াই আচম্বিতে সে অমৃতাকে দু হাত বাড়িয়ে জাপটে ধরলো। আনন্দে মাখামাখি হয়ে বললো, ‘কত দিন পর দোস্ত! আমি খুশিতে মইরা যাবো!’

দুই বান্ধবী আনন্দে কিছুক্ষণ তিড়িং বিড়িং করে নাচানাচি করল ইচ্ছে মতো হাত পা ছুঁড়ে। ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে মনের আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল তারা। যেন সদ্য বয়োসন্ধিতে পা দেয়া দুটি কিশোরী। একটু বাদে লাফ দিয়ে দুজনে উঠে পড়লো বিছানায়। কাঠের বিছানা মড়মড় শব্দ করে গোঙাতে লাগলো। হৃদি মহা বিরক্ত হয়ে বললো, ‘কী ব্যাপার মাঝরাতে বিছানার ওপর লম্ফঝম্প শুরু করছিস কেন? ঘুমাইতে দে!’

বিভা হৃদির গায়ের ওপর থেকে লেপটা এক টানে সরিয়ে নিলো, ‘এতদিন পর তোদেরকে পাইছি, ঘুমাবি মানে?’

হৃদি লেপটা নিজের গায়ে আবার টেনে নিলো। কঠিন গলায় বললো, ‘আমার প্রচন্ড মাথা ব্যথা করতেছে। বিরক্ত করিস না।’

অমৃতা বিভাকে বললো, ‘আচ্ছা থাক। ও ঘুমাক। আমরা তো আছি কয়েকদিন। তুই মন খারাপ করিস না।’

বিভা ঠোঁট ফুলিয়ে ফেলল বাচ্চাদের মতো, ‘দ্যাখ না, এই হৃদির বাচ্চি কেমন যেন হয়ে গেছে। এত দিন পর আমারে দেখছে কিন্তু ওর মইধ্যে কোনো ফিলিংস নাই। ও আমারে আর ভালোবাসেনা।’   হৃদি কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শোয়া থেকে উঠে

বসলো। হিসহিসে গলায় বললো, ‘এইসব ন্যাকা ন্যাকা বাংলা সিনেমার ডায়লগ কোত্থেকে শিখছিস? কলকাতার বাবুর কাছ থেকে?’

শুনে বিভা আর অমৃতা হিহি করে হেসে উঠল। বিছানার উপর গোল হয়ে বসেছে ওরা। বহুদিন পর তিন বান্ধবী এক ছাদের নিচে একত্রিত হয়েছে। আজকের রাতটা তাই আনন্দে মাখামাখি রূমঝুম করা এক রাত। এমন রূমঝুম রাতে সত্যিই কারো ঘুমোতে হয়না।

অমৃতা বললো, ‘আমার ঈদ ঈদ লাগতেছে। ছোট বেলায় ঈদের আগের রাতে যেই ফিলিংসটা হইত। ঠিক সেইরকম।’

– ‘চল প্ল্যান করে ফেলি, এই কয়েকদিন কী কী করবো, কোথায় ঘুরব সব আজকেই ঠিক করে ফেলি।’ বিভা বলল খুশিতে গদগদ হয়ে।

দুই বান্ধবীর গলার স্বরের আনন্দের রেশটা একটু একটু করে হৃদিকে ও ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। বুকের ওপর চেপে বসে থাকা ভারটা নেমে যাচ্ছিলো আস্তে আস্তে।

অমৃতা বললো, ‘কালকে কি আমরা ন্যাশনাল পার্কে যেতে পারবো?’

– ‘না কাল অভিজিতের অফিস। আমি নিজেই এখন পর্যন্ত যাইনি। সো রাস্তা চিনে তোদের নিয়ে যেতে পারবোনা।’ এটুকু বলে বিভা একটু থেমে আবার বললো, ‘তবে আশপাশটা ঘুরে দেখতে পারিস। খুব কাছেই জলঢাকা ব্যারেজ। নদীর ওপারে ভুটান পাহাড়। খুব সুন্দর।’

হৃদি বললো, ‘ওখানে কি হেঁটে যেতে হবে?’

– ‘হাঁটবি না তো কেমনে যাবি? কোলে কইরা নিয়া যাবে কে তোরে?’ বিভার প্রশ্ন।

হৃদি ফিচেল গলায় বললো, ‘কে আবার? আমাদের দুলাভাই? তোমার হ্যান্ডসাম জামাই?’

বিভা খুব হাসলো, ‘হ, ভালোই বলছিস। বলিস তারে তোদের দুইজনকে কোলে কইরা নদীর পাড়ে নিয়া যাবে।’

অমৃতা বললো, ‘যাই বলিস, অভিজিৎ কিন্তু জোশ। আমার অনেক ভালো লাগে। তুই বল বিভা, উনার সাথে সব কেমন চলছে?’

বিভার আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকা কণ্ঠটায় এ প্রশ্নটা যেন আকস্মিক এক ভাটার সংকেত নিয়ে আসলো। নিভন্ত ভাবে বললো,’কেমন আবার চলবে। ও তো আমার জন্য টিকেট করছে দেশে যাওয়ার। এই উইকেন্ডেই চলে যাচ্ছি।’

কথা শুনে দুই বান্ধবী থমকে গেল।

– ‘চলে যাচ্ছিস মানে?’ হৃদি বিস্মিত।

– ‘এতো অবাক হওয়ার কী আছে? যেমনটা হবার কথা ছিল তেমনটাই হচ্ছে। দেশে চলে যাবো। তারপর ডিভোর্স দিব। দেন কিছুদিন পর আমি আর সামি, আমরা বিয়ে করবো।’

অমৃতা শীতল গলায় বললো, ‘তুই এসব কী বলতেছিস বিভা?’

বিভা অবাক হয়, ‘কী বলছি মানে? এটাই কি হবার ছিলো না?’

– ‘তাহলে তুই অভিজিৎকে বিয়ে করলি কেন? ডিভোর্সই যদি দিবি?’

– ‘বিয়ে করেছি কেন তুই জানিসনা? আমার বাবা মরে যাচ্ছিল।’

– ‘এখন যদি তুই ডিভোর্স দিয়ে সামিকে বিয়ে করিস, তাহলে তোর বাবা বুঝি খুব বেঁচে থাকবেন? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? জীবনে সব সময় মন দিয়ে চিন্তা করলে হয়না, মাঝে মাঝে বিবেক বুদ্ধি দিয়েও চিন্তা করতে হয়।’

বিভা খুব অধৈর্য গলায় বলে উঠল, ‘আমি এতকিছু জানিনা, সামিকে আমার চাই। আমি ওকে ভালোবাসি। ভালোবাসলে অত বিবেক বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করা যায়না। বুদ্ধি শুদ্ধি সব জানলা দিয়ে পালায়। তুই কখনো কাউকে ভালোবাসিস নি তো তাই বুঝতে পারছিস না।’

অমৃতা একটু চুপসে গেলো। ভালোবাসলে কি মানুষ হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হয়ে যায়? বাস্তব বুদ্ধি বিবর্জিত হয়ে যায়?সত্যিই সে তো কখনো কাউকে ভালোবাসেনি আজ অবধি! ভালোবাসলে কী রকম লাগে তা সে জানবে কী করে?

হৃদি আস্তে করে বললো, ‘অভিজিৎ এতো ভালো একটা মানুষ। তার সাথে কি এমন অন্যায় কাজ করাটা ঠিক হচ্ছে?’

বিভা ক্যাটক্যাট করে বলল, ‘ভালো মানুষ বলেই তো হয়েছে আমার জ্বালা। একটু খারাপ হলেই তো বেঁচে যেতাম! খারাপ হলে আমার একে ছেড়ে যেতে এতো কষ্ট হতনা।’

অমৃতা চমকে উঠল, ‘কষ্ট হচ্ছে নাকি?’

– ‘হচ্ছে তো দোস্ত, একটা কেমন গিলটি ফিলিংস হচ্ছে ভেতরে ভেতরে।’ বলতে গিয়ে একদম কাঁচুমাচু হয়ে গেল বিভা।

কেউ একজন দরজার কড়া নাড়ছে খুটখুট করে। নিশ্চুপ শব্দহীন রাতে ওই খুটখুট শব্দটা বিস্ফোরণের মতো বুকে এসে লাগল। বিভা বিছানা থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজার ওপাশের করিডোরে একটা হালকা নীল আলোর ডিম লাইট জ্বলছে। সেই নিষ্প্রভ আলোয় আকাশকে দেখা গেল। সে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বলল, ‘রুদ্রর বাচ্চা ঘড়ঘড় কইরা নাক ডাকতেছে। শালার নাক ডাকার জ্বালায় না পারতেছি ঘুমাইতে, না পারতেছি জাইগা থাকতে। আর সামির তো ভাব হইছে। ভাবের ঠ্যালায় ব্যাটা বারান্দায় গিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানতাছে। কিছু জিগাইলেও উত্তর দেয়না। কাহিনী কী বুঝলাম না মামা। ‘

শুনে বিভা বললো, ‘আমি ওর কাছে একটু যাই। মনে হয় আমার উপর রাগ করে আছে।’

সন্ধ্যে নামার পর সামির সাথে তার উঠোনে দেখা করার কথা ছিল। ভেবেছিল দুর্গাকে দ্রুত পেঁয়াজগুলো কেটে দিয়েই বের হয়ে আসবে। কিন্তু রান্নাঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই রুদ্র আর অভিজিতের প্রবেশ ঘটলো। এটা সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে

সময় কোনদিক দিয়ে কেটে গেল টেরই পেলোনা। অভিজিতের সামনে ফোন হাতে নিয়ে যে সামিকে একটা টেক্সট করবে সে উপায়ও রইলোনা আর। এরপর থেকেই সামি খুব রেগে আছে। খাবার টেবিলে একটা কথাও বলেনি। এমনকি ঠিক মতো খেতেও পারেনি বেচারা। বিভা দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসল ঘর থেকে।

আকাশ বিছানার ওপর উঠে বিভার জায়গাটা দখল করে বসল। অন্ধকারে মূর্তির ন্যায় বসে থাকা দুই বান্ধবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, 'কী কথা হচ্ছিলো?'

– 'আরে বিভা একটা পাগল। কী বলে নিজেও জানেনা।' অমৃতা বললো।

– 'এটা তো নতুন কথা না। সবাই জানে।'

বিছানার মাথার কাছে রাখা শিমূল তুলোর একটা নরম বালিশ হাত দিয়ে খামচে ধরে নিজের কোলের ওপর তুলে নিল অমৃতা। বলল, –'শোন আমার কী মনে হয় জানিস?এ মুহূর্তে বিভার দেশে যাওয়াটা একেবারেই ঠিক হবেনা। অন্তত আরো দু এক মাস অপেক্ষা করা উচিৎ। এখন দেশে গেলে আমাদের প্রত্যেকের বাবা মা বলবে যে আমরা এখানে এসে বিভাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর সামির আব্বার কথা তো বাদই দিলাম। সে আমাকে জ্যান্ত গিলে খাবে।'

আকাশ একটু অবাক হয়ে বললো, 'কিন্তু দেশে যাওয়ার কথা আসছে কেন? বিভাকে দেখে তো বেশ হ্যাপিই মনে হচ্ছে। আমার তো ধারণা অভিজিতের সাথে ওর ভালোই চলছে সব।'

হৃদি এতক্ষণে মুখ খুললো, 'তুই তো জানিস না অভিজিৎ বিভার জন্য দেশে ফেরার টিকেট করে দিয়েছে। ওরা দুজনেই সেপারেশন চায়।'

– 'তাই নাকি? কী কাণ্ড!' বলে আকাশ একটু সময় চুপ করে থাকলো। তারপর আবার বললো, 'শোন আমার বাপের বৌ একটু আগে ফোন দিছিলো।'

– 'তাই? কী বললেন আন্টি?'

আকাশ চিন্তাযুক্ত গলায় বললো, 'আমি বুঝিনা এই মহিলা এত অত্যাচারের পরেও কেন এই বাসায় পইড়া আছে। সমস্যা কী?'

অমৃতা সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করল, 'আবার কি কিছু হয়েছে?'

– 'কী আবার হবে? যা প্রতিদিন হয় তাই হইছে। আমার বাপ মাইরা তার কপাল ফাটায় দিছে। পরে কান্নার আওয়াজ শুইনা পাশের বাসা থেকে লোক ছুইটা আসছে। শাসায় গেছে নাকি এরপর এরকম কিছু হইলে নারী নির্যাতন আইনের আওতায় মামলা দিবে।

– 'ঠিকই আছে, তোর বাপের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত। শোন আন্টির সাথে আমার ঐদিন এ ব্যাপারে কথা হয়েছিল। আমি ঠিক করেছি তোর বাবা মা' কে একদিন আমাদের এন জি ও' র অফিসে ডাকবো।'

আকাশ অমৃতাকে মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'বাবা মা বলছিস কেন? ওই মহিলা আমার মা না। আমার মা মরে গেছে!'

– 'আচ্ছা বুঝছি,তোর বাপ আর বাপের বৌ রে আমাদের অফিসে ডাকবো। জানি তোর বাপ আসতে চাইবোনা। সো আমি সামন পাঠাবো তোর বাসার ঠিকানায়।'

– ‘কিছুই বুঝলাম না, অফিসে গিয়া কী করবে? আর কিসের সামন টামন? কী কইতেছিস এসব? তোদের ওখানে এসব হয় নাকি? তোরা না হিজড়া নিয়া কাজ করস?’

– ‘ফ্যামিলি ল নিয়েও কাজ করা হয়। শোন কোর্টের বাইরে ফ্যামিলি প্রব্লেম সল্ভ করার একটা প্রসেস আছে। এটাকে বলে অল্টারনেটিভ ডিস্পিউট রিজলিউশন। এ ডি আর। সো নিয়ম মোতাবেক যে কোন এক পক্ষকে কমপ্লেইন করতে হবে। আমি আন্টির হয়ে কমপ্লেইন টা করে দেব ভাবছি। তোর আব্বার নামে নোটিশ যাবে।’

– ‘এতে লাভটা কী হবে?’ আকাশ থমথমে গলায় প্রশ্ন করলো।

– ‘কাউন্সেলিং হবে। তোর আব্বা আর তার ওয়াইফের মধ্যের প্রব্লেম ফিগার আউট করার চেষ্টা করবে কাউন্সেলর বা মেডিয়েশন অফিসার।’

– ‘বালটা করবে। শোন এইসব হাবিজাবিতে কোন লাভ হবেনা। আমি ঠিক করছি এবার দেশে ফিরে গিয়ে ওই মহিলারে বলবো যে জানে বাঁচতে চাইলে তুমি তোমার বাপের বাড়ি ফিরা যাও। সিরিয়াসলি দোস্ত আমি এই টেনশন মাথায় নিয়া থাকতে পারবোনা। ওই লোকটা পুরাই পাগল, নেশাখোর, যে কোন সময় মহিলাকে খুন করে রেখে দেবে জানতেও পারবিনা।’

জলঢাকা নদী ঝিরঝির শব্দ তুলে বয়ে চলেছে অবিরাম। দূর অন্ধকার পাহাড়ের মাথায় সাদা মেঘের টোপর। কুয়াশাও হতে পারে। কোনটা কুয়াশা আর কোনটা মেঘ তা ঠিকমতো ঠাওর করে ওঠা যায়না। ঝিঁঝি পোকার নিরবিচ্ছিন্ন শব্দ, আর হঠাৎ হঠাৎ রাত পাখিদের বুক চমকানো ডাকে ভারী হয়ে আছে এলোমেলো বনজ বাতাস। প্রকৃতির এই অলৌকিক গা ছমছমে সৌন্দর্য গায়ে জড়িয়ে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সামি। বারান্দার রেলিঙের ধার ঘেঁষে। তার এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট,অপর হাতে সেলফোন। এই মাত্র মায়ের সাথে কথা বলে ফোন কাটলো সে।

মা খুব কাঁদছিল। অকারণ এই কান্নার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা তার কাছে নেই। মাত্র কদিনের জন্যই তো বেড়াতে এসেছে। আসার আগে সঙ্গত কারণেই মা' কে জানিয়ে আসা হয়নি। এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। একজন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের জোয়ান ছেলের পক্ষে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বাবা মায়ের অবগতি এবং সম্মতি সাপেক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। মায়ের মন অবশ্য আজ অন্য কারণেও খারাপ। গ্রামের বাড়ি থেকে চাচা এসেছেন দাদীজানকে নিয়ে। দাদীজানের ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসা দরকার। ঢাকা শহরে চিকিৎসা করতে হলে চাচারা চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে তাদের বাড়িতে অবস্থান করবেন এটাই স্বাভাবিক। এর ব্যতিক্রম কিছু ভাবাই যায়না। কিন্তু সামির মায়ের গ্রামের লোকদের নিয়ে আছে ভয়ঙ্কর এলার্জি। বাড়ির মধ্যে টানা দুই তিন মাস গ্রামের লোক থাকবে এটা ভাবতেই তার গায়ে জ্বর চলে আসার উপক্রম হয়েছে। অথচ কাজ কিছুই তার নিজের হাতে করতে হয়না। ঝি চাকরে বাড়ি ভর্তি। সামি জানে বাবা সারাজীবন তার মা' কে রাণীর মতো মাথায় তুলে রেখেছেন। যে কোন ইচ্ছে প্রকাশ করা মাত্র আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জ্বীন হয়ে স্ত্রীর ইচ্ছে পূরণ করেছেন তিনি। সারা দুনিয়ার সুখ তার মায়ের পায়ের তলায় এনে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। বাবার এই চেষ্টায় কখনও কোন ত্রুটি দেখেনি সে। আজকে যদি বাবার আত্মীয় স্বজনদের বিপদের দিনে তাদেরকে অল্পবিস্তর আদর যত্ন করে বাবাকে একটু খুশি করা যায়, তবে এতটুকু করতে মায়ের বাঁধছে কোথায়? মাকে মাঝে মাঝে বড্ড ছেলেমানুষ বলে মনে হয় তার। একটু বোকাও। হ্যাঁ বোকা না হলে কি আর এসব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে কেউ এতটা আপসেট হয়ে পড়ে? বলতে কী, সামি এখনও বাবা লোকটাকে খুব বেশি ঘেন্না করতে পারেনা। বরং এত কিছুর পরেও বাবার জন্য এক বুক ভালোবাসা তার ভেতরে টলমল করে সর্বদা। কিন্তু সেই ভালোবাসা দেখতে পাবার মতন মন বা চোখ কোনো টাই লোকটার নেই। আশপাশের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়কে নিজের আয়ত্তে রাখতে চাইবার বাজে অভ্যাস হয়ে গেছে তার। নিজের সন্তানকেও তাই আজ্ঞাধীন অধস্তন হিসেবেই দেখতে চেয়েছেন তিনি সারাজীবন। সামির বুক পিছলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস গড়িয়ে পড়লো আচম্বিতে। বাবার জন্য মন কেমন করছে। শেষবার দেখা হয়েছে নয় মাস দশদিন আগে। নয় মাস দশদিন! মা একটু আগেও বলছিল, তোমার বাবা খুব

রেগে আছেন। বাবা কেন সবসময় রেগে থাকেন? রাগ নামক অনুভূতিটিতে কি বাবারই কেবল একচ্ছত্র অধিকার? সামিরও যে রাগ দুঃখ, ক্ষোভ,অভিমান এই সমস্ত অনুভূতির সমন্বয়ে সত্যিকারের একটা মানবিক মন আছে এই তথ্যটা কি বাবার এখনও অজানা?

হঠাৎ নরম দুটি তুলতুলে হাত চুপিসারে সামিকে পেছন থেকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরলো। আকস্মিক এই স্পর্শ পেয়ে সামির নিশ্বাস গেলো থমকে, ক্ষণিকের জন্য। ভুটান পাহাড়ের মেঘ ছোঁয়া হু হু বুনো এক ঝলক বাতাস ওদের দুজনকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করে গেলো। উপত্যকার ওই ডাকবাংলোর এক চিলতে বারান্দাটায় ছড়িয়ে দিয়ে গেল মহুয়ার খুশবু। কী এক আশ্চর্য অলৌকিক আবেশে যে ভরে গেলো চারপাশটা মুহূর্তের মাঝে! সামি অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা নিশ্বাস টা ধীরে ধীরে ছাড়লো। ঘুরে দাঁড়িয়ে বিভার হাতদুটো নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিলো। অন্ধকারেও বিভার ডাগর দুটি চোখ পরিপূর্ণ বাঙ্ময়। এতো সুন্দর চোখ পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের নেই! বিভা একটু অপরাধীর গলায় বললো, ‘সরিরে, তখন আসব বলে আসতে পারিনি। রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। তাও কাজ শেষ করে যেই না বেরোবো। দেখি অভিজিৎ হাজির।’

সামি বিভার দিকে একদৃষ্টি তে চেয়ে ছিল বাক্যহারা হয়ে। কয়েকটা সেকেন্ড ওই রকম মূর্তির মতই কাটিয়ে দিল সে। একটা সময় খুব দুর্বল গলায় বললো, ‘তুই কেন কখনোই কথা দিয়ে কথা রাখতে পারিস না, বিভা? সব সময় কেন আসব বলেও আসিস না? কেন এভাবে কষ্ট দিস আমাকে?’

বিভা ভারী করুণ গলায় বলে, ‘সরি বললাম তো!’

সামি মোহাবিষ্টের মতো একটা হাত বিভার গালের ওপর আলতো করে ছোঁয়ালো। সেই ছোঁয়াটুকু বিভার শিরদাঁড়ায় একটি অনির্বচনীয় শিহরণ তুললো। হৃদপিন্ডে রক্তচ্ছাস টের পেলো সে। খুব করে চাইছিল সামি যেন তাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এই মুহূর্তে। এতো জোরে যেন তার দম আটকে আসে। কিন্তু সামি এসবের কিছুই করলোনা। হতভম্ব বিহ্বল চোখে শুধু চেয়েই রইল। বিভা আরো একটু কাছে এগিয়ে আসলো তার। ঠিক সেই সময় চলচ্চিত্রের মতো সামির চোখের সামনে ভেসে উঠলো সন্ধ্যেবেলার ঘটনাটা। মনে পড়ল সেই আশ্চর্য নারীর কথা। কী এক তীব্র বাধঁছেড়া আকর্ষণে ভেতরটা ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল তার! পুরো দৃশ্যপট টা যেন সমস্ত সত্তার ভেতর গেঁথে গেছে। তার ঠোঁটে এখনো লেগে আছে সেই রহস্যময়ী নারীর ঠোঁটের স্বাদ, কানের কাছে তার নিশ্বাসের শব্দ। চতুর্দিক মাতোয়ারা এখনও ওই জাদুকরীর বশীকরণ মায়ায়!

সামির ভেতরটা অজান্তেই কেমন কেঁপে ওঠে। সেই মেয়ে বিভা নয়, ঠিক হৃদিতাও নয়··· কে জানে হয়তো হৃদিতাই··· না না, হৃদিতা নয়। অন্য কেউ!

কে ছিল??

জানেনা সামি, কিন্তু মনে হয়েছিল এর চেয়ে ভালো কিছু তার জীবনে এর আগে কোনো দিন ঘটেনি। এরকম কেন মনে হয়েছিল তার? বিভা ওর গালে একটা চুমু খেল হালকা ভাবে। চমকে উঠে বিভার কাছ থেকে একটু পিছিয়ে আসল সে। স্তিমিত গলায় বলল, ‘এখন থাক।’

বিভা আকুল হয়ে বলল, ‘সামি রাগ করিস না লক্ষীটি, আমি তোকে ভালোবাসি!’

– ‘আমিও তোকে ভালোবাসি। এখন··· এখন শুতে যা। কাল সকালে কথা হবে। ’

১৭

এক জোড়া পাহাড়ি তিতিরের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল আকাশের। চোখ মেলে দেখল পূবের বন্ধ জানালার পাল্লার ফাঁক ফোকর গেলে স্বচ্ছ একফালি কাচরঙা রোদ্দুর এসে পড়েছে অমৃতার ডান গালে। তার ঘুমন্ত মুখখানায় এখন শিশুসুলভ নির্মলতা। বুজে থাকা চোখের কোলে কোন ক্লান্তি নেই। ছোট টিকলো নাক, লালচে গাল আর পাতলা দুখানা ঠোঁট সদ্য ফোঁটা ফুলের মতোই সতেজ। অমৃতাকে তো সে রোজ দেখে। কিন্তু আজকের এই দিন শুরুর ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন প্রথম দৃষ্টিটা যখন সকাল বেলার প্রথম রোদে ডুবে থাকা ওই সুন্দর মুখখানার ওপর গিয়ে পড়ল, তখন মনে হল রোজকার দেখা অমৃতার সাথে এই ঘুমিয়ে থাকা স্নিগ্ধ অমৃতার যেন আকাশ পাতাল তফাৎ!

– ‘কীরে তুই অমন হা করে কী দেখছিস?’ হৃদির প্রশ্নে আকাশ ধরাধামে ফিরল। রাতে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিল এখানেই। মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে। শেষ রাতের দিকে অবশ্য খুব শীত করছিল। শীতের ঠ্যালায় বার কয়েক ঘুমও ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম খুব একটা জমেনি রাতে। সে নিজের গায়ের ওপরের ছাই রঙের কম্বলটা হাত দিয়ে সরিয়ে নিল। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে সহজ ভাবে বলল, ‘অমৃতাকে দেখতেছিলাম।’

বীমের খাঁজে খাঁজে দুরন্ত পায়ে বাকবাকুম করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধবল তিন চারটে পায়রা।ওদের বাকবাকুম আর তিতিরের হাঁকডাকে ঘুমিয়ে থাকা রীতিমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। হৃদি শোয়া থেকে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলতে তুলতে বললো, ‘অমৃতাকে অত কী দেখতেছিস?’

– ‘ওকে সুন্দর লাগতেছে!’

হৃদি তাকালো গুটিশুটি হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে আদুরে বেড়ালের মতো শুয়ে থাকা অমৃতার দিকে। অতর্কিতে তার মুখে ফুটে উঠল একটি প্রশ্রয়ের হাসি। হাসি ঠোঁটে

নিয়েই সে বললো, 'হুম··· অমৃতাটা না, অনেক কিউট কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই তো তার দাদাগিরি শুরু হয়ে যাবে। দাদাগিরির ভয়ে কিউটনেস জানালা দিয়ে বাপের নাম তুলে পালাবে।'

আকাশ কম্বল খানা দু হাত দিয়ে ভাঁজ করতে করতে বললো, 'তাতো বটেই। বলেই দ্যাখ না একবার তাকে কিউট, জুতা খুইলা মারতে আসবে।'

হৃদি শাড়ি পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রাতে। সুতির শাড়ির আঁচল কুঁচকে গিয়ে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। সে শাড়ির আঁচলটা ঠিক ঠাক করে নিল ভালোভাবে। এলোমেলো খোলা চুলগুলোতে নিজের হাতের আঙুল চালালো খানিকক্ষণ। বিষণ্ণ ভাবে কী যেন একটা গভীর ভাবনা ভাবল। তারপর ঘুমে ফোলা টসটসে চোখ দুটো নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ভারী করুণ গলায় বললো, 'হ্যাঁরে আকাশ, তোর কখনো আমাকে দেখতে সুন্দর লাগেনা?'

আকাশ তখন ঘরের দেয়াল সংলগ্ন ক্লজেটের দরজা খুলে ভাঁজ করা দুটি কম্বল গুছিয়ে রাখছিল ভেতরে। হৃদির প্রশ্ন শুনে সে ভারী অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভ্রু কুঁচকে বলল, 'লাগবেনা কেন? আজিব! তোর ঘুম মনে হয় এখনো ভাংগেনাই। ঘুমের ঘোরে আবোল তাবোল বকতেছিস। ঘুমা, ঘুমা! শুয়ে পড়।'

হৃদি আগের চাইতেও বেশি মন খারাপ করা গলায় বলল, 'নারে সত্যি বলতেছি। কারো কারো কাছে আমাকে সুন্দর লাগেনা বুঝছিস?'

আকাশ বিরক্ত হতে গিয়েও হেসে ফেলল। তার বন্ধু গুলা একেকটা ফার্স্ট ক্লাস চিড়িয়া। চিড়িয়া গিরি করার বাই উঠলে কেউ মাথা বরাবর বন্দুক উঁচিয়ে ধরলেও

এদের চিড়িয়া গিরি থামাতে পারবেনা। সে হাসতে হাসতে বলল, 'তুই তো সবসময় সুন্দর। বোকার মতো কথা বলতেছিস কেন?'

হৃদি বিছানা ছেড়ে নেমে জানালার পাল্লা দুটি খুলে দিল। খুলতেই হলুদাভ পেলব সূর্যের আলো ঝপ করে লাফিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যিখানে। সেই সাথে মিহি হাওয়া। হৃদি জানালার বাইরে ঘোর লাগা এক দৃষ্টি রেখে বললো,

– 'কেউ কেউ কী বলে জানিস? বলে আমি নাকি প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে না।'

আকাশ হো হো করে ডাকাতের মতো হেসে উঠলো এবার, 'তাই নাকি? কে বললো শুনি? আমার ফ্রেন্ডের প্রেমে পড়বেনা? হুম? কার এতো সাহস? নাম ধাম বল এমন কথা যে বলেছে শুধু সে না তার চোদ্দ গুষ্ঠি তোর প্রেমে পড়বে।'

হৃদি ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'সিরিয়াসলি দোস্ত, আমি কি দেখতে খুবই বাজে?'

– 'তুই একটা পাগলী!'

– 'বিভা কি আমার চেয়ে বেশি সুন্দর?'

আকাশ একটু থমকে গেল এবার। তার ঠোঁটে লেপটে থাকা হাসির রেখাটা মুহূর্তের মাঝে ফিকে হয়ে আসল। বিভ্রম নিয়ে প্রশ্ন করল,

– 'তোর হয়েছে কী আজকে?'

হৃদি ঘুরে তাকাল আকাশের দিকে। নিস্তেজ ভাবে বললো, 'কিছু না। 'বিভার কথা কেন বললি?'

–’ এমনি।’

আকাশ তীক্ষ্ণ চোখে দেখল হৃদিকে, বলল, ‘কে কার থেকে বেশি সুন্দর, এইসব লেইম জিনিস নিয়ে ভাবা শুরু করছিস নাকি আজকাল?’

হৃদি একটু লাজুক গলায় বললো, ‘এমনি বললাম দোস্ত, তুই আবার বিভাকে কিছু বলিস না।’

– ‘তোর কি কিছু নিয়ে মন খারাপ?

– ‘না’

– ‘হ্যাঁ তোর মন খারাপ।’

– ‘একেবারেই না’

অমৃতার ঘুম ভেঙে গেছে। সে মুখ দিয়ে খানিক বাদে বাদে বিরক্তি সূচক চ’ কারান্ত শব্দ করছে এবং এপাশ ওপাশ করছে। এবার সে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, ‘ওই চখা চখির বাচ্চা,এই ঘর থেকে যা!ঘুমাইতে দে!’

আকাশ অমৃতার কথায় ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে কয়েক পা এগিয়ে আসল হৃদির দিকে। হৃদি মাথা হেঁট করে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজের মুখ নিঃসৃত বক্তব্যের কারণে যেন সে প্রকৃত অর্থেই ভারী লজ্জিত এখন। আকাশ ওর চিবুকে হাত রেখে মুখটা উপরে তুলে ধরে বললো, ‘আর কখনো এরকম মন ছোট করবিনা। বিভা বিভার জায়গায়, তুই তোর জায়গায়। এসব আজেবাজে চিন্তা করবি না, কেমন?’

হৃদির চোখ দুটো আচমকা একটু কেমন ছলছল করে উঠলো। ভারী গলায় বললো, ‘কী যে হচ্ছে আমার সাথে, বুঝতে পারছিনা।’

– ‘কী হয়েছে হৃদি? বল আমাকে!’

হৃদি ঠোঁট টিপে কান্না চাপার চেষ্টা করল। আকাশ বিরক্তির সাথে বললো,’তোর এই ফিচ ফিচ কান্নার স্বভাবটা আমার অসহ্য লাগে।’

হঠাৎ আকাশের চোখ পড়ল হৃদির হাতের আঙুলে পরা হোয়াইট গোল্ডের আংটিটার দিকে।

– ‘এই আংটি তুই কোথায় পাইলি?’

হৃদি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললো, ‘ইয়ে··· কই পাবো আবার, কিনছি!’ আকাশের চোখে সন্দেহ খেলা করে, ‘কিনছস?’

– ‘হুম।’ অন্য দিকে তাকিয়ে দায়সারা ভাবে উত্তর দেয় হৃদি। তারপর একটু চুপ থেকে আবার বলে,

– ‘দোস্ত, তুই এসব নিয়ে এখন কারো সাথে কথা বলিস না কেমন? প্লিজ!’

অমৃতা উঠে বসেছে। ওদের দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, ‘কী কাহিনী?’

আকাশের মুখে বিরক্তির একটা ভাব তখন সদর্পে বিরাজমান। সে মুখ ঝামড়ে উঠে বললো, 'তোর মাথা কাহিনী।'

– 'মাথা কাহিনীটা আবার কী?'

– 'মাথা কাহিনীটা হচ্ছে তোর মাথা আর আমার মুন্ডু।'

– 'সকাল সকাল এতো মাথা মুণ্ডুর পিছনে পড়লি কেন? আর কোনো কাজ নাই?

– 'না নাই।'

আকাশ হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বাইরের ঘরে এসে দেখলো সামি বসে আছে সোফায় হাত পা ছড়িয়ে। রান্নাঘর থেকে বিভার গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রুদ্র আশেপাশে নেই।

– 'রুদ্র কই রে?' আকাশ জানতে চাইল, সামির কাছে।

সামি একটা ফ্যাশন ম্যাগাজিনে আলগা ভাবে চোখ বুলাচ্ছিলো। আকাশের প্রশ্নটা শুনে সে চোখ তুলে তাকাল, 'ও, উঠেছিস? মর্নিং!'

– 'মর্নিং, রুদ্র কই?'

– 'ঘুমায়।'

– 'ওই শালা আসার পর থেকে ঘুমাইতেছে কেন? হইছে কী ওর?'

সামি ঠোঁট উল্টে বললো, 'আল্লাহ জানে!'

আকাশ শার্টের হাতা গুটিয়ে নিতে নিতে খুব উদ্যমী গলায় বললো, ‘চল তো, গিয়ে দেখি ব্যাটার হইছে কী? মইরা টইরা গেছে নাকি?’

বিভা রান্নাঘর ছেড়ে ডাইনিং এ পা রেখেছিল সবে মাত্র, হাতে পরোটার প্লেট নিয়ে। আকাশের বলা মাত্র কথাটা তার কানে যেতেই সে আঁতকে উঠে উচ্চস্বরে বললো, ‘ছি ছি এসব কী কথা আকাশ? মরবে কেন? এসব অশুভ কথা বলার সময় বুক কাঁপেনা? কোথায় রুদ্র?’

– ‘সেটা তো আমারও প্রশ্ন, চল গিয়ে দেখি।’

তিনজন মিলে ছেলেদের জন্য বরাদ্দ শোবার ঘরটায় আসল। দরজা খোলাই ছিল। দেখা গেলো রুদ্র বিছানায় বাঁকা চ্যাকা হয়ে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। তার গায়ের কম্বল সরে গেছে। মাথার বাবড়ি চুল এলোমেলো হয়ে কপালে এসে পড়েছে। দাড়ি গোঁফ ভর্তি ঘুমন্ত মুখটায় লেগে আছে এক টুকরো প্রাঞ্জল হাসি।

আকাশ খুব চিন্তিত গলায় বলল, ‘ঘুমায় ঘুমায় হাসতেছে। নিশ্চয়ই কোনো মেজর প্রব্লেম হইছে শালার মাথায়।’

বিভা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘প্রব্লেমের কী আছে? বেচারা হয়তো ভালোমন্দ কোন স্বপ্ন দেখতেছে ঘুমের মধ্যে। তোদের ওর সুখ সহ্য হচ্ছেনা কেন?’

সামি বললো, ‘এতো সুখ কই পাইতেছে সে? ট্রেনেও খালি ঘুমাইছে পইড়া পইড়া। আবার বলতেছিল, ট্রেনে ঘুমানোর মজাই আলাদা। মনে হয় ছোট বেলার মতো দোল দোল দোলনি দিয়ে কেউ ঘুম পাড়াচ্ছে।’

– ‘আহারে, বেচারা। ঘুমাচ্ছে একটু ঘুমাতে দে তোরা। হিংসা করিস না।’ বিভার কণ্ঠ দিয়ে মায়া ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

সামি বলল, ‘ওর ঘুমের চোটে তো আমরা কেউ ঘুমাইতে পারলাম না। রাত্রে বাঁশির মতো নাক ডাকতেছিল শালা। নাক ডাকার চোটে আমি ঘুমাইতেই পারিনাই।’

আকাশ তালে তাল মিলিয়ে বলল, ‘হুম রাইট, আমি তো ঘর ছেড়েই পালায় গেলাম ওর অত্যাচারে।’

সামি রুদ্রর হাস্যোজ্বল তৃপ্তি মাখা ঘুমন্ত মুখখানার দিকে তাকিয়ে চাটুকারিতার গলায় বলে উঠল, ‘শালারে একটা শিক্ষা দেয়া উচিৎ। কী করা যায় বল তো?’

রুদ্র তখনো হেসে হেসে নাক ডেকে ডেকে ঘুমাচ্ছে তো ঘুমাচ্ছেই। আকাশ ওর দিকে তাকিয়ে বললো, ‘চল ধাক্কা মাইরা ফ্যালায় দেই বিছানা থিকা।’

– ‘কানের ভিতর পোকা ঢুকায় দেই।’ সামি মতামত দিলো।

– ‘সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙায় দেই!’ আকাশের সাজেশন।

বিভা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ‘ইশ! তোরা এতো খাররাফ!’

– ‘খাররাফ জিনিসটা আবার কী?’ আকাশের প্রশ্ন।

বিভা জ্ঞানী লোকের মতো গম্ভীর মুখে বললো,-’মানুষ যখন ভয়াবহ রকমের খারাপ হয়ে যায় তখন তাকে খাররাফ বলে।’

ঠিক সেই সময় অমৃতা আর হৃদির আগমন ঘটল।

– ‘হচ্ছে কী এখানে?

আকাশ বললো, ‘রুদ্র কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইতেছে। একটা শিক্ষা দিতে হবে ওরে।’

শুনে অমৃতা হৈ হৈ করে বলে উঠলো, ‘এতো ঘুমাইতেছে ক্যান? এখুনি ব্যাটার মাথায় পানি ঢাল!’

এই আইডিয়া বিভা বাদে অন্য সবার পছন্দ হল। আকাশ আর সামি মহা আনন্দে নাচতে নাচতে বাথরুমে দৌড়ে গেলো বালতি ভর্তি পানি আনতে। বিভা রাগে গজগজ করতে করতে হৃদি আর অমৃতাকে বললো,’তোদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?’

হৃদি দাঁত বের করা হাসি হাসল, ‘আমার তো ভালোই লাগতেছে ব্যাপারটা। মজাই মজা!’

– ‘এখন পানি ঢাইলা আমার ঘর নষ্ট করবা তোমরা। বিছানার চাদর ভিজাবা। কাজ বাড়াইতেছ কেন? এমনিতে আমি সংসার সামলাইতে সামলাইতে হিমশিম খাচ্ছি।’

অমৃতা বিভার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনার গলায় বলল, ‘আরে চিল দোস্ত। জাস্ট চিল। বিছানার চাদর বাইরে মেইলা দিলেই খটখটে শুকনা হয়ে যাবে। ভালো রোদ আছে আজকে।’

আকাশ আর সামি দুজনে মিলেমিশে এক বালতি পানি ঘুমন্ত রুদ্রর গায়ে ঝপাং করে দিল ঢেলে। ঠান্ডা জলের স্পর্শ পেয়েই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রুদ্র। তার চক্ষু দুটো চড়কগাছ। চুল, দাড়ি, গায়ের টি শার্ট,প্যান্ট সব ভিজে একাকার। সে মুখ হা করে থ বনে গিয়ে চারপাশটা দেখছে। বড় বড় নিশ্বাস পড়ছে তার। চোখের সামনে সব ঝাপসা। মাথা ফাঁকা। গোটা একটা মিনিট পার হবার পর সে ঘোলা চোখে আবিষ্কার করল যে চার ডাকাত হো হো শব্দ করে হেসে যাচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে। এক ডাকাতের হাতে খালি বালতি ধরা। পুরো বিষয়টা বুঝে উঠতে আর সময় লাগলোনা।

তড়িৎ গতিতে উঠে দাঁড়িয়ে ‘বান্দরের বাচ্চা!’ বলে এক বিকট চিৎকারে ফেটে পড়ল রুদ্র। এরপর তেড়ে উঠে মারতে আসল হাতে বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সামিকে। সামি তড়িঘড়ি করে বালতিটা ছুঁড়ে ফেললো মেঝেতে। চকিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে দিল ছুট। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোর পেরোতেই দুম করে ধাক্কা খেল এক ছিপছিপে দেহের পুরুষের সাথে। ধাক্কাটা লাগা মাত্রই একটা আর্তচিৎকার ছিটকে বেরিয়ে আসল তার মুখ থেকে। চোখ তুলে দেখলো অভিজিৎ দাঁড়িয়ে আছে! দুজনেরই কপালে লেগে গেছে বেশ জোরেসোরে। অভিজিতের চোখের চশমা প্রায় খুলে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। হাত দিয়ে ধরে ফেলে কোন রকমে বাঁচানো গেল চশমাটা। এই আকস্মিক তান্ডবের মুখে পড়ে সে রীতিমত ভীত, আতঙ্কিত এবং বিমূঢ় হয়ে গেল।

চশমাহীন ফোলা চোখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকাল সামির দিকে। সামি হাত দিয়ে নিজের কপাল ডলতে ডলতে ভারী আফসোসের গলায় বলল, 'সরি ম্যান!'

পেছন থেকে তখন রুদ্র তেড়ে আসছে। সামি আর সময় নষ্ট না করে তার সম্মুখে দাঁড়ানো অভিজিৎকে ঠেলে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় দিল ভোঁ দৌড়। অভিজিৎ বিস্ফোরিত চোখে মুখ হা করে তাকিয়ে দেখল লম্বা চুল ওয়ালা ইঞ্জিনিয়ার ছেলেটা ভিজে চুবুচুবু হয়ে তার স্ত্রীর হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ডকে বুনো মোষের মতো তাড়া করছে।

বিভা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল। অভিজিতের কপালে একটা হাত ছুঁইয়ে ব্যতিব্যস্ত গলায় বলল, 'আপনার লাগেনি তো?'

অভিজিৎ একটা ঢোঁক গিলল, 'উনাদের··· ক··· কী হয়েছে?'

– 'আর বলবেন না। পাগলদের কিছু হওয়া লাগেনা। এমনিই পাগলামি করে কারণে অকারণে।'

এটুকু বলে একটু থেমে বিভা আবার বললো, 'আসুন, আপনি নাশতা করে নিন। অফিসের দেরি হয়ে যাবে।

ডাইনিং এ নাশতার টেবিলে অভিজিৎ বলল, 'আজকে আমাদের অফিসে ক্রিকেট ম্যাচ আছে। আপনাদের মধ্যে কারো ক্রিকেটে ইন্টারেস্ট আছে কি?'

বিভা বলল, 'আমাদের আকাশ কিন্তু খুব ভালো খেলত এক সময়।

– ‘তাই নাকি? আপনি চাইলে আমার সাথে যেতে পারেন। জায়গাটা ঘুরে দেখলেন। ম্যাচটাও এনজয় করলেন।’

আকাশ খুশি হয়ে বললো, ‘নিশ্চয়ই। আমার অন্য দুই বন্ধুও মনে হয় যেতে আগ্রহী হবে। ওদের জিজ্ঞাসা করে দেখি।’

অভিজিৎ গম্ভীর গলায় বলল, ‘হ্যাঁ, যদি মারামারি করার পরে উনাদের গায়ে আর কোন জোর অবশিষ্ট থাকে, তবে।’

অভিজিতের বলার ঢঙে হেসে ফেললো সবাই। খানিক বাদে সামির কান পাকড়াও করে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসল রুদ্র। তার মাথার চুল থেকে তখনও টুপটাপ ঝরে পড়ছে জল। গায়ের সাথে ভিজে লেপ্টে আছে টি শার্ট। সামি সমানে চ্যাঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে, ‘আল্লাহ আমার কান ছিঁড়ে ফেলল। বাঁচাও! বাঁচাও!’

ওরকম লম্বা চওড়া সুঠাম দেহী এক যুবককে অমন নাস্তানাবুদ হয়ে চিৎকার করতে দেখে অভিজিৎ আর হাসি আটকে রাখতে পারলনা। রান্নাঘরের দরজার পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে দূর্গাও খিক খিক করে হেসে উঠলো I

রুদ্র প্রকৃত রুদ্রমূর্তি ধারণ করেই সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে বললো, ‘এতো বড় সাহস! আমার সাধের ঘুমে পানি ঢাইলা দেয়! এর বিচার চাই আমি।’

হৃদি আকুলিবিকুলি হয়ে বলল, ‘আহা বেচারা ব্যথা পাচ্ছে কানে। ছেড়ে দে দোস্ত!’

– ‘ছেড়ে দিব মানে? আমার ঘুম ভেঙে দিয়ে সে গায়ে হাওয়া লাগায় বেড়াবে? এতো সোজা?’

আকাশ আর অমৃতা চোরের মতো কান কাটা হয়ে পরোটা দিয়ে আলুর দম খাচ্ছিল। বিভা রহস্য ভরা কণ্ঠে বলল, ‘আসল ক্রিমিনালরা তো ধরা পড়লোনা!’

রুদ্র এবার সামির কান ছেড়ে দিয়ে বললো,’কে আসল ক্রিমিনাল?‘

ছাড়া পেয়ে সামি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কানের ডগা লাল হয়ে গেছে তার। কান ঘষতে ঘষতে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, ‘শালার হাত নাকি লোহার সাঁড়াশি? আমার কান দিল শেষ করে!’

অভিজিৎ এতক্ষণে মুখ খুলল। রুদ্রকে বললো, ‘আসল ক্রিমিনাল আমরা ঠিক ঠিক খুঁজে বের করবো। আপনি দয়া করে মাথা টাথা মুছে আসুন। কাপড়টা পাল্টে নিন। নাশতা করুন।’

আকাশ খাওয়া থেকে মুখ তুলে তড়িঘড়ি করে প্রসঙ্গ পাল্টাল, ও আচ্ছা,আমরা দুলাভাইয়ের অফিসে যাচ্ছি। ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে।’

রুদ্র অভিজিতের কথা শুনে বাধ্য ছেলের মত ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে আঙুল তুলে শাসিয়ে যেতে ভুলল না, ‘মূল অপরাধীর শাস্তি হবেই হবে!’

সামি চেয়ার টেনে বসে অবাক গলায় বললো, ‘অফিসে ক্রিকেট ম্যাচ?’ উত্তরটা অভিজিৎ দিলো, ‘হ্যাঁ প্রতিবছর এরকম একটা দুটা ম্যাচ হয়েই থাকে। কলিগরা মিলে একটা দিন ঠিক করে খেলা হয় আরকি। বিশেষ কিছু না।

সামি চোখ তুলে তাকাল অভিজিতের দিকে। হালকা একটু হেসে বললো, ‘ও আচ্ছা বুঝেছি। বাই দ্যা ওয়ে,আই এম এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যা মেস। আপনি ব্যথা পেয়েছেন নাকি?’

– ‘না না, ও কিছু না।’ হাসিটা ফিরিয়ে দিলো অভিজিৎ।

তাদের কারো মুখ দেখেই এ মুহূর্তে বোঝা গেলনা যে গতরাত অবধিও দুজনের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর সম্পর্ক ছিল। কেউ কারো দিকে মুখ তুলে চাইছিল না পর্যন্ত। অথচ আজ কত সহজে সেই অস্বস্তিটা হাওয়ায় উবে গেলো। পৃথিবীতে আসলে একই সাথে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে জটিল বিষয় হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। চাইলেই একে পানির মতো তরল করা যায় আবার চাইলেই বরফের চেয়েও কঠিন। নির্ভর করে মানুষের ইচ্ছে শক্তির ওপর এবং সেই ইচ্ছে শক্তি কতটা প্রবল তার ওপর।

অভিজিৎকে সামির এখন আর অতটা খারাপ লাগছেনা বরং চশমা চোখের ভালোমানুষী চেহারার লোকটার দিকে তাকিয়ে তার মনের মধ্যে হঠাৎ আজ এত দিন বাদে একটি অন্যরকম উপলব্ধির সৃষ্টি হল। মনে হল মানুষটাকে সে এতকাল মিছিমিছি ঘেন্না করে এসেছে। এর তো কোনো দোষ নেই! দোষ যদি কারো থেকে থাকে তা একমাত্র বিভার বাবা মায়ের। এমনকি এই অঘটনের পেছনে তার নিজের বাবার ভূমিকাও নিছক কম নয়। অভিজিৎ তো তার আর বিভার প্রেমের খবর জানতে

পেরে বিয়ে নাকচ করেই দিয়েছিল। এতো কিছুর পরেও যে সে বিভার বন্ধুদের সাথে হাসিমুখে কথা বলছে এই তো বেশি। এমন উদারতা তো আজকের দুনিয়ায় বিরল।

ছেলেরা নাশতা সেরে দ্রুত তৈরি হয়ে নিল অভিজিতের সাথে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে। অমৃতাও খেলা দেখতে যাবে বলে মনস্থির করেছিল কিন্তু বাধ সাধল বিভা। আজকে হাটবার। একটু বাদেই সে দূর্গাকে নিয়ে বাজারে যাবে। এর আগে কোনো দিন তার এখানকার হাটে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আজকেই প্রথম। অতএব প্রথম বারের যাত্রা সঙ্গী হিসেবে সে দুই বান্ধবীকে পাশে চায়। বন্ধুদের যে চায়না তা নয়, কিন্তু বন্ধুদের যেহেতু অভিজিৎ আগে থেকেই দখল করে নিয়েছে তাই এখন আর কিছু বলা যাচ্ছে না।

অগত্যা অমৃতাকে বাড়িতেই থেকে যেতে হল। হৃদি আর বিভা আজ অনেকদিন পর একত্রে রূপচর্চা করবে। দূর্গাকে বলা হয়েছে কাঁচা হলুদ আর মসুরের ডাল বেটে দিতে। এখন ঘড়িতে বাজে দশটা। ঠিক হল, বারোটার মধ্যে রূপচর্চা শেষ করে বাজারে যাবে ওরা। অতএব এই দুটি ঘন্টা অমৃতার কিছুই করার নেই। এ সময় বিভাদের কাছাকাছি থাকাটাও ঝুঁকি পূর্ণ। যেকেনো মুহূর্তে অমৃতার মুখে ওসব ছাই পাশ লাগিয়ে দেবে। অতএব এই বিপজ্জনক সময়টাতে দুই বান্ধবীকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে দৌড়োনোর পোশাক পরে তৈরী হয়ে নিলো।

বিভা রোজ দিনের এ সময়টায় মায়ের সাথে ফোনে একবার কথা বলে। তার বন্ধুরা এসেছে এ খবরটা মায়ের অজানা নেই। বাবা অবশ্য কিছুই জানেন না এ ব্যাপারে। মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে সামির উপস্থিতি তাদের জামাইবাবু কোন ভাবেই স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেবেনা। মেয়ের সংসারে একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে এই আশংকা তার রাতের ঘুম কেঁড়ে নিয়েছে। বিভা তার মা' কে বোঝানোর দায়িত্বটা তাই হৃদির ওপর ছেড়ে দিল। হৃদি এখন ফোন কানে নিয়ে

ইনিয়ে বিনিয়ে বিভার মাকে বোঝাচ্ছে যে সামির সাথে অভিজিতের সম্পর্ক আসলে কতটা ভালো, কতটা মধুর। আর বিভা যেহেতু এখন মন দিয়ে সংসার করছে তাই কোন নেগেটিভ চিন্তা মাথায় আনাটাই নাকি বোকামি।

অমৃতা বেরোবার মুখে বিভার মুখোমুখি পড়ে গেল। –'দোস্ত, কোথায় যাচ্ছিস?'

– 'একটু দৌড়ে আসি।'

– 'দৌড়ে আসি মানে? এই বনে বাঁদাড়ে আবার মানুষ দৌড়ায় নাকি? এখানে তো দৌড়ায় পশুপাখি, বাঁদর ছাদর।'

– 'ছাদর জিনিসটা কী?

– 'বাঁদরের ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, হনুমান টোনুমান আর কি।

– 'সমস্যা নাই। আমি ওদের সাথেই দৌড়াতে পারবো।'

একটা ফোন কল সেই মুহূর্তে অমৃতাকে বাঁচিয়ে দিল। অমৃতা দ্রুত পকেট থেকে ফোনটা বের করল। নম্বর তার চেনা। সে 'চেম্বার থেকে ফোন আসছে' বলে দ্রুত পায়ে ছাড়লো জায়গাটা।

বাড়ির বাইরে বেরোবার সাথে সাথে আলো ঝলমলে সকালটা দু হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করল তাকে। পেয়ারা গাছের পাতার ফাঁক গলে শীতের মিষ্টি রোদ এসে পড়েছে উঠোনে। কত পাখি যে ডাকছে গাছে গাছে! কিন্তু অমৃতা এই সুন্দর সকালটায় তার প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুর সাথে অসাবধানতা বশত একটা মিথ্যা বলে ফেলল। ফোনটা চেম্বার থেকে আসেনি। চেম্বারের নামটা ফট করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

উঠোন পেরিয়ে মাটির রাস্তায় উঠে ফোন ধরল সে। খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আজকে এতো সকাল সকাল?'

– 'হ্যাঁ সকাল সকাল।' হক বললেন একটু ব্যস্ত গলায়। ফোনের ভেতর দিয়ে গাড়ির হর্ন থেকে শুরু করে যাবতীয় শহুরে কোলাহল ফুড়ুৎ করে অমৃতার কানে উড়ে এসে লাগল। বোঝা গেলো ওপাশের ব্যক্তিটির অবস্থান এখন রাজধানীর যে কোন এক ব্যস্ততম সড়কে।

– 'আমি ভেবেছিলাম আপনি রাতে ফোন করবেন।'

হক প্রত্যুত্তরে অমৃতাকে কিছু না বলে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির সাথে কিছু একটা বললেন। শুনে অমৃতা মহা বিরক্ত, 'মিস্টার হক, আপনি আমাকে কেন ফোন করেছেন? আর আমাকে ফোন দিয়ে অন্যদের সাথেই বা কেন কথা বলছেন?'

হক তৃতীয় ব্যক্তির সাথে কথোপকথন শেষ করে অমৃতার কাছে ফেরত আসলেন মিনিট না গড়াতেই। প্রথম যে কথাটা তিনি বললেন, তা হল,

– 'গাধাটা কী করে?'

– 'জানিনা।'

– 'জানোনা? তোমরা কি একসাথে নেই?'

– 'না নেই। আপনি কি বাংলাদেশেও রোজ গুপ্তচরের মাধ্যমে সকাল বিকাল নিয়ম করে আপনার ছেলের খোঁজ নেন?'

– ‘প্রিটি মাচ।’

– ‘ইশ! কী বিশ্রী ব্যাপার! সামি বেচারার জন্য খারাপই লাগছে আমার। বেচারার লাইফে প্রাইভেসি বলতে কিচ্ছু নেই।

ধুলো ধূসরিত পথটায় অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ বড়সড় এক পাথরে অমৃতার পা আটকে গেলো। আরেকটু হলে হোঁচট খেয়ে পড়েই যেত। বিদ্যুত্রে মতো চিলিক দিয়ে একটা ব্যথা ছড়িয়ে গেলো পায়ের আঙুল থেকে গোড়ালি তে। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে, অনেকটা গোঙানির মতো। হক একটু উদ্বেগ নিয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে?’

অমৃতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ব্যথাটা হজম করলো। কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলোনা। হক আবার প্রশ্ন করলেন, ‘তুমি ঠিক আছ?’

অমৃতা এবার চাপা গর্জন করে বলে উঠলো, ‘ঠিক থাকবো কিভাবে? সকাল সকাল ফোন দিয়ে বিরক্ত করা শুরু করছেন। ঠিক থাকার উপায় আছে?’

– ‘আমি জানতে চাইলাম তুমি ঠিক আছ কিনা।’ খুব শীতল শোনাল হক সাহেবের কণ্ঠস্বর।

অমৃতা শ্লেষ যুক্ত হাসি হাসল, -’আপনি হঠাৎ আমার কথা জানতে চাইছেন?’

– ‘আমি অফিস চলে এসেছি। সময় নেই। তোমাকে যা বলার জন্য ফোন করেছিলাম তা বলে নেই।’

– ‘প্লিজ বলুন। বলে আমাকে উদ্ধার করুন।

– ‘গাধাটাকে মনে করিয়ে দিও যে আজকে তার মায়ের জন্মদিন। গতকাল রাতে সে তার মায়ের সাথে কথা বলেছে ফোনে। কিন্তু বার্থডে উইশ করতে ভুলে গেছে। আজকে যেন মনে করে উইশ করে দেয়।’

অমৃতা হঠাৎ চপল গলায় বললো, ‘আমি যে আপনার এতসব উপকার করে দিচ্ছি, এর বদলে আপনি আমাকে কী দেবেন?’

হক এই আকস্মিক প্রশ্নটা শুনে একটু বুঝি থমকে গেলেন। অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, ‘কী দেব?’

– ‘হুম, কী দেবেন?’

– ‘কী চাই তোমার? যা চাইবে তাই পাবে।’

– ‘রিয়েলি? আপনার কি একটা সব পেয়েছির দেশ আছে নাকি? যেখানে যা ইচ্ছা চাওয়া যায়, আর চাইলেই তা পাওয়া যায়?’

হক বোধহয় কথাটা পরিষ্কার ভাবে শুনতে পেলেন না। ফোনের ওপাশে নিরবিচ্ছিন্ন কোলাহল। তিনি উঁচু গলায় বললেন, ‘শোনো অমৃতা, কিছু শুনতে পাচ্ছিনা। ছাড়ছি। রাতে কথা হবে।’

ফোন কেটে গেল। ফোনটা পকেটে রাখতে রাখতে অমৃতার হঠাৎ মনে হল, লোকটা এতো দিক সামলায় কী করে? প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় দৌড়ল সে। বিভার বাংলোর আশেপাশেই। ফিরল ঘামে ভেজা জবজবে শরীর নিয়ে। ওকে দেখামাত্র বিভা প্রশ্ন করল,

– ‘কীরে? কেমন দৌড়াইলি বনে বাঁদাড়ে?’

অমৃতা সোফায় বসে পায়ের জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বলল, ‘বেশ ভালোই।’

– ‘বাঁদর ছাদর দেখলি কিছু?’

– ‘বাঁদর দেখিনি, ছাদর দেখেছি।’

– ‘কেমন দেখতে তারা?’

অমৃতা জুতো জোড়া একপাশে সরিয়ে রেখে উদাস গলায় বললো, ‘একদম তোর মত!’

– ‘আজাইরা!’ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল বিভা।

বিভা আর হৃদির রূপচর্চা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। দুজনে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ড্রইংরুমে এসে বসেছে। তাদের পরনে এখন শাড়ি নেই। হৃদি ব্লু জিন্স আর অফ হোয়াইট ফুল হাত টপ পরেছে। বিভার গায়ে অফ হোয়াইট টিশার্ট, সাথে কালো জিন্স। দুজনের চুল বাঁধা একই ভঙ্গিতে। মাথার ওপর চুড়ো করে। ঘোড়ার ল্যাজের মত ছড়িয়ে আছে ঢেউ খেলানো চুলগুলো পিঠের ওপর। দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন যমজ দুটি বোন। বাবা মা শখ করে দুজনকে একই রকম জামা কাপড় পরিয়ে একই ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে পুতুলের মত। অমৃতা অবশ্য আর মিনিট পাঁচেক আগে আসলেই বিপদে পড়ত। বেঁধে ছেদে তার মুখেও ওসব ছাই পাশ ফেসপ্যাক লাগিয়ে দিত বান্ধবীরা।

বিভা বলল, ‘শোন, তোদের সাথে একটু কথা ছিল।’

– ‘বলে ফ্যাল।’ সোফায় বসে পেপার টাওয়েল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছে নিতে নিতে বলল অমৃতা কথাটা।

বিভা ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশটা একবার দেখে নিল। দূর্গা ধারে কাছে কোথাও নেই এ বিষয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হবার পর সে গলা খাদে নামিয়ে বলল, ‘কালকে একটা ঘটনা ঘটছে।’

হৃদি আর অমৃতা কান খাড়া করলো, ‘কী ঘটনা?’

– ‘সন্ধ্যার পর পর মানে তোরা আসার ঘন্টা খানেক পরে সামি আমারে টেক্সট করছে যে একটু বাইরে আয়। আমি উঠানে ওয়েইট করতেছি। তো ঘটনা যেটা হইছে,ইশে আমি তো রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছি। দুর্গার বাচ্চি এতো বেয়াদব আমারে বলে কি, বৌদি আমাকে একটু সাহায্য কর। তো ওই বেটিরে সাহায্য করতে গিয়ে আমি ফাঁইসা গেছি। যখন বাইর হইতে নিব দেখি অভিজিৎ আর রুদ্র আইসা পড়ছে রান্নাঘরে। আমি আর সামিরে এটা জানাইতেও পারিনাই যে আমি আসতে পারতেছিনা।’

কেউ লক্ষ্য করলো না হৃদির মুখের রংটা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছিল। বুকের মধ্যে একটা অবিদিত ভয়ের খামচাখামচি। অপরাধের পাষাণভারে নুইয়ে পড়া কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামির মতো চোরা চোখে বিভার দিকে চেয়ে থেকে কথাগুলো শুনছিল সে।

বিভা বলে যাচ্ছিল, ‘এরপর মনে কর সামি তো সেইরকম ক্ষেপছে। রাত্রে যখন ওর সাথে দেখা করতে গেলাম বারান্দায় তখন দেখি রাগের চোটে আমার সাথে ভালো মতো কথাই বলেনা!’

অমৃতা বললো, ‘কথা বলেনা মানে? কিছুই বলেনাই?’

– ‘বলতেছে যে আমি সব সময় কেন এরকম করি? কেন কথা দিয়ে কথা রাখিনা। ব্লা ব্লা ব্লা··· আর জানিস ও এখানে আসার পর থেকে আমারে একটা কিস পর্যন্ত করেনাই।’

অমৃতার হাতে ফোন ধরা ছিল। কথাটা শুনতে পেয়ে সে ফোনের পর্দা থেকে চোখ তুলে বিস্মিত গলায় বললো,

‘বলিস কী? কেন?’

বিভা করুণ ভাবে বললো,- ‘আই হ্যাভ নো আইডিয়া গাইজ! ইনফ্যাক্ট, ইউ নো হোয়াট? আমি ওকে কিস করতে গেছি, কয় কি এখন না, থাক! মানে আমার বয়ফ্রেন্ড আমারে বলতেছে এখন না, থাক। কত বড় অপমান চিন্তা করছিস?’

হৃদি প্রচণ্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। একটা আনকোরা, অন্যরকম, সুতীব্র শিহরণ তার সকল ইন্দ্রিয় কে কেমন বিকল করে দিচ্ছিল ধীরে ধীরে। আশ্চর্য ব্যাপার হল সমস্ত গ্লানি আর অপরাধবোধ ডিঙিয়ে এই মাত্র একটি সুমিষ্ট শীতল সু বাতাস তার হৃদয়তলের দেশটিকে প্রবল ভাবে আলোড়িত করে তুলল। সামি যে বিভার খুব কাছাকাছি যায়নি গতকাল রাতে, এই তথ্যটা জানতে পেরে তার এত ভালো লাগছে কেন?

ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা কড়া ডাক আসে। হৃদিতা! বিভা তোমার বন্ধু!

হৃদি নড়ে চড়ে বসলো। কিছু একটা বলা দরকার। কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছেনা সে। কাল রাত থেকেই উড়ন্ত মেঘের মতো নানা জাতের চিন্তারা মাথায় আসছে, আবার পালিয়ে যাচ্ছে। কোনো ভাবনাই স্থায়ী হচ্ছেনা। তারা বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু লুকোয়না। গত সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া ঘটনাটাও লুকোনো থাকবেনা সে জানে। সামির মুখ থেকে কিছু শোনার আগে তার উচিত নিজ থেকেই ব্যাপারটা বিভাকে খুলে বলা। কিন্তু এই মুহূর্তে সে বিভাকে কিছুই বলতে পারলোনা। কেমন বোবায় ধরা চোখ নিয়ে চেয়ে রইলো সামনে

বিভা বললো, ‘তর কী হইছে? এরকম হাঁসের মত চাইয়া আছস ক্যান?’

হৃদি বড় একটা নিশ্বাস নিলো। আস্তে আস্তে বললো, ‘না ভাবতেছি। শোন একটু টাইম দে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

বিভা হতাশ ভাবে বললো, ‘কী টাইম দিব বল? এতো রাগ করলে কি চলে? আর জানিস ও আমার জন্য কোন গিফটও আনেনাই। লাইক সিরিয়াসলি? তোমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে তুমি এতদিন পর দেখা করতেছো, তুমি একটা কিছু গিফট করবানা তারে?’

হৃদির আংটিটার কথা মনে পড়ল। হ্যাঁ, আজ একটা ভালো কাজ হয়েছে। সে আংটিটা খুলতে পেরেছে অবশেষে। নারকেল তেল দিয়ে অনেক ঘষাঘষির পর জিনিসটা বেরিয়ে এসেছে টুপ্ করে আঙুল থেকে। সে ব্যস্ত গলায় বললো, ‘নিশ্চয়ই কিছুনা কিছু এনেছে তোর জন্য। সময় হলেই পাবি।’

বিভাকে বিষণ্ণ দেখায়, নিস্তেজ ভাবে বলে, ‘নারে, কেমন যেন লাগতেছে সব কিছু। খুব উল্টাপাল্টা।

অমৃতার চোখ তখন ফোনেই নিবদ্ধ ছিল। মনে হচ্ছে বিভার রিলেশনশিপের উত্থান পতন তাকে অতটা টানছেনা। সে হঠাৎ খুশি খুশি গলায় বললো, ‘বাদ দে এসব, সামির রাগ বেশিক্ষণ থাকেনা। সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন আয় তোদের মুড ভালো করে দেই। এই দ্যাখ শার্টলেস ডেমন সালভাটর। ইনস্টাগ্রামে পেয়ে গেলাম।’

অমৃতা নিজের আই ফোন টেন এসের পর্দা বন্ধুদের চোখের সামনে মেলে ধরল।

‘উফ! হট!’ দেখামাত্র মন্তব্য ছুঁড়ে দিল হৃদি।

বিভা উঠে এসে অমৃতার হাত থেকে ফোনটা কেঁড়ে নিল,’দেখি দেখি, ও গড! হটনেস! মামা, হটনেস!’ বলে নিজের হাতের পাঁচটা আঙুল মুখের সামনে হাতপাখার মতো নাড়তে লাগলো সে।

অমৃতা বললো, ‘দে একটা টাকলা কমেন্ট করে দেই।’

হৃদি হেসে বললো, ‘ওরা কি বাংলা বুঝবে নাকি?’

– ‘বুঝবেনা দেখেই তো করব।’

বিভা বললো, ‘লিখে দে, এন সি (nc)’

হৃদি বলল, ‘না না, তুই লিখ, বেটিফুল (betiful)।’

অমৃতা হো হো করে হেসে উঠলো, ‘তার চেয়ে বরং আমি লিখি, ভাই এইসব ছাড়েন আর পর্দা করা শুরু করেন। আপনাদের এসব খোলামেলা ছবি মেয়েদের খারাপ করে দিচ্ছে।’

দূর্গা সে সময় খালি চায়ের কাপ ফিরিয়ে নিতে এসেছিল বসবার ঘরে। এসেই দেখলো বৌদিমণি এবং তার বান্ধবীরা মিলে ঝুলে মোবাইলে একটি হাফ ন্যাংটা ছেলের ছবি নিয়ে হাসি তামাশা করছে। সে তড়িঘড়ি করে খালি চায়ের কাপ গুলি ট্রেতে তুলে নিয়ে জিভ কেটে পালাল জায়গাটা থেকে। রাম রাম! এমন লক্ষীছাড়া মেয়েছেলে সে বাপের জন্মে কোনো দিন দেখেনি। দাদাবাবুর জন্য তার বড়ই কষ্ট হয়। দাদাবাবুর মত দেবতার মত একজন মানুষের ভাগ্যে কিনা জুটলো এমন বেহায়া বেলেল্লা এক মেয়ে। না আছে সংসারে মন, না আছে পতিভক্তি। এখন আবার অর্ধ উলঙ্গ ব্যাটাছেলের ছবি নিয়ে তামশা করা হচ্ছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

খানিক বাদে দূর্গাকে সাথে নিয়ে ওরা হাটের উদ্যেশ্যে বেরোলো। হাট থেকে গোটা কয়েক মোরগ কিনলো। ঠিক হল আজ রাতে বারবিকিউ করা হবে। সেই সাথে পেয়ে গেলো দারুণ কিছু জিনিস। টাটকা বেলিফুলের মালা, কাচের চুড়ি। গ্রামের সহজ সরল আদিবাসীদের কাছ থেকে একেবারে কম দামে ঐসব শৌখিন জিনিস কিনতে পেরে বিভা আর হৃদি আনন্দে একেবারে ঝুমঝুম করে উঠলো। সেই ঝুমঝুম ভাবটা অনেকক্ষণ অবধি বাজতে থাকলো তাদের মনে। দুজনেই ঠিক করল আজ অনেক সাজবে। কত দিন হয়ে গেলো ওরা দুজনে একত্রে সাজগোজ করেনা!

১৮

আকাশে আজ কৃষ্ণপক্ষের একাদশী চাঁদ। খুব একটা জোছনা হয়নি। তবে জোছনার অভাব ঘুচিয়ে দিয়েছে অসংখ্য হীরের টুকরোর মত উজ্বল নক্ষত্র। উঠোনে বারবিকিউ গ্রিল বসানো হয়েছে। তার পাশে একটি চৌপায়া টেবিল। টেবিলের ওপর রাখা বারবিকিউর নানা সরঞ্জাম। কয়লা পোড়া গন্ধে ভরে আছে চারপাশ। অমৃতা আর সামি টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে লোহার শিকে মসলা মাখানো মাংস গেঁথে নিচ্ছে। তারপর বসিয়ে দিচ্ছে গ্রিলের কয়লার ওপর। কয়লা থেকে উঠে আসছে জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

একটু দূরে চেয়ার পেতে বসে আছে রুদ্র আর আকাশ। বিভা, হৃদিতা সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত। মাংস ধুয়ে মশলা মাখানো শেষ হতে না হতেই দেখা গেল কাজকর্মের চাইতে সাজগোজ করে তৈরী হবার দিকেই তাদের ঝোঁক বেশি। রুদ্র গিটার নিয়ে টুংটাং করছিলো। তার অবাধ্য চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে ঘাড়ের ওপর। গায়ে সাদা আর কালো রং মেশানো জ্যাকেট। সে গিটারের টুংটাঙের সাথে গুণগুণ করে কী একটা সুর ভাজছিল। হঠাৎ থেমে গিয়ে আকাশকে বলল,

– ‘দোস্ত, তুই খেলাটা আবার শুরু কর।’

আকাশ মনোযোগ দিয়ে সামি আর অমৃতার মোরগের মাংসে মশলা লাগানোর প্রক্রিয়া দেখছিলো। রুদ্রর কথা শুনতে পেয়ে তার একাগ্রতা ভাঙল।

– ‘ধুর, এখন আর ওসব হবেনা।’

– ‘কেন হবেনা?’

– ‘হবেনা দোস্ত। সময় শেষ। তাছাড়া আমার লাইফের কোন কিছু ঠিক নাই।’

– 'ঠিক থাকবেনা কেন? তুই একটা চাকরি করতেছিস। পাশাপাশি খেলাটা চালায় যা। মানুষের জীবনে বুঝছিস সবসময় একটা আলাদা জায়গা থাকা উচিৎ। শুধুমাত্র নিজের জন্য। ভালোলাগার একটা ব্যক্তিগত জায়গা। আমার যেমন গান। দিন শেষে এই গানই আমাকে বাঁচায় রাখে দোস্ত। গানের মধ্যে ঢুকলে আমি দুনিয়ার সব প্যারা ভুইলা যাই।'

আকাশ খুব স্পষ্ট গলায় বললো, 'আসলে আমার ভুলে যাবার মত কিছু নাই, মনে রাখার মতও কিছু নাই। মনে রাখার মধ্যে আমি শুধু আমার মায়ের মুখটাই মনে রাখতে চাই রুদ্র। আর বাপ্ তো থাইকাও নাই। একটা জিনিস চিন্তা করে দ্যাখ আমার কিন্তু কোনো পিছুটান নাই। এইযে তোরা সবাই বেঁচে আছিস তোদের বাবা মায়ের জন্য, পরিবারের জন্য। আমারতো কারো প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই। বলতে গেলে আমি একা। জীবনটা নিয়ে আমি তাই অত ভাবিনা। এক ভাবে কেটে গেলেই হইল।'

– 'তুই একা হবি কেন? আমরা আছি না?'.

– 'হ্যাঁ তোরা আছিস। তোরাই আছিস। তোরা ছিলি, তোরা থাকবি। ব্যাস এটাই আমার লাইফ।'

রুদ্র একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললো, 'ইয়ে আকাশ, একটা খবর ছিল তোদেরকে দেয়ার। কাউকে বলিনাই। তোকেই বলি প্রথমে। তুই তো জানিস আমি ইউ এস এ' র কয়েকটা ভার্সিটিতে এপ্লাই করছিলাম। তো দুই জায়গা থেকে রিপ্লাই আসছে দোস্ত। একটা তে মোটামুটি ফান্ডের অবস্থা ভালো। স্কলারশিপ দিবে।'

আকাশ থমকায়। কিছুক্ষণ সরু চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে থেকে সন্দিহান হয়ে বলে, 'তুই চলে যাবি?'

রুদ্র মুখ নিচু করে গিটারে ডুবল আবার। পাশ কাটানো গলায় বলল, 'চলে যাব কেন? কয়েকটা বছরের তো ব্যাপার। পড়া শেষ হলেই আবার চলে আসবো। সব কিছু ঠিক থাকলে হয়তো নেক্সট অগাস্ট ক্লাস থেকে শুরু।'

আকাশ কোনো কথা বলতে পারলোনা। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তার শ্বাসনালীতে আটকা পড়ে আঁকুপাঁকু করতে লাগলো। অগাস্ট! এটা ডিসেম্বর। আর মাত্র সাতটা মাস পর রুদ্র দেশ ছেড়ে চলে যাবে? বিভা নেই, রুদ্রও থাকবেনা। বাংলাদেশে তাদের দিন গুলো এই দুজনকে ছাড়া কী করে কাটবে? আকাশের বুকটা খুব ভারী হয়ে উঠল। রুদ্র বিনা পয়সায় ভালো জায়গায় পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছে। মেধা আর যোগ্যতা আছে বলেই সে এটা অর্জন করতে পেরেছে। তার উচিৎ বন্ধুর সাফল্যের কথা শুনে বন্ধুকে অভিবাদন করা, খুশি হওয়া। কিন্তু সে কিছুতেই খুশি হতে পারছেনা। খুশির বদলে ভেতর থেকে ঊর্ধ্বমুখী এক হাহাকার তীব্র আর্তনাদ করে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

রুদ্র কেন চলে যাবে? বিভা কেন চলে গিয়েছিল? সবাইকে কেন চলে যেতে হয়? একই গণ্ডিতে, একই আকাশের নিচে বেড়ে ওঠা মানুষগুলোকে কেন জীবনের একটা সময়ে এসে বেছে নিতে হয় ভিন্ন ভিন্ন সব গন্তব্য?

গুম হয়ে যাওয়া আকাশকে খানিকক্ষণ ত্যাড়া চোখে পর্যবেক্ষণ করলো রুদ্র। তারপর একরাশ বিরক্তি নিয়ে বললো, 'শালা, তোরা এরকম করলে আমি যাইতে পারবোনা। যাইতে চাইওনা। কিন্তু ফ্যামিলি থেকে প্রেশার আছে। বুঝতে হবে দোস্ত!

আকাশ হাসার চেষ্টা করলো। হাসলোও একটু অনেক কষ্টে, বললো, ‘মনীষার কী হবে?’

– ‘বিয়ে করে ফেলি। বৌ নিয়া যাইতে পারবো।’

– ‘ওর ছেলের কী হবে?’

– ‘ছেলেতো মালয়েশিয়ায়।’

– ‘প্রেম নিবেদনই করতে পারিস নাই এখনো। আর বিয়ে! যাই হোক মনীষাকে নাহয় বিয়ে করে নিয়ে যাবি। কিন্তু আমাদের কী হবে? আমাদেরকে ছাড়া তুই থাকতে পারবি?’

– ‘তোদেরকেও বিয়ে করে ফেলি।’

-’ গুড আইডিয়া।’

কয়লা পোড়া মাংসের গন্ধে ভুরভুর করছে চারপাশ। ঝলসানো মাংসগুলো তুলে রাখার জন্য কোনো খালি পাত্র আনা হয়নি। অমৃতা সামিকে বললো, ‘যা তো ভেতরে গিয়ে একটা প্লেট নিয়ে আয়।’

– ‘আমি কেন যাবো? তুই যা।’

– ‘না, তুই যা।’

– ‘অমৃতা তোর অভ্যাস বেশি খারাপ হয়ে গেছে। সব সময় সবাইকে আদেশ করিস কেন?

– 'আমি আদেশ করতে ভালোবাসি।' অমৃতার নির্বিকার স্বীকারোক্তি। সামি গমগম করে বললো – 'আমি আদেশ পালন করতে ভালোবাসি না।'

~'তুই একদম তোর বাপের মত হইছিস। খটোমটো, কাঠখোট্টা।'

– 'আমার বাপকে যেন তুই কত চিনিস!'

– 'চিনিই তো। কাঠখোট্টা লোক একটা।'

জানা কথা হলেও কেন যেন সামির নিজের বাবা সম্পর্কে অমৃতার করা মন্তব্যটা এই মুহূর্তে ভালো লাগলোনা। সে কিছু না বলে চুপ করে গেলো। অমৃতা আবার খ্যাঁক দিয়ে উঠে বললো, 'যা, প্লেট নিয়ে আয়।'

সীমাহীন বিরক্তির একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো সামি অমৃতার মুখের ওপর। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। বসার ঘর পার হয়ে ডাইনিং এ আসতেই বিভা আর হৃদিতার মুখোমুখি পড়ে গেলো সে। বিভা টেবিলের ওপর চপিং বোর্ড রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাদ কাটছিলো। তার পরনে একটি বেগুনি হাফ সিল্কের শাড়ি। খোঁপা বাঁধা চুলে বেলিফুলের গাজরা। চোখ ভর্তি কাজল। সুন্দর দামি পারফিউমের ঘ্রাণে ম ম করছে সারা ঘর। পাশে দাঁড়ানো হৃদি পরেছে রুপালি পাড়ের সাদা কাতান। তার চুলগুলো এলো করে ছাড়া। তাতে জড়ানো ফুলের মালা। ওদের দুজনকেই এতো বেশি সুন্দর লাগছিল যে দেখামাত্র সামি একটু কেমন থ বনে গেলো। অস্ফুটে বললো, 'ওরে বাপরে, এতো সাজগোজ?'

এই গৌরবর্ণের কোঁকড়া চুলো যুবকের সহসা আগমন একটা স্নিগ্ধ কোমল বাতাসের ঝাপটার মতো ছুঁয়ে দিয়ে গেল দুই নারীকে। ঝলমলিয়ে উঠল বিভাবরীর ডাগর দুটি চোখের তারা। ওদিকে গতরাতের সেই ঝগড়ার পর থেকে এখন অবধি হৃদির আর কোনরকম বাক্য বিনিময় হয়নি সামির সাথে। আজ সারাদিন পর মানুষটার মুখ

দর্শনে তার সর্বাঙ্গে কেন যে অমন বিনা কারণে রিমঝিম এক সুর বেজে উঠলো তা কে জানে!

বিভা হাসল, 'এতদিন পরে একসাথে হয়েছি আমরা। সাজবোনা?'

সামি ঠোঁট উল্টে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'ও আচ্ছা।'

হৃদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি করছিল। ভারী আনমনা দেখাচ্ছিল তাকে। সামি বিভাকে একবার আগাগোড়া দেখে নিল। তারপর মুগ্ধ গলায় বললো, 'তোকে সুন্দর লাগছে!'

প্রশংসা শুনে বিভা তার রাজেন্দ্রাণী হাসিটা হাসলো। হৃদি আঁকিবুকি থামিয়ে দিয়ে সামির দিকে চোখ তুলে তাকালো একবার। বিভাকে সুন্দর লাগছে, আর হৃদিকে? চকিতে মনে পড়ল গতকাল রাতে সামি তাকে বলেছিল, তুই প্রেমে পড়ার মতো মেয়ে না। মনে পড়তেই একটা অন্ধ রাগ সাপের মতো ফণা তুলতে আরম্ভ করল বুকের ভেতর। সামি ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে একটা প্লেট দিতে পারবি? মাংস রাখার জন্য একটা প্লেট লাগবে।'

- 'পারবো না। নিজে নিয়ে নে।' সামির মুখের ওপর তির্যক ভাবে কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে আর দাঁড়ালোনা হৃদি। গটগট করে হেঁটে সরে গেলো জায়গাটা থেকে।

বিভা ভারী অবাক গলায় বলে উঠলো, 'ওমা! এর আবার কী হইলো?'

হৃদির এই হঠকারী প্রস্থান সামির মুখমণ্ডলে একটি মেদুর ছায়াপাত ঘটাল। সেই মুহূর্তে দূর্গা হাতে কফির মগ নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, ‘বৌদিমণি, দাদাবাবুর কফিটা। তুমি যাবে? নাকি আমিই দিয়ে আসবো?’

– ‘আমাকে দাও।’ বলে হাতে ধরা ছুরিটা টেবিলের ওপর রাখলো বিভা। দুর্গার হাত থেকে কফির মগটা নিতে নিতে বললো, ‘এই দাদাকে একটা খালি প্লেট দাও। বড় ডিশ।’

দূর্গা আদেশ পালন করতে রান্নাঘরে ফিরে গেলো। বিভা সামিকে বললো, ‘উনার কফিটা দিয়ে আসি। বুঝতেই তো পারছিস ওদিকটাও একটু খেয়াল রাখতে হচ্ছে। উনি যদি আবার রেগে যান?’

- ‘কী হবে বিভা? উনি রেগে গেলে? তুই বানে ভেসে যাবি?’

– ‘আহ, তুই বুঝতে পারছিস না সামি। ডিভোর্সটা তো এখনো হয়নি। আমাকে তো সবটা ম্যানেজ করতে হচ্ছে।’

সামি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো,’শোন বিভা, তোর এসব শিটি ম্যানেজমেন্ট আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধ না করলে, ডিভোর্সটা জীবনেও হবেনা।’

দূর্গা একটি বড়সড় সিরামিকের প্লেট সমেত ফেরত আসলো। সামি প্লেটটা হাতে নিতে নিতে ম্লান চোখ মেলে চেয়ে দেখল কফির মগ হাতে নিয়ে বিভার দ্রুত পায়ে চলে যাওয়া।

ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল হৃদি। তার মনটা হতাশা আর রাগে টানটান হয়ে আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে এক টানে চুলে লটকে থাকা ফুলের মালাটা ছিঁড়ে ফেললো। ফুলগুলো ঝরঝর করে ঝরে পড়ল লাল সিমেন্টের মেঝের ওপর। কেন কে জানে, দমকা হাওয়ার মতো হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই দিনগুলির কথা। যে দিনগুলিতে সামির পাশে কেউ ছিলনা। ছিল শুধু হৃদি। হ্যাঁ এই হৃদি। যাকে কিনা সামি কোনো দিন চোখ মেলে ঠিকমতো দেখেনি পর্যন্ত!

মনে পড়ল সেই ঝুম বৃষ্টির বিকেল। মনে পড়ল একটা সি এন জি। মনে পড়ল রিকশা, মানুষ, গাড়ি, কালো ধোঁয়া! মনে পড়ল পাশে বসে থাকা বোল শূন্য মূর্তির মতো সামিকে।একটু বাদে সামি থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করল। হৃদি ওর কপালে হাত ছুঁইয়ে দেখলো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সি এন জি ওয়ালাকে গাড়ি ঘোরাতে বললো সে। ফিরে চললো অমৃতার বাসায়। তারপরের কয়েকদিন সামির কী ভীষণ জ্বর! টেস্ট করানোর পর টাইফয়েড ধরা পড়লো। অমৃতার তখন এন জি ওর নতুন প্রজেক্টের কাজ চলছে। তার সময় নেই। আকাশ সবেমাত্র চাকরিতে জয়েন করেছে। রুদ্রটার ঢাকা শহরে থাকবার জায়গা নেই। দুদিন ঢাকা, দুদিন চিটাগাং করে দিন কাটাচ্ছে সে। চাকরি খুঁজছে পাগলের মত। সামির পাশে দাঁড়াবার মত কেউ ছিলোনা। ছিল এক হৃদি। রোজ ক্লাস শেষে অমৃতার বাসায় চলে যেত সে সামিকে দেখতে। সামির আম্মা আসতেন ঠিকই কিন্তু অন্যের বাসায় খুব বেশিক্ষণ পড়ে থাকতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন না। বাবুর্চিকে দিয়ে রান্না করিয়ে ছেলের জন্য খাবার নিয়ে আসতেন রোজ। সেই খাবার খাওয়ানোর দায়িত্ব ছিল হৃদির। সামির আম্মা ছেলের সুস্থতার জন্য পর পর তিনদিন রোজা রাখলেন। সেই তিনদিন হৃদিও রোজা রেখেছিলো। এ খবর কেউ জানেনা, শুধু হৃদি আর হৃদির আল্লাহ জানেন। জায়নামাজে বসে কত কান্নাকাটি করেছে সে সামির সুস্থতার জন্য। কত রাত সে ওই জ্বর গায়ের ছেলেটার পাশে একটানা বসে থেকেছে। জ্বরের ঘোরে সামি বিভার নাম ধরে ডাকাডাকি করতো। সে খুঁজত বিভাকে কিন্তু তার পাশে বসে থাকত হৃদি। বিভাকেই তো ভালোবাসে সামি! ভালোবেসেছে সব সময়। বিভাই সবসময় সুন্দর তার চোখে, হৃদি তো নয়! এটা তো সবাই জানে। সব জেনে বুঝেও হৃদি কেন কষ্ট

পাচ্ছে? বিভা তার বন্ধু! যে বিভাকে সে ভালোবেসে এসেছে মেয়েবেলা থেকে, সেই বিভাকেই এতো হিংসা? ছিঃ হৃদিতা ছিঃ, ধিক তোমাকে ধিক!

অভিজিৎ বিছানায় বসে ছিল কোলের ওপর ল্যাপটপ নিয়ে। তার পরনে একটি বাদামি উলের সোয়েটার। চশমাটা নাকের ডগায়। বিভা কফির মগ হাতে ঘরে ঢুকতেই সে মুখ তুলে তাকাল। তাকানো মাত্র তার মোটা চশমার আড়ালের ভালোমানুষী চোখের তারায় ঝিকমিক করে উঠলো একরাশ মুগ্ধতা। বিভাকে দেখতে কী ভীষণ সুন্দর লাগছে! এতো সুন্দর যে ভালো লাগায় একদম দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

বিভা খাটের ওপর বসে থাকা অভিজিতের দিকে কফির মগটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘এই নিন।’

অভিজিৎ হাত বাড়িয়ে কফির মগ নিল। পুলকিত চোখে বিভার দিকে খানিক সময় চেয়ে থেকে বললো,

– ‘আজ কি কোন বিশেষ দিন?’

বিভা ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। খোঁপায় বাঁধা ফুলের মালাটা জায়গা মতো আছে কিনা দেখে নিলো। তারপর সিঁদুরের কৌটা থেকে এক চিমটি লাল রং নিয়ে সিঁথির সিঁদুর গাঢ় করতে করতে বললো, ‘বিশেষ দিন হতে হবে কেন?’

– ‘এতো সাজগোজ?

বিভা হেসে বললো, দেশে থাকতে আমি আর হৃদি প্রায়ই একসাথে সাজগোজ করতাম। আজকে এতদিন পর দুজন একসাথে হয়েছি তো, তাই ভাবলাম একটু আগের মতো ফান করি।’

– ‘ফান?’

– ‘হ্যাঁ ফান, অত অবাক হচ্ছেন কেন?’

বলে বিভা ঘুরে দাঁড়াল। তাকাল অভিজিতের চোখে চোখ রেখে। অভিজিৎ কফির মগে চুমুক দিতে গিয়েও দিতে পারলনা। বড্ড গরম। ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নিরস্ত হয়ে মগটা বিছানার সাইড টেবিলের ওপর রেখে সে বললো, ‘আপনার যে দুদিন পর ঢাকা ফিরে যাবার কথা। এ বিষয়ে কথা বলেছেন আপনার বন্ধুদের সাথে?’

বিভা নির্বিকার গলায় বললো, ‘এবার মনে হয় যাওয়া হবেনা।’

অভিজিৎ অবাক হয়, চোখ বড় করে বলে, ‘যাওয়া হবেনা মানে?’

– ‘মানে, আমার বন্ধুদের ল্যাজ ধরে দেশে ফিরে গেলে আমার বাবা মা ওদের দোষ দেবে। বলবে যে ওরা আমাকে ফুসলিয়ে, কুমতলব দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

অভিজিৎ কোলের ওপর থেকে ল্যাপটপটা নামিয়ে রাখলো বিছানায়। বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে খুব গম্ভীর গলায় বলল ‘ আপনার প্রেমিক কী বলেছে এ বিষয়ে?’

– ‘তার সাথে এখনো কোনো কথাই হয়নি এসব নিয়ে। আপনি তো রেস্ট্রিকশন দিয়ে রেখেছেন। বলেছেন তার কাছাকাছি না যেতে, বলেন নি?’

– ‘কাছাকাছি যেতে মানা করিনি। আপনারা যা খুশি করতে পারেন দ্যাটস নান অফ মাই বিজনেস। শুধু বলেছি আমার চোখের সামনে ওসব রংঢং করবেন না।’

বিভা ফিচেল হাসে। দু পা এগিয়ে এসে অভিজিতের মুখোমুখি দাঁড়ায়। টেনে টেনে বলে, 'কেন? আপনার চোখের সামনে রংঢং করলে কী হয়? হিংসে?'

অভিজিৎ বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিল, 'আপনার সবসময় ফালতু কথা।'

বিভা হাসতেই থাকে। অভিজিতের সোয়েটারের গলার ওপর কুঁচকে থাকা শার্টের কলারটা আলতো হাতে ঠিক করে দিতে দিতে হালকা গলায় বলে, 'ধরেন আমি যদি আর কোনো দিন না যাই। সারাজীবন আপনাকে এভাবেই বিরক্ত করি। তখন কী হবে?'

এ কথার পর অভিজিৎ আকস্মিক ভাবে, খুব আকস্মিক ভাবে বিভার দুই বাহু খামচে ধরে টেনে নিয়ে আসল নিজের কাছে। অনেকটা ফিসফিস করে বলল, 'ভালোবাসতে পারবেন আমাকে?'

চার চোখেতে বিদ্যুৎ বেগে বিভ্রম খেলে যায়। কয়েকটা মুহূর্ত কেউ কিছু বলতে পারেনা। কেমন এলোমেলো সবকিছু! খন্ডপ্রলয়টা কেটে যাবার পর বিভা খুব ধীরে ধীরে নিজেকে অভিজিতের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। তার হাত পা কাঁপছিলো। ভেতরটা বড্ড অবশ। ভালোবাসতে পারবে কি? সামিকে দেখলে এখনো যে তার মন কেমন করে! ছেলেটা নেশার মতো তাকে সর্বক্ষণ টানতে থাকে নিজের দিকে। পারবে কি সে ওই মদির সম্মোহন থেকে বেরিয়ে আসতে কোনো দিন? ভাবতে ভাবতে কয়েক পা পিছিয়ে আসে সে। দরজার দিকে এগিয়ে যায় ধীর পায়ে। হঠাৎ তার মাথায় আসে অন্য এক চিন্তা। সে থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে নতমুখে আস্তে করে বলে, 'আপনি পারবেন? আমাকে ভালোবাসতে? আমার মত একটা খারাপ মেয়েকে?'

– 'আপনি খারাপ এ কথা কে বললো?' দুর্বল গলায় প্রশ্ন করল অভিজিৎ।

বিভা স্নিগ্ধ চোখে তাকায় অভিজিতের দিকে, 'খারাপ নই?'

– 'না!'

– 'আপনার মত ভালোও তো নই!'

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। হৃদি চোখের জল মুছে নিল দু হাত দিয়ে ডলে ডলে খুব ভালো ভাবে। যেন কান্নার কোনো চিহ্ন লেগে না থাকে মুখে। দরজা খুলে দেখলো সামি দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে বিশাল বড় এক সিরামিকের খালি প্লেট। ওর পরনে সাদা পুলওভার, কালো জিন্স। হৃদিকে সে জহুরি চোখে একবার পরখ করে নিয়ে বললো, 'কী হইছে তর?'

হৃদি একটু অপ্রস্তুত হল। তার চুল হয়ে আছে আলুথালু। মেঝেতে পড়ে আছে ছেঁড়া ফুলের মালা। সবকিছু ছন্নছাড়া, বিশৃঙ্খল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি বিশৃঙ্খল হৃদি নিজে। তার দুচোখ জোড়া ভয়াবহ বিষণ্ণতা। নিশ্বাস পড়ছে ফোঁসফোঁস। সামির প্রশ্নে সে গর্জে উঠে বললো, 'তাতে তোর কী? বিরক্ত করতে আসছিস কেন?

সামি হৃদির খ্যাঁক শুনে একটু কাঁচুমাচু হয়ে গেল, বিব্রত গলায় বলল, 'ওরে বাপরে, এতো রাগ করতেছিস কেন? ইদানিং তোর রাগ দেখলে আমার ভয় লাগে!'

কথাটা বলে সামি মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা বিধ্বস্ত, ছেঁড়া ফুলের মালাটি দেখল এক নজর। ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বললো, 'এই খ্যাত জিনিসটা মাথা থেকে খুলে ফেলে একটা ভালো কাজ করছিস। সঙের মত লাগতেছিলো দেখতে।'

হৃদি জ্বলন্ত চোখ নিয়ে তাকাল সামির দিকে, প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘আমাকে সঙের মত লাগছে নাকি হুরপরীর মত লাগছে এই কথা তোর কাছে থেকে শুনতে হবে? তোর মত একটা থার্ড ক্লাস ছেলের কাছ থেকে?

– ‘আমি থার্ড ক্লাস?’ সামি হতবাক।

– ‘হ্যাঁ থার্ড ক্লাস।’

– ‘আজিব কারবার! কোন এঙ্গেল থেকে আমাকে তোর থার্ড ক্লাস মনে হয়, হ্যাঁ?’

– ‘সব এঙ্গেল থেকেই। এই যে বিবাহিতা গার্লফ্রেন্ডের বাসায় এসে নির্লজ্জের মত পইড়া আছস। কোন লেভেলের মানুষ এ ধরণের কাজ করতে পারে শুনি?’

এ কথা শুনে সামির ফর্সা মুখের রং রাঙা হয়ে উঠল, ‘তুই আমার ফ্রেন্ড হয়ে এমন একটা কথা বলতে পারলি? তুই জানিস না আমি না পারতে এই কাজটা করতেছি?’

হৃদি তার আউলা ঝাউলা চুল গুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে খোঁপা বাঁধছিলো। তার নাকের পাটা ফোলা। চোখের দৃষ্টি তীব্র। সামি ভাল মতো আরেকবার দেখে নিল হৃদিকে। ওর আচরণ স্বাভাবিক ঠেকছে না। মনে হচ্ছে কোন কারণে মন খারাপ। হাতের প্লেটটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখল সে। এরপর মেঝেতে পড়ে থাকা ছেঁড়া ফুলের মালাটা যত্ন করে তুলে নিল হাতে। হৃদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ‘সঙের মত লাগছিলোনা। সুন্দর লাগছিলো। আজকাল কি তুই জোকও বুঝিস না? এরকম হয়ে গেছিস কেন?’

হৃদির মুখে থমথম করছে এক বাঁধভাঙা কান্নার পূর্বাভাস। সে অন্যদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। সামি ওর একটা হাত ধরে, হাতের মুঠো খুলে ফুলগুলো গছিয়ে দিল। হৃদির গাল হালকা ভাবে ছুঁয়ে দিয়ে নরম গলায় বললো, ‘তুই এখনো গত কালকের ব্যাপারটা

নিয়ে আমার ওপর রাগ করে আছিস তাইনা? আমি সরি বলছিনা দোস্ত? তুই এরকম করলে কি আমার ভালো লাগে? তুই না আমার বেস্ট ফ্রেন্ড?’

ঠিক সেই সময় ঘরের আধ ভেজানো দরজাটা খুলে আচমকা বিভা এসে দাঁড়ালো ওদের সম্মুখে। সামির একটা হাত হৃদির হাতে ধরা, অন্য হাত ছোঁয়ানো ওর গালে। কেন কে জানে, বিভার ওই আকস্মিক আগমনে দুজনেই ভারী চমকে উঠল। সামি চকিতে এক পা পিছিয়ে আসল হৃদির কাছ থেকে। হৃদি স্তব্ধ চোখে, রুদ্ধ শ্বাসে তাকাল বিভার দিকে।

বিভা অপ্রস্তুত এবং বাক্যহারা। কারো অত্যন্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তে হানা দেয়ার পরমুহূর্তে যেরকম অপরাধ বোধ হয় ঠিক সে রকম একটা বোধ জন্ম নিলো তার মনের মধ্যে। কোনো শিক্ষিত, বিবেকবান মানুষ অন্যের ব্যক্তিগত মুহূর্তে দখল দেয় না। বিভাও দিতে চাইলোনা। সে অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে বললো,’তোরা কী করতেছিস?’

কিছুক্ষণ বিরতি। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বিভাই কথা বলল আবার, ‘আচ্ছা … আমি উঠোনে যাচ্ছি, তোরা আয়।’

এটুকু বলে সে আর দাঁড়ালোনা। চলে আসার সময় তার হঠাৎ মনে হল, দুজন বন্ধুর মাঝে খুব বেশি প্রাইভেট কিছু কি থাকা উচিৎ? আর বিশেষ করে তাদের এই ছয়জনের বন্ধুত্বে তো প্রাইভেসি বলতে কোনো বস্তু কোনো কালে ছিলনা। তার মাথাটা একটু এলোমেলো লাগতে লাগলো। কী করছিল ওরা? কী কথা বলছিল?

বিভা চলে যাবার পর দুজনেই কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। নিজেদের এই অস্বাভাবিক আচরণের কোন ব্যাখ্যা আপাতত নেই তাদের কাছে। হয়তো গত সন্ধ্যায়

ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার কারণে তারা দুজনেই মনে মনে বিভার কাছে ছোট হয়ে আছে। হয়তো বিভা যখন দুজনের মাঝখানে হঠাৎ পর্দা ফুঁড়ে এসে হাজির হয়েছিল তখন বিনা নোটিশে নিজের ভেতরের অপরাধী মনটা সচকিত হয়ে উঠেছিল।

সামি একটু আড়ষ্ট ভাবে বলল, 'ইয়ে··· কী যেন বলছিলাম?'

হৃদি তখনো ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি। সে নিশ্বাস বন্ধ করে বললো, 'বিভা কী ভাবলো?... ইশ আমার কেমন যেন লাগছে। তুই বিভার কাছে যা।'

– 'হুম···' সামিকে অন্যমনস্ক দেখাল।

– 'আর শোন তোর আংটিটা আমি খুলতে পেরেছি।' বলে হৃদি হেঁটে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগের চেইন খুলে আংটিটা বের করলো। সামির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এই নে, বিভাকে দিয়ে দিস।'

সামি হাত বাড়িয়ে আংটিটা নিল। তার চোখের তারায় আর নাকের ভাঁজে চিন্তা খেলা করছে। সে গম্ভীর গলায় বললো, 'তোর কি মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের সবাইকে বলা উচিৎ? মানে গত কালকের ঘটনাটা?'

– 'হ্যাঁ আমিও এটা নিয়ে তোর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। তুই কি মনে করিস, বলার দরকার আছে?

সামি একটুক্ষণ চুপ থেকে বললো, 'দ্যাখ, ফ্রেন্ডদের কাছ থেকে আমরা তো কিছুই লুকাইনা। আর তা ছাড়া বিভাকে ব্যাপার টা না বললে সারা জীবন আমার মধ্যে একটা গিলটি ফিলিংস কাজ করবে। আই ওয়ান্ট টু বি লয়্যাল টু হার।'

হৃদি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'হুম তাহলে সবার সামনেই বলবি। বাট অভিজিতের এবসেন্স এ। তার কানে যেন এসব না যায়।'

বাইরে উঠোনে আকাশের সাথে হাত পাঞ্জা লড়ছে অমৃতা। মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে আর চেয়ারের গদিদে কনুই রেখে। পাশে রুদ্র মুখ ভর্তি আলুর চিপ্স নিয়ে লাফঝাঁপ দিয়ে দুজনকে চিয়ার আপ করছে। চিপ্স চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট ভাবে কী সব যেন বলে যাচ্ছে নিজের মনে। অমৃতা শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁত মুখ খিচিয়ে পাঞ্জা লড়ছে। সেই অবস্থায়ই বলল, 'রুদ্র তোর কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছতেছিনা। চাইনিজ বলতেছিস নাকি?'

রুদ্র চিপস গিলে বলল, 'চাইনিজ বলব কেন? বাংলা বলতেছি।'

– 'বাংলা বলতে পারিস তুই?'

– 'তুই পারিস?'

– 'আমি তোর থেকে ভালো পারি।'

– 'আব্ভা পারিস। বল দেখি মনীষা মানে কী?'

অমৃতার ভ্রু কুঁচকে গেলো। মনে হল মনীষা নামের অর্থ নিয়ে সে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। সেই দুশ্চিন্তার ফাঁক বুঝে আকাশ দিল অমৃতার হাত নামিয়ে। যেন তার জিতে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক এমন হালকা গলায় বলল, 'আমি জানি মনীষা নামের অর্থ।

অমৃতা তেড়ে মেরে এসে রুদ্রর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিল, 'শালা তোর জন্য হারছি আমি। ফালতু প্যাঁচালের আর টাইম পাইলিনা?'

সামিকে দেখা গেলো হেলে দুলে হাতে কাচের বাসন নিয়ে এগিয়ে আসতে। অমৃতা এবার চড়াও হল তার ওপর।

– 'একটা প্লেট আনতে গিয়া তো মানুষের যুগের পর যুগ লাইগা যায়। মানে কাহিনী কী বুঝলাম না আমি। ঘুমায় গেছিলি নাকি হাঁদারামের বাচ্চা?

সামি কানকাটার মত হয়ে কথা গুলো হজম করল। কিছু বললোনা। রুদ্র বলল, 'পারলিনা তো মনীষার অর্থ বলতে।'

অমৃতা মুখ ঝামড়ে উঠে বললো, 'আমি কি মনীষার উপর ক্রাশ খাইছি যে ওর নামের অর্থ মুখস্থ করব?'

– 'মনীষা অর্থ প্রতিভা, প্রজ্ঞা। আমার সব ফ্রেন্ডদের মনীষা নামের অর্থ মনে রাখতে হবে। আকাশ পারে, সামি পারে, তুই কেন পারবিনা?' কথাটা বলতে গিয়ে বেশ গম্ভীর হয়ে গেল রুদ্র।

অমৃতা রুদ্রর কথা পাত্তা না দিয়ে বারবিকিউর মাংস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলো। রুদ্র কিন্তু দমল না। আবার বললো,

'তুই বাংলা ইংরেজি কিছুই ঠিক মতো পারিস না অমৃতা।'

– 'না, আমি কোত্থেকে পারব? সব তো পারবি তোরা ইঞ্জিনিয়াররা। আমরা লইয়াররা তো ঘাস খাই মামা। ঘাস খায়ে বেঁচে থাকি।'

– 'হ, ঠিক কথা। বল দেখি, এক অক্ষরে আকাশের একটা প্রতিশব্দ বল।' আকাশ রুদ্রর পাশেই হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। অমৃতা অবাক চোখে আকাশের হাসি মাখা মুখখানার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, 'এক অক্ষরে আকাশ? মানে?'

– 'আরে এই আকাশ না, আসল আকাশ, মানে মাথার উপরের আকাশ। স্কাই।'

অমৃতার খুব রাগ ধরে গেলো, 'তুই বল দেখি মঞ্জু শব্দের অর্থ কী?' রুদ্র মুখ বাঁকা করে বলল, 'হু দ্যা ফাক ইজ মঞ্জু?'

– 'জাস্ট টেল মি দ্যা ফাকিং মিনিং অফ দ্যাট নেইম!' অমৃতার গলা চড়ে যায়।

রুদ্রকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল। সামি দাঁড়িয়ে ছিল ওদের পাশে। কেমন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে আছে বারবিকিউ গ্রিলের কয়লা পোড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। মনে হচ্ছে সে বন্ধুদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেনা। রুদ্র সামির কনুইয়ে একটা গুঁতা মেরে বললো, 'ইয়ো ম্যান, মঞ্জু মানে কী?'

সামি বিরক্তিতে কাদা হয়ে বললো, 'তুই একটা বাল শালা, আজাইরা বকবকানির জায়গা পাস্ না।'

উঠোনে তখন বিভা, অভিজিৎ আর হৃদি এসে গেছে। সবাই গোল হয়ে বসেছে চেয়ার পেতে। বারবিকিউর কাজ শেষের পথে। রুদ্র গিটার নিয়ে বসেছে সবার মধ্যমণি হয়ে। বাতাসে হিমের গন্ধ। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী চাঁদটা নীল হীরক কুচি তারাদের

সঙ্গে নিয়ে বুঝি রুদ্রর গান শোনারই আয়োজন করছে। পুরো আকাশ জুড়ে ভারী উৎসব উৎসব একটা ভাব।

রুদ্র গিটারে সুর তুলে ওদের চট্টগ্রামের একটা গান ধরলো,

মধু হৈ হৈ

বিষ খাওয়াইলা

মধু হৈ হৈ

বিষ খাওয়াইলা

হন কারনে…

ভালবাসার দাম নও দিলা

হন দোষ আণ পাই

ভালবাসার দাম ন… দিলা…

আশা আছিল তোয়ারে লই

বাইন্দুম একখান সুখেরি ঘর

সুখের বদল দুঃখ দিলা

হন কারনে

ভালবাসার দাম ন…দিলা

বিভা রুদ্রর মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসেছিল। হঠাৎ কী হল কে জানে! সে বসা থেকে উঠে, কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে গেল রুদ্রর দিকে। তারপর দাঁড়াল ওর চেয়ারের

ঠিক পেছনে। হাত দিতে রুদ্রর আউল বাউল চুল গুলো নেড়েচেড়ে দিয়ে আহ্লাদী গলায় বলল, 'কত দিন আমার দোস্তটার গান শুনিনা! থ্যাংক ইউ দোস্ত। থ্যাংক ইউ সো মাচ!'

রুদ্র গান গাইতে গাইতে বিভার দিকে ঘুরে তাকিয়ে ভারী সুন্দর একটা হাসি হাসলো। তারপর হঠাৎ করেই তার গিটারের সুর পরিবর্তন হয়ে গেল। পূর্বের গানটির ইতি টেনে নতুন গান ধরল সে।

'তুই বন্ধু হয়ে আমার হাতটা ছুঁলে

আমি এ বিশ্ব সংসার যাবো ভুলে

ভুলব সব ভুল অংকের ভুল উত্তর

শত দুঃখ বেদনা আর কষ্টের প্রহর'

গানটা ধরামাত্রই বন্ধুরা সব বসে থাকা অবস্থায় একে অন্যের হাত ধরল। চেয়ার গুলো কাছাকাছি ছিল বলে কাজটা খুব সহজেই করা সম্ভব হল। বন্ধুদের এই হাত ধরাধরি দেখে অভিজিতের মুখে একটি ব্যাঙ্গাত্বক তির্যক হাসি ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। বিভা ফিরে আসল নিজের জায়গায়। বসল অভিজিতের পাশের চেয়ারে। বসা মাত্রই হৃদি তার হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল।

'তুই বন্ধু হয়ে থাকলে আমার পাশে

আমি কষ্ট গিলে খাই এক নিঃশ্বাসে'

সেই মুহূর্তে বিভা চট করে ধরে ফেলল অভিজিতের একটা হাত। অভিজিৎ স্তব্ধ হয়ে চাইল একবার বিভার দিকে। বিভা রুদ্রর সাথে গলা মিলিয়ে গাইছে তখন,

‘তুই কাছে আয়, দূরে চলে যাই চল
তোর জন্য গড়েছি স্বপ্নের বৃষ্টি মহল!’

সামি তেরছা চোখে চেয়ে ছিল বিভা আর অভিজিতের ধরে থাকা হাতদুটির দিকে। বিভা হাতটা ধরতেই লোকটার চোখ মুখের ভঙ্গি পাল্টে গেছে। বোকা লোকটা যে গভীর ভাবে বিভার প্রেমে পড়ে গেছে সে বিষয়ে সামি এখন শত ভাগ নিশ্চিত। নাহ, বুকের ভেতর কোন জ্বালা অনুভব করছেনা সে। মন খারাপ হচ্ছে এ কথা ঠিক। কিন্তু তার চেয়ে বেশি যা হচ্ছে তার নাম হতাশা। সম্পর্কগুলো বড় বেশি উল্টেপাল্টে গেছে। তিনটা মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর বিশৃঙ্খলতা। এই বিশৃঙ্খল, অরাজক তিনটি জীবনের জন্য দায়ী কে? বিভার বাবা মা? তাঁর নিজের বাবা? নাকি স্বয়ং বিভা? ভাবতে ভাবতে সামি ক্রমশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। বিভা কেন হুট করে লোকটার হাত ধরতে গেল? হাতটা ধরা কি খুব বেশি জরুরি ছিল? অমৃতার স্বপ্নের বৃষ্টিমহলে অভিজিতের ঠিক কী ভূমিকা থাকতে পারে?

পকেটে রাখা সেলফোনটা বাজছিল। ফোন হাতে নিয়ে অমৃতা সন্তর্পণে বন্ধুদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে আসল। হেঁটে হেঁটে উঠোন পেরিয়ে লাল মাটির পথটায় উঠবার ঠিক আগ মুহূর্তে পেছন থেকে আকাশের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো, ‘এই অমৃতা, কই যাস?’

অমৃতা উচ্চস্বরে উত্তর দিল, ‘একটা ফোন আসছে।’

এ রাস্তার দুপাশে ঘন বনের সারি। শাল, বাবলা, জামুন, গজারি আর কাটা বাঁশের ছড়াছড়ি। পায়ের আওয়াজ শুনে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা রাত পাখি গুলি সচকিত হল। ডানা ঝাপটে উড়াল দিল এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে। ধারে কাছে কোথাও ডেকে উঠলো প্যাঁচা।

অমৃতা ফোন ধরে খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল, ‘বলুন।’

– ‘অমৃতা চৌধুরী!’

ভরাট এবং গম্ভীর পুরুষালী কণ্ঠটা এই রাত্রি কালীন গা ছমছমে, গভীর নিস্তব্ধতায়, অমৃতার মেরুদণ্ডে আচমকা একটি হিমেল শিহরণ তুলে দিয়ে গেল।

– ‘কী হয়েছে?’ উদ্বেগ টা আর চাপা থাকল না তার গলায়।

– ‘আজকে দেশের এক নামকরা নিউজপেপারে একটি খবর ছাপা হয়েছে। লেখা হয়েছে যে আমার একমাত্র পুত্রের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করেছি।’

অমৃতা থমকাল। চুপ করে রইল কয়েকটা সেকেন্ড। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল,’তো আমি কী করবো? আমাকে এসব কেন বলছেন?’

– ‘এই খবরটা প্রচার হওয়ার পেছনে তোমার হাত আছে কি?’

সেদিন উত্তরায় সামিদের বাড়ির সামনে একজন সাংবাদিক ছেলের সাথে অমৃতার এ বিষয়ে কথা হয়েছিল। কাজটা সে ইচ্ছাকৃত ভাবেই করেছিল এবং কাজটা করার পর

বিন্দু মাত্র অপরাধ বোধ তার ভেতর কাজ করেনি। আজও করছেনা। কিন্তু হকের এই অকপট, চাঁছাছোলা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে অন্যরকম একটা অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। সেদিন নিছক রাগের বশে কাজটা করে বসেছিল। এখন মনে হচ্ছে অতটা বাড়াবাড়ি না করলেও চলত। এই লোক যত খারাপই হোক না কেন, সামি তো তার বন্ধু! বন্ধুর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়া সংবাদটি জানতে পারার পর হাজার চেষ্টা করেও খুশি হতে পারছেনা সে। অস্বস্তি হচ্ছে, নিদারুণ অস্বস্তি।

– ‘আমি সঠিক জানিনা।’

– ‘সঠিক জানোনা মানে?’

অমৃতা একটা বড় নিশ্বাস টেনে নিয়ে নিজের ভেতর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। তারপর নির্ভয়ে বলল, ‘আমার হাত আছে কিনা এ ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত নই। আপনি ফেমাস মানুষ। সংবাদ মাধ্যম গুলো যে কোনো উপায়ে আপনার সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে পারে। দেয়ালেরও তো কান আছে। তবে হ্যাঁ, আমি একজন সাংবাদিকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম, কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর না যে এটা তার কাজ।’

হক মেয়েটির স্পষ্টবাদিতা দেখে এক নিদারুণ বিস্ময়ে চুপ হয়ে গেলেন। মেয়েটি যেন কেমনতর! কথাবার্তা টানটান এবং জড়তা হীন। চট করে রেগে গিয়ে ধমক দেয়া যায়না আবার ছেলেমানুষ ভেবে এর বক্তব্য উড়িয়েও দেয়া যায়না। একে শাসন করার আগে দশবার ভেবে নিতে হয়। মেয়েটিকে তিনি দিনকে দিন যত আবিষ্কার করছেন ততই বিস্মিত হচ্ছেন। অল্প বয়সে এতটা ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সচরাচর দেখা যায়না। ফোনটা করার আগে, মেয়েটির ওপর তার প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সামনে পেলে নির্ঘাত এক চড় মেরে এর দাঁ তের পাটি নাড়িয়ে দিতেন। একটা পুঁচকে মেয়ের এত সাহস হয় কী করে? কিন্তু এইমাত্র মেয়েটির দ্বিধা হীন অকপট

স্বীকারোক্তি শুনতে পেয়ে তার ভিতরকার অগ্নিবৎ রাগটায় হঠাৎ যেন ঠাণ্ডা জলের ছিটে এসে পড়ল। রাগের চাইতে প্রকট হয়ে ধরা দিল কৌতূহল এবং বিস্ময়।

– ‘ঠিক কী বিষয়ে কথা বলেছিলে তুমি সাংবাদিকের সাথে?’ বেশ খানিকটা সময় নীরবতা পালন করার পর হক মুখ খুললেন।

অন্ধকারে এক পা দু পা করে এগিয়ে, অমৃতা একটা ছোট টিলার উপর উঠে বসল। শীতটা এখন বড্ড দাপুটে। লেদারের জ্যাকেট ভেদ করে সরাসরি চামড়ায় গিয়ে কামড় বসাচ্ছে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধারালো অমৃতা। সময় নিয়ে। তারপর নিকোটিনের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কালো অন্তরীক্ষের গায়ে ফুটে থাকা হীরক কুচি নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, ‘বলেছিলাম আপনার ছেলে আপনার সাথে থাকেনা। আলাদা থাকে।’

– ‘কেন বলেছিলে?’

– ‘আপনাকে হ্যারাস করতে চেয়েছিলাম, তাই।’

–’ কেন এমনটা চেয়েছিলে? কারণ কী?’

– ‘আপনাকে আমার খুব একটা পছন্দ হয়না। এটাই কারণ।’

হক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন। তার এই ঊনপঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ময়, সফল জীবনটায় এর আগে কেউ কোনো দিন মুখের ওপর এহেন অপমান জনক এবং আক্রমণাত্মক কথা বলার সাহস পায়নি। তার ক্ষমতা সম্পর্কে এই মেয়েটির কোন ধারণাই নেই। মেয়েটি জানেনা তিনি চাইলেই এক লহমায় এর ভবিষ্যৎ জীবন তছনছ করে দিতে পারেন। একটা সুতীব্র অপমান বোধ টনটন করে উঠল তার ভেতরে। আর একটা শব্দও তিনি উচ্চারণ করলেন না। লাইন কেটে

দিলেন। ফোনটা পকেটে পুরতে পুরতে অমৃতা নিঃশব্দে হাসল। লোকটাকে জব্দ করতে পেরে একটা দারুণ সুখানুভূতি হচ্ছিল তার মনে মনে।

বাংলোর উঠোনে ফিরে এসে দেখা গেল খাওয়া দাওয়ার পালা এর মাঝেই শুরু হয়ে গেছে। সবার প্লেটে বারবিকিউ চিকেন আর পরোটা। গ্লাস ভর্তি সোডা। আকাশ তখন কোকের গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিচ্ছিল। চুমুক দেয়া শেষে বেশ উৎসুক গলায় সে অমৃতাকে প্রশ্ন করলো, 'কীরে? বয়ফ্রেন্ড নাকি? পলায় পলায় কার সাথে এত কথা বলিস?'

অমৃতা খুব হাসল, 'বয়ফ্রেন্ড! হা হা হা। ভালো বলেছিস।'

ঠিক সে সময় ফোনটা আবার আসল। আগের নম্বর থেকেই। বন্ধুদের কাছ থেকে আবারও কিঞ্চিৎ দূরে সরে গিয়ে ফোন ধরল সে। চাপা গলায় বলল, 'সিরিয়াসলি মিস্টার হক! এত বিরক্ত করলে হয়? আমার ফ্রেন্ডরা উল্টাপাল্টা ভাবছে।'

হক সন্দিহান হয়ে বললেন, 'উল্টাপাল্টা ভাবছে মানে?'

– 'ওরা ভাবছে আমি বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছি।'

ইয়া আল্লাহ! মেয়েটার মুখে কি কিছুই আটকায় না? হক আরেক বার বাক্যবধির হলেন, বিব্রত হলেন, লজ্জিত হলেন!

ওদিকে অমৃতা বলে চলেছে, ‘এভাবে চলতে থাকলে সামির কাছে ধরা পড়ে যাব। আর সামি যদি কোনভাবে জানতে পারে যে আপনি ওর প্রতিটা পদক্ষেপ এভাবে ফলো করছেন। তাহলে··· বুঝতেই পারছেন।’

হক একটু অপ্রস্তুত গলায় বললেন, ‘ইয়ে··· সামি কী করছে এখন?’

– ‘খাচ্ছে। আন্টিকে উইশ করেছে সে। আপনার চিন্তার কিছু নেই।’

– ‘হ্যাঁ জানি। তার মা খুশি হয়েছে।’

– ‘আর কিছু বলবেন?’

– ‘তুমি আমাকে অপছন্দ কর কেন?’ রয়ে সয়ে প্রশ্নটা করলেন হক। স্থির কণ্ঠে

– ‘ঠিক একই প্রশ্ন তো আমিও করতে পারি তাইনা? আপনি আমাকে আর আমার বন্ধুদের এতটা অপছন্দ করেন কেন? আমাদের বাবা মায়েদের আপনার মতো কোটি কোটি টাকা নেই বলে?’

হক কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, ‘এরকম কথা কি আমি কখনো বলেছি?’

অমৃতা হেঁটে হেঁটে বাড়ির ভেতর আসল। ভেতরে এখন কেউ নেই। সবাই উঠোনে।

– ‘বলেছেন। আপনার ছেলের সব চালচুলো হীন ছেলেমেয়েদের সাথে ওঠা বসা, এধরণের কথাবার্তা আপনি প্রায়শই বলে থাকেন। আমার কানে আসে।’

– ‘ব্যাপারটা ঠিক এরকম নয়।’

– ‘তাহলে ব্যাপারটা কী রকম?’

– ‘ব্যাপারটা হল, তোমরা কেউই লাইফ নিয়ে সিরিয়াস নও। আমার ছেলের মতো তোমরাও একেকটা রামগাধা। সব গাধারা একসাথে জোট বেঁধেছ। আসলে আমার ছেলেটার কিছু শুদ্ধ সঙ্গ প্রয়োজন ছিল। ডিসেন্ট এবং বুদ্ধিমান কিছু বন্ধুর প্রয়োজন ছিল। সঙ্গ দোষেই আজকে তার জীবনের এই নাজেহাল অবস্থা হয়েছে।’

– ‘আমরা প্রত্যেকে রামগাধা?’

– ‘ঠিক তাই।’

– ‘আমার বাবাকে আপনি একবার বলেছিলেন, তিনি সরকারি চাকরি করে যে বেতন পান তার চেয়ে বেশি টাকা বেতন পায় আপনার কোম্পানির সেকেন্ড ক্লাস কর্মচারীরা। একথা কেন বলেছিলেন?’

হক কিছু সময় নিশ্চুপ থাকলেন। তারপর প্রশ্ন বিদ্ধ গলায় বললেন, ‘বলেছিলাম নাকি? কই আমার তো মনে পড়েনা।’

– ‘হ্যাঁ বলেছিলেন।’

– ‘ও আচ্ছা। বলে থাকলেও ভুল কিছু তো বলিনি। ঘটনা ভীষণ সত্য।’

– ‘সত্য হলেই বুঝি মুখের ওপর বলে দিতে হবে? এইযে আপনি আমাকে সারাক্ষণ বেয়াদব বেয়াদব করেন, আদব জিনিসটা কি ষোল আনা আপনার মধ্যেও আছে মিস্টার হক? থাকলে তো আপনি আমার বাবাকে এমন কথা বলতে পারতেন না। তিনি একজন রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। তার বয়স সিক্সটি সিক্স। আপনার চেয়ে

বয়সে উনি বড়। তাহলে বেয়াদব কি শুধু আমরাই? আপনারা কী? ছেলেমেয়ের বাবা মা হয়েছেন বলে আপনাদের সব দোষ মাফ, তাইনা?'

– 'তুমি আসলেই বেয়াদব। তোমার বয়সে থাকতে আমরা এত কথা বলতে জানতামই না। জীবন যুদ্ধে ঠেকে ঠেকে কথা শিখেছি।'

– 'আমার বয়স খুব কিন্তু কাঁচা না। ছাব্বিশ হল এবার। আমার বয়সে থাকতে আপনি সন্তানের বাবা হয়ে গিয়েছিলেন। আমি প্রাপ্ত বয়স্কা। তাই কথায় কথায় বয়স নিয়ে খোঁটা দেবেন না।'

হক এ পর্যায়ে হেসে ফেললেন। ফোনের ভেতর দিয়ে অমৃতা সেই হাসির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। সে একটু কড়া ভাবে প্রশ্ন করল, 'হাসছেন কেন?'

– 'আচ্ছা, আমার ছেলে কী খাচ্ছে?' অমৃতার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন হক।

– 'বারবিকিউ চিকেন উইথ পরোটা।'

– 'বেশ, কে করলো বারবিকিউ?'

– 'বিভা আর হৃদি মাংস ধুয়ে দিয়েছে। আমি আর আপনার ছেলে মাংস ম্যারিনেট করেছি। পুড়িয়েছি।'

– 'সাউন্ডস গুড। এখন তাহলে রাখছি।'

– 'কাল কখন ফোন করবেন?'

– 'কেন জানতে চাইছ?'

– ‘সময়টা জেনে রাখতে চাইছি। আপনার তো কোন কিছু ঠিক নেই। যখন তখন ফোন দিয়ে বসেন।’

– ‘দেখি। যখন আমার ছেলের কথা মনে পড়বে ঠিক তখনই ফোন করব।’

– ‘ছেলেকে এত মিস করেন, ওর সাথে সরাসরি কথা বলেন না কেন?’

– ‘সেটা আপাতত সম্ভব নয়।’

– ‘কেন সম্ভব নয়?’

– ‘আরেকদিন বলবো। আপাতত গুড নাইট!’

– ‘শুনুন, শুনুন!’ অমৃতার হঠাৎ যেন মনে পড়ল খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু।

– ‘বল।’

– ‘এক অক্ষরে আকাশের প্রতিশব্দ কী? জানা আছে আপনার?’

– ‘খ?’

– ‘হ্যাঁ, খ, কেন পড়নি? খ তে চড়ে যে, খেচর। খেচর মানে আকাশচারী।’

– ‘ও… তাই তো!’

– ‘ছাড়ছি। আর কিছু বলবে?’

~’এ মুহূর্তে আর কিছু মনে পড়ছেনা।

– ‘খাওয়া দাওয়া কর। খুব বেশি রাত জেগো না তোমরা।’

– ‘রাত জাগব না মানে? আজ সারা রাত জেগে থাকব আমরা। বাবা টাইপ কথা বলবেন না তো!

– ‘আমি তো তোমার বাবারই মতো।

– ‘বাবার মতো হতে যাবেন কেন?’

– ‘বন্ধুর বাবা কি বাবার মতো নয়?’

– ‘আপনাকে আমার মোটেও বাবার মতো মনে হয়না।’

– ‘তাই নাকি? কেন বল তো!’

– ‘আরেক দিন বলবো।’

ফোনের ওয়েটিং লিস্টে একটা কল টুকটুক করে করা নাড়ছিল। অমৃতা বলল,

– ‘আমার আম্মু ফোন করেছেন। রাখি।’

– ‘রাখো।’

১৯

পরদিন ওরা একটু সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ল নাশতা সেরে। বাইরে ঝকঝকে একটি দিন। দিবাকর আজ বড্ড প্রফুল্ল। আকাশ আশ্চর্য নীল। শালবন আর ঝোপঝাড়ের গায়ে গায়ে শীত-গন্ধী কোমল হাওয়া। ঝিরঝিরে সেই হাওয়ায় ইচ্ছেমত উড়ে বেড়াচ্ছে কাচের টুকরোর মতো কুচি কুচি রোদ্দুর। বৃক্ষ ছায়াচ্ছন্ন ঘন সন্নিবিষ্ট এই অরণ্য যেন এক মায়া কানন। বিভা একটা হালকা হলুদ টপের সাথে নীল জিন্স পরেছিল। হৃদির গায়ের রংটা একটু চাপা বলে সে এসব গাঢ় রং বরাবরই এড়িয়ে চলে। কিন্তু আজকে বিভার পীড়াপীড়িতে গাঢ় রঙের জামাই পরতে হয়েছে তাকে। সে পরেছে নীল রঙের ফুল হাত শার্ট, সাথে কালো কাপড়ের প্যান্ট। শার্টটা তার নয়, বিভার। এখন রোদের মোটামুটি তেজ আছে বলে অতটা শীত করছেনা বরং রোদ গায়ে লাগাতে আরাম লাগছে।

অভিজিৎ অফিসে। ছয় বন্ধু লাল মাটির সরু পথটা ধরে হাঁটছিল। সারা পথ বনপুষ্পের সুবাসে ছাওয়া। কোন সেই ফুল, কোথায় সে লুকিয়ে আছে তা কে জানে! দেখা যায়না, শুধু ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আকাশ হঠাৎ বলল, 'এই, বনের মধ্যে যাবি?'

বিভা বলল, 'এখন নয়। আগে নদীর পাড় থেকে ঘুরে আসি। পরে দেখা যাবে।'

দিনের বেলা বলে গ্রামের পথে এখন মেলা লোকজনের আনাগোনা। এর মাঝে একটি চাইনিজ টুরিস্ট দলও আছে। চাইনিজ দলে দুজন তরুণী এবং একজন তরুণ। তরুণীদ্বয়ের পরনে সাদা হাফপ্যান্ট। একজনের গায়ে নীল গেঞ্জি অপর জনের গায়ে বাদামি লেইস ওয়ালা একটি অদ্ভূত টপ। সেই টপের গলা এতো বড় যে বুকের অনেকখানি দেখা যায়। দলের পুরুষ সদস্যটি বেটে খাটো। একেবারেই চোখে পড়ার মত নয়। চাইনিজ দলটি বন্ধুদেরকে একটু বেশিই টানছে। দুই তরুণীর সিল্কের মতো ফিনফিনে রেশমি কালো চুল। মোমের মত ফর্সা, মসৃণ হাত পা। বন্ধুদলের ছেলেদের মনে চৈনিক মেয়েদুটির খোলা মেলা রূপ বেশ আনন্দের উদ্রেক করছে। তারা খানিক বাদে বাদে চীনা মেয়েদের দিকে তাকাচ্ছে। দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

রুদ্রর চুলে আজকে বিণুনী করে দিয়েছে হৃদি। রুদ্র তার বেণী ওয়ালা চুল নিয়ে বড়ই বিব্রত। বিশেষ করে সুন্দরী রমণীদের উপস্থিতি তাকে তার বাহ্যিক রূপ সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছে। বিণুনীটা তার সহ্য হচ্ছেনা কিন্তু বন্ধু ভালোবেসে বেঁধে দিয়েছে বলে কিছু বলতেও পারছেনা। সে হাঁটতে হাঁটতে তার বিণুনীতে একটা হাত রেখে বললো, 'আমাকে কি মেয়ে মেয়ে লাগতেছে?'

আকাশ গম্ভীর গলায় বলল, 'হ্যাঁ একটু মেয়ে মেয়ে লাগতেছে।'

হৃদি বলল, ‘মেয়েদের মত লম্বা চুল রাখছস। মেয়ে মেয়ে তো লাগবোই।’

মাটির পথ ছেড়ে পিচ ঢালা রাস্তায় উঠতেই সামি হঠাৎ বলল, ‘রেস লাগবি?’

– ‘কীসের রেস?’ আকাশের প্রশ্ন।

– ‘দৌড়ের’

অমৃতা উৎফুল্ল গলায় বলল, ‘নট আ ব্যাড আইডিয়া।’

– ‘এখন রেস টেস হবেনা। অনেক রোদ। দৌড়াইলে মেকআপ নষ্ট হয়ে যাবে।’ বিভা জানিয়ে দিল স্পষ্ট ভাবে।

হৃদি সায় দিল বিভার কথায়, ‘হুম রাইট। এখন আমরা দৌড়াবোনা।’

অমৃতা বিরক্তিতে কাদা হয়ে বলল, ‘তাইলে তোমরা মুড়ি খাও। কে কে রেস লাগবা আসো।’

দেখা গেলো হৃদি আর বিভা বাদে বাকি সবাই দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। চার বন্ধু দৌড়ানোর জন্য প্রস্তুত হল। হৃদি বললো, ‘এই পাহাড়ি উঁচুনিচু রাস্তায় দোড়াদৌড়ি করার কোনো মানে হয়না। পইড়া গিয়া হাত পা ভাঙবি।’

– ‘আর বলিস না। মাইয়া দেইখা সব পাগল হয়ে গেছে। মানে এখন কী করবে খুঁইজা পাইতাছেনা। কিছু একটা কইরা তো সিনে আসতে হবে বুঝস নাই?’ চাপা ফ্যাসফ্যাসে গলায় ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করল বিভা।

হৃদি আর বিভার পাশে চীনা দলটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনের রাস্তা চার বন্ধু আটকে রেখেছে। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। অমৃতা ‘রেডি, স্টেডি এন্ড গো’ বলতেই চারজন দৌড়ানো আরম্ভ করলো।

চাইনিজ মেয়ে দুটি ভোঁ দৌড় দেখে কেন যেন অতি আনন্দিত হয়ে উঠল। তারা হাত তালি দিয়ে গদ গদ হয়ে বলে উঠল, ‘হুয়ানহু!’

বিভা মুখ কচুপানা করে বলল, ‘বেটি কী কয়? এতো আনন্দের কারণ কী?

চার বন্ধু তখন প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। এখন পর্যন্ত আকাশ সব থেকে এগিয়ে। মনে হচ্ছে রেসটা সেই জিতে যাবে। হৃদি হাঁটা শুরু করেছিল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, ‘চারটা গাধা পাহাড়ি রাস্তায় দল বাইন্ধা দৌড়াইতেছে, এটা একটা বিনোদনের বিষয় না?’

চাইনিজ দল দৌড় প্রতিযোগিতা খুব উপভোগ করছে। একটু পর পর হুয়ানহু হুয়ানহু বলে চ্যাঁচাচ্ছে। হৃদি আর বিভা হুয়ানহু শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়ল। বিভা দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, ‘বালের হুয়ানহু। এর মানে কী?’

– ‘কেউ জানেনা!’ হৃদি বলল, উদাস গলায়।

নদীর কাছাকাছি আসতেই জলের শব্দ তীব্র হল। পাহাড়ি উপত্যকার এই নদী পাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ছোট বড় পাথর। পাথরকুচির ওপর স্রোত এসে আছড়ে পড়ছে বলে শব্দ হচ্ছে জলপ্রপাতের মতো। হাওয়া শিফনের ন্যায় মসৃণ। স্রোতের পানির ওপর রোদ নাচছে ঝিকমিক করে। ভারী মনোরম একটি দিন! শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল বলে ভুটান পাহাড়ের গায়ের বৃক্ষরাজি এখন গাঢ় সবুজ। বাঁধের ওপর ঝুলছে ব্রিজ। খুব একটা লোকজন নেই এদিকটায়। ব্রিজের ওপর শুধু একটি শহুরে দল মহা উৎসাহে ছবি তুলে যাচ্ছে। চারবন্ধু দৌড়ে এসে ঘেমে টেমে একাকার হয়ে নদীতে নেমে গেছে। এদিকটায় নদীর পানি গভীর নয়। হাঁটু জল বলা যায়। সেই হাঁটুজল পানিতে নেমে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করছে ওরা। হৃদি আর বিভা একটি বড় পাথরের ওপর বসল পাশাপাশি। চাইনিজ দলটিও নাচতে নাচতে নদীতে নেমে গেছে। দেখা গেল বন্ধুদের দলের খুব কাছাকাছিই তাদের অবস্থান। বন্ধুরা চৈনিক দের দেখে উল্লসিত, আনন্দিত এবং আপ্লুত।

.

বিভা হঠাৎ কেমন চপল গলায় বলে উঠল, ‘দ্যাখ, সামিকে কী সুন্দর দেখতে লাগছেনা?’

হৃদি তাকাল। সামির চোখে নীল কাচের রোদ চশমা। খোঁচা দাড়ি ওয়ালা কাঞ্চন বর্ণের গালে আয়নার মতো ঝিকোচ্ছে রোদ। তার গায়ে লালনের ছবি আঁকা সাদা রঙের একটি টিশার্ট। কালচে ঠোঁট জোড়ায় এক বঙ্কিম চিত্তাকর্ষক হাসি।

হৃদি স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে। ওই মুখের দিকে তাকালে আজকাল কোত্থেকে যেন এক আশ্চর্য ভালোলাগা ভোমরার মতো গুনগুন করে মনের দেয়ালে এসে বসে।

সেই আশ্চর্য ভালোলাগার ভ্রমরকে হৃদির দারুণ ভয়। সে শক্ত ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'মোটেও না!'

বিভা চমকায়, 'মোটেও না মানে?'

'না।'

– 'কীসের না?'
– 'তেমন সুন্দরের কিছু নেই।'
– 'আমার বয়ফ্রেন্ডকে তুই অসুন্দর বলতে চাইছিস? তোর তো সাহস কম না?'
– 'তোর বয়ফ্রেন্ডটা আমার ফ্রেন্ড। এটা ভুলে যাস না।'

ঠিক সে সময় সামি ওদের দুজনের দিকে ঘুরে তাকাল। সানগ্লাস চোখে থাকায় বোঝা গেলোনা দুই রমণীর মধ্যে ঠিক কার দিকে তার দৃষ্টি। জল পায়ে ঠেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসল সে। কাছাকাছি এসে হঠাৎ একটা আজব কাণ্ড করে বসল। বিভাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দ্রুত ফিরে চলল নদীর কাছে। বিভা ঘটনার আকস্মিকতায় গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠল প্রথমে, তারপর ভেঙে পড়ল এক খিলখিল করা আহ্লাদী হাসিতে।

হৃদি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দেখল দৃশ্যটা। বুকের মধ্যে অস্ফুট এক অনির্বচনীয় ব্যথা। চোখের দেয়ালে নোনা অশ্রুবিন্দুর সুড়সুড়ি। জল ছিটাছিটির এক পর্যায়ে বিভা সামিকে খুব শক্ত ভাবে জড়িয়ে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'সাগর সৈকতের সেই দিনটার কথা তোর মনে আছে সামি?'

সামি হাসে,আলতো গলায় বলে, ‘মনে আছে!’

বিভা সামির দিকে গাঢ় চোখে তাকায়। তাকায় সামিও। একটা হালকা চুমু খায় সে বিভার কপালে। তারপর, ভালোবাসার মানুষটার খুব কাছাকাছি থাকার এই মোহময় সময়টাতে, আচমকা তার মনে পড়ে যায় সন্ধ্যাবেলার সেই অচেনা মেয়েটির কথা। কুয়াশা কেটে সেই যে মেয়েটির ধীরে ধীরে হেঁটে আসা, সেই অন্ধকার, সেই স্পর্শ! কী আশ্চর্য! বিভা তার কাছে আসলেই অন্ধকারের মেয়েটির কথা মনে পড়ছে কেন? তার কি বুদ্ধি ভ্রংশ হচ্ছে? পাগল হয়ে যাচ্ছে কি সে?

সামি একটু সতর্ক গলায় বলল, ‘ইশে··· এখানে তোর চেনা জানা মানুষজন থাকতে পারে। কেউ দেখলে সমস্যা হবেনা?’

বিভার যেন ঘোর ভাঙল। সে চকিতে সামির কাছে থেকে একটু দূরে সরে এসে বলল, ‘হুম, ঠিক বলেছিস।’

সামি তাকিয়ে দেখল হৃদি ওখানটায় একলা চুপটি করে বসে আছে। তার চোখদুটি কেমন ভাসা ভাসা। মুখখানা থমথমে।

সামি এগিয়ে আসল। পাথরের ওপর এসে বসল, হৃদির পাশে। লাইটার জ্বালিয়ে ধরালো সিগারেট। হৃদির মাঝে বিনা কারণে এক অদ্ভুত আড়ষ্টতা কাজ করছে। বিভা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকেই দেখছিলো। হৃদি বুঝতে পারছে বিভার চেহারার রংটা পাল্টে গেছে। বলতে নেই, সামির এই হঠাৎ করেই তার কাছে চলে আসা এবং আসবার পর বিভার মুখের রং পাল্টে যাওয়া, এই সমস্ত ঘটনাটি তার মেরুদণ্ডে এক সুখদায়ক শিরশিরে অনুভূতির জানান দিচ্ছিল। সাংঘাতিক এক নির্লজ্জ সুখে কেঁপে

কেঁপে উঠছিল ভেতরটা। ঠিক সেই সময় কেউ একজন কড়া ডাক দিয়ে উঠল মন থেকে, কী হচ্ছে হৃদিতা? বিভা তোমার বন্ধু!

আকাশ বিভার হাত ধরে টেনে টেনে নদীর আরো গভীরে নিয়ে গেল। তারপর বন্ধুদের দাপাদাপি, লাফালাফিতে বিভা আর পেছন ফিরে তাকানোর সুযোগ পেলোনা।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা কেউ কোনো কথা বলছিলনা। সামি নিঃশব্দে সিগারেট ফুঁকছে। একটা সময় নীরবতা ভঙ্গ করে হৃদি বলল, 'কী ব্যাপার? প্রেম শেষ?

সামি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল সময় নিয়ে, শ্লেষের গলায় বলল, 'হচ্ছেনা, কেউ একজন বিরক্ত করতেছে।'

হৃদি মনের অন্দরমহল সচকিত হয়।

– 'কে বিরক্ত করছে?'

– 'চিনিনা তাকে।'

– 'পাগল হয়ে গেছিস?'

– 'মনে হয়।'

চৈনিক মেয়েটি আচমকা দুম করে এক রাম ধাক্কা খেল আকাশের সাথে। দুজনের পিঠে পিঠে লেগে গেছে। ঘটনা দেখে রুদ্র সিটি বাজিয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'সিনেমা মামা! একদম সিনেমা!'

আকাশ ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো চৈনিক মেয়েটি হতচকিত ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। আকাশ তাকাতেই সে বিনীত ভাবে দুঃখ প্রকাশ করল ইংরেজিতে। আকাশের মুখে চওড়া এক হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে কৃতজ্ঞতায় মরে গিয়ে বলল, 'কোনো সমস্যা নেই। এরকম হয়েই থাকে।'

চৈনিক মেয়েটি আকাশের আকাশময় প্রাণখোলা হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাই আমি লি!'

আকাশ ওর হাত ধরল, 'আমি আকাশ।'

– 'একাস?' চৈনিক মেয়ে ভারী মিষ্টি ভাবে উচ্চারণ করলো নামটা।

আকাশ হেসে শুধরে দিল, 'আকাশ।'

– 'নাইস টু মিট ইউ আকাস।'

রুদ্র এক রাশ জলের ঝাপটা ছুঁড়ে মেরে ভিজিয়ে দিল আকাশকে। আকাশ মহা বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী শালা শাউয়া, দেখতাছস না একটা প্রসেসিং এর মইধ্যে আছি আমি? বিরক্ত করতাছস কেন?'

অমৃতা ঠেস দেওয়া গলায় বলল, 'এতো নাইচো না, চৈনিক তোমারে বেল দিবো না।

– ‘আরে দিবোনা মানে? ক্রাশ খাইয়াই ফেলছে অলরেডি।’

রুদ্র বলল, ‘ইশ কী ধাক্কাটা খাইলা মামা, সেই রকম!’

– ‘সেইরকম মানে? পিঠ জ্বইলা যাইতাছে, উফ!’

অমৃতা বলল,’তোকে ডেয়ার দিলাম যা, তুই ওই মেয়ের সাথে গিয়া কথা বল।’

‘কী কথা বলব?’

– ‘বল কথাবার্তা, এই ফোন নাম্বার টাম্বার নে, দ্যাখ একটা গতি হয় নাকি।’

– ‘তোর কি ধারণা আমি কথা বলতে পারবনা?’

– ‘বলেই দ্যাখ না। আই ডেয়ার ইউ।’

এদিকে বিভার ডাগর দুটি চোখ থেকে থেকে অবাধ্য বুনো পাগলা ষাঁড়ের মতো ছুটে ছুটে যাচ্ছিল, পাথর খণ্ডের ওপর বসে থাকা যুবক যুবতীর দিকে। সামি রোদ চশমা খুলে হাতে নিয়েছে। তার সুন্দর মুখখানায় এখন একটা অস্বস্তি খেলছে। এমনকি অস্বস্তি ফুটে উঠছে হৃদির আচরণেও। হঠাৎ এক নাম না জানা অভিশংকা ঝড়ো দমকা হাওয়ার ন্যায় তীব্র গতিতে তেড়ে এসে বিভাকে যেন লন্ডভন্ড করে দিতে লাগল। বুক কাঁপতে লাগল তার। গলা শুকিয়ে কাঠ!

শিফনের মতো মসৃণ বাতাস হৃদির খোলা চুল নিয়ে এলোমেলো খেলছিল। এক হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করতে করতে সে একটু অস্বস্তি নিয়ে সামিকে বলল, 'তুই এখানে এসে আমার পাশে বসে আছিস কেন? বিভা কী ভাববে?'

– 'কী ভাববে আবার? তুই আমার ফ্রেন্ড। আমি তোর পাশে বসতে পারিনা?' সামি নির্বিকার।

এ কথার পর আর কিছু বলা যায়না। হৃদি চুপ করে গেল। ভুটান পাহাড়ের মাথায় নিরুদ্দেশ উড়ে বেড়াচ্ছে এক গুচ্ছ সাদা পলকা মেঘ। মেঘের পাড় ঘেঁষে রুপালি রেখা। হৃদির মুখ থেকে এখন বিষণ্ণ ভাবটা মুছে গেছে। জনাব বিষণ্ণতা হঠাৎ বিনা নোটিশে ছুটি নিয়ে পালিয়েছে ঠিকই, তবে এই ছুটি কতক্ষণের বা কতদিনের তা সঠিক ভাবে বলা যাচ্ছেনা। হয়তো একটু বাদেই আবার হেলেদুলে হাজির হবেন তিনি। এই মুহূর্তে অবশ্য জনাব বিষণ্ণতাকে ছুটি দিতে পেরে হৃদির ভালো লাগছে। বিভা কি তাদের দুজনের দিকেই চেয়ে আছে? কী ভাবছে বিভা? সঠিক জানেনা হৃদি। তার কেন যেন মনে হচ্ছে শুধু বিভা নয় সারা পৃথিবীটা তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। বিভা যে তার বন্ধু, বিভাকে যে সে নিজের প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসে, এই সত্যটুকু, চেতনা টুকু এক মোহ বিদ্ধ, নেশাড়ু তুফান ঝড়ে বিলুপ্ত প্রায় হয়ে যাচ্ছে। সব কিছু ভুলে গিয়ে হৃদির এখন স্বার্থপর হতে মন চাইছে, ভয়ংকর স্বার্থপর! ভালোলাগার ভোমরা টা গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছে কানের কাছে। সুযোগ পেলেই টুপ করে মনের দেয়ালে বসে পড়বে। সামি এখন এত কাছাকাছি বসে আছে যে হাত বাড়ালেই তার হাতটা ছোঁয়া যায়। হৃদির খুব ইচ্ছে হচ্ছিল সামির হাতটা একবার ধরে! কিন্তু অনেক দিনের চেনা বন্ধুটির হাত ধরতে আজ বড় সংকোচ,বড় দ্বিধা!

সামি হঠাৎ গম্ভীর গলায় বললো,

– ‘শোন, এখন তো অভিজিৎ নাই। সো আমরা বিষয়টা সবার সাথে এখনই শেয়ার করতে পারি।’

হৃদি একটু নড়েচড়ে বসল, ‘এখন?’

– ‘হ্যাঁ এখনই। কজ সন্ধ্যার পরেই অভিজিৎ চলে আসবে। আর তুইই তো বললি অভিজিতের সামনে কথাটা না বলতে।’

হৃদি চিন্তাযুক্ত গলায় বলল, ‘আমার বিভাকে নিয়ে ভয় হচ্ছে। ও কী রকম রিয়্যাক্ট করবে বুঝতে পারছিনা।’

– ‘রিয়্যাক্ট করার তো আমি কোনো কারণ দেখছিনা। একটা ভুল হয়ে গেছে। ভুল তো ভুলই। ভালো তো আমি ওকেই বাসি তাইনা?’

শেষের প্রশ্নটা কাকে করলো সামি কে জানে! নিজেকে? নাকি হৃদিকে?

হৃদি চোখ তুলে চাইল সামির দিকে। একটু সময় চুপটি করে চেয়ে থেকে বলল, ‘তোর ভালোবাসা যদি সত্য হয় তাহলে বিভা তোকে ভুল বুঝবেনা। নিশ্চিত থাক।

হৃদি আর সময় নষ্ট না করে হাত তুলে বন্ধুদের ডাকল, ‘এই শোন তোরা! এদিকে আয়, কথা আছে।’

বিভাই আসলো প্রথমে। ভেজা জামা নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে এগিয়ে এসে বলল, ‘আমাদের আকাশের তো চাইনিজ গার্লফ্রেন্ড হয়ে যাচ্ছে।’

– ‘তাই নাকি?’

আকাশকে দেখা গেলো নাচতে নাচতে উড়তে উড়তে এগিয়ে আসতে। ওর পেছনে অমৃতা আর রুদ্র। সবাই কাক ভেজা হয়ে আছে।

আকাশকে দেখা মাত্র হৃদি বলে উঠল, ‘কীরে, চীনা বেটি নাকি তোর গার্লফ্রেন্ড হয়ে গেছে?’

আকাশ এক গাল হেসে বললো, ‘হয়নায় এখনো, তবে হয়ে যাবে। ডোন্ট ওরি। ইমেইল, ফেসবুক, টুইটার সব ঠিকানা নেয়া হয়ে গেছে। এমনকি আমি বাংলাদেশে যাওয়ার জন্যও ইনভাইট করে ফেলছি। সে বলেছে সম্ভব হলে এই যাত্রায়ই একবার বাংলাদেশ থেকে ঘুরে আসবে।’

অমৃতা ঠেস দেয়া গলায় বলল,’শেষ পর্যন্ত চৈনিক? তোর কপালে এই ছিল রে আকাশ!’

রুদ্র ফোড়ন কাটলো,’কেন ভালোইতো, বেশ খোলামেলা কাপড় চোপড় পরে। এরকম মেয়ে আশেপাশে থাকলে তো মন ভালো থাকে।’

আকাশ তাল মেলালো রুদ্রর সাথে, 'রাইট! হট একটা গার্লফ্রেন্ড থাকলে আর কী লাগে মামা? তবে অমৃতা, তোকে থ্যাংকস তুই ডেয়ার না দিলে কাজটা হইতোনা।

সামির মোবাইলে তার মায়ের ফোন নম্বরটা এই বড্ড অসময়েই কড়া নাড়লো। সে কুঞ্চিত ভ্রু নিয়ে ফোন রিসিভ করলো। রোমেলা প্রগলভ হয়ে বললেন, 'বাচ্চা শোন, আমি আর তোর বাবা, আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সামি বিরক্তিতে গোসল করতে করতে বললো, 'কী সিদ্ধান্ত?'

– 'শোন আমরা ঠিক করেছি তোকে একটা বিয়ে দেব। বাড়িতে একটা ফুটফুটে সুন্দর বৌ আসবে। আমাদের এত বড় বাড়িটা সারাদিন খালি পড়ে থাকে…'

– 'আহ্ মা থামো তো! মানে যত সব আজাইরা চিন্তা ভাবনা তোমাদের। এসব কথা রাখো এখন।'

– 'আজাইরা চিন্তা হবে কেন? মেয়ে আমাদের দেখা আছে। খুবই সুন্দর, শিক্ষিত স্মার্ট মেয়ে।'

– 'উফ আম্মা, আমি রাখি। পরে কথা বলবো।'

ফোন রেখে সামি একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বন্ধুদের বললো, 'লিসেন, আমাদের একটু জরুরি কথা আছে তোদের সাথে। বেটার হয় আমরা যদি কোথাও একটু বসি সবাই মিলে।'

– ‘বসবি কোথায়? এখানে তো কোনো কফিশপ টপ আছে বলে মনে হচ্ছেনা।’ আকাশ বললো।

– ‘আরে কফিশপ লাগবেনা। ঘাস টাস দেইখা বইসা পড়।’ রুদ্র বললো।

তার কথা মতোই কাজ হল। নদীর কাছেই সবুজ আগাছা ওয়ালা মাটির ওপর গোল হয়ে বসলো ওরা। গ্রামের লোকজনের আনাগোনা আছে বেড়েছে এখন এদিকটায়। এক ঝাঁক বাচ্চা ছেলে দল বেঁধে নদীতে নেমেছে। দেখা গেলো চৈনিক দলটা হেঁটে হেঁটে ব্রিজের ওপর উঠে গেছে। ফটোসেশন করছে।

বন্ধুরা সবাই অখন্ড মনোযোগের সাথে তাকিয়ে আছে সামির দিকে। সামি বিব্রত বোধ করছে। কোত্থেকে যেন রাজ্যের জড়তা এসে ভর করেছে তার মধ্যে। বিভা ওর মুখ পানে চেয়ে আছে ড্যাবড্যাবে চোখে। সেই চোখে চোখ পড়তেই সামির বুকটা কেমন খালি খালি লাগতে লাগলো। মনে পড়লো হৃদির বলা কথাটা, তোর ভালোবাসা যদি সত্য হয় তাহলে বিভা তোকে ভুল বুঝবেনা। নিশ্চিত থাক।’ বিভা যদি তাকে ভুল বোঝে? কী হবে তখন? কী করবে সামি?

বিভাই কথা বললো প্রথমে, ‘সমস্যা কী?এমন চোরের মত করতেছিস কেন? কী চুরি করছস?’

হৃদি মুখ নিচু করে বসে মাটির ওপর গজিয়ে থাকা ঘাস ছিঁড়ছিল। চোখমুখের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে ভেতরটা অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে আছে তার।

আকাশ ধমকে উঠে বলল, ‘কথা কস না ক্যান?’

সামি বন্ধুদের কারো চোখে চোখে তাকালনা। অন্যদিকে চোখ রেখে স্তিমিত ভাবে বলল, ‘কাহিনী হচ্ছে··· মানে··· যেদিন আমরা আসলাম এখানে, সেদিনের ঘটনা। সন্ধ্যাবেলা আমি বিভা রে এস এম এস করছিলাম যে একটু বাইরে ইয়ার্ডে আয় তোর সাথে কথা আছে। বিভা আমারে এসএমএস ব্যাক করছিল যে ওয়েইট কর, আসতেছি।’

বিভার চোখমুখ উৎকণ্ঠায় ফেটে পড়ছে। সে বুঝতে পারছেনা সেদিন কী এমন ঘটনা ঘটতে পারে যার কারণে সামি এহেন ব্যাখ্যাতীত আশ্চর্য আচরণ করছে। সে নিশ্বাস বন্ধ করে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে শুনতে লাগল সামির কথা।

সামি এলোমেলো ভাবে বলে চলেছে, ‘তো আই একচুয়েলি ওয়েইটেড ফর সো লং, বাট শী ডিড’ ন্ট শো আপ। মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল ওর দেরি দেইখা। দেন সাডেনলি আমি অন্ধকারে দেখলাম যে বিভা আসছে।’

বন্ধুরা সবাই একবার হার্টবিট মিস করলো। কারণ এই ঘটনা মোটামুটি সবার জানা যে বিভা সেই সন্ধ্যায় সামির সাথে উঠোনে দেখা করতে যায়নি। তাহলে বিভা সেজে কে গিয়েছিল সামির কাছে?

সামি একটি প্রলম্বিত নিশ্বাস নিলো, বললো, ‘আমি দেখলাম বিভা অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে আমার দিকে আসতেছে। শাড়ি পরা, চুল খোলা,এমন কি বিভার চুলের ঘ্রাণটাও বাতাসে উড়ে উড়ে আমার নাকে এসে ধাক্কা খাচ্ছিলো। তো আমি··· আমি···’

সামি আটকে গেল। দিশাহারা হয়ে হৃদিকে বললো, ‘হৃদি, ক্যান ইউ প্লিজ হেল্প মি আউট? আমি বলতে পারতেছিনা।’

হৃদি এবার মুখ তুললো। কারো দিকে না তাকিয়ে হড়বড় করে বলে ফেললো, ‘কাহিনী হচ্ছে যে সামি বিভা মনে করে আমারে কিস করছে।’

অমৃতার মুখ থেকে তাৎক্ষণিক ভাবে একটি আর্ত চিৎকার বেরিয়ে আসলো। রুদ্র স্তম্ভিত ভাবে উচ্চারণ করলো শব্দ গুলো, ‘ইউ গট টু বি কিডিং মি!’

বিভার মুখ সাদা। দুচোখে বিশ্বের বিস্ময়। সে যেন এই ধরাধামে নেই।

হৃদি বলল, ‘বিভার জন্য সামি একটা রিং কিনে আনছিল, গিফট। তো ও সেই রিংটা আমার হাতে পরায় দিছিল বিভা মনে করে।’

বেশ কিছু মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলতে পারলনা। একটা স্তম্ভিত, বিকৃত এবং অস্বস্তিকর বাতাস বইছিল ছয়জনের মধ্যে। বেশ অনেকক্ষণ পর আকাশ কড়া ভাবে বলে উঠলো, ‘এটার মানে কী? আমার মাথায় কিছুই ঢুকতেসেনা। মানে অন্ধকারে তুই কেন হৃদিকে বিভা মনে করবি? তুই কি টাল ছিলি শালা?’

অমৃতা একবার বিভার দিকে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে আকাশের হাতে একটা আলতো চাপ দিয়ে পাশকাটানো গলায় বলল, ‘হতেই পারে। এরকম ভুল হতেই পারে। হৃদিও তো শাড়ি পরে ছিল। আর ওদের দুজনের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার একই রকম। আমিও মাঝে মাঝে দুজনকে পেছন থেকে দেখলে বুঝতে পারিনা কে বিভা, কে হৃদি।’

আকাশ অমৃতার ইশারার মর্মার্থ বুঝলোনা। সে বলেই চললো, 'না এটা আমি মানতে পারলাম না। এর আগের বার কক্সবাজারে বিভা, এইবার হৃদি। মানে তুই আমাদের সব মেয়েদের সাথে এইসব করতে পারিস না। তামাশা নাকি?'

সামি এবার আকাশের চোখে চোখে চাইলো, 'তামাশা মানে? তোর কি ধারণা আমি ইচ্ছা করে করছি?'

রুদ্র হাত তুলে বললো, 'আচ্ছা থামো তোমরা। যা হবার হয়ে গেছে। এখন এটা নিয়ে ত্যানা প্যাঁচায়ে লাভ নাই।'

আকাশ থামলোনা, 'না যা হবার হয়ে গেছে বললে তো হবেনা। নেক্সট টাইম কোন ট্যুরে গিয়া দেখা যাবে আবার কিছু কইরা বসবে। এইসব রিস্কি মানুষজন নিয়ে তো চলা যায়না ভাই।'

–' তুই এসব কী বলতেছিস? আমাকে তোর এতটা ফালতু মনে হয়?' ক্ষুব্ধ অথচ ব্যথিত কণ্ঠে বলল সামি।

–' তুই শালা ফালতুর চেয়েও বড় ফালতু। প্রথমে বিভা, এখন হৃদি। পাইছিসটা কী তুই?'

সামি মরিয়া হয়ে বললো, 'আকাশ তুই আমাকে ভুল বুঝতেছিস এইভাবে? বিভার সাথে হৃদিকে কেন মিলাচ্ছিস? বিভাকে আমি ভালোবাসি। আর হৃদির ব্যাপারটা একটা ভুল ছিল! আ গ্রেভ মিস্টেক।'

'আ গ্রেভ মিস্টেক' কথাটা হৃদির কানে বাজলো ঝন ঝন করে, বুকে এসে লাগলো ধক করে!

বিভা এতক্ষণে মুখ খুললো। সামির চোখের উপর কাচের মতো স্বচ্ছ দৃষ্টি রেখে হিম হিম জাড় কণ্ঠে বললো, 'তোর কি হৃদির প্রতি কোনো ফিলিংস আছে?'

সামি সজোরে মাথা নেড়ে বললো, 'জীবনেও না! আমি তো তোকে ভালোবাসি বিভা! প্লিজ তুই আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর।'

বিভা এবার হৃদির দিকে তাকাল, 'হৃদি, তোর কি কোনো ফিলিংস আছে আমার বয়ফ্রেন্ডের জন্য?'

হৃদি নত মুখে বলল, 'না।'

সামি উঠে আসল বিভার কাছে। হাঁটু গেড়ে বসল ওর পাশে। তারপর ওর দুটি হাত নিজের হাতে নিয়ে ভারী করুণ গলায় বললো, 'বিভা প্লিজ, এসব আজেবাজে চিন্তা মাথায় আনিস না। তুই জানিস না তুই আমার কাছে কী?'

বিভা সামির চোখের দিকে না তাকিয়ে বললো, 'তুই সত্যি বলছিস? তুই আসলেই হৃদির জন্য কিছু ফিল করিস না?'

– 'আল্লাহর কসম! তুই বললে আমি হৃদির সাথে জীবনে আর কোনো দিন কোনো কথাই বলবোনা।'

বিভা সামির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললো, 'আমি বাসায় যাচ্ছি। তোরা ইচ্ছা হলে আসতে পারিস।'

বিভা চলে যাবার পর কেউ কোনো কথা বললোনা অনেকটা ক্ষণ। সবাই মূর্তির মতো বসে রইল। একটা সময় হৃদি হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা সামি, তুই এটা কী বললি? বিভা বললে তুই আমার সাথে জীবনে কোনো দিন কোনো কথা বলবিনা? এটার মানে কী? তোর কাছে প্রেমটাই সব? ফ্রেন্ড কিছুনা?'

সামি মাথায় হাত দিয়ে খেদোক্তি করে উঠল, 'উফ আল্লাহ! মাফ কর আমারে তোরা। আমি কি সেটা বলছি নাকি?'

– 'হ্যাঁ সেটাই তো বলছিস। ভুলটা তোর ছিল, তাইনা? শাস্তি কেন আমাকে পেতে হচ্ছে? বিভা কেন আমাকে ভুল বুঝছে?তুই কেন বিভার জন্য আমাকে ছাড়বি? আমার সাথেই কেন এসব হচ্ছে?'

অমৃতা বলল,'শোন, একটা মিস্টেক হয়ে গেছে এখন তো কিছু করার নাই তাইনা? সামি শোন, তুই বিভার কাছে যা। ওর সাথে গিয়ে কথা বল। আর হৃদি তুই মাইন্ড খাচ্ছিস কেন শুধু শুধু? সামি তো ঐটা এমনিই বলছে বিভারে ম্যানেজ করার জন্য। বুঝতে হবে তো।'

২০

ফানিমুনের সুরটা যে কেটে গেছে এটা বুঝতে বন্ধুদের খুব বেশি সময় লাগলোনা। কারো মুখে হাসি নেই। কেউ মুখ ফুটে কোনো কথাও বলছেনা। একটা চাপা উদ্বেগ খেলছে সবার ভেতর। কে কার পক্ষ নেবে এই নিয়েই যেন নিজেদের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব চলছে ভেতরে ভেতরে। একবার সামির ওপর রাগ হচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই এক অন্ধ মায়া এসে প্রলেপ আঁকছে সেই রাগের ওপর। ভুল তো মানুষই করে। বিভার অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে। খারাপ লাগছে হৃদির জন্যেও। কে কী বলবে, কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেনা ওরা। বসার ঘরে সবাই সোফার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল। সামি অবশ্য অন্য সবার সাথে একত্রে বসে নেই। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নেশাগ্রস্থের মতো একের পর এক সিগারেট টেনে যাচ্ছে।

হৃদি খুব কাঁদছে। রীতিমত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। না নিজের জন্য না, সামির জন্যও না, সে কাঁদছে বিভার জন্য। বিভা এবং তার এই এতকালের নিষ্পাপ, পবিত্র বন্ধুত্বে হঠাৎ করে এমন কলঙ্কের দাগ লেগে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি কখনও। বিভা তার আত্মার অংশ। পৃথিবী গোল্লায় যাক, বিভাকে কষ্ট দিয়ে সে বেঁচে থাকতে পারবেনা। বিভা তাকে ভুল বুঝলে গলায় দড়ি দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা থাকবেনা তার জন্য।

দুপুরে বিভা কিছুই খেলোনা। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইলো। বন্ধুরা ডাকাডাকি করল অনেক। সাড়া পাওয়া গেল না। দূর্গা রুই মাছ ভাজা আর ডাল দিয়ে ভাত খাওয়ালো বন্ধুদের। খেতে পারলোনা কেউ ঠিকমতো। রুদ্র এমনিতেই মাছ টাছ তেমন একটা পছন্দ করে না। তার ওপর দূর্গার রান্নায় একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব থাকে সবসময়। প্রতিটা তরকারিতে মনে হয় যেন দু তিন চামচ চিনি মিশিয়ে দিয়েছে ইচ্ছে করে। ওদের ঝাল সওয়া মুখে তাই ওই মিষ্টি তরকারি ভালো লাগলনা।

সন্ধ্যের পর বৃষ্টি নামলো। অভিজিৎ বাড়ি ফিরলো কাকভেজা হয়ে। বিভার বন্ধুদের ঝিম ধরা অবস্থা দেখে সে অবাক না হয়ে পারলোনা। এই চঞ্চল ছেলেমেয়ে গুলো শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে এ যেন অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। সবচেয়ে বেশি অবাক হল সে বিভাকে দেখে। বিভা তার শোবার ঘরের বিছানায় নিস্তেজ অবস্থায় ত্যাড়া ব্যাঁকা হয়ে শুয়ে আছে। সচরাচর বিভা অভিজিতের বিছানায় শোয় না। দুপুরের দিকে গড়াতে মন চাইলে অন্য ঘরের বিছানায় গড়িয়ে নেয়। আজকে নিজের বিছানায় বিভাকে ওরকম অবসন্ন শরীরে লেপ্টে থাকতে দেখে অভিজিৎ স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারলো যে কিছু একটা ঘটেছে।

অভিজিৎকে দেখে বিভা একটু অপ্রস্তুত ভাবে শোয়া থেকে উঠে বসল। দুর্বল গলায় বলল, ‘আপনি তো ভিজে গেছেন।

অভিজিৎ তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে বিভাকে পরখ করল, ‘আপনার কী হয়েছে?’

– ‘কিছুনা।’

– ‘মুখ চোখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?’

–’ এমনি।’

অভিজিৎ এগিয়ে এসে বিভার পাশে বসলো। কপালে আর গালে হাত ছুঁইয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে বললো, ‘জ্বর টর আসেনি তো?

ম্লান হাসলো বিভা, ‘না, আমি ঠিক আছি।’

সে জানেনা কেন, কিন্তু সারাদিন পর অভিজিৎকে দেখে তার কেমন শান্তি শান্তি একটা অনুভূতি হচ্ছে। চোখ ভরে সে অভিজিৎকে দেখলো আরেকবার। সাদা ফুলহাতা শার্ট, কালো টাই, কালো প্যান্ট পরা, চশমা ওয়ালা নিষ্কলুষ, সরল চেহারার মানুষটিকে তার হঠাৎ করেই খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হল এবং জীবনে প্রথমবারের মতো সে এই সত্যটা গভীর ভাবে উপলব্ধি করল যে অভিজিৎকে আসলে সে ভালোবাসতেই চেয়েছিল। ভীষণ ভাবে চেয়েছিল। কিন্তু চাইলেই যে সব হয়না এ জীবনে! অভিজিতের প্রতি একটা মায়া আছে তার এ কথা ঠিক কিন্তু সেই মায়াটা কোন ঝড় তোলেনা ভেতরে। ঝড়ের মতো সর্বনাশা প্রেম একবারই এসেছিলো তার জীবনে। আজকে সেই প্রেমটাও কেমন মিথ্যে হয়ে গেল। মনে হতেই বিভার দু চোখের দেয়াল উপচে জলের ফোয়ারা নামল। অভিজিৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কী হয়েছে আপনার? কী হয়েছে বলুন তো?'

কাঁদতে কাঁদতে বিভার হিক্কা উঠে গিয়েছিল। সেই অবস্থায় সে অভিজিতের কাঁধে আলতো ভাবে মাথা রাখল। অভিজিৎ ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সান্ত্বনার গলায় বললো, 'এভাবে কাঁদতে হয়না। কী হয়েছে আমাকে বলুন তো একবার!'

.

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হৃদি একটু তাড়াতাড়িই বিছানায় গেল আজ। সামিকে সন্ধ্যার পর থেকে আর পাওয়া যাচ্ছেনা। তার ফোনও বন্ধ। শীত কালের বৃষ্টি মানেই ভয়ংকর ঠান্ডা। এই বৃষ্টি বাদলার রুক্ষ আবহাওয়ায় বন জঙ্গলের ভেতর ছেলেটা কোথায় গিয়ে বসে আছে তা বন্ধুরা কেউ জানেনা।

উঠোনে চেয়ার পেতে বসেছিল রুদ্র, অমৃতা আর আকাশ। রুদ্র গিটারের তারে হাত চালাচ্ছিল আর অমৃতা, আকাশ নিজেদের সেলফোনের পর্দায় ডুবে ছিল। কারো মন ভালো নেই। মন ভালো করার প্রচেষ্টাও নেই। মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ এভাবেই

কাটবে তারপর প্রকৃতির নিয়ম রক্ষার্থে যথাসময়ে সব স্থিরতা আবার ফিরে আসবে। এখন শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা। বৃষ্টি তখন ধরে গেছে। তবে ঝড়ো বাতাসটা চড়ে বেড়াচ্ছে সদর্পে। সেই মুহূর্তে, ঝিম ধরা ওই মন খারাপের রাতটায় হঠাৎ একটি আনন্দের ঘটনা ঘটল। লি আকাশের সাথে দেখা করতে আসল সম্পূর্ণ বিনা নোটিশে। খুব কাছেই ওদের রিসোর্ট। হাঁটতে হাঁটতে সে একাই চলে এসেছে এদিকটায়। আকাশ সকালেই বিভার বাড়ির ঠিকানা ওকে দিয়ে ফেলেছিল।

স্বাভাবিক একটা সময় হলে আকাশ যতটা খুশি হত আজ ঠিক ততটা খুশি হতে পারলনা। তবে অখুশিও হল না। লি উঠোনে প্রবেশ করতেই তিন বন্ধুর মাঝে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। আকাশ চট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রসিয়ে রসিয়ে বলল, 'কী মামা বলছিলাম না? জাদু চাল গ্যায়া? থাক তোরা আমি একটু ওয়াক করে আসি নয়া বান্ধবীর সাথে।'

আকাশ চলে যাবার পর রুদ্র বলল,

– 'চাইনিজ মাইয়া তো পইটা গ্যাছে মনে হয়!'

অমৃতা মুখ বাঁকালো, 'এসব আজাইরা, আকাশ একেবারেই সিরিয়াস না।'

– 'সিরিয়াস হতে কতক্ষণ?'

– 'হলে তো ভালই।'

– 'চাইনিজ মেয়ের সাথে সিরিয়াস হলে ভালো? কী বলতেছিস তুই এসব? সামি আর বিভারে দেইখে শিক্ষা হয়নায়? বিভা তো বাংলাদেশি ছিল তাতেই বিয়া হইল না।'

– 'তুই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছিস আকাশের কোনো পিছুটান নাই। ও হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান যাকে ইচ্ছা বিয়ে করতে পারে।'

রুদ্র একটু গুম হয়ে উত্তর দিল, 'এভাবে অবশ্য চিন্তা করিনি!'

ফোনের পর্দায় চোখ বুলাতে গিয়ে খবরটায় হঠাৎ চোখ আটকে গেল অমৃতার। একটা অনলাইন পত্রিকায় সামির আব্বা সম্পর্কে খবর ছাপা হয়েছে। শিরোনাম হল এমপি রাশেদুল হকের নিজ পুত্রের সাথে বিরোধ 1 এটাও একটা খবর হতে পারে? সাংবাদিকগুলোর কি খেয়ে দেয়ে সত্যি আর কাজ নেই? খবরটার ঠিক পাশে হকের একটি ছবি দেয়া আছে। রোদে পোড়া বাদামি চেহারা, লম্বাটে মুখ, শক্ত চোয়াল আর গভীর দুটি চোখ। এতকাল অমৃতার মনে হত চোয়ালের কঠোর ভাবটা বুঝি লোকটার চেহারায় একটি চৌকস পাকা রাজনীতিবিদের ভাব এনে দিয়েছে। কিন্তু আজ এই কঠোরতা টুকুকে ব্যক্তিত্ব বলে মনে হল এবং সেই সাথে একটি অপ্রাসঙ্গিক ভাবনা বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে গেল মস্তিষ্কে, অতি অল্প সময়ের জন্য। লোকটা বোধহয় ঠিক ততটাও খারাপ না, যতটা অমৃতা ভেবেছিল!

লাল মাটির রাস্তাটা ধরে লি এর পাশে অন্ধকারে হাঁটছিল আকাশ। ঝাপটা বাতাসে বুনো ফুল আর ভেজা মাটির ঘ্রাণ ভাসছে। বুক ভরে সেই সুঘ্রাণ টেনে নিলে মনটা একদম বিশুদ্ধতায় ছেয়ে যায়। লি অনেক প্রশ্ন করছে। আকাশের বাবা মা, পরিবার, পড়াশোনা সব কিছু সম্পর্কে যেন আজ একদিনেই তার জেনে যাওয়া চাই। সবচেয়ে বেশি কৌতূহল তার বাংলাদেশ নিয়ে। সে কাজ করে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায়।

ভারত এসেছে তারা ডকুমেন্টারি তৈরির কাজে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করার ইচ্ছে আছে বলে জানাল সে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখ আটকে গেল একটি অন্যরকম দৃশ্যে। সামনের অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে এক বিশাল দেহী হাতি। ওদেরকে দেখা মাত্র শুঁড় তুলে বিকট আওয়াজ করে ডেকে উঠল হাতি মহাশয়। আকাশ একটু ভয় খেল। থমকে দাঁড়ালো আচমকা। লি বলল, 'আজকে দিনের বেলা এত চাইছিলাম একটা হাতির দেখা পেতে কিন্তু পেলামই না, এখন এই রাতের বেলা হাতির ছবি তুলব কী করে?' এই কথা শুনে আকাশ ব্যাক্কল বনে গেল একদম। বিরক্তও হল বেশ মনে মনে। দৈত্য দেহী হাতি দেখে সে কিনা ভয় পেয়ে কোন দিকে দৌড় দেবে সেই চিন্তায় মারা যাচ্ছে আর এই মেয়ে পড়েছে ছবি তোলা নিয়ে। কী হবে হাতিটা যদি এখন পা দিয়ে তাদের পিষে ফেলে? সেই সময় উল্টো দিকের জঙ্গলের ঝোপ ঝাড় ডিঙিয়ে এলোমেলো পায়ে সামিকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। জঙ্গল পার হয়ে মাটির রাস্তায় উঠতেই সে হাতিটির মুখোমুখি পড়ে গেল।

আকাশ গগন বিদারী এক চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'দোস্ত পালা! হাতি ইইইইইই!'

রাত গভীরের নিশ্ছিদ্র নীরবতায় সেই চিৎকার দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যেন। সামি হাতি দেখে নয়, বরং আকাশের চ্যাঁচামেচি শুনেই ভয় পেয়ে গেল। শুরু করল দৌড়।

লি অবাক গলায় আকাশকে বলল, 'তুমি কি ভয় পেয়েছ?'

আকাশ তখন আয়তুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিচ্ছিল। হাতিটা কিছুক্ষণের মধ্যে সরে পড়ল সামনে থেকে। আকাশ হাঁপ ধরা গলায় বলল, 'ভয় পাবোনা? কী বিশাল জায়ান্ট সাইজের হাতি মাই গড!'

সামি আকাশের সাথে কোনো বাক্য বিনিময় না করেই ওদেরকে পাশ কাটিয়ে, হেঁটে ডাক বাংলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আকাশ পেছন থেকে ডাকল ওকে, ‘ওই ছ্যাড়া, শুইনা যা।’

সামি তাৎক্ষণিক ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে আঙুল তাক করে কঠোর ভাবে বলল, ‘আমার সাথে কথা বলার ট্রাই করিস না ভুলেও, আজকে তুই অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলছস শালা। গার্লফ্রেন্ডের সাথে আছস বইলা ছাইড়া দিলাম নইলে মাইরা মাটির সাথে পিষা ফেলতাম হারামজাদা!’

আকাশ ‘দোস্ত লিসেন’ বলে এগিয়ে এসে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। সামি চিৎকার করে থামিয়ে দিল, ‘ফাক অফ!’

বোঝা যাচ্ছে সামি ভালোই কষ্ট পেয়েছে। বিপদের সময় আকাশকে সে পাশে চেয়েছিল। আকাশ ওর পাশে না থেকে, সঙ্গ না দিয়ে উল্টো রাগের মাথায় ত্যাড়া কথা বলে ফেলেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু বলার পর থেকেই তার ভেতরে একটি অপরাধ বোধ কাজ করছে, খারাপ লাগছে।

লি বলল, ‘ও তোমার গার্লফ্রেন্ডের কথা কী বলল? তোমার কি কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে?’

আকাশ লাজুক গলায় বলল, ‘না আমার কোনো গার্লফ্রেন্ড নেই।’

.

উপত্যকার গভীর জঙ্গলে একটি অচেনা রাতচরা পাখি ডাকছিল থেকে থেকে আর বৃষ্টি ছোঁয়া জেলো বাতাসটায় উড়ে বেড়াচ্ছিল মহুয়ার খুশবু। পাখিটির গলার স্বর ভারী সুন্দর। অমৃতা এই পাখির ডাক এর আগে কোনো দিন শোনেনি। আজকেই প্রথম! সামি ফিরল শুকনো মুখ আর আলতা পরা লাল চোখ নিয়ে। অমৃতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকেই সদর দরজা দিয়ে সামিকে ঢুকতে দেখল। বেচারার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল। হৃদি আর বিভার কথা চিন্তা করেও কষ্ট হচ্ছে। এভাবে রাগ করে যার যার মতো চুপচাপ গুম হয়ে থাকার চাইতে পরস্পরের সাথে খোলা মেলা কথা বলে সমস্যার সমাধান করে ফেলাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হত না? মিছিমিছি নিজেদের এমন কষ্ট দেবার কোনো মানে হয়? হক ঠিকই বলেছিলেন, তার বন্ধু গুলো একেকটা রামগাধা। সেলফোনটা বেজে উঠলো ঠিক তখনই, যখন ওই নামটা মনে এলো!

অমৃতার হ্যালো বলা শুনে ভরাট কণ্ঠটা কোন ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠল,'তোমার কি মন খারাপ নাকি?'

– 'কী করে বুঝলেন?'

– 'বোঝা যায়।'

মহুয়ার ঘ্রাণ ওয়ালা হাওয়ায় ডুবে বড় একটা নিশ্বাস নিল অমৃতা। বললো, 'একটু খারাপ।'

হক সঙ্গে সঙ্গে কিছু বললেন না। একটু সময় চুপ করে রইলেন। আজকে মেয়েটির গলায় সেই স্পর্ধিত, দৃপ্ত ভাবটি অনুপস্থিত বরং একটু যেন নরম, কোমল আর স্নিগ্ধ! ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা সমীচীন নয় বলে তিনি একটু ঘুরিয়ে প্রশ্নটা করলেন,

– ‘সব কিছু ঠিক আছে?’

– ‘চলছে।’

– ‘আমার ছেলে কেমন আছে?’

অমৃতা মিথ্যা বললো, ‘ভালো আছে।’

– ‘কী করছে?’

– ‘এ মুহূর্তে কী করছে আমি বলতে পারছিনা।’

– ‘খাওয়া দাওয়া করেছে?’

সামি যে কিছুই খায়নি রাতে অমৃতা তা জানে। সন্তান অভুক্ত অবস্থায় আছে এটা জানার পর বাবা মায়ের ঠিক কী রকম লাগে, সেই অনুভূতি অমৃতা পুরোপুরি ভাবে না জানলেও কিছুটা অন্তত আঁচ করতে পারে। সামির ব্যাপারে আজকে কোন সঠিক তথ্য দিতে পারবেনা সে এই মানুষটাকে। সামি যে আপাতত ভালো নেই এই সত্যটা তার পিতা না জানলেও পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবেনা। সব কথা সবাইকে জানতে হয়না। বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের কিছু ব্যক্তিগত তথ্য বাবা মায়ের অজানা থাকাই বোধ হয় মাঝে মাঝে শ্রেয়।

অমৃতা বললো, ‘হুম খেয়েছে।’

– ‘আজকে কী খেয়েছে?’

– ‘ইশ, আপনি এত বেশি প্রশ্ন করেন কেন?’

– ‘তোমরা ঢাকা ফিরছ কবে?’

– ‘দু তিন দিনের মধ্যেই।

– ‘সামি কি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে?’

– ‘এখনো দেয় নি, তবে শীঘ্রই দেবে হয়তো।’

– ‘তুমি কি জানো ও এই চাকরিটা করে ঠিক কত টাকা বেতন পেতো?’

– ‘তিরিশ হাজার।

– ‘তিরিশ হাজার? ওর মা’ তো বলেছিল পঁচিশ।’

– ‘স্টার্টিং এ পঁচিশ ছিল। পরে তিরিশ করা হয়েছে।’

– ‘ও কোন সাবজেক্টের ক্লাস নিত?’

– ‘ইকনোমিক্স।’

– ‘কোন ক্লাস?’

অমৃতা হতাশ একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, ‘ক্লাস টেন।’

উত্তরটা দিয়ে বিরক্তিতে চুপ করে থাকল সে খানিকক্ষণ। তারপর স্বভাবসুলভ উকিল উকিল কঠিন কণ্ঠটা নিজের মধ্যে ফিরিয়ে এনে বললো, ‘মিস্টার হক, আপনার ইন্টারভিউ কি শেষ হয়েছে? নাকি আরো চলবে?’

– ‘শেষ হয়নি। আরেকটা প্রশ্ন আছে।’

– ‘শেষ করুন তাড়াতাড়ি। ইন্টারভিউ দিতে আমার ভালো লাগছেনা।’

– ‘আচ্ছা শেষ করছি। শেষ প্রশ্ন টা হল, তুমি কেমন আছ?’

অমৃতা থমকালো। সে কেমন আছে? এক মুহূর্তের জন্য মনে হল যেন এটা পৃথিবীর সবচাইতে কঠিন প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তার জানা নেই। তবে একটা ব্যাপার সে খুব ভাল মতোই জানে যে বন্ধুরা ভালো না থাকলে, তার নিজেরও ভালো থাকার আর কোন উপায় অবশিষ্ট থাকেনা। হৃদি, বিভা, সামি এরা কেউ ভালো নেই আজ রাতে। রুদ্র, আকাশেরও মন খারাপ। বন্ধুদের এমন দুঃসময়ে অমৃতা কী করে ভালো থাকবে? কিন্তু কেন যেন মনে হল, এই মহুর্তে তার এমন একটি প্রশ্নের ভীষণ প্রয়োজন ছিল! এতক্ষণ ধরে বুকের ভেতরে একটা অব্যক্ত চাপা আকাঙ্খা গুমরে গুমরে উঠছিল যেন। মনে হচ্ছিল কেউ একজন এই নিশ্ছিদ্র নীরব রাতের আরণ্যক গভীরতার মতোই, মনের গভীরতর স্তর থেকে গভীর ভাবে প্রশ্ন করুক, কিংবা জানবার ইচ্ছে ব্যক্ত করুক, যে অমৃতা কেমন আছে!

– ‘আপনি হঠাৎ আমার কথা জানতে চাইছেন?’ এবারে অন্যরকম শোনায় অমৃতার গলা। একটু অভিমানী, রাগী আর ছেলেমানুষি!

– ‘কেন? তোমার কথা জানতে চাওয়া কি বারণ?’

– ‘আমার ভালো থাকা না থাকায় আপনার কী এসে যায়? আপনার ছেলে ভালো থাকলেই তো হল!’

– ‘পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের ভালো থাকার অধিকার আছে। আর তুমি বাচ্চা একটা মানুষ। বন্ধুদের সাথে বেড়াতে গিয়ে মন খারাপ করে বসে থাকবে কেন? এটা তো ঠিক না।’

– ‘আমি মোটেও বাচ্চা মানুষ না! আর কখনও আমাকে বাচ্চা বলবেন না। খুব রাগ হয়!’

কথাটা শুনে শব্দ করে হেসে উঠলেন হক। হাসতে হাসতেই বললেন, ‘আচ্ছা শোন, আমার একটা ইম্পরট্যান্ট কল এসেছে। ফোন রাখছি।’

লাইন কেটে গেল। অমৃতার দুই ভ্রুর মধ্যবর্তী চামড়ায় বিরক্তিসূচক ভাঁজ পড়ল একটা। মনে হচ্ছে অসমাপ্ত কনভারসেশনটা অনেক ক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে কাঁটার মতো লেগে থাকবে খচখচ করে। লোকটা পেয়েছে কী? ইচ্ছে হলে ফোন করবে আবার ইচ্ছে হলে ফোন রেখে দেবে। ভাবটা এমন যে গোটা দুনিয়ার সব মানুষ তার কেনা গোলাম। অমৃতার মতামতের যেন কোন দাম নেই! রাগ লাগতে লাগল ভীষণ। ইচ্ছে হল এখুনি ফোন করে বলে, লিসেন মিস্টার হক, ফোন আমি করেছি, ফোনের লাইনও কাটব আমি। আপনি খবরদার লাইন কাটবেন না। যতক্ষণ আমি কথা বলব চুপ করে আমার কথা শুনবেন। যত ইম্পরট্যান্ট কলই আসুক না কেন আমার ফোনের লাইন আপনি কাটতে পারবেন না। মনে থাকবে?

বিভা হঠাৎ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু গলায় বলল, ‘এই, তোরা কোথায় সব? এদিকে আয় আমার একটা কথা আছে।’

আকাশ বাদে বাকি সবাই মিনিট দুয়েকের মধ্যে হাজির হল ওর সামনে। আকাশ তখনও ফেরেনি।

বিভা সামির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, ‘সামি শোন, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিছি।’

বন্ধুরা সব নিমেষহারা চোখে চেয়ে ছিল বিভার দিকে। বিভাকে দেখাচ্ছে খ্যাপাটে পাগলের মত। তার চুল আলুথালু। ডাগর দুটি টানা চোখের নিচে কান্নার গাঢ় দাগ। মুখে একটি প্রলয়ংকরী ঝড়ের পূর্বাভাস।

রুদ্র চেঁচিয়ে উঠে বললো, ‘কী সিদ্ধান্ত?’

বিভা তার কম্পিত অস্থির দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করল সামির মুখের ওপর বড় একটা শ্বাস নিল। তারপর থেমে থেমে বলল, ‘সামি, আই এম ব্রেকিং আপ উইথ ইউ।’

সামির মুখখানা চকিতে রক্তশূন্য হয়ে গেল। চোখ হয়ে উঠল বিস্ফোরিত। মুহূর্তের জন্য থেমে গেল হৃদপিণ্ডের ধুকপুক।

– ‘তুই এসব কী বলছিস?’ চাপা আর্তনাদ করে উঠলো হৃদিতা।

ব্রেকআপের কথাটা বলে ফেলার পর বিভাকে অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সে দৃঢ় গলায় বললো, ‘ঠিকই বলছি। সিদ্ধান্তটা যথেষ্ট ভেবে চিন্তেই নিয়েছি।’

প্রাথমিক ধাক্কাটা সামির মুখ থেকে বাকশক্তি কেঁড়ে নিয়েছিল। পাক্কা তিন চার মিনিট সে কোনো কথা পারলনা। ধীরে ধীরে বুকের ভেতরের ভাংচুরের ছায়াটা তার চেহারায় স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হল। মুখ হয়ে উঠলো রক্তিম। কপালের নীল রগ দপদপ করে ফুলে উঠে স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠল ফর্সা চামড়ার ওপর। দাঁতে দাঁত চেপে রক্ত জল করা শীতল গলায় বললো, ‘কী বললি তুই?’

সামির ওই অত্যধিক ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর বিভাকে একটু কাঁপাল ভেতরে ভেতরে। সে মৃদু ভাবে বললো,’তোর সাথে ব্রেকআপ করছি।’

এবার সামি পাগলের মতো বিকট চিৎকারে ফেটে পড়ল, ‘ফাইজলামি করিস তুই আমার সাথে?’

চিৎকারটা বিভাকে এক লোমহর্ষক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিল। দূর্গা দৌড়ে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গেছে। তার চোখেমুখে এখন ছায়াছবি দেখার আনন্দ। আর এদিকে সামি বেহেড। তার বাহ্য জ্ঞান পুরোপুরি ভাবে লোপ পেয়েছে। দূর্গার সামনে এবার থলের বেড়াল বেরিয়ে আসবে। বিভারই ভুল। এভাবে সবার সামনে কথাটা বলে ফেলা তার একেবারেই উচিৎ হয়নি।

বিভাকে চুপ থাকতে দেখে সামি আরো একবার হুঙ্কার ছাড়ল, ‘কথা বলিস না কেন?’

ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে অভিজিৎ বেরিয়ে আসল। তার পরনে এখনো অফিসের প্যান্ট শার্ট। ভ্রু দুটি কুঁচকে আছে। মুখ গম্ভীর। সে দাঁড়িয়ে থাকা দলটার মাঝখানে এসে স্পষ্ট গলায় বলল, ‘কী হচ্ছে এখানে?’

অভিজিৎ কে দেখে অমৃতা আর রুদ্র চোখ নামাল নিচে। লোকটার সামনে তারা লজ্জিত, কুণ্ঠিত এবং অপদস্থ বোধ করছে এই মুহূর্তে। হৃদির হাত পায়ে শিনশিনে একটা অনুভূতি হচ্ছিলো। তাকে ভীষণ রকম অপরাধবোধে পেয়ে বসেছে। মনে হচ্ছে এই সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী সে নিজে। সামি অন্য কোনো দিকে তাকালো না। বিভার দিকে যেমন রক্তিম চোখে চেয়ে ছিল ঠিক তেমন ভাবে চেয়ে থেকেই পুনরায় গর্জন করে বলে উঠল, খেলা পাইছিস তুই? খেলা লাগে জীবনটা?'

অভিজিৎ এবার অত্যন্ত কঠিন গলায় বিভাকে বলল, 'বিভা, আপনি ভেতরে যান।'

বিভা সচকিত ভাবে একবার তাকাল অভিজিতের দিকে। খুব নার্ভাস হয়ে গেছে সে। সারা শরীর কাঁপছে উদ্বেগ আর উত্তেজনায়। অভিজিতের কথাটা সে ঠিকমতো বুঝি অনুধাবন করতে পারল না। বোকার মতো তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। অভিজিৎ আবারও শক্ত ভাবে বলল, 'তাকিয়ে দেখছেন কী? বললাম তো ভেতরে যান!'

বিভা এবার বাধ্য মেয়ের মতো জায়গাটা থেকে সরে গেল। অভিজিৎ সামির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'দেখুন, আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আপনি আমার স্ত্রীর সাথে এধরণের অফেন্সিভ আচরণ করবেন আর তা আমি মুখ বুজে সহ্য করব, এমনটা ভাবলে খুব বড় ভুল করবেন।'

সামি তীব্র চোখে তাকাল অভিজিতের দিকে। তার দুটি চোখ আলতা রঙে রাঙা। দেখা মাত্র বুক আঁতকে ওঠে। মনে হয় তাকে বুঝি বুদ্ধিবৈকল্যে পেয়েছে। এখুনি কিছু একটা লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাবে। অভিজিৎ সামির ওই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে একটু থমকালো। অমৃতাকে বললো, 'শুনুন, আপনাদের বন্ধুকে সামলান, উনার মনে হচ্ছে মাথার ঠিক নেই আজ।'

অমৃতা একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললো, ‘আপনি ভেতরে যান। আমরা দেখছি ওকে।’

অভিজিৎ জায়গাটা থেকে সরে যাবার পর সামি বন্ধুদের দিকে হাতের আঙুল তুলে শাসানোর গলায় বললো, ‘তোরা কি দেখছিস ও আমাকে সেকেন্ড টাইম ঠকাইল? এর আগে কথা দিছিল যে ও আমাকে বিয়া করবে।’

রুদ্র মাঝখান থেকে থামিয়ে দিয়ে বললো, ‘ও তোকে কখনোই বিয়ে করবে বলে কথা দেয় নাই সামি!’

সামির গলার জোর আরো বেড়ে যায়, পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে বলে, ‘আরে তুই কী জানিস? ও বলছিল সারা জীবন আমার সাথে থাকবে। এরপর ও আমাকে কিছু না জানায়া অভিজিৎকে বিয়া করছে। গত তিন চারমাস ধইরা বলছে যে অভিজিৎরে ডিভোর্স দিয়া আমার সাথে সেটেল হবে। নাও সাডেনলি শী ওয়ান্টস আ ব্রেকআপ। আমি জানতে চাই এসবের মানেটা কী?’

.

রুদ্র অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললো, ‘থাম তো মামা! কী এক ক্যাচাল লাগায় থুইসস। মাইয়াটার বিয়া হয়ে গেছে। এখন তো তুই এইসব আজাইরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ কর। ছাইড়া দে না রে বাপ। আল্লাহর ওয়াস্তে ছাইড়া দে। একটু শান্তিতে থাকতে দে ওরে।
’

সামির চোখ দুটো এই পর্যায়ে হঠাৎ একটু জলসিক্ত হয়ে উঠলো। সে একটা ঢোঁক গিলে বললো, ‘ওকে ফাইন। তোরা সবাই আমাকেই ভুল বুঝতেছিস। গ্রেট। একটা

লাস্ট কথা বলি শোন। বিভাকে বলিস আমি ওর সাথে আর নাই। আর বিয়া কি শুধু ও একাই করতে পারে? আমি করতে পারিনা? দাঁড়া আমিও বিয়া করব। এক মাসের মধ্যেই বিয়া করব আমি।’

কথাটা বলা শেষ করেই সে পকেট থেকে ফোন বের করে নিয়ে তার মায়ের নম্বরে ডায়াল করল।

– ‘হ্যালো মা, তোমরা আমার জন্য মেয়ে দেখতেছো বললা না? হ্যাঁ দেখো। আমি বিয়ে করব।’

একটু সময় চুপ থেকে সে ওপাশের কথা শুনল। এরপর আবার তারস্বরে বললো, ‘আরে সুন্দর হোক, পেত্নী হোক, শিক্ষিত, কুখ্যাত যা খুশি হোক। আমি বিয়ে করব এটাই ফাইনাল।’

ফোন রাখার পর একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে সে বন্ধুদের দিকে তাকালো, ‘এবার ঠিক আছে সব? তোমাদের বান্ধবীকে জানায় দিও খবরটা।’ একটু থেমে সে আবার বললো, ‘আমি এখানে আর একটা মুহূর্তও থাকবো না। সবাই রেডি হ, আমরা কালকে সকালেই লিভ করবো।’

.

বিভা বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো। অভিজিৎ একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে দৃশ্যটা অবলোকন করছে অনেকক্ষণ ধরে। একটা সময় সে অধৈর্য গলায় বললো, ‘এসব আর কতক্ষণ চলবে?’

বিভা বালিশ থেকে মুখ তুলে বললো, ‘আপনি বুঝতে পারছেন না কেন আজকে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে!’

অভিজিৎ হাহাকার করে বলে উঠল, ‘হায় ভগবান! ব্রেকআপ তো মানুষেরই হয়। আপনি তো টিনএজ মেয়ে নন যে এরকম মরা কান্না করতে হবে ব্রেকআপের জন্য।’

– ‘আপনি বুঝবেন না। আপনি কখনো কারুকে ভালোবাসেননি তো, তাই আপনি কখনই বুঝবেন না আমার কষ্ট।’

অভিজিৎ বিভার শেষ কথাটি শুনে গভীর চোখে তাকাল ওর দিকে। তারপর তার চেয়েও গভীরতর গলায় বলল, ‘সবার ভালোবাসা একরকম হয়না।’

– ‘আপনার কি আমাকে খুব ঘেন্না হচ্ছে?’ হঠাৎ কেমন অন্য গলায় প্রশ্ন করল বিভা।

– ‘ঘেন্না হবে কেন?’

– ‘এইযে, আপনার বাড়িতে কী একটা বাজে পরিস্থিতির সৃষ্টি হল আমার জন্য। সব তো আমারই দোষ। আপনার উচিৎ আমাকে ঘেন্না করা। আমি ভীষণ খারাপ একটা মেয়ে।’

অভিজিৎ ম্লান হাসলো, ‘আপনাকে আমি চাইলেও ঘেন্না করতে পারবনা বিভা!’

বিভা বড় বড় দুটি কান্না ভেজা চোখ মেলে ধরে অবাক হয়ে চায় অভিজিতের দিকে, ‘কেন?’

অভিজিৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। ক্ষীণ গলায় বলে, ‘কিছু প্রশ্নের উত্তর মুখ ফুটে বলতে নেই। মন দিয়ে বুঝতে হয়।

দরজায় কেউ একজন করা নাড়ছিল। অভিজিৎ এগিয়ে গিয়ে খুলল দরজার পাল্লাটা। হৃদি দাঁড়িয়ে আছে ফোলা চোখে। অভিজিৎকে দেখে সবিনয়ে বললো, ‘বিভাকে একটু ডাকবেন দুলাভাই? আমার কথা ছিল।’

অভিজিতের কিছু বলতে হলোনা। বিভা নিজেই শুনতে পেয়ে উঠে আসল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দুচোখ ডলে কান্নার রেখা মুছতে মুছতে সে বললো, ‘আসছি, চল।’

দুই বান্ধবী পাশের ঘরটায় এসে দোর আটকালো। হৃদি একটু আড়ষ্ট ভাবে ইশারায় বিছানাটা দেখিয়ে দিয়ে বিভাকে বলল, ‘বস ওখানে। তোর সাথে কথা আছে।’

বিভা বিছানার ওপর পা তুলে বসলো। খোলা অবিন্যস্ত চুলগুলো দুহাত দিয়ে আগলে নিয়ে হাত খোঁপা বাঁধল সময় নিয়ে। এই খোঁপা বাঁধার বিস্তর সময়টুকুতে সে হৃদিকে খুব ভালো করে দেখে নিল। ওর শ্যামবর্ণ মুখখানায় সর্বদাই একটা মন কেমন করা ভালো লাগা ভর করে থাকে। কলেজ ইউনিভার্সিটি তে ওকে সবাই কাজল বলে ডাকত। ঠিক কাজলের মতোই লম্বা ছাঁচে ঢালা মুখ, জোড়া ভ্রু আর চোখের চাউনিতে বড্ড মায়া! এই মায়াবতী মেয়েটি যে বিভার কতটা কাছের, কতটা আপন আর কতটা প্রিয় তা এক বিভা আর তার ভগবান ছাড়া আর কেউ জানেনা। হঠাৎ বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত নাম না জানা অনুভূতি ঝনঝন করে ব্যথার মত বেজে ওঠে। এই মেয়েটির ঠোঁট ছুঁয়ে গেছে তার জীবনের প্রথম প্রেম! এই মেয়েটি তার আত্মার অংশ আর সেই ছেলেটি তার আজন্ম সাধন ধন একমাত্র ভালোবাসার মানুষ! এই দুইয়ের মধ্যে বিভাকে যদি কখনও যে কোন একটিকে বেছে নিতে বলা হয় তাহলে সে কোনটি বেছে নেবে? ভালোবাসা? নাকি বন্ধুত্ব?

হৃদি অনেকক্ষণ অবধি লজ্জা আর সংকোচে জাড় হয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত সে সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিভার পাশে এসে বসলো।

বললো, ‘হঠাৎ তুই এরকম সিদ্ধান্ত নিলি কেন?’

বিভা ঠাণ্ডা চোখে চাইল হৃদির দিকে। কিছু একটা খুঁজল ওর মুখে। তারপর থমথমে গলায় বলল, ‘তুই কবে থেকে ওকে ভালোবাসিস?’

প্রশ্নটা শোনা মাত্র হৃদির মুখখানা একেবারে পান্ডুর বর্ণ হয়ে গেল। চোখের পলক নেই। মুখেও কোন কথা নেই। থম ধরা চোখে শুধু তাকিয়ে রইল বিভার দিকে। পাক্কা দেড় মিনিট পর সে ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে নিল নিচে। ক্ষীণ গলায় বলল, ‘এসব কী বলছিস?’

– 'তুই কি ভাবছিস আমি কিছু টের পাইনাই? তোকে আমি হাড্ডিতে হাড্ডিতে চিনি।'

হৃদির ভীষণ লজ্জা! বিভার দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস নেই। মাটির সাথে মিশে যেতে যেতে কোন রকমে বলল, 'কী বলতেছিস কিছুই বুঝতেছিনা।'

– 'আমার সাথে মিথ্যা কথা বলিস না হৃদি!'

হৃদির চোখ দিয়ে টপটপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, 'দোস্ত শোন। সামি তোকে ভালোবাসে। এর আগে তুই যখন ওকে ছেড়ে দিয়ে অভিজিৎকে বিয়ে করলি তখন ও একদম ভেঙে পড়ছিল। এবার আর ও সইতে পারবেনা। প্লিজ তুই ওর সাথে এরকম করিস না।'

বিভা অদ্ভুত হাসে। একটু শ্লেষ জড়ানো গলায় বলে, 'তুই ওর পাশে থাকলেই হবে। তুই পাশে থাকলে সব কিছু সইতে পারবে ও।'

হৃদি এবার কঠিন হবার চেষ্টা করল, 'বিভা আজেবাজে বকিস না। আমি ওর বন্ধু। বন্ধু হিসেবে সবসময়ই পাশে আছি। এর চেয়ে বেশি কিছু কখনোই সম্ভব না আমাদের মধ্যে।'

– 'কেন সম্ভব না?'

– 'কারণ সামি তোকে ভালোবাসে, আমাকে না।'

– 'আর তুই যে ওকে ভালোবাসিস? সেটার কী হবে হৃদি?'

– 'এসব মিথ্যা কথা। আমি মোটেও ওকে ভালোবাসিনা। বন্ধু হিসেবে বাসি তবে ওটা মোটেও রোমান্টিক লাভ না।'

– 'একটা ব্যাপার কী জানিস? সামির মধ্যেও কিছু পরিবর্তন এসে গেছে। আমি টের পাই।'

হৃদির বুকটা দুরুদুরু করে উঠল। ভয় ডোবা গলায় বললো, 'কী টের পেয়েছিস তুই?'

– 'গত আট ন' মাস তোরা খুব কাছাকাছি ছিলি, তাইনারে?'

হৃদি চুপ করে থাকে।

– 'শোন। আমাকে ছাড়া বেঁচে থাকার মোটামুটি অভ্যাস হয়ে গেছে সামির। মানুষ অভ্যাসের চিরকালের বাঁধা দাস। অভ্যাসের চেয়ে বড় সত্য আর কিছুই নাই। আমাকে ছাড়া সামি থাকতে পারবে, কিন্তু তোকে ছাড়া থাকতে পারবেনা।'

– 'তোর সব ফাউল কথা বার্তা।'

– 'এটাই সত্য। তুই ওকে যেভাবে সময় দিয়েছিস, সাপোর্ট দিয়েছিস আমি কোনো দিন ওকে এত কনস্ট্যান্ট ভাবে সঙ্গ দিতে পারিনাই।'

হৃদি আর কিছু বলতে পারলনা। তার কেমন পাগল পাগল লাগছে। হৃৎপিণ্ডের জমিনের ওপর একটা নচ্ছার ঘোড়া সেই তখন থেকে খুরের আঘাত হানছে ক্রমাগত।

– ‘আমি যখন ঘটনাটা শুনেছি তখন প্রচন্ড কষ্ট হয়েছে এ কথা ঠিক। কিন্তু পরমুহূর্তেই যখন মনে হল, যে মেয়েটাকে সামি চুমু খেয়েছে সে মেয়েটা অন্য কেউ না, তুই! তখন আস্তে আস্তে কষ্টটা ঝাপসা হয়ে আসল।’

একটু থামল বিভা, তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, ‘তোর জন্য তো জান দিয়ে দিতে পারব দোস্ত! সামি তো কোন ছাড়।’

– ‘তুই আমাকে এত ভালোবাসিস কেন?’

– ‘এই প্রশ্নের কোন উত্তর হয়না।’

বলে বিভা একটু এগিয়ে আসল হৃদির কাছে। ওর দুটি হাত ধরে গভীর গলায় বলল, ‘তোকেই দিলাম ওকে। তুই সামলায় রাখিস কিন্তু!

– ‘সামি বলছে যেদিন সে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে, সেদিন নিজের কান কেটে ফেলবে।

এই কথা শুনে বিভা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল। বিভার হাসি দেখে খানিক বাদে হেসে ফেলল হৃদিও। ভারী অদ্ভুত একটা দৃশ্যের দৃশ্যায়ন হল সেই মুহূর্তে ওই ছোট্ট চতুষ্কোণ টিউবলাইট জ্বলা ঘরটায়। দুটি যুবতী একত্রে একইরকম সুরে ঘর কাঁপানো হাসি হাসছে অথচ দুজনেরই চোখ ভেজা। তাদের গালে চিকচিক করছে অশ্রুর দাগ।

অমৃতা মনে মনে একটা ফোনের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সেই ফোনটা সর্বদাই বড় অসময়ে আসে। আজ রাতেও এমন একটা মুহূর্তে আসল যখন অমৃতা বন্ধুদের সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেছে। উঠোনে জড়ো হয়েছে ওরা চারজন। রুদ্র, সামি, অমৃতা আর আকাশ। সামি বিয়ে করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর। তার ধারণা একমাত্র এই একটি উপায়েই বিভাকে যথাযথ শিক্ষা দেয়া যাবে। বিভার নাকি একটা শিক্ষা পাওয়া অতিশয় জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশ সবে মাত্র ফিরেছে তখন। ঘটনা শুনে সে ব্যাক্কল বনে গেছে। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোচ্ছেনা। সেই রকম একটা টান টান সময়ে ফোনটা আসল। বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটু চোর চোর গলায় অমৃতা বন্ধুদের বলল, ‘মা ফোন দিছে। আসতেছি আমি।’ বাড়িতে ঢুকে ফোন নিয়ে সোজা বারান্দায় চলে গেল সে।

ফোন ধরেই মুখ ঝামড়ে উঠে বললো,-’আপনি পেয়েছেন কী?’

– ‘আমি আবার কী করলাম?’

– ‘যখন ইচ্ছে ফোন করবেন আবার নিজের ইচ্ছে মতো ফোন রেখেও দেবেন। আমার তো কোনো সে নাই, এজ ইফ আমি অলওয়েজ আপনার ফোন ধরতে বাধ্য! যখন তখন, যা ইচ্ছা।’

হক একটু থতমত খেয়ে গেলেন অমৃতার ধমক শুনে। এমন উঁচু গলায় কথা বলবার মতো মানুষ আজকাল তার আশেপাশে একেবারে নেই বললেই চলে। এমন কি নিজ স্ত্রী পুত্রও তার সাথে এই স্বরে কথা বলেনি কোনো দিন। রোমেলার সাথে তার সম্পর্ক অনেকটা শান্ত, স্থির, মন্থর নদীর মতো। রাগ, ভালোবাসা, অভিমান এর কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি বা আধিক্য নেই সেখানে। সামিটা বাউন্ডুলে এ কথা সত্য, কিন্তু একটি মূল্যবান শিক্ষা অন্তত তিনি ছেলেকে দিতে পেরেছেন যে, বড়দের সাথে উঁচু

গলায় কথা বলতে নেই। গুরুজনের সাথে কথা বলতে হয় চোখ নামিয়ে, নমনীয় ভাবে। এই মেয়েটিকে তার বাবা মা বোধহয় কিছুই শেখায়নি। হক তার চেয়ে বয়সে বড় শুধু এটাই নয়, তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের গুটি কয়েক অতিশয় ধনী এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের একজন। সমাজের প্রতিপত্তিশীল, যশস্বী লোকজনের সাথে যে সর্বদা নরম এবং তৈলাক্ত স্বরে কথা বলতে হয় এই অলিখিত নিয়মটুকু কি মেয়েটির জানা নেই? তবে চিন্তা সমুদ্রে ঝড় উঠলেও হক ঠিক রাগ করে উঠতে পারলেন না অমৃতার সাথে। মেয়েটির প্রতি এখন আর তার রাগ হয়না বরং এক ধরণের বিস্ময় বোধ হয়। এ বয়সী ছেলেমেয়ে দের সাথে তার মেলামেশা নেই বললেই চলে। নিজের ছেলেটার সাথে এক অপরিমেয় দূরত্ব রচনা হয়ে গেছে এই আট ন মাসে। সামি অবশ্য কোনোকালেই খুব একটা বাবা ঘেঁষা ছেলে ছিল না। বাবাকে সে ভালোবাসে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদের পিতাপুত্রের মাঝে কখনোই বন্ধু ভাবাপন্ন সম্পর্ক বিরাজমান ছিলনা। তাই এই জেনারেশনটা সম্পর্কে তিনি একেবারেই অজ্ঞ। এরা কী ভাবে, কী করে, কীসে রাগ হয় বা আনন্দ পায় এসব ব্যাপারে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।

তিনি কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে স্থিরতার সাথে বললেন, 'তোমার কোনো ধারণা নেই সারা টা দিন আমার ওপর দিয়ে কী গেছে! আমার চলতে হয় সময় মেপে মেপে। কাজের বাইরে এক কদম পা ফেলার অবকাশ নেই। তখন তোমার সাথে কথা বলবার সময় একটা খুব জরুরী ফোন চলে আসল। তাই…'

– 'এসব গল্প আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?' বাঁধা দিয়ে উঠল অমৃতা। –'তুমি মিছিমিছি রাগ করছ বলেই তো শোনাতে হচ্ছে।

– 'এসব বলে লাভ নেই, এরপর আপনি ফোন তখনই রাখবেন, যখন আমি বলব!'

হক অমৃতার ছেলেমানুষী আবদার শুনে হেসে উঠে বললেন,

– ‘ওরে বাবা! কঠিন আদেশ দেখছি!’

– ‘হ্যাঁ কঠিন আদেশ।

– ‘রাত বাজে এগারোটা। আমি বারোটার মধ্যে বিছানায় যাই। উঠি ফজরের ওয়াক্তে।’

– ‘এসব গল্প দিয়ে লাভ নেই। কথা শেষ হবার আগে আপনি ফোন রাখবেন না। আর রাখতে হলে এখনই রাখুন। কথার মাঝখানে হুট করে ফোন কেটে দিলে আমার খুব রাগ হয়। তাছাড়া আপনার জন্য আমাকে বন্ধুদের সাথে মিথ্যা বলতে হচ্ছে। লুকিয়ে ফোনে কথা বলতে হচ্ছে। আমি এর আগে কোনো দিন কারো সাথে চুরি করে কথা বলিনি।’

– ‘বল কী? কারো সাথে লুকিয়ে কথা বলো নি কখনও?’

হক সত্যিই বেশ অবাক হলেন। এই বয়সী মেয়েরা সাধারণত বাবা মায়ের চোখের আড়ালে প্রেমিক প্রেমিকের সাথে কথা বলে। অথচ এই মেয়ে বলছে সে নাকি কোনো দিন বাবা মায়ের কাছ থেকে বা কারো কাছ থেকেই কিছু লুকোয় নি। এটাও কি সম্ভব?

– ‘না কারো সাথে না।’

– ‘ইশ, তাহলে তো আমার জন্য তোমার রুল ব্রেক হয়ে গেল।’ হক বললেন, আলগা আফসোসের গলায়।

– ‘হলোই তো।’

– ‘তাহলে এখন কী হবে?’

– ‘কী আবার হবে? আপনার একটা শাস্তি হওয়া উচিৎ।’

হক সাহেব আবার হাসতে শুরু করলেন। এভাবে তার সাথে কেউ কথা বলেনা। এই মেয়েটা সত্যিই ছেলেমানুষ একদম!

– ‘কী শাস্তি হওয়া উচিৎ বলো তো?’

– ‘ভেবে চিন্তে বলবো।’

– ‘আচ্ছা ভেবে নাও। সময় দিলাম তোমাকে। এখন আমি জরুরি কথাটা বলে নিই।

– ‘আমারও একটি জরুরি কথা বলার আছে।’

– ‘ঠিক আছে তুমি বল আগে।’

– ‘না আপনি আগে।’

– ‘উঁহু, তুমি আগে।’

– ‘আপনি আগে।’

– ‘এ জন্যেই তোমাকে আমি বেয়াদব ডাকি।’

-’ যা ইচ্ছে ডাকুন, আমার কিছু এসে যায়না।’

– ‘তুমি কি সবসময়ই এরকম ড্যাম কেয়ার?’

– ‘আমার বন্ধুরা আর আমার পরিবার, এই দুটি জায়গা ছাড়া অন্য কিচ্ছুতে আমার দুর্বলতা নেই। আমি কাউকে তোয়াক্কা করিনা।’

হক একটা নিশ্বাস ফেললেন, ‘এ কারণেই সামিকে তোমাদের সঙ্গ ত্যাগ করতে বলেছিলাম।’

– ‘এটার মানে কী?’

– ‘মানে হল, আমার ছেলেটা তোমাদের সাথে থেকে থেকে দিন দিন বখে যাচ্ছে।

অমৃতা একটু কড়া ভাবে বলল- ‘শুনুন, আই ডোন্ট এপ্রিশিয়েট দ্যাট টোন। এরকম মুরুব্বিয়ানা গলায় আমার সাথে কথা বলবেন না। আমি মুরুব্বিদের সাথে ফোনালাপ করে অভ্যস্ত নই।’

হক ভীষণ অবাক গলায় বললেন, ‘আমি তো মুরুব্বিই, আমার বয়স কত তোমার কোন ধারণা আছে?

– ‘রাখছি ফোন। মুরুব্বিদের সাথে কথা বলতে বিরক্ত লাগে।’

– ‘দাঁড়াও দাঁড়াও!’

– ‘দাঁড়াতে পারবনা।’

– ‘শোনো অমৃতা, একটু আগে জানতে পারলাম যে আমার ছেলে নাকি বিয়ে করার জন্য রাজি হয়েছে। তার এই হঠকারী সিদ্ধান্ত আমাকে অত্যধিক দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে কি কোনো বিশেষ কারণ আছে?’

– ‘লিসেন মিস্টার হক, আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে চাই, নেবেন?’

এই পর্যায়ে হক কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করলেন। হাঁটুর বয়সী এক মেয়ের কাছ থেকে এখন তাকে পরামর্শ নিতে হবে? তিনি সকৌতুকে বললেন,

– ‘কী পরামর্শ?’

– ‘আপনার ছেলের ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করা আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধ করে দিন।

– ‘বিয়ে করার সিদ্ধান্তটি কিন্তু একেবারে ব্যক্তিগত নয়। এই সিদ্ধান্তের সাথে দুটি পরিবার জড়িত।’

– ‘হ্যাঁ বুঝেছি। কিন্তু সামি বিয়েতে রাজি হয়েছে এটাই কি আপনাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এর পরেও এটা সেটা প্রশ্ন করে জল ঘোলা করার কি কোনো মানে হয়?’

হক একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললেন, ‘দ্যাখো,আমি আমার ছেলেকে চিনি। একটা পরিবারের সাথে কথা হয়ে যাবার পরে সে যদি হঠাৎ করে বেঁকে বসে তাহলে আমরা সামাজিক ভাবে অপদস্থ হয়ে পড়ব। আমি জানতে চাই ওর এই সিদ্ধান্তের পেছনে কি হিন্দু মেয়েটার কোনো প্রকার ভূমিকা আছে?

—‘হিন্দু মেয়েটার একটা নাম আছে মিস্টার হক!’

– ‘নামটা ভুলে গেছি মিস অমৃতা!’

– ‘ওর নাম বিভা। এরপর থেকে ওকে নাম ধরেই ডাকবেন।’

– ‘নাম মনে থাকলে নিশ্চয়ই নাম ধরে ডাকব।’

– ‘বিভার হাত আছে কি নেই সে বিষয়ে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারবনা। আমি মানুষের প্রাইভেসিকে রেসপেক্ট করি।’

– ‘বিভা সংসার করছে মন দিয়ে?’

– ‘করবে।’

– ‘যাক, নিশ্চিন্ত হলাম। এবার তাহলে আমার ছেলেটারও মন ঘুরবে আশা করি।

– ‘সামির জন্য আপনারা মেয়ে দেখে ফেলেছেন?’

– ‘ওর মা দেখেছে।’

– ‘আপনাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড?’

– ‘অনেকটা সেরকমই।’

– ‘মেয়ে কী করে?’

– ‘অস্ট্রেলিয়া থেকে পড়াশোনা করে এসেছে শুনলাম।’

– ‘বাহ্ বেশ।’

– ‘তোমরা সামিকে একটু সাপোর্ট করো কেমন? ও যেন হুট্ করে আবার সিদ্ধান্ত বদলে না ফেলে।’

– ‘আচ্ছা শুনুন, আমরা কাল সকালে কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। তারপর সেখান থেকে ঢাকা।’

– 'তাই নাকি? খুব ভালো! যাক আজকে বেশ কিছু ভালো ভালো খবর পেলাম তোমার কাছ থেকে।'

– 'হ্যাঁ কলকাতা থেকে ফ্লাইটে যাবো ঢাকা। আশা করি এয়ারপোর্টে এই যাত্রায় কোনো পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকবে না আমাদের পাকড়াও করার জন্য।'

হক হাসলেন, 'না থাকবেনা।'

– 'তাহলে আর কী? দেশে আমরা পৌঁছুনো মাত্র আপনার কানে খবর চলে যাবে, তাইনা?'

– 'হুম তা যাবে।'

– 'সো, আই গেস আমাকে আর প্রয়োজন হবেনা আপনার।'

– 'না তা হবেনা।'

অমৃতা নিশ্বাস চেপে রেখে বললো,-'আর কখনো ফোন দিয়ে বিরক্ত করবেন না তো?'

– 'না আর বিরক্ত করব না। শুধু কাল সকালে যাত্রা শুরু করার সময়, আমাকে একটা টেক্সট করে জানিয়ে দিতে পারবে?'

চেপে রাখা নিশ্বাসটা ধীরেধীরে ছাড়ল অমৃতা। বলল, 'পারব।'

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার ছোট্ট পরিসরে কয়েক বার পায়চারি করল। কপালের কাছের ছোট ছোট চুল গুলোতে

চিরুনির মতো আঙুল চালাল বেশ কয়েকবার। গায়ে পরে থাকা জ্যাকেটের চেইন নাড়াচাড়া করলো অন্যমনস্ক ভাবে। সাবধানে বললো, 'আর আমি যদি আপনাকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করি? রাগ হবেন?'

হকের কণ্ঠে হঠাৎ একটা তরঙ্গ টের পাওয়া গেল।

– 'রাগ হব কেন?'

– 'সবাই যে বলে আপনি খুব রাগী!' খুব আস্তে করে বলে অমৃতা।

– 'তাই নাকি? কে বলে?'

-' সবাই।'

– 'সবাই কি আমাকে নিয়ে খুব কথা বলে বেড়ায়?'

– 'আপনি নামকরা মানুষ। লোকে আপনাকে নিয়ে কথা বলবে, এটাই

কি স্বাভাবিক নয়? সবাই আপনাকে ভয় পায়।

– 'তাই বুঝি? এর মানে তুমিও নিশ্চয়ই ভয় পাও আমাকে।'

অমৃতা হাসে, 'আমি আর ভয়? তাও আবার আপনাকে?'

-' তুমিই তো বললে সবাই আমাকে ভয় পায়।'

– 'সবার সাথে আমাকে মিলিয়ে ফেললেন?'

-' মেলানো উচিৎ বলেই তো আমার মনে হয়।'

– 'উচিৎ, অনুচিত মাথায় রেখে কি সব সময় সব কাজ করা যায়?'

– ‘করা উচিৎ।’

– ‘আপনি আমার কথা বুঝতে পারেন নি।’

– ‘আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি।’

– ‘আমি কি এখন ফোন রেখে দেব?’

– ‘তোমার ইচ্ছা।’

অমৃতা কয়েক সেকেন্ড কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপর ফোন কাটার আগে ছোট করে বললো,’বেশ, উচিৎ অনুচিৎ নিয়েই থাকুন।’

বিভা শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়েছে উঠোনে। পোড়া পাতার ঘ্রাণে ছেয়ে আছে চারপাশ। অগ্নিশিখার কমলা আলোর আভায় তিরতির করে কাঁপছে সাদা রঙের কুয়াশা। মাথার ওপর হিমবর্ষী কালো বিস্তৃত আকাশ। নক্ষত্ররা জেগে নেই আজ। নিরুদ্দেশ ভাসছে মেঘ। জঙ্গলের গভীরে, কেমন মন খারাপের গলায় একটা টুই পাখি ডাকছিল অনবরত। হঠাৎ ঘুম ভেঙে বুঝি সে আবিষ্কার করেছে পাশে অনেকদিনের প্রিয় সঙ্গীটি আর নেই। তাই অন্ধকার জঙ্গলে জঙ্গলে ভারী করুণ গলায় সেই প্রিয় বন্ধুটিকে ডেকে ডেকে হয়রান হচ্ছে সে। দূর পাহাড়ে একটা মেয়ে আসামিয়া গান গাইছিল। মেয়েটা প্রায়ই গান গায় একা একা। বিভা এর আগেও শুনেছিল একদিন।

বিভা আর হৃদি আগুনের পাশে বসেছিল পিঁড়ি পেতে। আগুনের আঁচ গায়ে লাগাতে আরাম লাগছে। অভিজিৎ অন্য বন্ধুদের সাথে নিয়ে বসেছে চেয়ারে। রুদ্র গিটারে টুংটাং করছিল। তাকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চায় কিন্তু কথাটা শুরু করবে কী করে তা ঠিক ভেবে পাচ্ছেনা।

সে বেশ কয়েকবার গলা খাঁকারি দিয়ে গম্ভীর ভাবে বললো,

– ‘শোন আমার তোদেরকে একটা কথা বলার আছে। মানে একটা গুড নিউজ আছে।’

বন্ধুরা সবাই উৎসুক হয়ে তাকাল তার দিকে। হৃদি গদগদ হয়ে বললো, ‘বলে ফ্যাল না, সুখবর দিতে দেরি করতে নাই।’

রুদ্র কোলের ওপর ধরে থাকা গিটারটার তারের দিকে নিবিষ্ট চোখে চেয়ে থেকে বললো, ‘ইশে··· আমার ইউএস এর একটা ইউনিভার্সিটিতে এডমিশন হয়ে গেছে। স্কলারশিপ পাইছি দোস্ত।’

দলটার মধ্যে অকস্ম্যাৎ এক অনাকাঙ্ক্ষিত নীরবতা জেঁকে বসল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। সেই অস্বস্তিকর নীরবতা ভেঙে অমৃতাই প্রথম কথা বললো, ‘ওয়াও! দ্যাটস ফ্যান্টাস্টিক! কনগ্রেস দোস্ত।’

রুদ্র মাথাটা নুইয়ে রেখেই বললো, ‘নেক্সট ইয়ার ফল সেমিস্টার থেকে শুরু করবো। সো আমার মনে হয় নেক্সট অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরে যাইতে হবে।’

– ‘কত দিনের জন্য?’ চাপা এক উৎকণ্ঠা ভেসে উঠল বিভার গলায়।

– ‘দুই বছর।’

হৃদির কান্না পেতে খুব বেশি সময় লাগেনা। সে কাঁপা গলায় বললো, ‘তুই চলে যাবি?’

রুদ্র অস্বস্তিতে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল, ‘চলে যাবো কেন? দুই বছরের ব্যাপার মাত্র।’

সামি গমগম করে বলে উঠল, ‘যাবি তো এখনই যা শালা। সেপ্টেম্বরে যাইতে হবে কেন? কালকেই যা।’

রুদ্র ম্লান হাসে, ‘তোরা এরকম করলে কিভাবে যাবো?’

রুদ্রর এ কথার পর কেউ আর টু শব্দটি করলো না। সবাই একদম গুম হয়ে বসে রইল। কী বলবে? কিচ্ছু তো বলার নেই। জীবন তরী যে বাইতেই হবে! মানুষ যত বড় হয়, যত দায়িত্ববান হয়, ততই যেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে থাকে সর্ব সাধারণের মাঝে। নিজের আপন ছোট্ট ভুবনটা তখন বড়ই কোণঠাসা হয়ে পড়ে। পুরোনো অভ্যাস গুলো এক সময় স্মৃতি হয়ে যায়। হৃদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল আর বারবার বলছিল, ‘প্লিজ যাস না, রুদ্র। কী হবে আমেরিকা গিয়ে পড়াশোনা না করলে? আমাদের দেশে কি পড়া নাই?’

রুদ্র চুপ করে রইল। তার চোখের সামনেটাও হঠাৎ করেই কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল। অমৃতা বললো,

– ‘দোস্ত তুই চলে গেলে আমাদেরকে গান শোনাবে কে?’

রুদ্র গিটারের তারে হাত চালাতে চালাতে মন্থর ভাবে বলল, ‘ওসব বাদ দে এখন। গান শোন। গান করি।’

আসামিয়া মেয়েটি তখনও গাইছিল। কী অদ্ভুত সুন্দর তার গানের গলা! এই নিকষ কালো অন্ধকার সুন্দর রাত্রির মতোই গভীর আর পবিত্র যেন!

রুদ্র হঠাৎ করে ধরলো গানটা-

‘ওই দূর পাহাড়ের ধারে
দিগন্তেরই কাছে
নিঃসঙ্গ বসে একটি মেয়ে
গাইছে
আপন সুরে
আপন সুরে
আপন সুরে…’

রুদ্র এই গানটি পুরোপুরি শেষ না করে হঠাৎ অন্য গানে চলে গেল।

I was a quick wet boy
Diving too deep for coins
All of your straight blind eyes
Wide on my plastic toys

হৃদি তখনও ফিচফিচ করে কেঁদে যাচ্ছে। আকাশ বসা থেকে উঠে হৃদির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাঁদিস না তো। ওঠ। আয় নাচি।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল হৃদিতাকে। সামি যেখানটায় বসেছে সেই জায়গা থেকে আগুনের কমলা রঙের আলোয় বিভার মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। রুদ্রর গাওয়া গানটা মনের মাঝে সেইদিনের স্মৃতিটা ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। বিভার বিয়ের আগের রাতে তাদের উত্তরা বাড়ির হলরুমে এই গানে বিভার সাথে সে শেষবারের মতো নেচেছিল। শেষবারের মতো কাছে এসেছিলো দুজনে। বুকের ভেতর ক্রমশ এক বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসতে লাগল। দম বন্ধ করা একটা কষ্ট! বিভারও কি এখন মনে পড়ছে সেই দিনটার কথা?

তার হঠাৎ মনে হল সময়ের সাথে সাথে আসলে সব কিছুই একটু একটু করে পাল্টাতে থাকে। সেই পাল্টানো অংশ টুকু এতো বেশি সূক্ষ্ম যে প্রাথমিক ভাবে মানুষের তা চোখে পড়েনা। আজ সকাল বেলায় সে নিজে যেমনটা ছিল, এই রাতের আঁধারে ঠিক তেমনটি আর নেই। একজন মানুষ তার জীবদ্দশায় টুকরো টুকরো ভাবে ছড়িয়ে থাকে বিভিন্ন সময়ের মাঝে। অতীতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। একেক সময়ে তার একেক রকম রূপ!

হৃদি আর আকাশ একে অপরের হাত ধরে আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে হালকা তালে পা ফেলে নেচে যাচ্ছিল। নাচের তালে তালে হৃদির মুখে ধীরে ধীরে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা জন্ম নিচ্ছিল। শীত-গন্ধী বাতাসে উড়ছিল ওর খোলা চুল।

'Then when the cops closed the fair

I cut my long baby hair

Stole me a dog eared map

And called for you everywhere’

বিভা উঠে দাঁড়ালো। ধীরে ধীরে হেঁটে সামির পাশের চেয়ারে এসে বসল। নরম ভাবে বললো,

– ‘সামি, প্রেমের ব্রেকআপ হয়। বন্ধুত্বের কখনো ব্রেকআপ হয়না। আমরা বন্ধু ছিলাম, বন্ধুই আছি।’

সামি কথাটা শুনেও না শোনার ভান করে চুপ করে রইলো। তার মনের ভেতর এখন গানের সুরটা বাজছে। এই গানের সুরটা কী অদ্ভুত করুণ! একদম মনে গিয়ে লাগে!

Have I found you?

Flightless bird, jealous, weeping

Or lost you?

সামির মনে হল প্রতিটা মানুষ আসলে একেকটি ফ্লাইটলেস বার্ড। যার উড়বার কথা ছিল, কিন্তু কোনো এক অভিশপ্ত কারণে কোনো দিন সত্যিকারের ওড়া হয়ে ওঠেনি। সে একটা বড় নিশ্বাস চাপল। তার মনটা দুর্দান্ত রকমের খারাপ। বিভা তার জীবন থেকে চলে গেছে। রুদ্রও চলে যাবে! একদিন সবাই চলে যাবে! মহাকালের দাপটে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবেনা।

বিভা উঠে এসে অভিজিৎকে বললো, ‘কী অভিজিৎ বাবু, নাচবেন নাকি?’

অভিজিৎ হাসে, ‘আমার দ্বারা ওসব হবেনা।’

বিভা জোর দিয়ে বলে, ‘আসুন, আসুন, আমি শিখিয়ে দেব।’ তারপর, শাল জামুনের গাছের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরছিল শিশির। রাত বাড়ছিল, আর আগুনের চারপাশে ঘুরে ঘুরে, ধীর লয়ে ওরা কজন নেচে যাচ্ছিলো।

রুদ্র গাইছিলো তখনও,

Have I found you?

Flightless bird, brown hair bleeding

Or lost you?

২১

‘শোন তোরা, আজকে সন্ধ্যায় আমাকে দেখতে আসবে।’ পিৎজার স্লাইসে একটা বড় কামড় বসিয়ে সামি বলল, খুব জরুরি গলায়।

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরো টেবিলে হাসির রোল পড়ে গেল। রুদ্র ডাকাতের মত হো হো করে হাসতে হাসতে বলল, ‘এত দিন জানতাম মেয়েদের দেখতে আসে। জীবনে প্রথম শুনলাম যে ছেলেদেরও দেখতে আসে। শালা মদন কোথাকার।’

ওরা বসে আছে সাত মসজিদ রোডের পিৎজা হাটের দোতলায়। টেবিলের ওপর দুইটা বেশ বড়সড় আকারের পিৎজা রাখা, সাথে কোকের গ্লাস। বাইরে তখন জানুয়ারির মিষ্টি দুপুর। রাজধানীর পথঘাট, রাস্তার ধারের গাছ, ফুটপাত অবশ্য ধূলোবালিতে ঢাকা, কিন্তু সেই ধূলোর আস্তরণের উপর যখন শীতের নরম রোদ এসে সোনালি ঝিলিক দেয় তখন এই শহুরে দুপুরটাকে সত্যিই ভারী মিষ্টি বলে মনে হয়। আজকেও ঠিক সেরকম একটি মিষ্টি দুপুরবেলা।

পিৎজা চিবোতে চিবোতে সামি ভয়ংকর চোখে তাকাল রুদ্রর দিকে, জাড় গলায় বলল,'দেখতে আসবে মানে মিট করতে আসবে।'

– 'কে?'

– 'মেয়ের পরিবার।'

– 'কোথায় আসবে?'

– 'পিঙ্ক সিটিতে মিট করবে বলছিল। এখন জানিনা ভেনু কি চেঞ্জ হইছে নাকি আগেরটাই আছে।'

আকাশ বলল, 'তোর প্রিপারেশন কী? মানে কীভাবে সাজগোজ করবি?'

অমৃতা কোকের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গম্ভীর গলায় বলল, 'পার্লারে যাবি?'

– 'ফেসিয়াল করবি? নাকি স্পা?' হৃদির প্রশ্ন।

সামির দুচোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল। সে বন্ধুদের দিকে ওই আগুন ঝরা দৃষ্টিটা তাক করে রেখেই বলল,

– 'আমার ওইসব কিসুই করা লাগবেনা, মাইয়া এমনিই আমারে দেইখা পছন্দ করব।'

হৃদি বলল, 'বলা যায়না, যদি রিজেক্ট করে দেয়? একটু সাজগোজ করে নিলে ভালো করবি। সেইফ সাইডে থাকলি।'

– 'জীবনেও রিজেক্ট করবনা।

– 'এত অহংকার ভালো না।

– 'অহংকারের কিছু নাই, আচ্ছা যা বেট ধরলাম মাইয়া আমারে পছন্দ করলে তুই আমারে দশ হাজার টাকা দিবি আর পছন্দ না করলে আমি তোরে দিব।'

– 'দশ হাজার কেন?এত টাকা নাই আমার।'

– 'তাহলে আট।'

– 'আট টাকা?'

– 'আট হাজার।'

– 'না আট টাকা হইলে রাজি আছি।'

– 'ফকিরনী কোথাকার।'

– 'মাইয়া দেখতে কেমন?' রুদ্রর প্রশ্ন।

সামি মহা উৎসাহ নিয়ে বলল,'মেয়ে তো মামা সেইরকম সুন্দর। আমার মনে হচ্ছে ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটার সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে। মানে সেইরকম একটা ফিলিংস হচ্ছে মনে মনে, বুঝছিস?'

হৃদি ভেংচি কাটল, 'শখ কত দ্যাখ না, আহা! ঢাকা শহরের সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটার বিয়ে হবে ঢাকা শহরের সবচেয়ে বান্দর ছেলেটার সাথে। জোশ তোহ!

সামি কঠিন চোখে একবার হৃদিকে দেখে নিয়ে মোবাইলের ইন্সটাগ্রাম অ্যাপ খুলল। একটা ছবি খুঁজে বের করে নিয়ে মোবাইলটা বন্ধুদের মুখের সামনে মেলে ধরে বলল, 'এই দ্যাখ।'

ছবির দৃশ্যপট দেশের বাইরের। ইওরোপ অথবা আমেরিকার কোনও এক উন্নত দেশের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। পেছনে একটি গম্বুজ ওয়ালা লাল ইটের বিল্ডিং। আশেপাশে সাদা চামড়ার লোকজন দেখা যাচ্ছে। পরিষ্কার, ছিমছাম রাস্তায় দু একটা গাড়ি চলছে। মেয়েটির চোখে সানগ্লাস। পরনে হাঁটু অবধি ঝুলে থাকা একটি ছোট জামা। হাতে ব্যাগ। উঁচু হিলের জুতো। সিল্কের মত মসৃণ খোলা চুল। হৃদি আর অমৃতা হামলে পড়ে ফোনটা ছিনিয়ে নিল সামির হাত থেকে। হৃদি মিনিট দুয়েক সময় নিয়ে পরখ করল ছবিটা। তারপর বিস্ময়ের গলায় অমৃতাকে বলল, 'দ্যাখ না, এই মেয়ের তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্র্যান্ড! সুন্দর হইছে ব্র্যান্ডের জিনিস ইউজ কইরা। আসলে তো দেখতে পেত্নী।

সামি ফোড়ন কাটল,'তোদের এত হিংসা কেন বলতো?'

অমৃতা বলল, 'না, হৃদি ঠিকই বলছে। এই মেয়ের সারা গায়ে ব্র্যান্ড। তবে দেখতেও ভালো।'

হৃদি গলায় পূর্বের বিস্ময় ভাবটা বজায় রেখেই অমৃতাকে বলল, 'হাতে লুই ভিটনের ব্যাগ। বুঝতেছিস কিছু?'

আকাশ অমৃতার হাত থেকে ফোন কেঁড়ে নিয়ে ছবিটা দেখল। হৈ হৈ করে বলে উঠল, 'আরে, সুন্দর তো! সত্যি মিস ঢাকা মনে হচ্ছে।'

হৃদি তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, 'এর থেকে আমিও অনেক সুন্দর আছি ভাই, শুধু দামি জিনিস গায়ে লাগাইলেই সুন্দর হয়না।'

সামি ক্ষেপে গেল কথাটা শুনে, 'নিজের চেহারা কখনো আয়নায় দেখছস?'

প্রশ্ন শুনে হৃদির চেহারার রং পাল্টে গেল। আকাশ ওর পাশেই বসে ছিল। হৃদির মুখের পাল্টানো রংটা খুব সহজেই ধরতে পারল সে। হাত বাড়িয়ে হৃদির হাতটা আলতো করে ছুঁয়ে দিয়ে বলল, 'বাদ দে তো, এই শালার মাথা ঠিক নাই। ব্রেকআপ হইছে এক সপ্তাহও হয়নায়। ওর মাথা আউট। কী বলতেছে নিজেও জানেনা।'

হৃদি রেগেমেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হয়ে আসার আগেই তার মুখখানা অকস্ম্যাৎ হা অবস্থায় স্থির হয়ে গেল, দৃষ্টি গেল থমকে। বন্ধুরা তার দৃষ্টি অনুসরণ করল। দেখা গেল খয়েরি রঙের সোয়েটার পরে লম্বা ছিপছিপে দেহের এক ছেলে হাসি হাসি মুখে তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে। ছেলেটাকে ওরা সবাই চেনে, এই ছেলের নাম রবিন।

অমৃতার মুখ দিয়ে বাক্যটা না চাইতেও বের হয়ে আসল, ‘এই শালা এইখানে কী করে?’

রবিন টেবিলের কাছাকাছি এসে মুখে তেলতেলে হাসি নিয়ে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলল, ‘কী খবর তোমাদের?’

বন্ধুরা কেউ কোনো কথা বলছিল না। সবাই হতভম্ব হয়ে চেয়ে ছিল রবিনের দিকে। হৃদির হা হওয়া মুখটা তখনো হা হয়েই ছিল। রবিন ওর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি কেমন আছ?’

হৃদি কথা বলল অনেক কষ্টে, ‘এইতো, তুমি এখানে?’

বন্ধুদের সূচালো দৃষ্টিটা তখন রবিনকে একটু অপ্রস্তুত করে তুলেছে। এরা কেউ কোনো কথা বলছে না, সবাই হিংস্র চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। যেন এখুনি চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। সে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘এসেছিলাম এক কলিগের সাথে। তোমার ফোন বন্ধ কেন?’

হৃদি এবার পরিষ্কার গলায় বলল, ‘নম্বর বদলে ফেলেছি, তাই।’

রবিন বাকি বন্ধুদের দিকে একবার অস্বস্তি নিয়ে তাকাল। বললো, ‘ইয়ে, হৃদিতা, তোমার সময় হবে? একটু কথা বলতাম?’

অমৃতা এবার মা মা গলায় বলে উঠল, ‘যা বলার এখানেই বল, আমাদের সামনে।’

রবিনের মুখে যেন চুনকালি পড়ল। একরোখা ভঙ্গিতে বলে উঠল, ‘তুমি কথা বলছ কেন আমাদের মাঝখানে? হৃদিতাকে ডিসিশন নিতে দাও। ইউ আর নট হার মম!’

– ‘হৃদি, ওকে বল যা বলার আমাদের সামনে বলতে।’ ঠাণ্ডা গলায় হুকুম করল অমৃতা।

হৃদি পড়ল ভীষণ বিপাকে। বেশ কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল সে। তারপর কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘যা বলার সবার সামনেই বল।’

– ‘এই জন্যেই আমি তোমার সাথে ব্রেকআপ করেছিলাম। তুমি নিজের বুদ্ধিতে চল না, বন্ধুদের কুবুদ্ধিতে চল।’ রাগটা আর চেপে রাখতে পারল না রবিন।

বন্ধুদের মুখে অস্বস্তি খেলছে তখন। আশেপাশের টেবিলের লোকজন উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে দলটার দিকে। বন্ধুরা অস্বস্তিতে কে কী করবে বুঝে উঠতে পারছেনা। রুদ্র আর আকাশ কিছু করার না পেয়ে মনোযোগ দিয়ে পিৎজা খেতে লাগল। সামি কোকের গ্লাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। শুধু মাত্র অমৃতা নাকের পাটা ফুলিয়ে কঠোর চোখে তাকিয়ে রইল রবিনের দিকে।

আকাশ খানিক বাদে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, ‘হৃদি, তুই চাইলে শুনে আসতে পারিস ও কী বলতে চায়। উই ওন্ট মাইন্ড।’

হৃদি কুঁকড়ে যাওয়া চোখে অমৃতার দিকে তাকাল। অমৃতা আঙুল তুলে শাসালো ওকে, ‘তুই কোথাও যাবিনা! এখানেই বসে থাক।’

রুদ্র বলল, ‘আচ্ছা আমি একটা জিনিস বুঝতেছিনা। ও যদি হৃদির সাথে জরুরি কিছু বলতে চায় তাতে তোদের সমস্যা কী? হৃদি কথা বলবে কি বলবেনা সেটা ওর উপরে ছাইড়া দে।

– ‘তোরা কি ভুলে গেছিস কক্সবাজারের সেই রাতটার কথা? হৃদিরে এই রবিনের বাচ্চা ক্যামনে কাঁদাইছিল?’ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল অমৃতা।

রবিন বিস্মিত গলায় বলে উঠল, ‘আরে! এই মেয়েতো আমারে গালাগালি করছে রীতিমতো! হৃদি তুমি কিছু বলবে না?’

হৃদিকে দেখে মনে হচ্ছিল সে এখুনি কেঁদে দেবে। অমৃতার আগুন গরম চোখের সামনে পড়ে সে কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারছেনা। রবিনের প্রতি যে তার মনের মধ্যে কোনো প্রেমানুভূতি এখনও অবশিষ্ট আছে তা কিন্তু নয়। বরং এই ছেলেকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার অদম্য ইচ্ছা বুকের মধ্যে আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলে আসছে অনেক দিন যাবৎ। ব্রেকআপের পর কয়েক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই যে এই ছেলে নতুন বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছিল সেই ঘটনাটা হৃদি হাজার চেষ্টা করেও ভুলতে পারেনি। না, ভালোবাসা নেই, বরং প্রতিশোধের আগুন আছে। হয়তো অমৃতা যা করছে একদম ঠিক করছে। কিন্তু হৃদির মনটা যে বড়ই নরম! হাজার চেষ্টা করেও সে মানুষের সাথে কঠোর হতে পারেনা। এইযে ড্রাইভার বাঁদরের ওপর ভয়ংকর রেগে গিয়ে বাবার কাছে নালিশ করে চাকরি থেকে ভাগিয়ে দিল, সেই বাঁদর যখন কদিন আগে ফোন দিয়ে কাকুতি মিনতি করতে লাগল এই বলে যে, আপা চাকরিটা আমার বড়ই প্রয়োজন, আপনি প্লিজ আমার চাকরি ফিরায়ে দেন। হৃদি তখন সেই

করুণ আকুতি শুনে একদম পানির মতো গলে গেলো। বাবাকে বলে চাকরিটা আবার পাইয়ে দিল বাঁদরকে। এখন সে বুঝতে পারছে মন, প্রাণ আর বুদ্ধি দিয়ে যে রবিনের সাথে তার সীমাহীন কঠোর হওয়া উচিৎ। বাজে ব্যবহার করে ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেয়া উচিৎ। কিন্তু পারছেনা। কিছুতেই পারছেনা হৃদি। নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে। বিব্রত হয়ে যাচ্ছে।

অনেক কষ্টে অমৃতার অগ্নি দৃষ্টি উপেক্ষা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'আচ্ছা আমি আসছি। কী বলবে বল।'

হৃদি আর রবিন হেঁটে একটু দূরে সরে যেতেই অমৃতা দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠল, 'এই হারামজাদারে আমার কী যে করতে মনে চাইতাছে!'

সামি বলল, 'চল পিটাই।'

অমৃতা সায় দিল, 'চল দোস্ত, আমার অনেক দিনের শখ রবিনরে একদিন ইচ্ছা মতো পিটামু।'

রুদ্র বলল,'শোন ওভার রিএক্ট করিস না। একটু কথা বললে কী হয়? ওরা তো আবার কোনো রিলেশনশিপে যাচ্ছেনা, তাইনা?'

আকাশ তাল মেলালো রুদ্রর সাথে, 'সেটাই, মামা তোরাও না একটু বেশি বেশি করিস। দুইটা কথা বললে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাইব?'

হৃদিতা আর রবিন তখন একটি দুই চেয়ারের টেবিল নিয়ে বসেছে। রবিন হাত নেড়ে নেড়ে গম্ভীর ভাবে হৃদিকে কিছু একটা বলছে। হৃদি মন দিয়ে শুনছে তার কথা। সামি ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'এই এসহোলের বাচ্চারে দেখলেই আমার গা কামড়ায় ক্যান?'

'একদম রাইট। আমারও গা কামড়ায়।' সহমত ব্যক্ত করল অমৃতা।

সামি নিজের এক হাতের পাঁচ আঙুল মুষ্টিবদ্ধ করে অপর হাতের তালুতে কিল মারতে মারতে বলল, 'দাঁড়া এসহোলটাকে মজা দেখাচ্ছি।'

– 'সামি প্লিজ, একটু শান্ত হয়ে বয়। কোনো ঝামেলা করিস না হুদাই।' আকাশ বলল গম্ভীর গলায়।

সামি কারো কথা কানে না নিয়ে এগিয়ে গেল হৃদিদের টেবিলটার দিকে। দাঁড়ালো টেবিলের সম্মুখে, রবিন আর হৃদির মাঝ বরাবর। ওকে দেখা মাত্র রবিন তারস্বরে বলে উঠল, 'কী চাই?'

হৃদিকে বিব্রত দেখাল। সে সামির কনুইয়ে একটা হাত রেখে আকুলিবিকুলি হয়ে বলল,'দোস্ত যা তুই, আমি আসতেছি এখনই।'

– 'তুই কি বলছিস ওরে লাস্ট ট্যুরে আমাদের মধ্যে কী হইছিল?'

অপ্রাসঙ্গিক ভাবে প্রশ্নটা করে বসল সামি।

হৃদি থমকে গেল। রক্তশূন্য দেখাল তার মুখ। এই ছেলে বলছে কী এসব? মাথা ঠিক আছে তো? হৃদির হতভম্ব, ভীত চাউনিটা সম্পূর্ণ ভাবে অগ্রাহ্য করে সামি খুব স্বাভাবিক গলায় রবিনকে বলল, 'ও কি তোমাকে কিছু বলেছে?'

রবিনের চোখে তখন একাধারে খেলছে কৌতূহল, উদ্বেগ এবং বিরক্তি।

– 'না, ও আমাকে কিছু বলেনি।'

হৃদি উঠে দাঁড়ালো চট করে। সামির বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'দূর হ এখান থেকে। দূর হ বলতেছি।' ধাক্কা খেয়েও সামি নির্বিকার। মুখে একটা বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলে সে ডাঁটিয়াল গলায় রবিনকে বলল, 'উই কিসড!'

রবিনের মুখের চামড়া ঝুলে গেল। চোখ হয়ে গেল গোল গোল বোতামের মত। মুখ থেকে ছিটকে আসলো শব্দটা, 'কী?' হৃদি উঠে এসে সামির পিঠে উপর্যুপরি থাপ্পড় মারতে মারতে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা! তুই যা এখান থেকে।'

সামি চড় থাপ্পড় সহ্য করে নিয়ে, রবিনকে অকপটে বলল, –'ইয়াহ, উই ডিড ইট। আস্ক হার। ইটস ট্রু!'

– 'ঘটনা কি সত্য?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রবিন।

রাগে দুঃখে অপমানে হৃদির চোখে পানি চলে আসছিল। সে ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলল। ক্ষীণ ভাবে বলল, 'রবিন তুমি যাও, পরে কথা বলব তোমার সাথে।'

রাগে গজগজ করতে করতে জায়গাটা ছাড়ল রবিন। যাবার আগে হাতের আঙুল তাক করে শাসানোর ভঙ্গিতে বলে গেল,'তোমার এই বন্ধুদের জন্য একদিন তোমার সর্বনাশ হবে। লিখে দিলাম আমি।'

রবিন যাবার পর হৃদি তেড়ে এসে সামির শার্টের কলার চেপে ধরল, 'তুই এই কুত্তামিটা কেন করলি?'

অন্য বন্ধুরা ততক্ষণে উপস্থিত হয়ে গেছে ঘটনাস' লে। সামি নিজের শার্টের কলার হৃদির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে হিসহিসে গলায় বলল, তোমার জন্য আমার ব্রেকআপ হইছেনা? মনে আছে আমার সব। আমার ব্রেকআপ করায়ে তুমি খুব প্রেম করবা মনে করছ? জীবনেও না।'

হৃদি হতভম্ব হয়ে গেল কথাটা শুনে। তার হাতের মুঠো আলগা হয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে। চোখ হয়ে উঠল জলসিক্ত। আশ্চর্য শীতল গলায় বলল, 'আমার জন্য তোর ব্রেকআপ হইছে?'

– 'তা নয় তো কী?

অমৃতা হৃদির পিঠে একটা হাত রেখে সান্ত্বনার গলায় বলল, 'আরে দোস্ত, ও মজা নিতেছে। পাত্তা দিস না।'

হৃদির চোখের কার্নিশে জল জমে উঠেছিল এক দু ফোঁটা। রুদ্র তাই দেখে একটা ধমক দিয়ে উঠল, 'কিছু হওয়ার আগেই চোখ দিয়া পানির কল ছাইড়া দেস কেন মামা? মানে সমস্যা কী তোর?

হৃদি কাঁপা গলায় বলল, ‘কিছু হয়নায় না? তোদের মনে হচ্ছে কিছু হয়নায়? ও আমাকে কত বড় বেইজ্জতিটা করল, এরপরও তোরা বলবি কিছু হয়নায়?’

– ‘এখানে এত বেইজ্জতির কী আছে?’ সামি নির্বিকার।

– ‘তুই আমাদের ফ্রেন্ডশিপকে অপমান করছিস।’

– ‘অপমানের কী আছে?’

– ‘খুব খারাপ কাজ করলি তুই। জীবনে কোনও দিন ক্ষমা করব না তোকে। দেখে নিস।’

সামি তাজ্জব বনে গিয়ে বলল, ‘আজিব কারবার! এমন সিনেমা করার মানে কী?’

– ‘আরেকটা কথা বললে তোর মুখে থুতু মারব আমি, কুত্তার বাচ্চা!’

হৃদির ধমক শুনে সামি এবার একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখল বেশিরভাগ লোকজনের দৃষ্টি তাদের দলটার দিকেই নিবদ্ধ। সে চাপা গলায় বলল, ‘বাপ মা তুলে গালি দেয়া কিন্তু ঠিক না।’

– 'তোরে শুধু বাপ মা না, একশো গুষ্টি তুইলা গালি দিলেও আমার শান্তি হবেনা। তুই যদি আরেকটা কথা বলছিস এখন, আল্লাহর কসম আমি সবার সামনে তোর মুখে থুতু মারব।'

এটুকু বলে হৃদি টেবিলের ওপরে রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে তুলে নিল। বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

– 'কিন্তু দোস্ত, আজকে তো তোর আমাদেরকে রান্না করে দেয়ার কথা ছিল।' হৃদির পথ আটকে দাঁড়িয়ে বলল রুদ্র।

– 'চল, রান্না করতে হইলে এখনই যাইতে হবে। রাতে আমার দাওয়াত আছে।' কথাটা বলা শেষ করে হৃদি আর দাঁড়াল না।

নিচে নেমে আসার পর রুদ্র বলল, 'আমার একটু নীলক্ষেত যাইতে হবে। তোরা কেউ যাবি?'

আকাশের যেতে হবে ভার্সিটি। বিকেল তিনটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত পর পর দুটা ক্লাস নিতে হবে তার। অগত্যা আকাশের আর অন্য কোনো দিকে যাওয়া হচ্ছেনা আজ। ঠিক হল সামি আর হৃদি বসুন্ধরার এপার্টমেন্টে যাবে। অমৃতা আর রুদ্র যাবে নীলক্ষেত। সামির সাথে গাড়ি ছিল। হৃদি গাড়িতে উঠে বসেই একচোট শাসিয়ে নিল সামিকে, 'এই শোন, আমার সাথে তুই কোনো কথা বলবিনা। কথা বললেই মুখে থুতু মারব।'

– ‘সেই তখন থেকে তুই খালি থুতু মারব, থুতু মারব করতেছিস কেন? সমস্যা কী তোর? মেন্টাল হয়ে গেছিস?’

– ‘মেন্টাল আমি না, তুই! এখন চুপ কর নইলে থুতু খাবি!’

সামি গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে বিড়বিড় করল, ‘আজিব কারবার।’

.

রিকশায় পাশাপাশি বসে আছে ওরা দুজন। রুদ্র আর অমৃতা। শীতের খরশান বাতাসে রুদ্রর আউল বাউল চুল গুলি উড়ছিল।

– ‘তোর চুল ঠিক কর। আমার নাকে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।’

রুদ্র পকেট থেকে রাবার ব্যান্ড বের করে সময় নিয়ে নিজের চুল গুলো বাঁধল। আফসোসের গলায় বলল, ‘সামির তো মাথা পুরাই আউট হয়ে গেছে দোস্ত। কী হবে এখন ওই শালার?’

– ‘আসলেই। পুরা পাগল হয়ে গেছে। শোন আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে।’

– ‘কী প্ল্যান?’

– ‘পরশুদিন সামির বার্থডে। মনে আছে?’

– ‘ও, হ্যাঁ তাই তো। ভুলে গেছিলাম।’

– 'আমি ভাবতেছি ঐদিন ওরে একটা সারপ্রাইজ দিব।'

– 'কী রকম সারপ্রাইজ?'

– 'আমরা তো রাত বারোটার সময় কেক কাটবই। তো আমি ভাবতেছি ওর আব্বা আম্মাকেও ইনভাইট করব।'

রুদ্র চমকে উঠল, 'আব্বা? মানে সামির আব্বা?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'মাথা খারাপ!'

– 'মাথা খারাপের কী আছে?'

– 'ওই লোকটা কী ভয়ংকর রাগী তুই জানিস না? দেখলেই আমার ভয় লাগে। তাছাড়া সামির সাথে ওর আব্বার ঝামেলা চলতেছে।'

– 'আরে ঝামেলা চলতেছে বলেই তো আমাদেরকে কাজটা করতে হবে। দোস্ত আমাদের উচিৎ সামির সাথে এখন ওর ফ্যামিলির প্যাঁচআপ করায় দেয়া। দ্যাখ বিভার সাথে ওর যা ছিল তা তো এখন শেষ। শুধু শুধু ছেলেটা নিজের পরিবারের কাছ থেকে দূরে থাকবে কেন?'

– 'আমি জানিনা। আমার ওর আব্বারে অনেক ভয় লাগে।'

– 'তোদের কিছু করা লাগবে না। যা করার আমিই করবো।'

রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে অমৃতা বলল, ‘চা খাবি?’

– ‘নাহ ইচ্ছা করতেছেনা।’

– ‘বিড়ি খাবি?’

– ‘ইচ্ছা নাই এখন।’

– ‘বিড়ি খাইতে ইচ্ছা করতেছে না, চা খাইতে ইচ্ছা করতেছেনা,তাহলে কী করতে মন চাইতেছে তোর? এতো বোরিং কেন তুই?’

রুদ্র ওর এক আঙুল সমান দাড়ি গুলো হাতড়ে হাতড়ে চিন্তিত ভাবে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, ‘ইয়ো ম্যান! কী করতে মনে চাইতেছে তোমার?’ প্রায় বিশ তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগল তার উত্তরটা খুঁজে বের করতে। খুঁজে পেতেই বত্রিশ দাতঁ বের করে হেসে বলল,’মেক আউট করতে মনে চাইতেছে দোস্ত!’

– ‘সব সময় খবিশ কথা বলিস কেন?’ ধমকে উঠল অমৃতা।

– ‘খবিশ কথা হবে কেন? তুই জিজ্ঞেস করলি কী করতে ইচ্ছা করতেছে। যা সত্যি তাই বললাম। ইশ যদি একটা গার্লফ্রেন্ড থাকত আজকে। তাইলে চিন্তা কর এইযে শীত শীত দুপুর…’

অমৃতা ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘এসব কথা মনীষাকে গিয়ে বল না, আমাকে বলতেছিস কেন?’

– 'ছিঃ মনীষাকে ক্যামনে বলব। সব কথা তো সবাইরে বলা যায়না।'

অমৃতা ত্যাড়া চোখে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ক্যান, তোর তো মনীষার জন্য পিরিতির শ্যাষ নাই। যা গিয়া বল, মনের আশা পূরণ হইলেও হইতে পারে।'

– 'আরে না, ভালোবাসার মানুষকে কি অত সহজে এসব বলা যায় নাকি?'

– 'ভালোবাসা না, ছাই!'

– 'ভালোবাসা না?'

– 'অফকোর্স ভালোবাসা না।'

– 'লাইফে আমি দুইবার সিরিয়াস ক্রাশ খাইছি। প্রথমবার কলেজ লাইফে। আর দ্বিতীয়বার এই বুড়া বয়সে। ছাত্র পড়াইতে গিয়া।'

অমৃতা চোখ কপালে তুলে বলল, 'কলেজ লাইফেরটা সিরিয়াস ছিল নাকি?'

– 'মজা নেও?'

– 'মজা নেয়ার কী হইল? আজিব, নরমাল একটা প্রশ্ন করলাম!'

রিকশা আটকে আছে তখন শাহবাগের সিগন্যালে। একটা বারো কি তেরো বছর বয়সী টোকাই মেয়ে হাতে গোলাপের তোড়া নিয়ে ওদের রিকশার কাছে এসে দাঁড়ালো। রুদ্রর দিকে গোলাপের তোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাইয়া, ফুল কিনেন আপার জন্য। আপা চুলে লাগাইব।'

– ‘এই আপার কি চুল আছে মাথায়?’ চোখ কটমটিয়ে বলল রুদ্র।

বাচ্চা মেয়েটা ফাজিল হেসে প্রত্যুত্তর করল, ‘তাইলে আপনে পইরেন, আপনের মাথায় তো অনেকডি চুল।’

অমৃতা হো হো করে হেসে উঠল। রুদ্র মেয়েটাকে মিনতির গলায় বলল, ‘অন্যদিকে যাও বাবু, এখন আমার ফুল কিনার মুড নাই।’

বাচ্চাটা ভেংচি কেটে দৌড়ে পালাল। পেছন থেকে একটা সিএনজি বিনা কারণে হর্ন দিয়ে যাচ্ছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। রুদ্র ঘাড় ঘুরিয়ে সিএনজি ড্রাইভারকে কড়া গলায় বলল, ‘কী ভাই, সমস্যা কী? নতুন নতুন হর্ন দেয়া শিখছেন নাকি?’

ড্রাইভারের বয়স পঞ্চাশের ধারে কাছে হবে। মাথায় টাক। চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি। চোখের চাউনি দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের উপর তার সীমাহীন রাগ। সে রুদ্রর ধমক শুনে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘তাতে তুমার কী? আমার হর্ন দিতে মনে চাইতেছে তাই দিতাছি।’

এ পর্যায়ে আশেপাশের উৎসুক জনতাদের একজন হুড তোলা রিকশা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল, ‘কী কন মিয়া, মনে চাইলেই আপনে হর্ন দিবেন নাকি? দ্যাশটা কি আপনের একার সম্পত্তি নাকি?’

রুদ্র হতাশ গলায় অমৃতাকে বলল, ‘আমাদের দেশের লোকজন বুঝছিস ডিপ্রেশন থেকে এইসব করে। মানে নিজের মনে শান্তি নাই, তাই অন্যরেও শান্তিতে থাকতে দিবেনা। হুদাই প্যারা দিবে মানুষকে।’

– ‘হ ঠিকই আছে। আমি ভাল নাই, তুমি কেন ভালো থাকবা মামা?’

– ‘ভালো থাকব ক্যামনে বল? আমরা তো ডেপ্রাইভড। সব কিছু থেকে ডেপ্রাইভড। এইযে মনে কর আমার মত একটা ইয়াং ছেলে ইচ্ছা থাকলেও গার্লফ্রেন্ডের অভাবে মেক আউট করতে পারতেছেনা। আমাদের জীবনে প্রেম নাই, সেক্স নাই, শালা কিছুই নাই।’

– ‘সেক্স আর প্রেম ছাড়াও পৃথিবীতে আরও অনেক জিনিস আছে।’

– ‘বেসিকই তো ঠিক নাই।’ রুদ্র উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছিল।

– ‘রুদ্র চুপ কর। অসহ্য লাগতেছে তোর এইসব কথা আমার।’

– ‘সত্য কথা বলতে গেলেই লোকে বলবে চুপ কর, চুপ কর! এ জন্যেই এই দেশের কিছু হবেনা।’

রাত নটায় বাড়ি ফিরে দেখা গেল পিতৃদেব ড্রয়িং রুমের সোফার ওপর ঠ্যাং তুলে বসে টিভিতে খবর দেখছেন। কোমরে ময়লা রঙের লুঙ্গি প্যাঁচানো। খালি গা। আকাশ আজকাল লোকটাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। মুখোমুখি পড়ে গেলেও চোখ তুলে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করেনা। সুযোগ পেলেই এমন সব অসভ্য কথাবার্তা বলে বসে যে আকাশের দিনটাই মাটি হয়ে যায়। আজকেও সে লোকটাকে না দেখার ভান করে ভেতরের ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। পেছন থেকে ডাক পড়ল অকস্মাৎ, ‘কী ব্যাপার? আজকাল কি বাপের খোঁজ খবর নেয়ার একেবারেই সময় হয়না?’

আকাশের পা আটকে গেল। ধীরেধীরে ঘুরে দাঁড়ালো সে। নতমুখে বলল, ‘খবর তো পাচ্ছিই রোজ। আলাদা ভাবে আবার কী খবর নিব?’

– ‘সারা দিন থাকা হয়েছে কোথায় শুনি?’

– ‘ক্লাস ছিল।’

– ‘এই মাস্টারির চাকরি ছেড়ে ভালো কোনও চাকরি খোঁজার কি চেষ্টা করা হচ্ছে?’

আকাশ চোখ তুলে তাকাল সামনে বসা মানুষটার দিকে। মানুষটার মুখের কালো চামড়ার ওপর নীল শিরা ভেসে আছে। চোখের রঙ মৃত প্রাণীর মত সাদা। দেখলেই মনে হয় এই লোক গভীর কোনও অসুখে ভুগছে। কীসের অসুখ লোকটার? শরীরের? নাকি মনের?

আকাশ স্তিমিত গলায় বলল, ‘আপাতত এই কাজটাই মন দিয়ে করতে চাইছি।’

– ‘সংসারের দিকে একটু খেয়াল করতে হবে তো নাকি? আমার তো ব্যাবসা বানিজ্য কিছুই নাই এখন। আমার পক্ষে এই সংসার টানা আর সম্ভব না। তোমাকেই দায়িত্ব নিতে হবে।’

– ‘সংসার?’ প্রশ্নটা করে আকাশ হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থাকে লোকটার দিকে।

– ‘সংসার নয়? এই সংসারের প্রতি তোমার কোনও দায়িত্ব নাই?’

আকাশের মুখ ঘেন্নায় বেঁকে যায়। তার খুব বলতে ইচ্ছে করে সংসার চালানোর মুরোদ না থাকলে সংসার করতে যাওয়া কেন? বউ মরার চল্লিশ দিনের মাথায় দ্বিতীয় বিয়ে করার সময় খেয়াল ছিল না যে নিজে একটা রাম অপদার্থ? যে লোক নিজের

সন্তানের ভরণ পোষণ দিতে পারেনা সে লাফিয়ে লাফিয়ে বিয়ে করতে যায় কোন মুখে?

আকাশ মাথা নিচু করে জায়গাটা থেকে সরে আসলো। ডাইনিং রুমের ওপর দিয়েই তার নিজের ঘরে যেতে হয়। ডাইনিং পার করার সময় আকাশ দেখল টেবিলের ওপর ঢাকনা দিয়ে খাবার রাখা আছে। ঝুমকি বসে আছে একটা চেয়ারে এবং ঝুমকির ঠিক পাশে একটি অচেনা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আড়ষ্ট ভাবে। ঝুমকির বাপের বাড়ির লোকজন এ বাড়িতে তেমন একটা আসেনা। তার কোনও বন্ধুবান্ধব আছে বলেও মনে হয়নি কখনও আকাশের। তাহলে এই মেয়ে কে? আকাশ ভালো মতো একবার তাকাল মেয়েটার দিকে। বয়স কত তা ঠিক প্রথম দেখায় ঠাওর করা যায়না। চোখে মোটা কাচের চশমা। লম্বা, পুরু এক বেণী ঝুলছে পিঠের ওপর। পরনে ঘিয়া রঙের সুতির সালওয়ার কামিজ। প্রচণ্ড রোগা। গায়ে একটু মাংস লাগলে হয়তো চেহারাখানা সুন্দর হলেও হতে পারত। আকাশকে দেখে সে লজ্জায় কেমন কাদা কাদা হয়ে গেল। আকাশ প্রশ্নবিদ্ধ চোখে ঝুমকির দিকে তাকাতেই ঝুমকি একটু অপ্রতিভ ভাবে বলল, 'ও আমার বোনের মেয়ে।'

– 'ও।' বলল আকাশ দায়সারা ভাবে।

ঝুমকি একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'কটা দিন থাকবে আমার সাথে।'

আকাশের পা দুটো নিজের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'এখানে থাকবে?

– 'হ্যাঁ, আসলে ওর বাড়িতে একটু ঝামেলা চলছে তো, তাই আমার কাছে নিয়ে এসেছি।'

আকাশ আর কিছু না বলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যেই ঘাড়ে চাপতে এসেছে। তার বাপের তো নিজের বউকে খাওয়ানোর সামর্থ্য নেই। বউয়ের বোনের মেয়েকে খাওয়াবে কোত্থেকে? তাছাড়া এই বাসায় মাত্র দুটো বেডরুম। একটা আকাশের, অন্যটা তার পিতা এবং পিতার স্ত্রীর। এই মেয়েটা রাতের বেলা কোথায় শোবে? বসার ঘরে কোনও প্রাইভেসি নেই। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে কি ওরকম পথের ওপর থাকতে দেয়া যায়? বিরক্তি আর দুশ্চিন্তায় কিছু ভালো লাগছিলনা আকাশের। দায়িত্ব! সম্পর্ক গুলোতে দায়িত্ব, কর্তব্য বোধের উৎপত্তি হয় ভালাবাসা থেকে। মায়া মমতা থেকে। যেখানে মনের টান নেই, ভালোবাসা নেই সেখানে দায়িত্ব ব্যাপারটা তো কেবল মাত্র বোঝা বই অন্য কিছু নয়! কেন এই বোঝা ঘাড়ে চাপাবে সে? ঝুমকি তার কে হয়? নাহ লোকটার সাথে এ ব্যাপারে সরাসরি কথা বলতে হবে। গেল মাসেও বাজার খরচ বাবদ আকাশের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নেয়া হয়েছে। ইলেক্ট্রিসিটি বিলও সে নিজের পকেট থেকে দিয়েছে। পিতৃদেবের বউ নিয়ে এত সংসার করার ইচ্ছা থাকলে নিজের পয়সায় করবে। আকাশের খাটনির পয়সা দিয়ে এসব ঢং করা চলবেনা। ঝুমকির জন্য সে আর একটা গাঁটের পয়সাও খরচ করবেনা। তার ওপর আবার উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বোনের মেয়ে। এই মেয়েকে খাওয়াবে কে? ইশ! বাড়ি ফিরতে তার ভালো লাগেনা একেবারেই। যতক্ষণ বন্ধুদের সাথে থাকে ততক্ষণ মাথার ভেতর দুশ্চিন্তার পোকাগুলো ঘুমিয়ে থাকে। আর বাড়িতে ঢোকা মাত্র সে একজন গোমড়ামুখো রগচটা মানুষে রূপান্তরিত হয়।

দরজায় ধাক্কা পড়ছিল। আকাশ দরজা খুলে ঘাড় বের করে দেখল ঝুমকি দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে একটা সবুজ সুতির শাড়ি। কপালের কাছের চুলগুলিতে এর মাঝেই পাক ধরেছে। সেই পাক ধরা চুলে জবজবে তেল। মনে হচ্ছে তেল দিয়ে গোসল করেছে সে। তার মুখ ভর্তি পান। পান চিবোতে চিবোতে সে বলল, ‘খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।’

– ‘আসছি। যান আপনি।’ খুব সংক্ষেপে কথাটা বলে দরজা আটকে দিল আকাশ। আজকাল একটু কেমন বিস্ময় বোধ হয় তার ঝুমকিকে দেখে। এই মহিলার সাথে সে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এক টানা দুর্ব্যবহার করে আসছে, এরপরেও মহিলা তার সাথে গায়ে পড়ে কথা বলতে আসে কেন? এর কি আত্মসম্মান বোধ বলতে কিছু নেই? তার বাপও যে এর সাথে ভালো ব্যবহার করে তা কিন্তু নয়। রোজ রাতে নিষ্ঠুর ভাবে পেটায়। এতসব সহ্য করে মহিলা এখানে মুখ বুজে পড়ে আছে কেন? চলে গেলেই তো পারে!

খাবার টেবিলে তখনও রোগা মেয়েটা বসে ছিল। গালে হাত দিয়ে আকাশকে দেখেই উঠে দাঁড়াল তটস্থ ভাবে। যেন আকাশ তার স্কুলের মাস্টার। ঘরে প্রবেশ করা মাত্র দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ঝুমকি রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ওঠা গরম ডালের বাটি নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখতে রাখতে বলল, ‘ডাল রান্না করেছে তারা।’

– ‘তারা?’ আকাশ চোখ তুলে প্রশ্ন করল, ঝুমকিকে।

ঝুমকি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘হ্যাঁ তারা। আমার বোনের মেয়ে।’

আকাশ চামচ দিয়ে প্লেটে ভাত তুলে নিতে নিতে মেয়েটিকে বলল, ‘আপনি চাইলে বসতে পারেন। কোনও পানিশমেন্ট দেয়া হয়নি আপনাকে যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

মেয়েটি এই কথা শুনে আরও কেমন চুপসে গেল। বিব্রত ভাবে খালার দিকে তাকাল একবার। ঝুমকি বলল, ‘বসে পড়। দাঁড়িয়ে কেন?

২২

ফ্ল্যাটের ভেতর ঢুকে হৃদি নাক কুঁচকে বলল, ‘এত নোংরা হয়ে মানুষ কীভাবে থাকে? সারা বাসায় কেমন বিচ্ছিরি একটা গন্ধ।

– ‘কই আমি তো কোন গন্ধ পাচ্ছিনা। তোর নাকে সমস্যা।’ সামি বলল, নির্বিকার গলায়।

হৃদির চোখ মুখ থেকে ঝরছে বিরক্তি। তার মেজাজ মর্জি এমনিতেই ভালো নেই। রবিনের সামনে একটু আগে সামি যে কান্ডটা করে এসেছে তা সে কিছুতেই ভুলতে পারছেনা। সামিকে দেখলেই তার গলা টিপে ধরতে মনে চাইছে। তার ওপর এরকম অগোছালো, ধূলো বালিতে ভরা ফ্ল্যাটে এসে সারা গা কেমন ঘিনঘিন করে উঠল। সে হ্যান্ড ব্যাগটা সোফার ওপর ছুঁড়ে ফেলে রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিক দেখতে লাগল। ফ্ল্যাটটা ছয় তলার ওপরে হওয়ায় বেশ ভালোই আলো বাতাস খেলে। দিনের বেলা আর আলগা বাতি জ্বালানো লাগেনা। খোলা জানালা আর বারান্দা দিয়ে যতটুকু আলো আসে, তাতেই ফকফক করে চারপাশ। ডাইনিং টেবিলের ওপর রাজ্যের জিনিস পত্র। চায়ের কাপ পড়ে আছে আধোয়া অবস্থায়। কলা খেয়ে কলার চোকলা টি পর্যন্ত ফেলা হয়নি। বিস্কুটের টিনের ঢাকনা খোলা। সারা টেবিলে ছড়িয়ে আছে বিস্কুটের গুড়ি। ঘরের টাইলসের মেঝে হয়ে আছে আঠালো এবং ধূলোটে। পা ফেলতেই বোঝা যাচ্ছে গত এক সপ্তাহ যাবৎ এই মেঝে সাফ করা হয়নি।

হৃদি মাথায় হাত দিয়ে ডাইনিং এর চেয়ারে বসে পড়ল, ‘আল্লাহ! এরকম নোংরা জায়গায় আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, আমার এখুনি দম আটকে আসতেছে। তোদের একটা ছুটা বুয়া ছিল না? ঘর মুছে দিত যে, সে কোথায়?’

– ‘ভাগছে।’ সামি উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল।

– ‘ভাগছে কেন? বেতন দিস নাই?’

– ‘বেতন তো দিছি। কিন্তু বেটি তো আমার কাছে মোবাইল চায় তার পোলার জন্য।

– ‘তা দিতি একটা মোবাইল।’

– ‘ট্যাকা কি গাছে ধরে? আমি নিজেই এক বছর ধরে ফোনের মডেল চেঞ্জ করতে পারতেছিনা। প্রতিদিন কত নতুন নতুন ইলেকট্রনিক্সের আবির্ভাব হচ্ছে দুনিয়ায়। শুধু চোখ দিয়া চায়ে চায়ে দেখতেছি, কিনতে পারতেছিনা। আর ওই বেটিরে মোবাইল কিনা দিব?’

হৃদি চিন্তিত গলায় বলল, ‘কিন্তু তোদের বাসার তো খুব খারাপ অবস্থা। আমার দ্বারা এই নোংরা সাফ করা সম্ভব হবেনা। দাঁড়া দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় নাকি।

কিছুক্ষণের মাঝেই হৃদি একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। তাদের বাসায় যে ছুটা বুয়াটা কাজ করে তাকে ফোন করে পাওয়া গেল। হৃদির প্রস্তাবে চট করে রাজিও হয়ে গেল সে। কিন্তু গাড়ি ভাড়া বাবদ আলাদা টাকা দেয়া লাগবে, সেই সাথে সার্ভিস চার্জ তো আছেই। বুয়া জানালো ঘন্টা খানেক সময় লেগে যাবে তার এখানে পৌঁছুতে। এর মাঝে হৃদি রান্নার কাজ শুরু করে দিল। তার পরনে ‘ইয়েলো’ থেকে কেনা ছয় হাজার টাকা মূল্যের একটি কুর্তি ছিল। এই জামাটি তার বড়ই পছন্দের। হালকা সবুজ রঙের সুতি কাপড়ের ওপর সবুজ সুতোর কাজ করা। জামার ঢংটাও চমৎকার। সামনের দিকে খাটো, পেছন দিকে পায়ের গোড়ালি ছোঁয়া লম্বা। এই সাধের জামা পরে এখন সে রান্না করবে? মশলার একটু দাগ লেগে গেলেই তো সর্বনাশ।

সামি ড্রইং রুমের সোফায় আধশোয়া অবস্থায় হেলান দিয়ে বসে টিভি দেখছে। টিভিতে চলছে ‘স্ট্রেঞ্জার থিংগস’ সিজন থ্রি, এপিসোড টু। হৃদি সেখানে উপস্থিত

হয়ে বলল, ‘এইযে নবাব জাদা, ঠ্যাং তুলে বসে টিভি দেখলে হবে নাকি শুধু? আমাকে একটু সাহায্য করতে হবেনা?

সামি টিভি থেকে চোখ না সরিয়েই উত্তর দিল, ‘আমি কোনো সাহায্য টাহাজ্য করতে পারবনা।’

হৃদি কোমরে হাত দিয়ে বলল, ‘কেন পারবিনা? আমি কি তোদের চাকর? কয় টাকা দিবি আমারে বল?’

– ‘ঐটা তুই রুদ্রর সাথে নেগোশিয়েট করে নিস। আমি এসবের মধ্যে নাই।’

হৃদি রাগে গজগজ করতে করতে রিমোট হাতে নিয়ে ফট করে টিভিটা বন্ধ করে দিল।

– ‘সমস্যা কী তোর হৃদিতা? কেন বিরক্ত করতেছিস? একটু শান্তিতে থাকতে দে নারে বাপ!’

– ‘আমাকে অশান্তিতে রেখে তুই নিজে শান্তিতে থাকতে চাস?’

– ‘তোকে আমি কী অশান্তিতে রাখলাম?

হৃদি একদম ঝগড়াটে গলায় বলে উঠল, ‘তুই রবিনকে কেন বলতে গেছিস ওই ফালতু কথাটা? তোর কি লজ্জা শরম নাই?’

– ‘খুব ভালো করছি বলছি। একশো বার বলব। সবাইরে বলব। তোর কী তাতে?’ রাগে সামির ফর্সা গাল টকটকে লাল হয়ে গেছে তখন।

হৃদি বিস্ময় নিয়ে বলল, ‘আমার কী তাতে? আমার নামে তুই বদনাম রটাচ্ছিস, আর বলছিস আমার কী তাতে? তোর কি মাথার স্ক্রু সবগুলা ঢিলা হয়ে গেছে? এখন রবিন যদি এই কথাটা সবাইকে বলে বেড়ায়? যদি… যদি আমার বাপ মায়ের কানে কথাটা চলে যায়?’

সামি অতটা সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা করেনি। কখনো করেও না। সে কথাটা শুনে একটুখানি চুপ করে থেকে বলল,’গেলেই কী? এটা এমন কোনো ঘটনা না। তুই প্রেগনেন্ট হয়ে যাস নাই।’

– ‘তোর কথা শুনলে না, মাঝে মাঝে তোরে আমার সত্যি থুতু মারতে মনে চায়।
’

সামি এবার তীক্ষ্ণ গলায় বললো, ‘আরেকবার থুতু মারার কথা বললে কিন্তু আমিই তোর মুখে থুতু মারব। মাইন্ড ইট।’

হৃদি টিভির রিমোটটা সামির দিকে ছুঁড়ে মেরে বলল, ‘আমাকে একটা এপ্রন দে।’

সামি হাত বাড়িয়ে রিমোট টা লুফে নিল। তাকে দেখে মনে হল এমন আজগুবি কথা সে জীবনে কোনো দিন শোনেনি। অবাক হয়ে বলল, ‘এপ্রন কোথায় পাবো আমি?’

– ‘তোর বাসায় কোনো এপ্রন নাই?’

– ‘না!’

– ‘আশ্চর্য!’

– ‘আশ্চর্যের কী আছে? এপ্রন দিয়া আমরা কী করবো?’

– ‘কী আর করবি, ভাজি করে খাবি। বাল! কোন দুঃখে যে আমি রান্না করার প্রস্তাবটায় রাজি হইছিলাম।’

– ‘তোর সমস্যা কী আমি বুঝলাম না। তোরে আমার অসহ্য লাগতেছে হৃদি। প্লিজ দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে।

– ‘আমাকে কিসু একটা দে।’

– ‘কী দিব?’ সামি বিস্মিত।

– ‘দে কিসু একটা, যেটা পরে আমি রান্না করতে পারব।’

‘রান্নার জন্য কি আলাদা পোশাক লাগে নাকি?’

– ‘এখন লাগবে। কারণ এই জামাটা আমার অনেক প্রিয়। এই জামা পরে আমি রান্না করব না।’

– ‘রান্না করার জামা আমি কোথায় পাব?’ সামি মহা বিরক্ত।

– ‘তোর টি শার্ট দে একটা।’

– ‘আমার টি শার্ট তোর হবে?’

– ‘পরা গেলেই হবে।’

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠতে হল সামিকে। খুঁজে পেতে একটা স্কাই ব্লু রঙের টি শার্ট নিয়ে আসল সে। হৃদির পরনে কালো টাইটস ছিল। টাইটসের ওপর সামির টি শার্ট টা গায়ে চড়াতেই ভারী অদ্ভুত দেখালো তাকে। টি শার্ট আরেকটু হলেই তার হাঁটু ছুঁয়ে ফেলবে। হাতা গুলো ঢলঢল করছে। দেখে সামি ডাকাতের মত হো হো করে হাসতে লাগল। বলল, 'যা লাগতেছে না তোকে, এখন একটা ছবি তুলে রবিনরে পাঠায় দেই কেমন? ছবি দেইখাই ভাগবে শালা।

সামির হাসি তামাশা সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে কাজে লেগে গেল হৃদি। ছুরি, চপিং বোর্ড নিয়ে বসে গেল সবজি কাটতে, ডাইনিং টেবিলে। টেবিলটা আগে পরিষ্কার করে নিতে হয়েছে তার। ওদিকে সোফায় হেলান দিয়ে বসে টিভি দেখছে সামি। তার গায়ে একটা সাদা কালো চেকের ফুল হাত শার্ট। মুখে এলোমেলো দাড়ি। গত কয়েকদিনেই বেশ একটু শুকিয়ে গেছে সে। দেখলে বোঝা যায় মানুষটার মনের ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। রোগা ভাব আসলেও তার মুখখানা এখনও বড়ই শ্রীময়, ধারালো এবং আকর্ষণীয়। ছুরি দিয়ে আলু কাটতে কাটতে হৃদি সামিকেই দেখছিল। ঠিক তখনই ঘটল অঘটন টা। ছুরির পোঁচ আলুর ওপর না পড়ে, পড়ল আঙুলের ওপর। একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসলো হৃদির মুখ থেকে। চমকে উঠল সামি। দৌড়ে এসে দেখল হৃদির বাম হাতের কানি আঙুল রক্তাক্ত হয়ে আছে। অস্থির হয়ে গেল সে। ছুটে গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে আসলো। হৃদির আঙুলে স্যাভলন সমেত তুলো চেপে ধরে শাসানোর ভঙ্গিতে বলল, 'পারিস না করতে একটা কাজ। কে বলছে তোরে এইসব রান্না বান্না করতে? এসব তোর দ্বারা হবেনা। করতে হবেনা কিছু।'

হৃদি কাঁচুমাচু হয়ে গেল, 'না না রুদ্রকে আমি কথা দিছি।'

– 'কথা দিলে কিছু হয়না। তোর এত কষ্ট করতে হবেনা। আমি রুদ্রকে বুঝায় বলব।'

– ‘না তুই কিছুই বলবিনা। খবরদার।’

আঙুলে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে সামি খুব বিষণ্ণ ভাবে বলল, ‘আমার হিমোফোবিয়া আছে। রক্ত দেখতে পারিনা। সমস্যা হয়। মাথা ঝিম ঝিম করতেছে এখন

-‘হ্যাঁ জানি আমি। সরি। আচ্ছা যা টিভি দ্যাখ। আর বিরক্ত করবো না তোরে।’

সামি বিষণ্ণ মুখ নিয়েই উঠে গেল। হৃদি সবজি টবজি কেটে নিয়ে রান্নাঘরে আসলো। রান্না করা শিখেছে সে খুব বেশিদিন হয়নি। তিন চার মাস আগে মায়ের হঠাৎ টাইফয়েড ধরা পড়ল। বাড়িতে কাজের লোক ছিল কিন্তু কাজের লোকের হাতের রান্না বাবার মুখে রোচে না। মা বললেন তোমার বাবার পছন্দ মত রান্না কী করে করতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। সেই প্রথম তার রান্নায় হাতেখড়ি হল। কদিনের মাঝেই আবিষ্কার করল যে তার রান্নার হাতটা আসলে বেশ ভালো এবং রান্না করে সে আনন্দও পায়। মা সুস্থ হবার পর বন্ধুদের একদিন বাড়িতে দাওয়াত করে খাওয়াল। তারপর আর কী, ঝুড়িতে প্রশংসা উপচে পড়ল!

সামির টি শার্টটায় মনে হয় কোনো ম্যাজিক আছে। ওটা গায়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে হৃদির মন ভালো হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে সামি তার খুব কাছে আছে। একদম নিজের মানুষ হয়ে। সে মনে মনে ঠিক করল টি শার্টটা আর ফেরত দেবেনা। রেখে দেবে নিজের কাছে। রান্না শুরু করার খানিক বাদেই সামি এসে উঁকি দিল রান্নাঘরে। চুলার আগুনের আঁচ লেগে হৃদির মুখ লাল হয়ে গেছে। নাকের ডগার বিন্দু বিন্দু ঘাম জানালা দিয়ে আসা শেষ দুপুরের রোদে চিকচিক করছে। সামি কখন এসে দাঁড়িয়েছে হৃদি খেয়াল করেনি। হঠাৎ চোখ পড়তেই বলল, ‘কীরে, কী চাই?’

– ‘তুই ঘামতেছিস কেন? তোর কি কষ্ট হচ্ছে?’

– ‘না কষ্ট হচ্ছেনা।’

– ‘দেখে মনে হচ্ছে তোর কষ্ট হচ্ছে।’

– ‘একেবারেই কষ্ট হচ্ছেনা।’

– ‘রান্নাবান্না খুব ঝামেলার কাজ। আমি আমার বৌকে কখনো রান্নাঘরে যেতেই দিব না।

– ‘তোর বৌকে রান্নাঘরে যেতে হবেনা। বড়লোকের বৌদের রান্না টান্না করতে হয়না।’

– ‘আমি তো বড়লোক না। বড়লোক আমার বাপ।’

– ‘ওই একই কথা।

সামি আর কিছু বলল না। হৃদির কাজ দেখতে লাগল। বাইরে একটা কমলা রঙের পেলব দুপুর। রাস্তা থেকে ভেসে আসছে গাড়ির হর্ন আর রিক্সার টুংটাং। সামনের বাড়ির ছাদে কয়েকটা টিনএজ ছেলে রেলিঙে পা ঝুলিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে। থেকে থেকে তাদের হাসির শব্দে কেঁপে উঠছে সারা পাড়া। শীত বাতাসে হালকা দোল খাচ্ছে ছাদের রশিতে শুকোতে দেয়া ঢাকাই শাড়ির আঁচল, বাচ্চা ছেলের শার্ট প্যান্ট, লুঙ্গি। নিত্যদিনের চিরচেনা এক দুপুর। তবুও, কোনো এক বিচিত্র কারণে সামির হঠাৎ মনে হল আজকের দুপুরটা যেন একটু অন্যরকম। বাতাসে কী যেন মিশে আছে! একটু সুগন্ধ, একটু শিহরণ! কিন্তু সব কিছুই বড় আবছা। সামি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে সেই অন্যরকম আবছা দুপুরের অস্তিত্বটাকে কিছুক্ষণ মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করল। তারপর নীরবে প্রস্থান করল। মিনিট দশেক বাদে আবার আসল। কোনো কথা না বলে দু তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আবার চলেও গেল। হৃদির মনটা বড়ই ফুরফুরে লাগছিল। ভালো লাগার ভোমরাটা গুনগুন করে উড়ে বেড়াচ্ছিল মনের পাশে, কানের কাছে। তার যেদিন একলা একটা সংসার হবে,

এরকম ছুটির দিনের নিরালা দুপুর গুলোতে মন প্রাণ ভরে রান্না করবে। তারপর রান্নাঘরের দরজায় একটু পর পর ঠিক এমনি ভাবেই উঁকি দেবে ভালোবাসার মানুষটা। এটুকু ভাববার পরেই তার মনটা হঠাৎ ঝুপ করে খারাপ হয়ে গেল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল অজান্তেই। সেই ভালোবাসার মানুষটা কখনোই সামি হবেনা। সামি তো বিয়ে করতে যাচ্ছে অন্য একজনকে। অন্য যাকেই বিয়ে করুক না কেন, হৃদিকে সে কখনোই বিয়ে করবেনা। বলেই তো দিয়েছে, প্রয়োজনে নিজের কান কেটে ফেলবে, তবুও হৃদিকে বিয়ে করবেনা। ভাবতে ভাবতে হৃদির কপালে ভাঁজ পড়ে যাচ্ছিল। খুন্তি দিয়ে তরকারি নাড়ছিলো সে। পেছনে একটা ছায়া টের পেল হঠাৎ। চুলার আঁচ কমিয়ে পেছন ফিরতেই দেখলো সামি দাঁড়িয়ে আছে, খুব কাছে।

– ‘কী চাই?’

সামি টিস্যু পেপার দিয়ে খুব মনোযোগের সাথে হৃদির কপাল আর নাকের ঘাম মুছে দিতে দিতে বলল, ‘কিছু চাইনা।’

– ‘বিরক্ত করছিস কেন?

সামি হৃদির লালচে গালদুটোর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে থেকে ভারী গম্ভীর গলায় বলল –’আর কোনো দিন রান্না করবিনা তুই।’

হৃদি হেসে ফেলল।

-’ হাসছিস কেন?’

– ‘আমি রান্না না করলে করবেটা কে? আমার বর?’

– ‘হ্যাঁ প্রয়োজনে সেই করবে। বাড়িতে কাজের লোক রাখবে।’

– ‘আমার বর তো তোর মত বড়লোক হবেনা। অত কাজের লোক রাখার টাকা পাবে কই?’

– ‘টাকাওয়ালা লোকের সাথেই বিয়ে দেব তোকে।’

হৃদি মগ্ন চোখে চেয়ে ছিল সামির দিকে। কয়েক সেকেন্ড গড়াতেই সামির চোখেও দেখা দিল একটু কেমন বিভ্রম! সে হৃদির লালচে গালে একটা হাত রেখে বলল, ‘রবিনকে কথাটা বলেছি বলে তুই এত ক্ষেপলি কেন?’

হৃদি উত্তরটা জানে। রেগে যাবার কারণ হল রবিন সর্বদাই ওর ছেলে বন্ধুদের নিয়ে হাবিজাবি সন্দেহ করত। এখন সে সবাইকে সদর্পে বলে বেড়াবে যে হৃদি বন্ধুত্বের নাম করে ছেলেদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়। কথাগুলো সামিকে গুছিয়ে বলবে বলে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ওই একলা দুপুরের কমলা রোদে, সামির অত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থেকে সে সব কথা গুলিয়ে ফেলল। দারুণ এক শব্দহীনতায় পেয়ে বসল তাকে।

কলিং বেলটা তারস্বরে বেজে উঠল ঠিক সেই সময়েই। চমকে উঠল হৃদি। দৌড়ে ছুটে গেল দরজার কাছে। বুয়া এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে রান্নাঘরে ফেরত এসে সে দেখল সামি তখনো দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। তার চোখে মুখে একটু কেমন বিহ্বল ভাব। হৃদি আসতেই সে অস্থির হয়ে বলল, ‘তুই আমার প্রশ্নের উত্তর দিলিনা?’

হৃদির পেছন পেছন বুয়া ঢুকল রান্নাঘরে। হৃদি বলল, ‘তুই ভাগ এখান থেকে।

– ‘শোন হৃদি, রবিনকে আমরা কেউ পছন্দ করিনা। তুই কিন্তু কোনো ভাবেই ওর কাছে ব্যাক করার কথা চিন্তা করিস না।’

– ‘সে পরে দেখা যাবে।’

– 'হোয়াট পরে দেখা যাবে। এটাই ফাইনাল।'

হৃদি হাসে, 'ভাগবি? নাকি থুতু মারব? এখন গিয়ে শেভ টেভ করে একটু মানুষ হ। বিকালে তো যাবি মেয়ে দেখতে।'

হক সাহেব কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রেখে মঞ্চ থেকে নামছিলেন। সেই সময় তার মোবাইলে ফোনটা আসল। ধরতেই ওপাশ থেকে একটা চপল গলা বলে উঠল, 'মিস্টার হক,সময় হবে আপনার?'

হক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'খুব জরুরি কিছু বলার আছে কি?'

– 'হ্যাঁ জরুরি তো বটেই।'

– 'এখুনি বলতে হবে? নাকি পরেও বলা যাবে?'

– 'পরে বলা যাবে।'

– 'তাহলে অমৃতা, আমি রাতে বাড়ি ফিরে তোমাকে ফোন করি?'

– 'হ্যাঁ, শিওর!'

– 'এখন রাখছি।'

দরজায় করা নাড়ছিল কেউ একজন। অমৃতা দরজা খুলতেই দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

– 'কী করিস মা?'

– 'এইতো তেমন কিছুনা। এসো, ভেতরে এসো।'

বাবা ভেতরে ঢুকে বিছানার ওপর বসে বললেন, 'তোর প্র্যাকটিস কেমন চলছে?'

– 'ভালোই।'

– 'সুপ্রিম কোর্টের পরীক্ষাটা কি এবার দিবি?'

– 'দেব বাবা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পড়াশোনার টাইম পাচ্ছিনা। প্র্যাকটিসের পাশাপাশি প্রজেক্টের কাজ করতে হচ্ছে তো!'

– 'ওই কাজটা আপাতত বন্ধ রাখ।

– 'না বাবা তা হয়না। আমার তো দুই বছরের কন্ট্রাক্ট হয়েছে ওদের সাথে। এর আগে আমি কুইট করতে পারব না। তাছাড়া এখানে একটা সুবিধা হচ্ছে আমি বাসায় বসে অনলাইনে কাজ করতে পারি। রোজ অফিস যেতে হয়না। এটা একটা প্লাস পয়েন্ট না?'

– 'হুম। তা বটে। আচ্ছা শোন তোর সেই বন্ধুর বাবার সাথে দেখা হয়েছিল গত কাল'

অমৃতা প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারলোনা বাবা ঠিক কার কথা বলছেন।

– 'কোন বন্ধুর বাবা?'

– 'ওই যে, এম পি সাহেব। গতকাল আমার বন্ধু আরিফের বাসায় গিয়েছিলাম, উত্তরা। সন্ধ্যার পর হাঁটতে বেরিয়েছি দুই বন্ধুতে মিলে। হঠাৎ উনার সাথে দেখা।'

অমৃতা কান খাড়া করল,'কোথায় দেখা হল?'

– 'রাস্তায়। উনি গাড়িতে ছিলেন। আমাকে দেখে গাড়ি দাঁড় করালেন।

নেমে এসে নিজ থেকে কথা বললেন।

– ‘তাই নাকি? কী বললেন?’

– ‘খুব অদ্ভুত একটা কথা বললেন।

-‘কী কথা?’ একটা বাধঁছেড়া কৌতূহল অমৃতার নিশ্বাস আটকে দিচ্ছিল।

– ‘বললেন বছর তিনেক আগে তিনি নাকি আমাকে ভুল করে একটি অপমানজনক কথা বলে ফেলেছিলেন। সেজন্যে তিনি আন্তরিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থী। তবে কথাটি তিনি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে অপমান করার জন্য বলেননি, এবং বলার সময় তাঁর মনেও হয়নি যে কথাটা অপমানজনক। কিন্তু পরে রিয়ালাইজ করেছেন যে এমনটা বলে তিনি ঠিক করেন নি। আমি বুঝতে পারলাম না উনি কী বিষয়ে কথা বলছেন। জানতে চাইলে বললেন আমার মনে না থাকলে নাকি ঝামেলা এর মাঝেই চুকে গেছে। ওসব কথা আর তুলে লাভ নেই।

জন্মগত ভাবেই অমৃতার বিস্মিত হওয়ার ক্ষমতা কম। বিস্ময় জিনিসটা তার ভেতরে নেই বললেই চলে। কিন্তু বাবার মাত্র বলা কথাগুলো তাকে বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌঁছে দিল। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। সে হতভম্ব হয়ে বলল, ‘আর কী বললেন?’

– ‘আর তেমন কিছুই বলেন নি। তোর কথা জানতে চাইলেন। তুই কেমন আছিস, তোর প্র্যাকটিস কেমন চলছে এইসব।’

– ‘ও আচ্ছা।’

– ‘উনি কিসের কথা বলেছেন, তোর কি কোনো ধারণা আছে?’

– ‘তোমার কিছু মনে নেই?’

– ‘না, আমার তো কিছু মনে নেই রে মা!’

– ‘তাহলে আমারও কিছু মনে নেই।’

– ‘ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। তুই কি আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবি?’

– ‘বাবা, বুঝিয়ে বলার কিছু নেই। তুমি যাও এখন। আমার কাজ আছে।’

বাবা সাথে সাথে চলে গেলেন না। বসে থেকে অমৃতার কর্মজীবনের খোঁজ খবর নিতে লাগলেন। উঠলেন আরো মিনিট দশেক সময় পরে। তিনি চলে যাবার পর অমৃতা কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে রইল। লোকটা যে বাবার কাছে সরাসরি ক্ষমা চেয়ে বসবে এটা তার ধারণাতেও ছিলনা। পুরো বিষয়টা কেমন আশ্চর্য ঠেকছে তার কাছে। কিন্তু ভালোও লাগছে। কেন যে কথাটা শোনার পর থেকেই তার এত বেশি ভালো লাগছে তা সে জানেনা। কাজে মন বসছিলনা। একটু বাদে বাদে মোবাইলের দিকে তাকাচ্ছিল সে। লোকটা বলেছে রাতে ফোন দেবে। রাত হতে আর কতক্ষণ বাকি? শেষবার কথা হয়েছিল দমদম এয়ারপোর্টে। বোর্ডিং হবার খানিক আগে ফোন করলেন। জানতে চাইলেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। খুব বেশিক্ষণ নয়, দুই তিন মিনিট সময় কথা হয়েছিল। সেদিনের পর কেটে গেছে আরো তিন দিন। মাত্র তিন দিন, অথচ অমৃতার মনে হচ্ছে যেন তিন বছরেরও অধিক সময়। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। কাজ পড়ে আছে। সে কাজ পাগল মানুষ। কাজ ছাড়া তার বেঁচে থাকাই দায়। ল্যাপটপ খুলে নিয়ে বিছানায় বসল সে। একটা রিট পিটিশন লিখতে হবে। ঘড়িতে রাত এগারোটা বাজে তখন। রিট পিটিশন লিখতে গিয়েও অমৃতার চোখ দুটি মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে ছুটে যাচ্ছিল বারংবার। কিন্তু ফোনটা আর সে রাতে এলো না। ঘুমোতে যাবার আগে সে মনে মনে বলল,

‘অমৃতা চৌধুরী, তোমাকে কি এসব ছোট খাটো বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া মানায়? আজকের পর থেকে আর কোনোদিন কোনো কিছুর জন্য অপেক্ষা করবেনা তুমি, কেমন? তোমার জন্য লোকে অপেক্ষা করবে। তুমি কারো জন্য অপেক্ষা করবেনা। তোমাকে এসবে মানায় না।’

কথা গুলো বলে শেষ করে অমৃতা একটি প্রলম্বিত তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। নিজের সাথে বোঝাপড়ায় সে সর্বদা সক্ষম। তার মন বুঝ মেনে গেল। ঘুম আসতে খুব বেশি সময় লাগলো না। কাল সকালে আরেকটি কর্মব্যস্ত দিনের সূচনা হবে। শনিবার দিনও তার চেম্বার খোলা থাকে। কাজের সাথে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করেনা, কাজ করার জন্য বেঁচে থাকে। কেজো মানুষের সময় মত ঘুমোতে হয়, সময় মত জাগতে হয়!

হক সাহেব সাধারণ সভা থেকে সরাসরি গেলেন স্কয়ার হাসপাতালে তার ফুপুকে দেখতে। সেখানে আধা ঘন্টার মত সময় কাটিয়ে চললেন পার্টির মিটিং এ। পার্টির মিটিং গুলো লেট নাইট হয়ে যায়। আজকেও মিটিং শেষ হতে হতে বারোটা বাজল। বাড়ি ফিরলেন অত্যন্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে রাতের খাবার খেয়েই শুয়ে পড়লেন তিনি। ঘুম ভাঙল ঠিক ফজরের ওয়াক্তে। ঘুমটা ভাঙার সাথে সাথেই মনে পড়ল, অমৃতাকে তাঁর একটা ফোন করার কথা ছিল।

নামাজ আদায় করে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। ঘরে তার স্ত্রী ঘুমোচ্ছেন। স্ত্রীর ভারী নিশ্বাসের শব্দ বারান্দা পর্যন্ত ভেসে আসছে। কাকদের দল জেগে উঠেছে এর মাঝেই। সদলবলে ডাকছে তারা। বাড়ির সামনেই একটি স্কুলের ক্যাম্পাস। সেই সুবাদে অনেক খানি খালি জায়গা পাওয়া গেছে। সম্মুখেই ফাঁকা স্কুল মাঠ। খোলা মাঠের ওপর বাতাস ইচ্ছে মত চড়ে বেড়ায়। বারান্দায় বা ছাদে দাঁড়াতে তাই ভালোই লাগে। অমৃতাকে এখন ফোন দেয়াটা কি

উচিৎ হবে? হয়তো হবেনা, কিন্তু এখন কথা বলে না নিলে সারাদিন তিনি আর সময়ই পাবেন না। দিনের শুরুতে আর রাতের শেষেই তিনি নিজের জন্য যা একটু সময় পান। মেয়েটার কি ভোরে ওঠার অভ্যাস আছে? ভাবতে ভাবতে ফোনের ডায়াল লিস্ট থেকে নম্বরটা খুঁজে বের করলেন তিনি। ফোন করলেন। চতুর্থ বার রিং পড়ার সাথে সাথেই ওপাশ থেকে গলাটা ভেসে আসল।

– 'সিরিয়াসলি?'

হক একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া গলায় বললেন, 'কী হল?'

অমৃতা লেপের তলা থেকে বলল, -'আপনার এতক্ষণে ফোন করার সময় হল?'

– 'তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে?'

– 'এত ভোরে ঘুমোবো না তো কী করবো?'

– 'ওহ, সরি। আচ্ছা ঘুমোও,পরে কথা বলব।'

– 'ঘুমটা ভেঙে দিয়ে এখন পরে কথা বলব, মানে কী এসবের?'

হক বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সারাদিন এতো হোমরা চোমরা লোকদের সাথে যে তিনি ওঠা বসা করেন, কেউ তাকে এমন বেকায়দায় ফেলতে পারেনা, যেমনটা এই মেয়ে পারে। ক্যাট ক্যাট করে কথা বলে মুখের ওপর। হক কী বলবেন খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলেন। অমৃতা তেজি গলায় প্রশ্ন করল, 'রাতে ফোন করেননি কেন?'

একই কথা একেক লোকে বলে একেক রকম ভাবে। ঠিক এই কথাটাই অন্য লোকে তার সাথে বললে তিনি হয়তো খুব রেগে যেতেন। বেয়াদব বলে গালাগালও দিয়ে বসতেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, অমৃতা যখন বলল, ভুলেও তার কাছে উদ্ধত কোনো আচরণ বলে মনে হলোনা বরং মনে হল যেন এই মেয়েটির তার সাথে ঠিক এভাবেই কথা বলার কথা। দোষ তো তাঁরই। তিনিই ফোন করতে ভুলে গেছেন।

– 'দুঃখিত। আমি আসলে বাড়ি ফিরেছি খুব লেট নাইটে। টায়ার্ড ছিলাম, তাই তোমাকে আর ফোন করার সময় পাইনি।'

– 'কাজ তো শুধু আপনি একাই করেন। অন্য লোকের তো আর কাজ নেই।

হক হেসে বললেন, 'তুমি তো দেখি রেগে আছ খুব।'

– 'মোটেও রেগে নেই আমি। আমার এসব ফালতু ব্যাপার নিয়ে রাগ করার সময় নেই।

-'ও তাই?'

– 'হ্যাঁ তাই।'

– 'কী যেন বলার ছিল তোমার?'

– 'আগামী কাল আপনার ছেলের জন্মদিন। মনে আছে?'

– 'হ্যাঁ মনে আছে।'

– 'শুনুন, আমরা একটা সারপ্রাইজ পার্টি করছি। আপনি কি আমাদের সাথে আছেন?'

– ‘কী রকম সারপ্রাইজ পার্টি?’

– ‘প্ল্যান হল যে কালকে বিকালে আমার বন্ধু রুদ্র, সামিকে নিয়ে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে যাবে। আপঝাপ নানা কাজে আটকে রাখবে ওকে। বাড়ি ফিরবে রাত বারোটায়। ততক্ষণে আমরা বাসা সাজিয়ে ফেলব। সামি রাত বারোটায় বাড়ি ফিরে পুরাই সারপ্রাইজড হয়ে যাবে।’

– ‘আচ্ছা… তো এখানে আমার কী ভূমিকা থাকতে পারে?

– ‘আপনি আন্টিকে নিয়ে চলে আসবেন রাত এগারোটার দিকে।’

– ‘কোথায়?’

– ‘কোথায় আবার, সামিদের ফ্ল্যাটে।’

হক চুপ করে গেলেন। ছেলের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়না প্রায় ন মাস। এই ন মাসে ছেলে তার সাথে নিজ থেকে কোনো যোগাযোগ করেনি। তিনিও আত্মসম্মান বোধ বজায় রাখার নিমিত্তে গায়ে পড়ে ছেলের সাথে কথা বলেননি। আজ এতদিন পর হুট করে না বলে কয়ে ছেলের বাসায় গিয়ে হাজির হওয়াটা কি তার জন্য সমীচীন হবে? অমৃতা অধৈর্য গলায় বলল, ‘কী হল? কথা বলছেন না কেন?’

– ‘আসলে, আমার যাওয়াটা মনে হয় ঠিক হবেনা।’

– ‘কেন?’

– ‘দেখো সামির সাথে আমার কথা হয়না বেশ অনেক দিন যাবৎ। সে তো নিজ ইচ্ছায় আমার সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি…’

– ‘উফ মিস্টার হক আপনি কেন বুঝতে পারছেন না যে সামি আপনার ওপর অভিমান করে আছে। সে আপনাকে প্রচন্ড মিস করে। ঠিক আপনার মতো সেও ভাবছে যে আপনি কেন নিজের ইচ্ছায় ওর সাথে কথা বলছেন না।’

কিছুক্ষণ নীরবতা। অমৃতা বলল, ‘এতো কমপ্লেক্স কাজ করছে কেন আপনার ভেতরে? আমার কথা শুনুন, রাজি হয়ে যান। শেষটায় আপনিই জিতবেন। কথা দিচ্ছি।’

– ‘আমি একটু চিন্তা করে দেখি। এখনই শিওর ভাবে কিছু বলতে পারছিনা।’

– ‘এতো চিন্তা করতে হবেনা। আপনাকে আসতেই হবে। আন্টিকে নিয়ে ঠিক এগারোটায় চলে আসবেন।’

– ‘এগারোটার মধ্যে আমার কাজ শেষ হবে কিনা তা তো বলতে পারছিনা।’

– ‘হতেই হবে। আর আমি আন্টিকে ফোন করে বুঝিয়ে দেব প্ল্যানটা।’ হকের যেন হঠাৎ কিছু একটা মনে পড়ল এমন গলায় বললেন, ‘সামির আম্মাকে তুমি আন্টি ডাকো কিন্তু আমাকে নাম ধরে ডাকা কেন? এ তো ভীষণ অন্যায়।’

অমৃতা কণ্ঠে কপট বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল- 'তা, কী ডাকা উচিৎ আপনাকে?'

– 'বন্ধুর বাবাকে লোকে কি নাম ধরে ডাকে? আংকেল ডাকলেই তো পারো।'

– 'আংকেল ডাকব কেন? মাথা খারাপ নাকি?'

– 'মাথা খারাপের কী হল। এটাই তো স্বাভাবিক।'

অমৃতা এবার দৃঢ় গলায় বলল, 'জীবনেও না। দুনিয়ার সবাইকে আংকেল ডাকলেও আপনাকে আমি কিছুতেই আংকেল ডাকব না!

হক হেসে ফেললেন। কিঞ্চিৎ কৌতুকও বোধ করলেন। মজা পাওয়ার গলায় বললেন, 'কেন?'

– 'সব প্রশ্নের উত্তর হয়না। ডাকব না, ব্যাস ডাকব না। এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন!'

– 'আজ তো ছুটি। সারাদিন কী করছেন?'

– 'কোনও প্ল্যান নেই তো! কেন আপনি কোথাও যেতে চান?' খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলেই বিভার প্রশ্নের উত্তর দিল অভিজিৎ। খাবার টেবিলের এক প্রান্তে বসে আছে সে, অন্য প্রান্তে বিভা। টেবিলের ওপর রাখা দুটি গরম চায়ের কাপ। চায়ের কাপ থেকে এঁকেবেঁকে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া উড়ে উড়ে মিশে যাচ্ছে সকাল বেলার স্বচ্ছ ঝকঝকে রোদের সাথে। উঠোনে বাকবাকুম শব্দে পায়রা গুলো ক্রমাগত ডেকে চলেছে। দূর্গা ওদের জন্য খাবার ছিটিয়ে দিচ্ছে। মুখে ডাকছে, আ, আ, আ।

– ‘কোথায় যাব? আমি কি এখানে কিছু চিনি নাকি? যা জংলি এলাকা। একলা ঘর থেকে বেরোতেই ভয় হয়।’

– ‘আপনাকে একা যেতে হবে কেন?

– ‘দোকা পাবো কোথায়? আপনার তো মশাই আমার জন্য সময়ই হয়না!’

ধোঁয়া মেশানো রোদের ভেতর দিয়ে অভিজিৎ বিভার দিকে তাকাল। বিভা একটু আগেই স্নান করেছে। তার পরনে একটা ফিরোজা রঙের সুতির সালওয়ার কামিজ। ভেজা চুলের মাঝ বরাবর সিঁথি ভর্তি সিঁদুর। গরম চায়ের কাপ থেকে উঠতে থাকা ধোঁয়া ভেদ করে, আয়নার মত স্বচ্ছ শীত সকালের মিষ্টি রোদের ভেতর দিয়ে, অভিজিতের দৃষ্টি যখন বিভার ওই সদ্য স্নান করা পান পাতার মত সতেজ মুখ খানির ওপর গিয়ে পড়ল, তখন মনে হল দূর অন্তরীক্ষের স্বর্গ লোক থেকে বুঝি একটি পবিত্র স্নিগ্ধতার ধারা, সুধা স্রোতের মতো এসে বাড়ি খেলো তার হৃদয় মাঝারে। সে কিছুটা ক্ষণ কোনও কথা বলল না। চুপটি করে চেয়ে রইল বিভার দিকে।

বন্ধুরা চলে যাবার পর কেটে গেছে চারটি দিন। এই চারদিন অভিজিৎ ছিল সীমাহীন ব্যস্ত। তার অফিসের অডিট শুরু হয়েছে। এত কাজের চাপ যে মনে হচ্ছিল যেন নিশ্বাস ফেলার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। এক এক দিন বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার হয়ে গেছে গভীর রাত। ফিরে এসে সে বিভাকে পেয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায়। শুধু এক রাতে একটু অন্যরকম ঘটনা ঘটল। রাত এগারোটায় বাড়ি ফিরেছিল অভিজিৎ। এসে দেখল বিভা খাবার টেবিলে বসে আছে বাড়া ভাত নিয়ে। তার মুখ শুকনো। চোখজোড়ায় গভীর হতাশার ছাপ। দেখলে কেমন বুক কেঁপে যায়।

অভিজিৎ চমকে উঠে বলল, ‘সেকি! আপনি এখনও খান নি?’ বিভা বিষণ্ণ গলায় বলল, ‘একা একা খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।’

– ‘দূর্গা কোথায়?’

– ‘ঘুমিয়ে পড়েছে।’

অভিজিৎ অফিসেই রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছিল। কিন্তু বিভার জন্য তাকে আবার বসতে হল। অফিসের কাপড় না পাল্টেই হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে খেতে বসল সে। বিভা চুপচাপ অভজিতের প্লেটে খাবার তুলে দিল। নিজেও নিলো অল্প একটু ভাত আর বেগুনের তরকারি।

– ‘আপনার কি খুব মন খারাপ?’ অভিজিৎ প্রশ্ন করলো, সাবধানে

বিভা একবার চোখ তুলে তাকালো অভিজিতের দিকে। কী নিষ্প্রভ সেই চোখের চাউনি! অভিজিতের মনটা ভারী খারাপ হল। মেয়েটার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ব্রেকআপ হয়েছে মাত্র কদিন আগে। এরকম নাজুক মানসিক অবস্থায় সারাদিন এই বাড়ির মধ্যে ভূতের মত একা একা দিন কাটাতে হচ্ছে। মনের কথা বলার একটি মানুষ নেই। করার মত কোনও কাজ নেই। এভাবে থাকলে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের পক্ষেও অসুস্থ হতে খুব বেশি সময় লাগবেনা। সে নিজে যে একটু সময় দেবে তাও তো সম্ভব হচ্ছেনা। অভিজিৎ বিভার ওই নিষ্প্রভ চোখের দিকে চেয়ে নরম গলায় বলল, ‘বলছিলাম কি, আপনি বরং কয়েকটা দিন ঢাকায় গিয়ে আপনার আব্বা আম্মার সাথে থেকে আসুন। ভালো লাগবে।’

মুহূর্তের মাঝে বিভার চেহারাটা পাল্টে গেল। বিষণ্ন চোখের তারায় ক্রোধের ঘষা লেগে ম্যাচের কাঠির মত ভস করে জ্বলে উঠল আগুন। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘আপনি কি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছেন?’

অভিজিৎ গর্জন শুনে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এত বেশি রেগে যাবার মত কিছু বলেছে কি সে? আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে, ভাবছিলাম যে···।

বিভা ওর কথা শেষ হতে দিল না। খাবার বাসনটা হাতে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ ঝামটা মেরে বলল, 'আর কিছু বলতে হবেনা আপনাকে। যা বুঝার বুঝে নিয়েছি আমি।

কথাটা বলে শেষ করে বিভা প্রায় দৌড়ে ছুটে গেল শোবার ঘরের দিকে। মুখের সামনে খাবারের প্লেট নিয়ে অভিজিৎ কিছুক্ষণ থ মেরে বসে রইল। তারপর হাত ধুয়ে নিয়ে খাবার গুলো ঢাকা দিয়ে রাখল। ঘরে এসে দেখল বিভা বিছানার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কী যন্ত্রণারে বাবা! কান্নাকাটি জুড়ে দেবার মত কোনও ঘটনা হল নাকি এটা? অভিজিৎ হেঁটে এসে বিভার পাশে বসল। কান্নার দমকে বিভার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অভিজিৎ বুঝতে পারছেনা তার এখন ঠিক কী করা উচিৎ, কী বলা উচিৎ। সমস্ত কিছুর জন্য নিজেকেই দায়ী বলে মনে হচ্ছে। বুকের ভেতর বড্ড অপরাধী ভাব। মনে হচ্ছে যেন তার জন্যেই এই নিষ্পাপ মেয়েটির জীবন আজ তছনছ হয়ে গেল!

– 'দেখুন, আপনি কষ্ট পাবেন জানলে আমি কথাটা বলতাম না।'

বিভা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এখন করুণা দেখাতে এসেছেন? লাগবেনা আমার আপনার করুণা।'

– 'করুণা দেখাচ্ছিনা। আপনার মন মেজাজ ভালো নেই। তাই আমাকে ভুল বুঝছেন।'

বিভা তার অশ্রু মাখা ডাগর দুটি চোখ অভজিতের দিকে মেলে ধরে বলল, ‘আমি চলে যাব অভিজিৎ বাবু। কথা দিচ্ছি। আমি জানি যে আমি চলে গেলে আপনার শান্তি হবে। বার বার বলতে হবেনা।’

– ‘আমার শান্তির জন্য কথাটা বলিনি আমি। বলেছি আপনার মঙ্গল চিন্তা করে।’

– ‘বেশ তো। উদ্ধার করেছেন আমাকে।

– ‘আপনি মিছি মিছি রাগ করছেন।’

বিভা ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘বাদ দিন। আপনি ব্যস্ত মানুষ আপনার সময় বরবাদ করাটা উচিৎ কাজ হচ্ছেনা। আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝে গিয়েছি। খুব বেশিদিন আর বিরক্ত করব না।’

অভিজিৎ বিভার হাত ধরে ফেলল, ‘আপনি কিছুই বুঝতে পারেন নি। আসল ব্যাপারটা হল…’

বলতে বলতে অভিজিৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল, ‘আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার কষ্ট দেখতে আমার ভাল লাগছেনা।’

– ‘আমার কষ্ট দেখতে আপনার ভালো লাগছেনা?’

– ‘একদম ভালো লাগছেনা। যে কটা দিন এখানে আছেন, সে কটা দিন একটু হাসিখুশি থাকতে পারবেন? প্লিজ?’

কথাটা শুনে বিভা কেমন চুপ মেরে গেল। তার চোখ থেকে হতাশার পুঞ্জীভূত মেঘের ছায়া একটু বুঝি আবছা হল। তারপর সেখানে উঁকি দিল এক টুকরো বিস্ময়। এই মানুষটাকে সে বুঝতে পারেনা। এতো সহজ, এতো স্বচ্ছ তবুও যেন এর মনের ভেতরটাকে পড়তে পারা ভারী দুষ্কর কাজ। এতো গুলো মাস প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা ঘণ্টা সে সামির সাথে ফোনে অথবা ম্যাসেজে কথা বলে কাটিয়েছে। হ্যাঁ, মানুষ অভ্যাসেরই দাস। সামির সাথে কথা বলার অভ্যাসটাই তাকে বাঁচিয়ে রাখত এতকাল। কিন্তু তার যে শুধু অভ্যাসের বিসর্জন দিতে হয়েছে তাই নয়। অভ্যাসের সাথে সাথে সে বিসর্জন দিয়েছে স্বপ্নের। এতকাল সে মনে মনে জানত যে সামির সাথে একদিন তার ঠিক ঠিক মিলন হবে। তাদের দুজনের বেঁচে থাকার মত একটা জীবন হবে, সংসার হবে। ভালোবাসার বৃষ্টিতে কানায় কানায় পূর্ণ হবে তাদের ছোট্ট ভুবন। হঠাৎ করে সেই এতদিনের লালিত, পালিত, কাঙ্খিত স্বপ্নটা এক করাল ঝড়ের কবলে পড়ে কাচের শিশির মতন ঝনঝন করে ভেঙে গেল। এই বাস্তবতা মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে! মাথার ভেতরে হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশার মতো কী যেন নেমে আসছে। সমস্ত চেতনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেই অদ্ভুত কুয়াশায়। সামনে পেছনে কিছু দেখতে পাচ্ছেনা সে। কেবলই শূন্যতা আর শূন্যতা। সেইরকম দারুণ বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত সময়টিতে অভিজিতের মাত্র বলা কথাটি তার কাছে প্রচন্ড খর রোদ্দুরে এক ঝাপটা হিমেল হাওয়ার মতো মনে হল।

সে চোখ নিচের দিকে নামিয়ে আলতো গলায় বলেছিল, ‘আচ্ছা।’

.

চায়ের কাপটা কাছে টেনে নিয়ে এসে অভিজিৎ বলল, -’আজ বিকেলে আপনাকে হাতির পিঠে চড়াব। চড়বেন?’

বিভা হাসলো, ‘কেন নয়?’

– ‘অবশ্য বিকেল কেন? আমরা চাইলে এখুনি বেরিয়ে যেতে পারি।’

– ‘না, এখন আমার কাজ আছে।’

– ‘কী কাজ?’

– ‘বাজারে যেতে হবে।’

–সে তো দূর্গাই করতে পারে।’

– ‘দূর্গা সবকিছু মনে করে আনতে পারেনা। ভীষণ ভুলো মন মেয়েটার। ‘

– ‘ঠিক আছে। তাহলে বিকেল পাঁচটায় বেরোবো।’

২৩

ওয়াচ টাওয়ারের ওপর বিকেল বেলার ম্লান আলোয়, আবছা কুয়াশার ভেতর দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দুজন। বিভা আর অভিজিৎ। বিভার গায়ে একটি হালকা আকাশি রঙের কাশ্মীরী শাল জড়ানো। দীঘল কালো লম্বা চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে। অভিজিৎ একটা বাদামি রঙের ফুল হাতা উলের সোয়েটার পরেছে। টাওয়ারের নিচে বইছে মূর্তি নদী। নদীর পাড় ঘেঁষেই শিমূল, জাম, শিরিষ আর বহেড়ার ঘন অরণ্য। গভীর সে অরণ্যের মাথায় মাকড়শার জালের মত ঝুলে আছে কুয়াশা। শীত বাতাসে বিভার চুল উড়ছিল হালকা। বিকেলের মরা আলোয় বিষণ্ন দেখাচ্ছে ওর প্রতিমার মত টানা দুটি চোখ। তবুও কী আশ্চর্য সুন্দর! অভিজিতের মনে হল এতো সুন্দর চোখ বুঝি এ পৃথিবীর অন্য কোনো নারীর নেই। এই চোখ দেখামাত্র যে কোনো পুরুষ প্রেমে পড়ে যাবে। আর যে পুরুষ এর প্রেমে পড়বেনা, সে কোনো পুরুষই না! আচ্ছা, বিভাকে কখনো এমন এক আনমনা মুহূর্তে, ভুল করে পেছন থেকে আচমকা জড়িয়ে ধরলে কি ও খুব রেগে যাবে? ভাবনার ঘোর পুরোপুরি কাটতে না কাটতেই বিভা ঘুরে তাকাল। অভিজিৎকে ওরকম থম মেরে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক গলায় প্রশ্ন করল, ‘কী ভাবছেন?’

অভিজিৎ অপ্রতিভ হল। কী যেন বলতে গিয়ে মুখ খুলেও চুপ করে গেল আবার।

– ‘কী হয়েছে আপনার? কী অত ভাবছেন?’

– ‘যা ভাবছিলাম, তা আপনাকে বলা যাবেনা।’

– ‘কেন?’

– ‘বললে রেগে যেতে পারেন।’

বিভা চোখ সরু করে বলল, ‘তাই নাকি? তার মানে নিশ্চয়ই মনে মনে আমার নামে নিন্দা করছিলেন।’

অভিজিৎ হাসলো, ‘নিন্দে করছিলাম না।’

– ‘তাহলে বলে ফেলুন।’

– ‘আপনি রাগ করবেন না তো?’

– ‘না রাগ করবোনা।’

অভিজিৎ লাজুক হেসে বলল, ‘কিছুনা।’

-’ আপনি ভীষণ ভীতু!’

অভিজিৎ অবাক হয়, ‘আমি ভীতু?’

– ‘তা নয়তো কী?’

– ‘আমার ঠিক কোন আচরণটা দেখে আপনার কাছে আমাকে ভীতু মনে হয়েছে?’

– ‘এইযে মনের কথা বলতে গিয়েও বলতে পারেন না। আমি রেগে গেলেই বা আপনার কী? আপনি কি আমাকে ভয় পান?’

প্রশ্নটা শুনে অভিজিৎ একটু কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য। আস্তে আস্তে বলল, ‘ভয় পাই তা ঠিক না। তবে…’

– ‘তবে?’

– ‘কেয়ার করি।

– ‘কেয়ার করেন?’

– ‘হ্যাঁ কেয়ার করি। আপনি রেগে গিয়ে আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করলে আসলে আমার খুব খারাপ লাগবে।’

বিভা বিস্ময় নিয়ে তাকায় অভিজিতের ভালো মানুষী চোখদুটির দিকে, ‘এত কিছুর পরেও আপনি আমাকে কেন কেয়ার করেন অভিজিৎ বাবু?’

অভিজিৎ চোখ নিচে নামায়, ‘সব কিছুর ওপরে তো মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকেনা, তাইনা?’

সেই মুহূর্তে বিভা ওই নত মুখের অভিজিতের দিকে চেয়ে থেকে আর কোনো কথা খুঁজে পেলোনা। মা প্রায়ই বলেন তার নাকি একটা দেবতার মত মানুষের সাথে বিয়ে হয়েছে। মা হয়তো ঠিকই বলেন। মাঝে মাঝে তার নিজের কাছেও এই মানুষটাকে দেবতার চেয়ে কম কিছু বলে মনে হয়না। কিন্তু সমস্যা হল দেবতার সাথে মানুষের মিলন বাস্তব পৃথিবীতে কখনোই সম্ভব না। বিভা রক্ত মাংসে গড়া মানুষদের আশেপাশে থেকে অভ্যস্ত। অভিজিতের এমন অস্বাভাবিক ভালো মানুষী গিরি দেখলে আজকাল তার কেমন দম বন্ধ ভাব হয়। লোকটা একটু সাধারণ আর একটু খারাপ হলে কী এমন ক্ষতি হত? বিভা অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারত দু দণ্ড।

ওরা ন্যাশনাল পার্কে এসেছে বিকেল চারটায়। বের হবার আগ মুহূর্তে অভিজিৎ বলল, ‘আপনি একটা দুটা এক্সট্রা কাপড় নিয়ে নিয়েন। আজ রাতে হয়তো বাড়ি ফিরবোনা। ’

– ‘বাড়ি ফিরবো না তো থাকব কোথায়?’

– ‘ও আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন।’

অফিসের জিপগাড়ি করে রওয়ানা হল ওরা। গরুমারা অভয়ারণ্যের চেকপোস্ট পেরিয়ে আরো ছয় কিমি পথ পাড়ি দিতে হল বন বাংলোতে পৌঁছনোর নিমিত্তে। বিয়ের পরে এই প্রথম ওদের দুজনের এক সঙ্গে ঘুরতে বের হওয়া। বিভা একটা আবছা অনুভূতিতে ডুবে ছিল। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, কোনো অনুভূতিই তাকে বিশেষ ভাবে নাড়া দিচ্ছিলনা। তবে আজ সকাল থেকে একটা অন্যরকম বোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই বোধটা স্বস্তির। সামির সাথে লুকিয়ে লুকিয়ে সারা রাত কথা বলার মাঝে রোমাঞ্চ আছে, তরঙ্গ আছে, আছে প্রেমের অনুভূতি। কিন্তু এইযে নিজের বিয়ে করা স্বামীর সাথে নিশ্চিন্ত মনের এক নির্বিঘ্ন ভ্রমণ, এই ভ্রমণে প্রেম বা রোমাঞ্চ না থাকলেও আছে শান্তি এবং নিশ্চয়তা। বিভা আজ সেই শান্তিটাকেই

মন ভরে উপভোগ করছে। পুরো পথটায় খুব একটা কথা বলেনি সে। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে এই মেয়েটিই বন্ধুদের সামনে পেলে অহেতুক, ভিত্তিহীন, নিরবিচ্ছিন্ন কৌতুক রসে ডুবে থাকতে পারে আকণ্ঠ। এ কদিনেই যেন বয়স বেড়ে গেছে তার। কথাবার্তা, আচার আচরণে এসে গেছে পরিপক্ক ভাব। মানুষের বয়স আসলে সময়ে বাড়েনা, বাড়ে অভিজ্ঞতা আর টানাপোড়েনে।

দূর অন্তরীক্ষে পাখির পালকের মত সাদা, মসৃণ, পলকা মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছিল নিরুদ্দেশ। বাতাসে অনবরত ভাসছে বনকুসুমের সুবাস। ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে দেখা যাচ্ছে সরু নদীর ওপারের রুপালি বালি, সবুজ ঘাস আর বৃক্ষরাজি। বালির ওপর দাঁড়িয়ে একপাল বাইসন নিশ্চিন্তে নদীর জল খাচ্ছে। অভিজিৎ হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা বিভা, আমাকে আপনার কেমন লাগে?'

– 'বোরিং!'

বিভার ঠোঁট দ্বারা মাত্র উচ্চারিত শব্দটা মোটা চশমার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অভিজিতের সরল দুটি চোখে একটা মেদুর ছায়াপাত ঘটাল। বিভা সেটা লক্ষ্য না করেই বলল, 'আপনি মানুষ ভালো, তবে কাহিনী কী জানেন? বেশি ভালোমানুষরা একটু বেশি বোরিং হয়।'

অভিজিৎ তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু বলতে পারলনা। মেয়েটা যে মুখের ওপর এভাবে তাকে বোরিং বলে বসবে এটা সে ভাবতেও পারেনি। কুয়াশায় আবছা হয়ে আসা দূরের বনের দিকে চোখ রেখে সে খানিক বাদে বলল,'বোরিং আর ভালো মানুষ, এই দুটি মাত্র অবজারভেশন আপনার?'

– ‘আর কী জানতে চাইছেন? আপনি হ্যান্ডসাম কিনা? এট্রাকটিভ কিনা? এসব প্রশংসা শুনতে চাইছেন?’

অভিজিৎ বিব্রত ভাবে বলল, ‘না না, তা কেন?’

– ‘তাহলে?’

– ‘কিছুনা।

– ‘আপনার কি ‘কিছুনা’ রোগ হয়েছে নাকি আজকে?’

– ‘কিছুনা রোগটা আবার কী জিনিস?’

– ‘প্রতিটা প্রশ্নের উত্তরে কিছুনা বলা। এটাকে বলে কিছুনা রোগ।’

– ‘আপনি বড় বেশি ফালতু কথা বলেন।’

– ‘আজ সারাদিন তো কোনো কথাই বলিনি। তবুও বিরক্ত হচ্ছেন কেন?’ অভিজিৎ একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘বিরক্ত হচ্ছিনা।’

-‘শীত করছে খুব। চলুন বাংলোয় ফিরে যাই। আর আপনি যে আমাকে হাতির মাথায় চড়াবেন বলেছিলেন? সেটা কখন হচ্ছে?’

– ‘হাতির মাথায় নয়, হাতির পিঠে।’

– ‘ওই একই।’

– ‘এখন তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে হলেও হতে পারে।’

পার্কের ভেতরে বন দফতরের অফিস আছে। রাতের খাবারের ব্যবস্থা অভিজিতের অফিস থেকেই করা হল। অফিস ঘরের সামনে অনেক রাত অবধি চলল মাদলের তালে তালে পাহাড়ি নাচ। সত্যি বলতে কি, ভালো লাগছিল বিভার। গত চার দিন একটানা ঘরের ভেতর একাকী বসে থেকে মনের মাঝে যে চাপটা সৃষ্টি হয়েছিল সে চাপটা ধীরে ধীরে লঘু হয়ে আসছিল। একটু রাত করেই বাংলোতে ফিরলো ওরা। বাংলোর ঘরে আসবাব বলতে শুধু একটি ডাবল খাট, এবং এক কোণে রাখা কাঠের টেবিল চেয়ার। কাঠের দেয়ালে টাঙানো আছে বুনো হাতি এবং বাইসনের ছবি। ল্যাম্পশেডে জ্বলছে টিমটিমে একটি কম পাওয়ারের বাতি। সেই বাতিতে কিচ্ছু স্পষ্ট দেখা যায়না। কাঠের মেঝে বরফের মত ঠান্ডা। ক্লজেট খুলে দেখা গেল কোনো স্পেয়ার চাদর বা কম্বলও নেই। এরকম জানলে বাড়ি থেকেই চাদর, কম্বল এসব প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসা যেত। বিভা ওয়াশরুমে গিয়েছিল কাপড় পাল্টাতে। ঘুমোনোর পোশাক পরে ওয়াশরুম থেকে সে বেরোতেই অভিজিৎ একদম কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে বলল, ‘সরি এখানে কোনো এক্সটা চাদর বা কম্বল নেই। মেঝে খুব ঠান্ডা। এই শীতের রাতে মেঝেতে ঘুমোনো কোনো ভাবেই সম্ভব না। এক কাজ করি। আপনি এখানে শুয়ে পড়ুন। আমি অফিসে চলে যাই। সোফায় দিব্যি রাত কাটানো যাবে।’

বিভা আঁতকে উঠে বলল,’সেকী! এই জঙ্গলের মধ্যে পুরো একটা ঘরে আমি একলা থাকবো?’

– ‘ভয় পাবেন?’

– ‘পাবোই তো!’

– ‘ভয় কী? পাশেই তো আরো বাংলো আছে। হাঁক ডাক করলেই লোক পেয়ে যাবেন।

– ‘আপনি কোথথাও যাবেন না। এখানেই থাকবেন!’ হুকুম করল বিভা।

অভিজিৎকে চিন্তিত দেখালো, ‘তাহলে··· আচ্ছা আমি দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা।’

পকেট থেকে মোবাইল বের করে সে ডায়াল লিস্ট ঘেঁটে কাকে যেন ফোন করতে যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় বিভা একটু নরম গলায় বলে বসল, ‘ইয়ে··· আপনি মাইন্ড না করলে আমরা বেড শেয়ার করতে পারি।’

অভিজিৎ চমকে উঠল। বিস্মিত নয়নে তাকালো চকিতে বিভার দিকে। বিভা কথাটা বলেই মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। বলার সময় লজ্জা লাগেনি কিন্তু বলে ফেলার পর অভিজিতের ওই চমকে ওঠা মুখখানা দেখে দারুণ এক লজ্জাজনক অস্বস্তি তে পেয়ে বসল তাকে।

অভিজিৎ অস্ফুটে বলল, ‘কী বললেন?’

বিভা আঙুল দিয়ে বিছানার চাদরের ওপর আঁকিবুকি করতে করতে বলল, ‘না বলছিলাম যে, আপনার আপত্তি না থাকলে··· আমরা বেড শেয়ার করতে পারি।’

অভিজিৎ এর মুখটা হয়েছিল দেখার মত। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। কিছুক্ষণ থ্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকার পর খুব মন্থর ভাবে সে মোবাইলটা

পকেটে পুরে রাখল। বিভার সেই মুহূর্তে ওর নার্ভাস চেহারা দেখে হাসি পেয়ে গেল। অভিজিৎ আড়চোখে হাসিটা দেখে নিয়ে বলল, 'অত হাসির কী আছে?'

বিভা কিছু বলল না। হাসতেই লাগল। খানিক বাদে মাথায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল সে। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আগামীকাল সামির জন্মদিন। তার মুখে ঝুলে থাকা মিটমিটে হাসিটি ধীরে ধীরে মুছে যেতে লাগল। ওরা নিশ্চয়ই সামির জন্মদিন উপলক্ষ্যে হৈ হুল্লোড় করবে অনেক। হৃদি বলেছিল কী নাকি সারপ্রাইজ পার্টির আয়োজন করা হচ্ছে। সবকিছু থেকে বিভা বাদ। সবাই আগের মতোই আছে, শুধু বিভাকেই মেনে নিতে হচ্ছে এই বনবাসের একাকী জীবন। তার ভাগ্যটা এতো খারাপ হল কেন? দূর থেকে সেই কুয়াশাটা ধেয়ে আসছিল, ফিরে আসছিল মনের গুমোট। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল তার। আজকাল বেশি মন খারাপের সময় দম আটকে আসার উপক্রম হয়। সে বড় একটা শ্বাস ফেলে কম্বলটা মুখের ওপর থেকে সরালো। অভিজিৎ ঘরের ভেতর চিন্তিত মুখে পায়চারি করছে। বিভা উঠে বসতে বসতে বলল, 'সারাক্ষণ এতো কী আকাশ পাতাল চিন্তা করেন আপনি? ভীষণ বোরিং ব্যাপার স্যাপার।'

অভিজিৎ হাঁটা থামিয়ে বিভার দিকে তাকাল। খুব জরুরি গলায় বলল, 'আপনার প্ল্যান কী?'

– 'কীসের প্ল্যান?' বিরক্তি ঝরে পড়ছে বিভার কণ্ঠ থেকে।

অভিজিৎ হেঁটে আসল বিভার দিকে। বিছানায় বসল পা তুলে। গম্ভীর ভাবে বলল, 'আপনি কী করবেন ভবিষ্যতে, কিছু ঠিক করেছেন?'

-'কী সব আজাইরা কথা বলছেন আপনি? আমি আবার কী করব?'

-' না মানে, আপনি তো ডিভোর্স চেয়েছিলেন আমার কাছে, তাইনা?' বিভা অভিজিতের বলা শেষ কথাটা শুনে একটু কেমন চুপসে গেল। দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল তাকে ক্ষণিকের জন্য।

– 'আপনি ডিভোর্স দিতে চাইলে দিতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই।'

– 'আর দিতে না চাইলে?'

বিভার বুকের ভেতর এক খন্ড কষ্টের মেঘ গুরুগুরু শব্দে ডেকে উঠে কান্নার বৃষ্টি নামানোর আয়োজন করছিল তখন। সে চিবুকটা গলার সাথে লাগিয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, 'না দিলেও সমস্যা নেই।'

– 'আপনি তো আপনার বয়ফ্রেন্ডকে কখনো ভুলতে পারবেননা, পারবেন কি?'

বিভার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। সে তার জল টসটসে ডাগর চক্ষু দুটি অভিজিতের মুখের ওপর মেলে ধরে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, 'অভিজিৎ, আমার মনটা অসম্ভব রকমের খারাপ। আপনি কি এসব ফালতু কথা বলা বন্ধ করে অন্য কিছু বলবেন দয়া করে?'

– 'অন্য কী বলব?'

– 'আমার মাথা আর আপনার মুন্ডু বলবেন।

– 'তখন ওয়াচ টাওয়ারে দাঁড়িয়ে যা ভাবছিলাম তা বলব এখন?'

-'বলুন।'

অভিজিৎ একটা বড় নিশ্বাস ফেলল, 'ভাবছিলাম আমি যদি আপনাকে কখনো হঠাৎ করে জড়িয়ে ধরি, তাহলে আপনি কি খুব রেগে যাবেন কিনা।

বিভা স্তব্ধ চোখে তাকাল অভিজিতের দিকে। অভিজিতের মুখে তখন খেলছে নিদারুণ এক অস্বস্তি। কথাটা বলে ফেলার পর তার মনে হচ্ছে না বলাই বুঝি ভালো ছিল। নিজেকে খুব ছোট লাগছে এখন মেয়েটার কাছে। নত মুখে স্থির হয়ে বসে রইল সে। বিভা কিছু বলছেনা। না বলাই শ্রেয়, কারণ অভিজিৎ জানে, মেয়েটা নিষ্ঠুর কথা মুখের ওপর বলে দিতে বড্ড ওস্তাদ। এখন নিশ্চয়ই এমন কোনো অপ্রীতিকর কথা মুখের ওপর ছুঁড়ে দেবে যা শুনে অভিজিতের অপমানে মাটি খুঁড়ে লুকিয়ে পড়তে মন চাইবে। একেকটা সেকেন্ডকে একেকটা ঘন্টা মনে হচ্ছিল যেন। ভারী অস্বস্তি হাওয়ায়! একটা সময় বিভা ধীর স্বরে বলল, 'না, রাগ করবো না।'

অভিজিৎ চমকে উঠল। তার হৃৎপিণ্ডটা কেউ একজন আকস্মিক ভাবে ধনুকে বাঁধা তীরের মত পেছন দিকে টেনে ধরে ছেড়ে দিল শূন্যে, ক্ষিপ্র গতিতে। অনেকক্ষণ অবধি সে কোনো কথা খুঁজে পেলোনা। বিস্ময় ভরা চোখে চেয়ে রইল শুধু বিভার দিকে। তাকে যেন বুদ্ধি বৈকল্যে পেয়েছে। কিছু বলার না পেয়ে, করার না পেয়ে সে চোখ থেকে সময় নিয়ে মোটা কাচের চশমাটা খুলল। মাথা চুলকে বলল, 'আচ্ছা।'

তারপর ধীরে ধীরে কম্বলটা গায়ে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল। বিভা ওর কান্ড দেখে আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'মানে কী? আপনি শুয়ে পড়লেন কেন?'

– 'কী… করব?'

– ‘কী করবেন মানে? বললাম তো আমি রাগ করবো না!’

– ‘শুনলাম তো!’

– ‘তাহলে শুয়ে পড়লেন কেন?’

– ‘আমি বলেছি হঠাৎ করে…। কথা বোঝেন নি?’

– ‘হঠাৎ ফটাৎ বুঝিনা। যা করার এখনই করেন।’

-‘কী মুশকিল!’

– ‘উঠুন! শোয়া থেকে উঠুন বলছি।’

অভিজিৎ অস্বস্তি নিয়ে উঠে বসল। তাকাল বিভার দিকে।

– ‘এবার আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরুন।’ আদেশ করল বিভা

অভিজিতের বুক চিরে একটা দীর্ঘ কম্পন যুক্ত নিশ্বাস বেরিয়ে আসল। রুদ্ধ গলায় অতি কষ্টে বলল, ‘শ্রীমতি বিভাবরী দেবী! যা বলার ভেবে চিন্তে বলুন। আমি একবার ধরলে কিন্তু জীবনে আর কোনো দিন ছাড়ব না!’

এ কথার পর বিভা আর কিছু বলতে পারলোনা। তার চোখ থেকে অনবরত গড়িয়ে পড়তে থাকলো জল।

২৪

রাত নয়টার পর আকাশ মোবাইল কেনার বাহানা করে সামিকে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। বেরোনোর কথা ছিল রুদ্রর, কিন্তু যাবার আগ মুহূর্তে সে বন্ধুদের জানালো যে সামির জন্মদিনের গানটা এখনো লেখা হয়নি। তাই কিছু সময় তার নিরিবিলিতে কাটানো খুব জরুরি। সামিকে নিয়ে আকাশ বেরিয়ে যাবার আধঘন্টার মাথায় অমৃতা আর হৃদি চলে আসলো। অমৃতার হাতে মিস্টার বেকার থেকে কেনা বিশাল বড় কেক। হৃদির হাত ভর্তি ঘর সাজানোর সরঞ্জাম। এসেই ওরা দুজন কাজে লেগে গেল, আর রুদ্র গেল তার নিজের ঘরে গান লিখতে। এক কাপ কফি সঙ্গে নিয়ে। তার ভাব দেখে অমৃতা আর হৃদি হেসেই বাঁচেনা। হৃদি হাসতে হাসতে অমৃতাকে বলল, 'রুদ্রকে দেখে আমার বিশ্ব কবি রোদ্দুর রায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আজকে নিশ্চয়ই সে বিশেষ কিছু পয়দা করবে।

গান লেখা শেষ করে রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল সারা ফ্ল্যাট নীল আর সাদা বেলুন দিয়ে সাজানো হয়েছে। ডাইনিং রুমের দেয়ালে নীল ব্যানারের ওপর সাদা কাগজ দিয়ে লেখা হয়েছে, হ্যাপি টোয়েন্টি সিক্সথ বার্থডে টু সামি। খাবার আনা হচ্ছে বাইরে থেকে। সামির নান্নার বিরিয়ানি খুব পছন্দ তাই ঠিক হয়েছে আজকে সবাই নান্নার বিরিয়ানিই খাবে। আয়োজন দেখে রুদ্র মুখ গোঁজ করে বলল, 'এইসব কী মামা? আমার জন্মদিনে তো এতকিছু হয়নায়। সামির জন্যে এত আয়োজন কেন হবে? এভাবে খেলবো না।'

অমৃতা জবাবে বলেছে, 'সামির কয়দিন আগে ব্রেকআপ হইছে, বাপ মায়ের সাথেও সম্পর্ক ভালো না। তার মন ভালো করার জন্য এসব করা হচ্ছে। নিজের সাথে মিলাচ্ছিস কেন?'

কথাটা শুনে রুদ্র ভারী আহত হল-'তাতে কী? আমার তো সারাজীবন ধরেই ব্রেকআপ চলতেছে। বিরহের উপরেই আছি। এই জিনিসটা তোমরা একটু বিবেচনায় রাখবা না? এটা তো ফেয়ার হইলো না।'

– 'আচ্ছা তোর নেক্সট বার্থডের আগে একটা সত্যিকারের প্রেম করে সত্যি কারের ব্রেকআপ করিস। তারপর তোর জন্যেও এসব করা হবে।'

– 'নেক্সট বার্থডে তে আমি দেশেই থাকবো না।'

– 'তাহলে আর কী করা? তোর তখন কত নতুন নতুন বন্ধু হবে। বিদেশী বন্ধু সব। আমাদেরকে কি আর মনে থাকবে?'

– 'এসব কথা বলে লাভ নাই। আমি বুঝে গেছি তোরা সামিকে ভালোবাসিস, আমাকে বাসিসনা।'

– 'খুব ভালো বুঝছিস। ইঞ্জিনিয়ারদের যে এত বুদ্ধি তা আমি আগে জানতাম না।

– 'না ইঞ্জিনিয়ারদের আর বুদ্ধি কোথায়, বুদ্ধি তো তোমাদের মত লায়ারদের একার সম্পত্তি।'

সব কাজ হয়ে গেলে ওরা ড্রইং রুমে এসে বসলো। এখন শুধু বারোটা বাজার অপেক্ষা। হৃদিতা পাশের বাসার এক দম্পতিকেও দাওয়াত করেছে। এই দম্পতি প্রায়শই রুদ্র সামির খোঁজ খবর নেয়। মেয়েটি মাঝে মাঝে ভালো মন্দ রান্না করে পাঠায়। স্বামী স্ত্রী দুজনেই সপ্রতিভ, মার্জিত এবং মিশুক প্রকৃতির। সিঁড়িতে বা লিফটে হঠাৎ দেখা হলে আপন লোকের মত হেসে কথা বলে।

রুদ্র বসার ঘরে গিটার নিয়ে বসেছিল। তার আউলবাউল চুল গুলোর অনেকটা অংশ কপালের ওপর পড়ে আছে অবহেলায়। চোখ বন্ধ করে সে গিটারের তারে টুংটাং করছে। খানিক বাদে একটু গম্ভীর গলায় সে দুই বান্ধবীকে বলল, 'তোরা কি গানটা একবার শুনে দেখতে চাস?'

হৃদি আর অমৃতা একত্রে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'না!'

রুদ্র ফাটা বেলুনের মত চুপসে গিয়ে বলল, 'এতো বড় অপমান!' ওর চুপসে যাওয়া মুখখানি দেখে অমৃতার বুঝি একটু মায়া হল। সে

পর মুহূর্তেই গলার সুর পাল্টে ফেলল, 'গাওয়া শুরু কর।'

– 'না এখন আর হবেনা। তোরা চান্স হারায় ফেলছিস।'

হৃদি বিড়বিড় করল,'শোকর আলহামদুলিল্লাহ যে চান্সটা হারায় গেছে।

– 'তুই আলহামদুলিল্লাহ বললি কেন?'

– 'ওমা, আলহামদুলিল্লাহ বলব না?'

– 'কেন বলছিস?'

– 'ফর এভরিথিং! এই যে আল্লাহ আমারে এত ভালো রাখছে। খাওয়াইতেছে, পরাইতেছে আমার তো উঠতে বসতে আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত। তোরাও বল।'

রুদ্র ব্যাপারখানা খুব ভালো মতোই বুঝল। বুঝতে পেরে তার মুখ ভার হয়ে গেল। বিষাদমাখা কণ্ঠে সে বলল, 'গুণী জনের কদর করতে জানলি না রে তোরা। যখন থাকব না আর, তখন বুঝবি। তখন এই রুদ্রর গান শোনার জন্য কাইন্দা মরলেও রুদ্র আর আসবেনা গান শুনাইতে। দেইখা নিস।'

অমৃতা রুদ্রর কথা পাত্তা না দিয়ে হাতে রিমোট তুলে নিয়ে টিভি চালু করল। রুদ্রর গান তাদের খুবই পছন্দ কিন্তু বন্ধুদের জন্মদিন উপলক্ষে সে যে গান গুলো বাঁধে সেগুলো বড়ই অখাদ্য হয়। সেই অখাদ্য হজম করা খুব সহজ কাজ নয়। হৃদি ওর হ্যান্ডব্যাগের চেইন খুলে চিরুনি বের করতে করতে বলল,'তোর চুলগুলা কি জীবনে আঁচড়াস না?'

– 'এতক্ষণে দেখলি তুই?' রুদ্রর কণ্ঠে অভিমান বেজে ওঠে ঝনঝন করে।

– 'আহা আমারতো তোর চুলের দিকে চাইয়া বইসা থাকা ছাড়া আর কাজ নাই।'

হৃদি চিরুনি হাতে নিয়ে রুদ্রর সামনে এসে দাঁড়ালো। বাম হাত দিয়ে ওর গাল টিপে ধরে মুখটা খানিক উঁচু করল। তারপর ডান হাত দিয়ে ওই জট লাগা চুল গুলো আঁচড়াতে আঁচড়াতে খিটখিটে গলায় বলতে লাগলো, 'চুলের যত্ন করতে পারেনা কিন্তু লম্বা চুল রাখা চাই তার। বিদেশে গেলে চুল আঁচড়ে দেবে কে? কী হবে তখন তোর?'

হৃদি গাল টিপে ধরে রাখায় রুদ্র কথা বলতে গিয়ে ঠিক মতো মুখ নাড়াতে পারল না। কিছু একটা বলল সে, যা শুনতে লাগলো, ব শ গ্লে বি শী মে দিয়ে।'

অমৃতা হেসে উঠে বলল, ‘এই শালা তো বিদেশ যাওয়ার আগেই বিদেশী ভাষায় কথা বলা শুরু কইরা দিছে।’

কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দেখা গেল পাশের বাড়ির ভাই ভাবি এসেছেন। সাথে তাদের ছয় বছরের বাচ্চা। বাচ্চা ছেলেটির নাম বুবুন। বুবুন হল দুষ্টুর শিরোমণি। রুদ্রকে দেখা মাত্র তার কোনও না কোনও উপায়ে ঘাড়ে উঠে বসা চাই আর ঘাড়ে চেপে বসা মাত্র শুরু হয়ে যায় চুল টানা টানির পালা। একবার তো বেশ কিছু চুল ছিঁড়ে গিয়ে তার হাতে চলে এসেছিল। বুবুনকে দেখে রুদ্রর মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল। সে বুবুনকে দেখেও না দেখার ভান করে গিটার বাজাতে লাগল মনোযোগ দিয়ে। কী দরকার ছিল এই বিচ্ছুটাকে আজকে দাওয়াত করে আনার? দিনটাই খারাপ যাচ্ছে তার। কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিল কে জানে।

অমৃতা চুপচাপ টিভি দেখছিল। সব কিছু প্ল্যান মোতাবেকই হচ্ছে। সামির জন্য আজকের দিনের বিশেষ সারপ্রাইজ হল তার বাবা। অথচ সেই বিশেষ ব্যক্তিটিই এখন পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কিছু জানান নি। একটু আগে অমৃতা টেক্সট করেছে। তিনি সেই টেক্সট এর উত্তরে কিছু লেখেন নি। উত্তর না পেয়ে অমৃতার মেজাজটা একটু চড়ে গেছে। রিমোট চাপতে চাপতে হঠাৎ একটি নিউজ চ্যানেলে চোখ আটকে গেল। চলছে লাইভ টক শো। একটা চেনা মুখ কথা বলছে। টক শো’ র বিষয় বস্তু সাম্প্রতিক এক রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। অমৃতা চকিতে অভিনিবিষ্ট হয়ে উঠল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, শুনতে লাগলো, বক্তার বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ, অঙ্গভঙ্গি এবং বাচনভঙ্গি।

হৃদি হঠাৎ বলে উঠল, ‘আরে এটা তো সামির আব্বা।’

রুদ্র তাকালো একবার টিভির দিকে। অমৃতার নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগটা লক্ষ্য করে বলল, ‘আমাদের উকিল আফাও আর কদিন পরে এসব টক শো, ফক শো করে বেড়াবে বলে আমার বিশ্বাস।’

– ‘ঠিক বলছিস। আমার কী মনে হয় জানিস? মনে হয় একদিন আমাদের অমৃতা বিশাল কিছু হবে।’

– ‘ফালতু কথা বলিস নাতো! শুনতে দে।’ বিরক্তি নিয়ে বলে উঠল অমৃতা।

– ‘এতো মনোযোগ দিয়ে শুনার কী হইল?’

অমৃতা হাত তুলে হৃদিকে থামিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, ‘বললাম না চুপ করতে?’

– ‘ওরে বাবা! হোয়াই সো সিরিয়াস?’ হৃদি অবাক।

অমৃতার মাথায় হঠাৎ করেই ভাবনাটা আসলো। লোকটা এখন এই রাত পৌনে এগারোটার সময় নিউজ চ্যানেলে টক শো করছেন। চলতি অনুষ্ঠানটা শেষ হবে কখন তার নেই কোন ঠিক ঠিকানা। অতএব তিনি কোনও ভাবেই আজ আর এমুখো হবেন না। এতবার অনুরোধ করার পরেও ইনি রাজি হলেন না কেন? খুব রাগ হয়ে গেল অমৃতার। এতক্ষণের মসৃণ ছন্দময় তালটা গেল কেটে। অসহ্য লাগতে লাগল রুদ্রর গিটারের আওয়াজ, হৃদির অযথা বকবকানি, এবং আনুসাঙ্গিক সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু! টিভি বন্ধ করে দিয়ে চট করে উঠে পড়ল সে।

বুবুন রুদ্রর হাঁটু ধরে ঝুলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ হল। সুর করে করে বলছে, ‘রুদ্র মামা! ঘাড়ে নাও! রুদ্র মামা! ঘাড়ে নাও!’

রুদ্র অনেক কষ্টে রাগ চেপে রেখেছে। দাঁত মুখ খিঁচে কানকাটার মতো বাজাচ্ছে গিটার। ভাবটা এমন যে বুবুনের কথা সে শুনতেই পাচ্ছেনা। এরকম বান্দরের রাজা সে গোটা জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখেনি। মনে চাইছে কষে একটা চড় মারতে বাঁদরটার গালে। ঠিক করল, এর বাপ মা এখান থেকে উঠে গেলেই আচ্ছা মতন একটা শিক্ষা দেবে বাঁদরটাকে। একটু ভেবে চিন্তে সে হৃদিকে বলল, ‘এই হৃদি, ভাইয়া ভাবিকে তোদের বার্থডে ডেকোরেশন দেখাইতে নিয়ে যা। ভাইয়া দেখে আসেন ওরা খুব সুন্দর করে ঘর সাজিয়েছে।’

এ কথায় কাজ হল। হৃদি লাফ দিয়ে উঠে বলল, ‘হ্যাঁ ভাবি আসেন, ভাইয়া আসেন, দেখে যান।’

ওরা উঠে পড়ার পর রুদ্র গিটার বাজানো থামিয়ে, দাঁত কিড়মিড় করে বুবুনকে বলল, ‘এই বান্দরের বাদশাহ! তর সমস্যা কী?’

বুবুন ফোকলা দাঁত বের করে হেসে, সুর করে বলল, ‘ঘাড়ে নাও, ঘাড়ে নাও।’

সিংহের মতো গর্জে উঠল রুদ্র,’ঘাড়ে নিব মানে? আমার ঘাড়টা কি তুই কলাগাছ পাইছস? এত সস্তা? পয়সা দে! ঘাড়ে উঠতে হইলে পয়সা দেয়া লাগব।’

বুবুনকে দেখে মনে হল সে রুদ্রর কথায় খুব মজা পাচ্ছে। হাঁটু ধরে ঝুলতে ঝুলতে এবার সে গান গেয়ে বলতে লাগল, ‘পয়সা লেবো! পয়সা লেবো!’

– ‘আরে কী যন্ত্রণা, তুই কেন পয়সা লইবি, পয়সা লমু আমি। তোরে ঘাড়ে তোলার চার্জ

বুবুন ফোকলা দাঁতে হাসে, সুর করে বলতে থাকে, ‘পয়সা লেবো! আমি পয়সা লেবো। ’

বুবুনের বাবা মা ফিরে আসল মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই। বুবুন এবার বাপ মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে নেচে নেচে গাইতে থাকল, ‘পয়সা লেবো, আহা আমি পয়সা লেবো! আহারে আমি পয়সা লেবো।’

বুবুনের বাবা অবাক গলায় বলল, ‘এ আবার কেমন কথা? পয়সা দিয়ে তুমি কী করবে?’

রুদ্র কান কাটার মতো হয়ে গিটার বাজাতে থাকল। এই বান্দরের বাদশাহ আজকে তাকে লোক সম্মুখে হেস্তনেস্ত করে ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

অমৃতা সামির ঘরের বাতি নিভিয়ে চুপচাপ অন্ধকারে বসে মোবাইলে গেম খেলছিল। হঠাৎ করেই তাকে ‘কিচ্ছু ভালো লাগেনা রোগে পেয়েছে। এই রোগটার তো কোনো নিয়ম কানুন নেই। সিম্পটম নেই। যখন তখন বিনা নোটিশে হাজির হয়ে যায়। কতক্ষণ কাটল কে জানে, আচমকা বেজে উঠল ডোর বেল। দুই মিনিটের মাথায় হৃদি দৌড়ে আসল এই ঘরে। দরজায় উঁকি দিয়ে চাপা গলায় বলল,

– ‘এই অমৃতা,ওঠ! সামির আব্বা আম্মা আসছে।’

কথাটা শোনা মাত্র অমৃতা জানেনা কেন, জীবনে প্রথমবারের মত সম্পূর্ণ বিনা কারণে তার বুক কেঁপে উঠল। স্নায়ু হয়ে উঠল টান টান!

.

সামি রাগে গজগজ করতে করতে রাইফেল স্কয়ারের সামনের ময়লা ফুটপাতের ওপর বসে পড়ল। চারিদিকে লোকজন গিজগিজ করেছে। ফুটপাতের ধার ধরেই দাঁড়িয়ে আছে অগণিত রিকশা, সি এন জি, গাড়ি। শীতকাল হলেও শীতের আমেজ নেই তেমন একটা। রাত সাড়ে দশটা বাজে। সামিকে ওরকম হঠাৎ করে ব্যস্ত রাস্তার ফুটপাতে বসে পড়তে দেখে আকাশ তাজ্জব বনে গিয়ে বলল, 'কী মামা, কাহিনী কী?'

সামির রাগ তখন আকাশচুম্বি। সে চিৎকার করে বলে উঠল, 'ফাইজলামি পাইছস তুই? আমারে কি তর গাধা মনে হয়? গরু মনে হয়? ছাগল মনে হয়? দুম্বা মনে হয়?'

আকাশ গম্ভীর মুখে বলল, 'চারটার একটাও মনে হয়না। অন্য কোনও অপশন আছে?'

– 'কুত্তা মনে হয়?'

– 'না দোস্ত!'

– 'তাহলে কী মনে হয়?'

– 'পাগল মনে হয়। শুধু আমার না। এই মুহূর্তে যত মানুষ তোরে দেখতেছে, সবাই পাগল ভাবতেছে। আমি শিওর।'

সামি জ্বলন্ত চোখে আশপাশটা একবার দেখল। মধ্যবয়স্ক এক ভিক্ষুক সামির ওই আগুন গরম মুখখানার দিকে চেয়ে হে হে করে হাসছিল ফুতপাতের এক কোণায় দাঁড়িয়ে। একটু আগে সামি তার ভিক্ষার থালায় দশ টাকার একটা নোট রেখেছে। এই মুহূর্তে ভিক্ষুকের অকৃতজ্ঞ হাসি দেখে তার গায়ে জ্বালা ধরে গেল। সে বিকট গলায় আকাশকে হুকুম করল, 'ওর ভিক্ষার থালা থেকে দশটাকার নোটটা ফেরত ল।'

।হুকুম শুনে ভিক্ষুকের মুখ হয়ে গেল কালো। হে হে হাসি পালাল এক ছুটে। আকাশ বন্ধুর আদেশ মান্য করতে এগিয়ে গেল তার দিকে। ভিক্ষুক আকুলি বিকুলি হয়ে বলল, 'এইটা কি কোন বিচার হইল ভাই?'

আকাশ উদাস গলায় বলল, 'বিচার কোথাও নাই ভাই। এই দুনিয়া হইল অবিচারের জায়গা।'

থালা থেকে দশ টাকার নোটটা নির্বিকার ভাবে তুলে নিল সে। ভিক্ষুক বেচারার মুখের রঙ পাল্টে গেছে। তার ভিক্ষার থালায় আজকে এটাই সবচেয়ে বড় নোট ছিল। বোকামির বশে সেই নোটটাও হারাতে হল। আকাশ নিজের পকেট থেকে দশটাকার আরেকটা নোট বের করে থালায় রাখল। এবার ভিক্ষুক খুব হেসে হেসে বলতে লাগল, 'এইডা একটা ভালো বিচার হইছে।'

আকাশ ফিরে আসতেই সামি ক্ষিপ্তবৎ হয়ে বলল, 'এতক্ষণ কী করলি?'

– 'একটা ভালো বিচার করে দিয়ে আসলাম।'

– ‘তামশা করস?’

– ‘আরে কিয়ের তামশা, জিগা ওরে।’ এটুকু বলে আকাশ চিৎকার করে ভিক্ষুককে জিজ্ঞাসা করল, ‘কী মামা কেমন বিচার হইল?’

ভিক্ষুক গদগদ ভাবে বলল, ‘খুব ভালো বিচার হইছে।

– ‘আমার ট্যাকা দে।’

আকাশ দশ টাকার নোটটা ফিরিয়ে দিল সামিকে। যে করেই হোক আর ঘণ্টা দেড়েক সময় এই ছেলেকে বসুন্ধরার ফ্ল্যাট থেকে দূরে রাখতেই হবে। সামির অবশ্য রেগে যাবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে। সীমান্ত স্কয়ার থেকে মোবাইল সেট কেনার কথা বলে বেরিয়েছিল আকাশ ওকে সঙ্গে নিয়ে। অনেকটা সময় ধরে বেশ কিছু দোকান ঘুরে তারা মোবাইল দেখেছে। সামি কাজটা করেছে বেশ আগ্রহ নিয়েই। ইলেক্ট্রনিক্স জিনিসের প্রতি সে ভয়াবহ রকমের আসক্ত। প্রযুক্তি ছাড়া এই ছেলে কিছুই বোঝেনা। সীমান্ত স্কয়ারে প্রায় ঘন্টা দেড়েক সময় ঘুরাঘুরি করার পর আকাশ জানালো যে সে একবার বসুন্ধরা সিটি গিয়ে মোবাইল সেট যাচাই বাছাই করে দেখতে চায়। দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনবে, যাচাই না করে হুট করে কিনে ফেলা নাকি উচিত হবেনা। সামি রাজি হল। বসুন্ধরা সিটি গিয়ে একটা গুগল পিক্সেল থ্রি এ সেট খুব পছন্দ হয়ে গেল তার। মূল্যও সুলভ। কিন্তু বেঁকে বসল আকাশ। এখন নাকি তার মনে হচ্ছে সীমান্ত স্কয়ারে যে স্যামসাং সেটটা দেখেছিল সেটাই বেশি ভালো। সেই মোবাইলটিই তার চাই। অগত্যা আবারো আসতে হল সীমান্ত স্কয়ারে। এরপর সেই স্যামসাং সেটের দোকানে গিয়ে আকাশের আকস্মিক ভাবে মনে পড়ল যে তার সাথে আসলে কোনো টাকা পয়সা নেই আজ। পকেট গড়ের মাঠ! সামি দিশাহারা হয়ে বলল, ‘টাকা নাই তো কী হইছে? ক্রেডিট কার্ড দিয়া কিনে ফ্যাল।’

আকাশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়ে, ওয়ালেট হাতড়ে, সামিকে জানালো যে ক্রেডিট কার্ড বাড়িতে ফেলে এসেছে। সেই থেকে সামির মেজাজ হয়ে আছে ফুটন্ত তেলের মত উত্তপ্ত।

আকাশ, সামির পাশে বসে বলল, 'দোস্ত আমার মাথায় একটা প্ল্যান আছে।'

– 'তোর প্ল্যানের আমি গুষ্টি কিলাই।'

– 'চেতস ক্যান মামা? শোন না আগে প্ল্যানটা।'

সামি পকেট থেকে মোবাইল বের করতে করতে বলল, 'না আমি আর তোর কোনো কথাই শুনবনা। তোর দান এখানেই শ্যাষ।'

আকাশ বলতে থাকল, 'শোন আমরা ঠিক করছি তোর বিয়ের আগে আমরা একটা ব্যাচেলর পার্টি করুম। স্ট্রিপার ভাড়া কইরা আনমু। মদ উদ খাইয়া টাল হইয়া যাব পুরা। তারপর তুইও গান গাবি, কাল মেরা শাদী, আজ আজাদি! বুঝছস?'

– 'হ, আরো কিসু।'

– 'কারে ফোন করস?' আকাশের প্রশ্ন।

– 'তুই আমার সাথে কী কান্ডটা করছিস আজকে, এই কথাটা সবাইরে জানাইতে হবেনা?'

– 'তুই হৃদিরে ফোন করতেছিস তাইনা?'

সামি ফোন কানে নিয়ে বলল, 'হ।'

আকাশ ছোঁ মেরে ওর কান থেকে ফোনটা টেনে নিয়ে বলল, 'তুই কথায় কথায় খালি হৃদিরে ফোন দেস ক্যান? সমস্যা কী? গতকাল মাইয়া দেইখা তোর পছন্দ হইছে এই কথাটা তুই সবার আগে হৃদিরে বলছস। কথা ঠিক কিনা?'

'হ ঠিক।'

– 'ওই শালা, আমারে না বইলা তুই হৃদিরে বলছিস কেন? তোর কাছে হৃদি বড় না, আকাশ বড়?'

ঠিক সেই সময় পেছন থেকে দুজনের পিঠের ওপরে একযোগে দুটি থাপ্পড় এসে পড়ল বজ্রপাতের মতো। চমকে উঠে পেছনে তাকিয়ে রাস্তার ফ্লুরোসেন্ট আলোয় ওরা একটা চেনা মুখ আবিষ্কার করল। স্কুল শিক্ষক, মামুন স্যার। সমাজ বিজ্ঞানের টিচার ছিলেন তিনি। থাপ্পড়টা এত জোরে এসে পড়েছে যে দুজনেরই পিঠ জ্বলছে তখনও প্রচন্ড ভাবে। স্যার ওদের কান খামচে ধরে বসা থেকে টেনে তুলতে তুলতে বললেন, 'এই চামচিকা গুলা, তোরা দুইটা সব সময় একসাথে থাকিস কেন? ব্যাপারটা কী?'

মামুন স্যার দেখতে বেঁটেখাটো মানুষ। কিন্তু গায়ে প্রচন্ড জোর। স্কুলেও তিনি শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ছাত্রদের পেটাতেন। কত বছর কেটে গেল মাঝে। লম্বায় আকাশ, সামি স্যারের উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেল কিন্তু স্যারের হাতের জোর এখনও বিন্দু মাত্র কমল না। মারামারি ছাড়াও স্যারের আরেকটি বদ অভ্যাস আছে। সেটা হল স্যার ছাত্রদের দেখলেই পেটে সুড়সুড়ি দেন। শুধু সুড়সুড়ি দিয়ে ক্ষান্ত হন না। একটা দুটা রাম চিমটিও কেটে দেন সুযোগ বুঝে। চিমটিটা সবচেয়ে ভয়ংকর।

আকাশ স্যারের হাত থেকে নিজের কান ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, ‘একসাথে থাকব না কেন স্যার? আমরা তো বি এফ এফ।’

– ‘বি এফ এফ আবার কী জিনিস?’

উত্তরটা সামি দিল,’বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার।’

কথাটা শুনে স্যার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন, ‘ঊঊঊ… বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার? ছিনেমা না? লাইফটাকে ছিনেমা লাগে?’ বলতে বলতে তিনি আকাশের পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি দিতে লাগলেন। আকাশ হো হো করে হাসা শুরু করল। স্যার বললেন, ‘বিয়া শাদী কিছু করিস নাই? তোদের বয়সে থাকতে তো আমি বাচ্চার বাপ হয়ে গেছিলাম।’

আকাশ দু পা পিছিয়ে গিয়ে স্যারের হাতের নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টা করল, বলল, ‘স্যার, সামির বিয়া হইতে পারে এই বছর। দোয়া কইরেন।’

স্যার এবার সামির পেটে একটা রাম চিমটি কেটে আবারও মুখ দিয়ে সেই অদ্ভুত শব্দ করে বললেন, ‘উউউ… বিয়া করবি? দাওয়াত কই? স্যাররে দাওয়াত না দিয়া নাচতে নাচতে বিয়া করবি? এতো সাহস?’

– ‘দাওয়াত পাবেন স্যার, যথা সময়ে দাওয়াত পাবেন।’ সামি বলল।

– ‘তোদের দলে না একটা পাংকু ছিল? সেই পাংকু কোথায়?’

ওরা বুঝল স্যার রুদ্রর কথা বলছেন।

-‘পাংকু তো স্যার বিদেশ যাইতাছে। পি এইচ ডি করতে।’

– ‘তাই নাকি? কবে?’

– ‘এইতো এই বছরের শেষে।’

স্যার হাসতে হাসতে বললেন, ‘পাংকু করবে পি এইচ ডি, আর তোরা কী করবি? ফুটপাতে বসে ভিক্ষাবৃত্তি? বাসা থেকে বাইর কইরা দিছে নাকি? ফুটপাতে বইসা আছস ক্যান?’

আকাশ আর সামি স্যারের এই কথার প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। তারা জানে মামুন স্যার আরো অনেকটা ক্ষণ যাবৎ অযথা বকবক করবেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেই বকবকানি শুনতে হবে নিরুপায় হয়ে। স্কুলের স্যার বলে কথা। যতই বিরক্তিকর হোক না কেন স্কুলজীবনের শিক্ষকদের দেখলে যে আসলে মনটা পবিত্র হয়ে যায়, এ সত্যটা তারা দুজনেই ভেতরে ভেতরে গভীর ভাবে অনুভব করল। এছাড়া আকাশ মনে মনে নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে স্যারের উছিলায় অন্তত বাড়তি কিছু সময় সামিকে আটকে রাখা যাবে।

২৫

হক সাহেব ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতেই উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে একটি অনভিপ্রেত চাঞ্চল্য দেখা দিল। ড্রইংরুমের সোফায় পা তুলে বসে থাকা রুদ্র তাঁকে দেখা মাত্র লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। পাশের বাসার দম্পতিও এই সম্মানটুকু দেখাতে দ্বিধা বোধ করলনা। এই ব্যক্তিটিকে চেনেনা এমন লোকের সংখ্যা বাংলাদেশে একেবারেই কম বর্তমানে। তিনি কেবল মাত্র দেশের ধনাঢ্য ব্যাক্তি তালিকার প্রথম সারির একজন তাই নয়, রাজনৈতিক অঙ্গনেও বেশ পরিচিত এক মুখ। রোমেলা এই বাসায় প্রায়ই

আসেন ছেলেকে দেখতে। কিন্তু হকের এই প্রথম আসা। রুদ্র তো এঁকে যমের মত ভয় পায়। সর্বদা এড়িয়ে চলে। সামির বাড়িতে থাকা কালীন সময়ে লোকটার সাথে তার কথা হয়েছে হাতে গোনা দুই একবার। দৈবক্রমে সামনে পড়ে গেলে একটা সালাম দিয়েই পালিয়ে যেত সে। বলতে কি বন্ধুদের কেউই এই অহংকারী দম্পতি টিকে খুব একটা পছন্দ করেনা। সামির আম্মা অহংকারী এবং ঠোঁটকাটা হলেও আদতে দুর্বল বুদ্ধির অধিকারিণী। তাই তার ডাঁটিয়াল কথাবার্তা গুলো বোকামি মনে করে কোনও এক ভাবে হজম করে ফেলা যায়। কিন্তু হকের ব্যাপারটা অন্যরকম। তিনি একাধারে অহংকারী, বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং অটল ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এঁর মুখের ওপর চট করে কিছু বলা যায়না। আবার খুব বেশিক্ষণ এঁর উপস্থিতি সহ্যও করা যায়না। হাঁসফাঁস লাগে।

রোমেলা ঘরের ডেকোরেশন দেখে বললেন, 'বাব্বাহ ভালোই তো সাজিয়েছ!'

– 'জ্বি আন্টি, ডাইনিং রুমটাও সাজিয়েছি। আসুন দেখে যান।' রোমেলা হৃদির সাথে ডাইনিং এ চলে গেলেন। তাদের পেছন পেছন পাশের বাড়ির মেয়েটিও আসল। হক বসলেন ড্রয়িং রুমের সোফায়। রুদ্রদের দাঁড়িয়ে থাকতে থেকে বললেন, 'বসো, বসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

পাশের বাড়ির ছেলেটার নাম ফয়সাল। বেশ মিশুক এবং স্মার্ট ছেলে। কিন্তু এ মুহূর্তে হক সাহেবের সামনে বসে থেকে তার মাঝে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট ভাব কাজ করছে। এমন যশস্বী ব্যক্তির সাথে ঠিক কীভাবে কথা শুরু করা যায় তা সে বুঝে উঠতে পারছেনা। সে এবং রুদ্র দুজনেই বসে আছে নত মুখে। বিকার নেই শুধু বুবুনের। সে সমানে নেচে নেচে বলে যাচ্ছে তখনও 'পয়সা লেবো! আমি পয়সা লেবো!'

হক বুঝতে পারছেন না এতটুকু বাচ্চা পয়সা দিয়ে কী করবে। তিনি ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ বাচ্চা ছেলেটির দিকে চেয়ে থেকে ফয়সালকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার ছেলে?'

– 'জি স্যার।' বলল ফয়সাল।

– 'কী বলছে ও?'

ফয়সাল মিনমিন করে বলল,'কেন যে হঠাৎ পয়সা পয়সা করছে আমার ছেলেটা ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

রুদ্র চোরের মত আড়চোখে তাকাল একবার বুবুনের দিকে। এই বুলি যে রুদ্র শিখিয়েছে সেই সত্য কথাটা আবার সবার সামনে ফট করে বলে বসবেনা তো বান্দরের বাদশাহ? কথাটা মাথায় আসতেই রুদ্র বড় ব্রিত বোধ করতে লাগল।

হক এবার রুদ্রকে বললেন,'তোমার কী খবর?'

– 'এইতো আংকেল ভালোই।'

হক জানেন এই ছেলেটি ভালো ছাত্র। তার পুত্রের বন্ধুদের মধ্যে এই ছেলেটি এবং অমৃতা, এই দুটি ছেলেমেয়ের মাথা ভালো। তার পুত্র যে ছাত্র খারাপ, তা নয়। কিন্তু পড়ালেখা বা ক্যারিয়ার নিয়ে সে কখনই খুব একটা সিরিয়াস ছিল না। একমাত্র সন্তানের লেখাপড়ার ওপর খুব বেশি চাপ সৃষ্টি করেননি তিনি কখনও। কিন্তু রুদ্র

নামের ছেলেটি ছাত্র ভালো হলেও এর চলাফেরা উজবুকের মতো। মাথা ভর্তি লম্বা চুল নিয়ে গিটার বাজিয়ে ষাঁড়ের মত চ্যাঁচায় সারাদিন। এই একটি কারণেই তিনি ছেলেটিকে অপছন্দ করেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ অপছন্দে কিছু এসে যায়না। সামির হৃদয়ে বন্ধুদের জন্য আছে এক সমুদ্র পরিমাণ ভালোবাসা। তিনি জানেন, তার পুত্রের বন্ধুরা একদিকে, দুনিয়া আরেকদিকে।

রুদ্র কিছুক্ষণের মাঝেই অস্থির হয়ে উঠল। তার মনে হচ্ছে এমন বিরক্তিকর পরিস্থিতিতে এর আগে সে কোনোদিন পড়েনি। অমৃতার ওপর রাগ হচ্ছে। কী দরকার ছিল এই রাগী, খিটখিটে লোকটাকে দাওয়াত করে ডেকে নিয়ে আসার? পার্টির আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল। সে একটু ইতস্তত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এক্সকিউজমি আংকেল, আমার একটা জরুরি ফোন করতে হবে। আমি একটু আসছি।'

হক হেসে বললেন,'নো প্রব্লেম।' তিনি জানেন তার পুত্রের বন্ধুদের মাঝে তার সম্পর্কে একটি ত্রাস বা শঙ্কা কাজ করে সর্বক্ষণ। এদের কারও সাথে তিনি কখনও খারাপ ব্যবহার করেন নি। ধমকও দেন নি। তবুও এরা তাকে সহজ ভাবে নিতে পারেনা। যমের মতো ভয় পায়। ব্যতিক্রম শুধু একজন! আচ্ছা, সেই বিচ্ছু মেয়েটি কোথায়? যার অনুরোধের ঢেঁকি গিলতেই এই ফ্ল্যাটে তাঁকে আসতে হল শেষ পর্যন্ত? হক ঘাড় ঘুরিয়ে ডাইনিং রুমের দিকে তাকালেন। ড্রয়িং কাম ডাইনিং এর মাঝখানে পর্দা দিয়ে পার্টিশন দেয়া হয়েছে। পর্দার ফাঁকে ডাইনিং টেবিলের একাংশ দৃশ্যমান হয়ে আছে। টেবিলের সাথের লাগোয়া চেয়ারে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী। অন্য কিছু দেখা যাচ্ছেনা। রুদ্র ঘর থেকে বেরোতেই বুবুন লাফঝাঁপ দিয়ে ওর পেছন পেছন দৌড়ে গেল। খানিক বাদে ফয়সালও টয়লেট যাবার বাহানা দিয়ে উঠে পড়ল। হক বসে রইলেন একা।

অমৃতা ডাইনিং এ এসে দেখতে পেল সামির আম্মাকে। মহিলার পরনে হালকা সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ি। গলায় কানে হীরের পাথর খচিত সোনার গয়না। ফর্সা গালে ব্লাশনের লাল ছোঁয়া। ঠোঁটে কফি কালারের লিপস্টিক। গা থেকে উড়ে আসছে বিদেশী দামি পারফিউমের ঘ্রাণ। ডাইনিং এর চেয়ারে বসে তিনি হাত নেড়ে নেড়ে হৃদির সাথে কথা বলছেন। অন্য কাউকে কিছু বলার সুযোগ দিচ্ছেন না। একবার কথা বলা শুরু করলে তিনি থামতে ভুলে যান। হৃদি এবং পাশের বাসার ভাবি হা করে তার কথা গিলছে। অমৃতা রোমেলার পাশে এসে দাঁড়াল। সালাম দিয়ে বলল, 'আন্টি কেমন আছেন?'

রোমেলা এক গাল হেসে বললেন, 'খুবই ভালো। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সামির এনগেজমেন্টের ডেট প্রায় ফিক্স করে ফেলেছি। আর জানোই তো, সামির মেয়ে খুব পছন্দ হয়েছে।'

অমৃতা হৃদির দিকে তাকাল এক পলক। সামি বন্ধুদের জানিয়ে দিয়েছে যে মেয়ে তার মোটামুটি পছন্দ। বিয়ে করলে নাকি সে এই মেয়েকেই করবে। কিন্তু অমৃতা লক্ষ্য করেছে সামির এই সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে হৃদির আচরণে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে সামির বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে তার চোখ মুখের ভঙ্গি। যেমন এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে বিয়ের টপিক নিয়ে আলোচনা করতে সে মোটেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেনা।

রোমেলার বকবক শুনতে শুনতেই অমৃতা ড্রয়িং রুমের দিকে তাকাল। পর্দার ফাঁক দিয়ে লোকটার মুখের এক পাশ দেখা যাচ্ছে। সাদা পাঞ্জাবী তার পরনে। গালে কয়েকদিনের অযত্নের দাড়ি। জুলপিতে হালকা সাদা আঁচড়। রুদ্র কিংবা ফয়সাল কেউ নেই ওখানে। মানুষটাকে একলা বসিয়ে রেখে এরা অন্য ঘরে চলে গেছে। এদের কি ন্যূনতম ভদ্রতা জ্ঞান নেই?

– ‘তুই দাঁড়ায় আছিস ক্যান? বসে পড়।’ বলল হৃদি, অমৃতাকে।

কী করবে অমৃতা? লোকটার সাথে একবার দেখা করে আসবে কি? নাকি এখানে বসে পড়বে হৃদির কথা মতো? সিদ্ধান্তহীনতায় সে খুব একটা ভোগেনা। তবে আজকে হালকা দোটানায় পড়ে গেল। সেই সময় লোকটা আচমকা তাকাল ঝুলন্ত দুটি পর্দার মাঝ বরাবর জায়গাটিতে। যেখানে এই মুহূর্তে অমৃতা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়ল। কয়েক মুহূর্তের অস্বস্তি। তারপর অমৃতা হৃদিকে আস্তে করে বলল, ‘দাঁড়া, আসতেছি।’

কথাটা বলা শেষ করে ধীর পায়ে হেঁটে আসল বসার ঘরে। একটা শিহরণ টের পাচ্ছিল সে ভেতরে ভেতরে। মনোবীণায় আজ বাজছে এক অন্যরকম সুর। এ সুর তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন এবং অচেনা। আশ্চর্য! এরকমও হয় নাকি? সে একটা বড় শ্বাস নিল। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম!’

হক সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে বললেন,’কেমন আছ?’

– ‘ভালোই, আপনি?’

– ‘এইতো চলছে। বসো। দাঁড়িয়ে কেন?’

অমৃতা বসল। উল্টোদিকের সোফায়, মুখোমুখি। হক চোখ তুলে তাকালেন সম্মুখে বসা মেয়েটির দিকে। কালো ঢোলা টিশার্ট। কালো জিন্স মুখে কোনো প্রসাধন নেই। ছেলেদের মতো ছোট ছোট করে চুল ছাটা। এর আগে মেয়েটিকে কখনো এতটা নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করা হয়নি। আগে যতবার দেখা হয়েছে একে অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাবের একজন বলেই মনে হয়েছে তাঁর কাছে। হাঁটা চলায় পুরুষালি ভাব। এখনও

বসে আছে দুই ঊরু একটু তফাতে রেখে। মেয়েরা সচরাচর এভাবে বসেনা। কিন্তু তার মুখখানা বড়ই মিষ্টি। ছোট ছোট চোখ, গোলাপি রঙের পাতলা দুটি ঠোঁট, টিকলো নাক। চন্দনের মতো গায়ের রং। দেখলে কেমন আদর আদর লাগে। কই উদ্ধত বা উগ্র তো লাগছেনা মোটেও! ভাবতে অবাক লাগছে যে, বেশ কয়েক জন পরিচিত লোকের কাছে তিনি এই মেয়েকে বেয়াদব বলে আখ্যায়িত করেছেন একটা সময়। তার জানা মতে কোর্ট পাড়ায় একে কম বেশি সবাই চেনে। সুনাম এবং দুর্নাম দুটিই আছে তার ঘটে। সুনাম আছে কাজের, আর দুর্নাম আছে ঠোঁট কাটা স্বভাবের। পরিচিত উকিল বন্ধুদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, এই মেয়ে যখন কোর্টরুমে সাবমিশন রাখে তখন কোর্ট বারান্দায় হাঁটতে থাকা মানুষজন নাকি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুগ্ধ হয়ে শোনে।

অমৃতা বুঝতে পারছিল এক জোড়া অভিজ্ঞ, গভীর চোখ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে ছিল সে। মনে হচ্ছিল সামনা সামনি কথা বলার চাইতে ফোনে কথা বলা ঢের সহজ কাজ। নার্ভাস ফিল করছিল সে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো, সম্পূর্ণ বিনা কারণে অমৃতা চৌধুরী নার্ভাস ফিল করছিল। তাজ্জব ব্যাপার!

– ‘তোমার বন্ধু কোথায়?’ গমগমে গলায় পুরুষ কণ্ঠটা প্রশ্ন করল।

– ‘আকাশ ওকে নিয়ে বাইরে গেছে। এইতো কিছুক্ষণের মাঝেই চলে আসার কথা।
’

– ‘তোমার কী মনে হয়? আমাকে দেখে ওর রিএকশন কেমন হবে?’

– ‘প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কী হবে তা বলতে পারছিনা। তবে মনে মনে যে ভীষণ খুশি হবে, এতটুকু নিশ্চয়তা আমি দিতে পারি আপনাকে।’

হক পায়ের ওপর পা তুলে সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। এবার তিনি এক পা নাচাতে নাচাতে বললেন, ‘তোমার খবর কী?’

– ‘এইতো’

– ‘প্র্যাকটিস কেমন চলছে?’

– ‘ভালোই।’

– ‘কোন দিকে যাবে বলে ঠিক করেছ? সিভিল? ক্রিমিনাল? নাকি কর্পোরেট?’

– ‘কর্পোরেটে আমার ইন্টারেস্ট নেই একেবারেই। ক্রিমিনাল নিয়েই কাজ করার ইচ্ছে।’

– ‘বেশ। তুমি তো শুনেছি এন জি ও তেও জব করছ। কী নাম যেন তোমাদের এন জি ও টার?’

অমৃতা নাম বলল। শুনে হক বললেন, ‘ফান্ড কারা দিচ্ছে?’

– ‘ইউ এস এইড।’

হক লক্ষ্য করছিলেন মেয়েটির কথাবার্তায় একটা দারুণ স্মার্ট ব্যাপার স্যাপার আছে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে এতটা স্মার্টনেস সচরাচর চোখে পড়েনা। তার নিজের কোনো কন্যা সন্তান নেই। থাকলে হয়তো আজকে অমৃতার বয়সীই হয়ে উঠত। এরকম বুদ্ধিমতী, স্মার্ট এবং সপ্রতিভ একটি মেয়ে তার থাকলে কিন্তু দারুণ ব্যাপার হত। ভাবলেন ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে অমৃতা তার দিকে ঠিক যেভাবে চেয়ে আছে সেই চাউনিটা যে একেবারেই কন্যা সুলভ নয়, তা কি তার এই বয়সে বুঝে উঠতে খুব বেশি সময় লাগার কথা?

– ‘আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।’ বললো অমৃতা।

হক হেসে বললেন, ‘আসতেই হল!’

এই প্রথম অমৃতার মনে হল লোকটা হাসলে চমৎকার দেখতে লাগে! শুধু মাত্র কানের কাছের জুলপিতে হালকা পাকা চুলের আঁচড় ব্যতীত এঁর চেহারায় কোনো বয়সের ছাপ নেই। লম্বাটে ধারালো মুখ। শক্ত চোয়াল। চোখ জোড়া গভীর। ছিপছিপে লম্বা মেদহীন শরীর। গায়ের রঙ ফর্সা নয়, বাদামি। আচ্ছা, রোমেলাকে কি এর পাশে একটু বয়স্ক এবং বেশিই সাধারণ বলে মনে হয়না? ইশ… এসব কী ভাবছে সে? এবার ভাবনায় লাগাম টানা দরকার। এর আগে কোনোদিন নিজের ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি অমৃতা। কিন্তু আজকে যে লক্ষ্মীছাড়া সব ভাবনারা একেবারে সীমানা অতিক্রম করে ফেলছে! এবার রাশ টেনে ধরতে হবে। কিন্তু খানিক বাদেই সে আরো একটি গুরুতর বিষয় জীবনে প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করল যে, মানুষের মনের রাশ টেনে ধরা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ গুলোর একটি।

– ‘পলিটিক্স কেন করেন?’ হঠাৎ প্রশ্নটা করলো অমৃতা। হক একটু তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করলেন মেয়েটিকে। খুব সাধারণ প্রশ্ন। কিন্তু এই সাধারণ প্রশ্নটিই এর আগে তাকে কেউ কোনো দিন করেনি। তিনি পা নাচানো বন্ধ করে একটু নড়ে চড়ে বসলেন। অমৃতার চোখের দিকে সরাসরি চেয়ে লঘু গলায় বললেন, ‘শুরু করেছিলাম শখের বশে। কিন্তু এখন দায়িত্ব বলে মনে হয়।’

অমৃতা হেসে উঠল, শব্দ করে।

– ‘হাসছ যে?’ ধারালো কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হক। প্রশ্নের ধরণ দেখে আচমকা হাসি থামিয়ে ফেলল অমৃতা। এজন্যেই মানুষটাকে লোকে বদরাগীবলে। কেমন ক্যাট ক্যাট

করে কথা বলেরে বাবা! সে অপ্রতিভ ভাবে বলল, ‘না মানে। কেমন যেন লাগল কথাটা শুনতে।’

– ‘কোন কথাটা?’

– ‘এইযে বললেন, দায়িত্ব মনে করেন।’

হক ভ্রু কুঁচকে বললেন, ‘এটা তোমার কাছে হাসির কথা মনে হল কেন? অমৃতা একটু ইতস্তত করে বলল, ‘দায়িত্ব বলতে আপনি ঠিক কী বোঝালেন?’

– ‘দেশের প্রতি তো প্রতিটি নাগরিকেরই দায়িত্ব, কর্তব্য থেকে থাকে। তাইনা?’

– ‘হ্যাঁ কিন্তু সে জন্যে পলিটিক্স করতে হবে কেন?’

– ‘পলিটিক্স না করেও দিব্যি দায়িত্ব পালন করা যায়। কিন্তু একটা ব্যাপার কি জানো? শুধু দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা থাকলেই হয়না, ক্ষমতাটাও জরুরি। রাজনৈতিক অঙ্গনে আসার পর দেশের সাধারণ লোকের সাথে যোগাযোগটা আমার আগের চাইতে আরো অনেক বেশি পাকাপোক্ত হয়েছে।’

– ‘আপনার কি ধারণা আপনি সফল ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন?’

– ‘চেষ্টা করছি।’ একটু সময় চুপ থেকে তিনি আবার বললেন, ‘তুমি আইন পড়লে কেন? পৃথিবীতে বিষয়ের কি অভাব পড়েছিল?’

– ‘আই জাস্ট লাভ ল’ জ!’ অমৃতা হেসে বলল।

– ‘তাই? একজন ভালো লইয়ারের ঠিক কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর?’

– ‘ভালো লইয়ার বলে কোনো শব্দ আমার ডিকশনারিতে নেই, আমি বলি কমপ্লিট লইয়ার! পরিপূর্ণ আইনজীবী!’

– ‘বেশ। কমপ্লিট লইয়ার বলতে কী বোঝায়? সব আইন মুখস্থ রাখা? প্রশ্ন করতেই ধারা সহ সমস্ত ডিটেইলস গড়গড়িয়ে বলে ফেলা?’

– ‘তা ঠিক নয়। লইয়ার নোজ হোয়্যার দ্যা ল ইজ। আমি জানি কোন আইন কোথায় আছে। সব সময় সব কিছু মুখস্থ রাখতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। ইটস হিউম্যানলি ইম্পসিবল।’

– ‘হুম কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো যে পলিটিশিয়ানদের নিয়ে তোমার যে ধারণাটি আছে, আম জনতার উকিলদের নিয়েও ঠিক এ ধরণেরই একটি ঋণাত্মক ধারণা আছে।’

অমৃতা খোঁচাটা টের পেলো। কথা সত্য, সাধারণ লোকে উকিল, পুলিশ এবং রাজনীতিবিদ এদের কাউকেই খুব একটা সাদা চোখে দেখেনা। অমৃতা স্পষ্ট গলায় বলল,

– ‘হ্যাঁ উকিলদের নিয়ে লোকজনের অনেক স্টেরিওটাইপ ধারণা আছে। কিন্তু ওকালতি একটি পেশা, রাজনীতি তো পেশা নয়। সরি টু সে, আমার কাছে ওয়ার্ল্ডের সব রাজনীতিবিদদের দুই নাম্বার বলে মনে হয়। জর্জ বার্নার্ডশ বলেছিলেন- ‘ He knows nothing; and he thinks he knows everything. That points clearly to a political career.’

– ‘শ’ নিজেও কিন্তু পলিটিক্যাল একটিভিস্ট ছিলেন। এছাড়া একজন তরুণ নোবেল বিজয়ী কী বলেছেন জানো? বলেছেন, A doctor can only treat patients. A doctor can only help the people who are shot or who are injured. But a politician can stop people from injuries. শেষের লাইনটা হুবহু মনে পড়ছেনা। অনেকটা এরকম ছিল যে একজন পলিটিশিয়ান সমগ্র জাতিকে উদ্ধার করতে পারে, যেটা একজন ডাক্তার পারবেন না।’

– ‘কে সেই তরুণ নোবেল বিজয়ী?’

– ‘নাম বলবোনা। তুমি খুঁজে বের কর। এটা তোমার জন্য ধাঁধা। তাছাড়া শেখ মুজিবও কিন্তু রাজনীতি করতেন। তুমি কি তাঁর ক্ষেত্রেও একই রকম ধারণা পোষণ কর?’

– ‘না না, উনার সাথে অন্য কারো তুলনা হয়না।’

– ‘এর মানে তুমি মাত্র যে কথাটা বললে, যে জগতের সব রাজনীতিবিদদের তোমার দুই নাম্বার বলে মনে হয়, কথাটা ভুল। তোমার চিন্তা ধারাও কিন্তু স্টেরিওটাইপ!’

– ‘বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই দুই নাম্বার।’

– ‘আমাকেও কি তোমার দুই নাম্বার বলে মনে হয়?’

অমৃতা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, ‘আপনি রেগে যাচ্ছেন, মিস্টার হক!’

– ‘না, রেগে যাচ্ছিনা।’

অমৃতা মুখে আগের হাসিটা বজায় রেখেই বলল, 'হ্যাঁ রেগে যাচ্ছেন। আপনার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

– 'আর আমার রাগ দেখে বুঝি তোমার খুব হাসি পাচ্ছে?'

অমৃতা হাসি লুকোতে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। প্রথমদিকে একটা নার্ভাসনেস কাজ করছিল। কিন্তু এখন আর সেই নার্ভাসনেসটা নেই। বন্ধুরা বাদে বেশিরভাগ লোকজনের সাথে কথা বলতে গেলে তার কম বেশি বিরক্ত লাগে। এই লোকটার সাথে কথোপকথন সে উপভোগ করছে। হক তখনো রাগ রাগ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে হাসিটা অনেক কষ্ট করে গিলে নিয়ে বলল, 'কই নাহ, হাসি তো পাচ্ছেনা!'

হৃদি পর্দার ফাঁক দিয়ে অমৃতার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল। সে বুঝে উঠতে পারছেনা বাবার বয়সী একটা লোকের সাথে অত কীসের হাসি ঠাট্টা? অমৃতার এমন বিজলী বাতির মতো রসিক হাসি সে জীবনে এই প্রথম দেখছে!

হক সরু চোখে অমৃতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি মেয়েটা কিন্তু খুব ফাজিল!'

– 'তাই নাকি? আর কিছু?'

– 'দুষ্টু।'

– 'আর কিছু?'

– 'ভীষণ পাকা!'

– 'পাকা বলছেন কেন? আমার বয়স কত আপনি জানেন?'

– 'আমার বয়স কত তুমি জানো?' প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করেন হক।

– 'কত আর, নব্বই অথবা একশ হবে?' বলে অমৃতা মিটমিটিয়ে হাসে। হক চোখ বড় করে বললেন, 'আবার দুষ্টুমি হচ্ছে?'

– 'ও নব্বই নয়? তাহলে কত? সত্তর?'

– 'ঊনপঞ্চাশ।

অমৃতা ঠোঁট টেনে গলায় একটা মেকী সুর এনে বলল, -'অনেক বুড়ো হয়ে গেছেন আপনি।

হৃদি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল বসার ঘরে। ঘরে উপস্থিত দুজন সদস্যের একজনও লক্ষ্য করেনি তাকে। কয়েক সেকেন্ড ঠান্ডা চোখে পর্যবেক্ষণ করলো সে দুজনকে। তারপর একটু কেশে অমৃতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'রেডি হ, আকাশ টেক্সট করছে। ওরা চলে আসছে। তিন চার মিনিট লাগবে।'

অমৃতা হৃদির আকস্মিক ডাকটা শুনে একটু চমকে উঠেছিল। অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন হকও। হৃদি কথাটা বলে জায়গা থেকে সরে পড়েনি। অমৃতার উঠে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। চোখা ভাবে চেয়ে ছিল সে অমৃতার দিকে। অমৃতা অস্ফুটে বলল, 'আসছি।'

– 'এখুনি আয়, রেডি হতে হবেনা?'

অমৃতার চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। খেলায় মজে থাকা ছোট বাচ্চাকে আচমকা খেলা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পড়তে বসিয়ে দিলে যেরকম চেহারা

হয় তার চেহারাটা তখন ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিল। হক স্থির ভাবে দুই বান্ধবীকে লক্ষ্য করছিলেন। অমৃতা উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বলল, 'সামি চলে আসছে। সো, ইউ নো হোয়াট টু ডু রাইট?'

হককে সেই মুহূর্তে খানিক বিচলিত দেখাল। দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললেন, 'ঠিক কী করা উচিত বল তো?' হৃদি লোকটার প্রশ্ন শুনে অবাক হল। কী আশ্চর্য! ইনি অমৃতার কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন নাকি? অমৃতা কবে থেকে উনার বস হয়ে গেল? মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে ব্যাক্কলের মতো চেয়ে রইল সে দুজনের দিকে।

ওকে বুঝিয়ে বলবেন যে আপনি ওকে কতটা মিস করেন।'

হক চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, 'এসব কথা আমি কখনোই বলতে পারিনা।' অমৃতা জোর দিয়ে বলল, 'বলতে হবে মিস্টার হক! আজকে আপনাকে বলতেই হবে!'

হৃদি আরো একবার বিস্ময়ের স্রোতে হাবুডুবু খেয়ে গেল। মিস্টার হক! কী হচ্ছে এসব? বন্ধুর বাবাকে কেউ নাম ধরে ডাকে নাকি?

হক বললেন, 'আচ্ছা, লেটস সি।'

– 'বেস্ট অফ লাক' অমৃতা বলল।

– 'থ্যাংক ইউ।'

হৃদি পুরাই বেকুব বনে গিয়েছিল। নড়তে চড়তে পারছিলোনা একদম। অমৃতা এগিয়ে এসে ওর বাহুতে একটা হাত রেখে বলল, 'দাঁড়ায় আছিস ক্যান? চল!'

আকাশ আর সামি ঠিক বারোটা বেজে দুই মিনিটে লিফ্ট দিয়ে উপরে উঠে আসল। সামির কাছে চাবি ছিল। এসেই সে তাড়াহুড়ো করে ওয়ালেট থেকে চাবি বের করে খুলে ফেলল সদর দরজা। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। সামি রাগী গলায় বিড়বিড়িয়ে বলল, 'রুদ্রর বাচ্চা পুরা বাসা কবর খানা বানায় রাখছে কেন? একটা লাইট তো অন্তত জ্বালায় রাখবে।'

ভেতরে ঢুকে সে প্রথমে ডাইনিং এর বাতি জ্বালালো। আলোটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়তেই চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অনেক গুলো চেনা মুখ। এক গগন বিদারী চিৎকারে ফেটে পড়ল চারপাশ। চেনা মুখগুলো সব সমস্বরে বলে উঠল, 'হ্যাপি বার্থডে!'

চমকে উঠল সামি। বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। সত্যি ভুলে গিয়েছিল যে আজ তার জন্মদিন। জন্মদিন নিয়ে আহ্লাদ করার বয়সটা এখন আর নেই। জন্মদিন এলে কোনো বিশেষ অনুভূতিও হয়না আজকাল। তবুও প্রিয়জনদের কাছ থেকে একটু নির্ভেজাল মনোযোগ পাবার জন্য জন্মদিনের চাইতে উত্তম দিন বোধহয় মানুষের জীবনে আর একটিও নেই। বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটতে না কাটতেই সামির মুখে একটি শিশুসুলভ নির্মল হাসি ফুটে উঠল। সারা বাড়ি নীল সাদা বেলুন দিয়ে সাজিয়ে ফেলেছে পাগল গুলা। দেয়ালে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছে তার নাম। টেবিলের ওপর বিশাল আকারের এক কেক। কেকের ওপর গুণে গুণে ছাব্বিশটি মোমবাতি রাখা। বন্ধুরা সব চিৎকার করে গান গেয়েই চলেছে। রুদ্র তার নিজের বাঁধা গান গাইছে গলা ফাটিয়ে, 'সামিউল হকের আজ জন্মদিন/সবাই নাচো তাধিন তাধিন/নাচো কোমর দুলিয়ে/দুদিন বাদে জমিয়ে/সামি করবে বিয়ে/টোপর মাথায় দিয়ে/'

গানের লিরিক্স শুনে সামির হাসি আরো জোরদার হচ্ছিল। এরকম আজব গানও মানুষ লিখতে পারে? কীভাবে সম্ভব? কিন্তু হাসিটা খুব বেশিক্ষণ তার মুখে স্থির হয়ে থাকলো না। মায়ের পাশে দাঁড়ানো লম্বা মানুষটার ওপর চোখ পড়তেই সে থমকে গেল। মুখ থেকে হাসি মুছে গিয়ে ধীরে ধীরে ভর করল এক অচ্ছেদ্য বিমূঢ়তা।

কেঁপে উঠল অন্তরাত্মা। সংজ্ঞাহীন একরাশ আবেগ এবং অভিমান উথলে উঠল চোখের তারায়। কত দিন পর? নয় মাস? নাকি তারও বেশি?

হক ছেলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। সামি কি এই নয় মাসে আরো একটু বড় হয়ে গেছে? তাকে দেখাচ্ছে পূর্ণ বয়স্ক যুবকের মতো। চোখে মুখে আর আগের সেই কচি ছেলেমানুষি ভাবটি নেই। তার বদলে আছে এক প্রবল আত্মবিশ্বাসের ছায়া। যে ছেলেটি জন্মের পর থেকে পিতার সাহায্য ছাড়া এক কদম চলতে পারেনি, সেই ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের জিম্মায় একা একা কাটিয়েছে নয়টি মাস! এই নয়মাস সে পিতার কাছে একটি বারের জন্যেও হাত পাতেনি। হক ভেবেছিলেন দু তিন মাসের মাথায়ই ছেলে সুড়সুড় করে ঘরে ফিরে আসবে। তার আরাম আয়েশ করে অভ্যাস। স্ট্রাগল কী তা সে জানেনা। ক্ষমতাধর পিতার সাহায্য ব্যতীত এই কঠিন পৃথিবীতে একটি দিন টিকে থাকা পুত্রের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু তাঁর ধারণা পুরোপুরি মিথ্যে প্রমাণ করেছে সামি। অতএব ছেলে বদলে গেছে। ছেলে এখন আত্মনির্ভরশীল, সাহসী এবং পরিপক্ক। হক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তার পুত্র জিতে গেছে। তিনি হেরে গেছেন। তবে এই হারে তিনি এক ফোঁটাও গ্লানী বোধ করছেন না। বরং এক আশ্চর্য পরিতৃপ্তি তে ছেয়ে যাচ্ছে সারা মন।

বাবাকে দেখে সামির থমকে যাওয়াটা বন্ধুরা লক্ষ্য করলো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার নিমিত্তে তারা দ্রুত বার্থডে বয়কে টেনে নিয়ে আসলো কেক কাটার টেবিলে। সামির মুখখানা সে মুহূর্তে ভীষণ আবেগপ্রবণ দেখাচ্ছিল। চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। নিশ্বাস ঘন। হাত কাঁপছে হালকা। সেই অবস্থায়ই কেক কাটা হল। হাত তালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সারা ফ্ল্যাট। খাবার সার্ভ করার কিছু সময় আগে রোমেলা ছেলেকে কানে কানে বললেন, ‘তুই একটু ভেতরের ঘরে আয়। তোর আব্বা কথা বলবেন তোর সাথে।’

সামি উদ্বেলিত বুক নিয়ে নিজের ঘরে আসল। তার পিতা বসে আছেন পড়ার টেবিলের চেয়ারে। হাতে একাউন্টিং এর একটি বই। বইটা মনোযোগ দিয়ে উল্টে পাল্টে দেখছেন তিনি। সামি ঘরের ভেতর ঢুকতেই তিনি চোখ তুলে তাকালেন এবং তাকানো মাত্রই মন প্রাণ দিয়ে অনুভব করলেন যে এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিজের সন্তানের চাইতে পবিত্র এবং সুন্দরতম বস্তু আর দ্বিতীয়টি নেই। নিজ পুত্রের ওই সুন্দর মুখখানার দিকে চাইতেই নিষ্কলুষ এক বিশুদ্ধ হাওয়া বইতে লাগল তার মনের অলিন্দ জুড়ে। মনে হল যেন মাইলের পর মাইল তপ্ত রোদে ঢাকা কন্টকাকীর্ণ মরুভূমি পার হয়ে আসার পর তিনি অবশেষে প্রাণ জুড়ানো, স্বচ্ছ, টলমলে এক বিন্দু জলের দেখা পেলেন।

সামি বিছানার ওপর এসে বসল, নত মুখে। তার বুক একটু একটু কাঁপছে। বিশ্বাস হচ্ছেনা যে বাবা নিজ উদ্যোগে তার সাথে দেখা করতে এসেছেন। এ যেন বাস্তব নয়, এ যেন এক রূপকথার কাহিনী। তার চোখ জোড়া তখন বাষ্পময়। সে প্রাণপণে পিতার কাছ থেকে এই বাষ্পবারি লুকোতে চায়। জোয়ান ছেলের বাপ মায়ের সামনে কাঁদতে নেই।

রোমেলা ছেলের পাশে বসলেন। কিছুটা সময় নীরবে কাটল। হক কাশতে লাগলেন ঘন ঘন। তিনি ভেতরে ভেতরে একটু নার্ভাস ফিল করছেন। আবেগের কথা, ভালোবাসার কথা তিনি কখনোই মুখ ফুটে বলতে পারেন না। পুত্রকে কখনোই বলা হয়নি যে তার জীবনে এক মাত্র সন্তানের গুরুত্ব কত খানি। ইমোশনাল কথাবার্তা বলা তার ধাতে নেই। কিন্তু আজ তাঁর ছেলেকে মনের কথা বলতে হবে। হ্যাঁ বলতেই হবে। অমৃতা বলে দিয়েছে, যে করেই হোক সামিকে জানাতে হবে, যে তাকে তিনি কতটা মিস করেন। পরমুহূর্তেই নিজের এই ভাবনাটা তাকে চমকে দিল। অমৃতা বলে দিয়েছে বলেই কি তিনি ছেলেকে কথা গুলো বলবেন? নাকি নিজের তাগিদে বলবেন?

– ‘শুভ জন্মদিন আব্বু!’ বললেন তিনি ছেলেকে।

সামি চোখ নিচে নামিয়ে রেখেই অস্ফুটে বলল,’থ্যাঙ্ক ইউ।’

আবার কিছুক্ষণ বিরতি। হক শ্বাস নিলেন সময় নিয়ে। গম্ভীর ভাবে বললেন, ‘শোনো সামি, তোমার জন্য আজ আমি কোন উপহার নিয়ে আসিনি। কেন নিয়ে আসিনি জানো? কারণ আমার মনে হয়েছে যে তোমাকে দেবার মতো কিছুই আসলে আমার নেই। আমার অর্থবিত্ত, সম্পদ, সুনাম, খ্যাতি এর কোনো টাই তোমাকে কখনো আকর্ষণ করেনি। আর একারণেই তুমি অন্য সবার চাইতে আলাদা। নয় মাস আগে নিজের বাড়ি ছেড়ে একলা পথে নেমে যে যুদ্ধটা তুমি শুরু করেছিলে সেই যুদ্ধে তুমি জিতে গেছ। আমি হেরে গেছি। কিন্তু এই হার অনেক বেশি সম্মানের। আমি বুঝে গেছি, জেনে গেছি যে আমার ছেলে এই পৃথিবীতে আমার সাহায্য ছাড়া সারভাইভ করতে পারবে। খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার জন্য তার আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি গর্বিত।’

সামির চিবুক গলার সাথে লেগে ছিল। সে কোনো কথা বলতে পারছিলনা। মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন ধীরে ধীরে, আর মুখে শাড়ির আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিলেন।

– ‘আমি জানি তুমি আমার ওপর রাগ করে আছ এখনো। কিন্তু একটু বোঝার চেষ্টা কর, যে মেয়েটিকে তুমি পছন্দ করেছিলে সেই মেয়েটির সাথে সারাজীবনের জন্য কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া তোমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হত না। আমরা মেনে নিলেও মেয়েটির বাবা মা তোমাকে কোনোদিনই গ্রহণ করতেন না। আমি মেয়েটির বাবার সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলাপ করেছিলাম। তার মেয়ের সাথে একটি

মুসলমান ছেলের প্রণয় ঘটিত ব্যাপার আছে এটা জানতে পেরে তার বুকে ব্যথা উঠে গিয়েছিল। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।'

সামি নিশ্চুপ। আসলে সে মুহূর্তে কোনো ব্যাখ্যা, যুক্তি কিংবা কৈফিয়ৎ তার মাথায় ঢুকছিলনা। বাবা তার সাথে দেখা করতে এসেছে সমস্ত অভিমান ভুলে গিয়ে, রাগ ভুলে গিয়ে, এই একটি মাত্র ঘটনা তাকে বিহ্বল করে রেখেছিল, বাক্যহারা করে দিয়েছিল।

হক বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ছেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ছেলের মাথায় একটা হাত রেখে ভারী গলায় বললেন, 'তোমার হয়তো আমাদেরকে প্রয়োজন নেই। তুমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখে গেছ। কিন্তু আমাদের তোমাকে প্রয়োজন আছে। তোমার মা এবং আমি, আমরা তোমাকে অনেক মিস করি সবসময়। তুমি… তুমি প্লিজ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসো।'

সামি কোনো বাক্যব্যয় না করে উঠে দাঁড়াল বসা থেকে। তারপর আচমকা জড়িয়ে ধরল বাবাকে। তার চোখ দুটো তখন ভিজে উঠেছিল অশ্রুজলে।

খাওয়া দাওয়ার পর রুদ্র দুই তিনটা গান শোনাল। পাশে বাসার মেয়েটিও গান জানে। তাই আসর বেশ জমে উঠল। যদিও হক সাহেবের উপস্থিতি বন্ধুদের মধ্যে একটি আড়ষ্ট ভাবের জন্ম দিয়েছিল। সামি বাদে অন্য কেউই সহজ হতে পারছিলোনা। আজ প্রথমবারের মতো লোকটা বন্ধুদের মাঝখানে এতক্ষণ সময় পার করলো। এই দলটাকে তিনি ঘেন্না করেন বলেই জানে সবাই। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি খুব আগ্রহ নিয়েই উৎসবটা উপভোগ করছেন। সামির ভালো লাগছিল। অনেক দিন বাদে পরিবার আর বন্ধুদের একত্রে পেয়ে তার বুকটা ভরে উঠেছিল এক অনাবিল আনন্দে। শুধু একটি মানুষের অনুপস্থিতি সেই আনন্দতে কিঞ্চিৎ ঘাটতি

এনে দিচ্ছিল। সেই মানুষটি বিভা। বিভা টেক্সট করেছে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে। সে প্রত্যুত্তর করেনি। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া থেকে ফেরার পর থেকে আর একটিবারের জন্যেও সে বিভার সাথে কথা বলেনি। প্রেরণ করেনি কোনো বার্তা।

বসার ঘরেই বসে ছিল সবাই। রুদ্র গাইছিল একটা লালন গীতি।

'কত লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে, পেয়েছি এই মানব জনম…'

সবাই বুঁদ হয়ে শুনছিল ওর গান। ঘরের মূল বাতি নেভানো ছিল। জ্বলছিল একটি কম পাওয়ারের হলুদ আলোর ল্যাম্পশেড। সেই টিমটিমে হলদে আলোয় হৃদি একটি আশ্চর্য বিষয় আবিষ্কার করল যা অন্য কেউ টের পেলনা। সে দেখতে পেল একজোড়া নবীন চোখ বারংবার একজোড়া গভীর, অভিজ্ঞ চোখের ওপর আটকে যাচ্ছিল, থমকে যাচ্ছিল। চারটা চোখ মিলিত হচ্ছিল থেকে থেকে। দৃশ্যটা কেন যেন তার বুক কাঁপিয়ে দিল। এরকম আজব কান্ডও পৃথিবীতে ঘটে নাকি?

সে রাতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সবারই একটু দেরি হয়ে গেল। সামিদের ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগ মুহূর্তে হৃদি অমৃতাকে আড়ালে ডেকে এনে বলল, 'এই তোর সমস্যা কী?'

– 'কীসের সমস্যা?'

– 'শুনো অমৃতা, সবাইকে বেকুব বানাইতে পারলেও আমাকে তুমি বেকুব বানাইতে পারবানা। তোমাকে আমি হাড্ডিতে হাড্ডিতে চিনি।

অমৃতা বিস্মিত গলায় বলল, 'কী বলতেছিস? কিছুই বুঝতেছিনা।'

হৃদি চাপা গর্জন করে উঠে বলল, 'দাঁড়াও, বিভারে ডাকতেছি আমি বিভাকে এখন আমার খুবই দরকার। কারণ তুমি একদম ফালতু হয়ে গেছ। নষ্ট হয়ে গেছ। তোমারে দিয়া আমার পোষাইতেছে না।'

অমৃতা রুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওকে ফাইন, ডাকো বিভারে, আমারও অবজারভেশন আছে তোমারে নিয়ে। তুমি কি মনে করছ, আমার চোখে ধূলা দেয়া এত সহজ?'

হৃদি একটু চুপসে গেল, 'আমাকে নিয়ে আবার কিসের অবজারভেশন?'

– 'আসুক বিভা, তারপর কথা হবে।'

বিভার মাথাটা রাখা ছিল অভিজিতের বুকের ওপর। দুজনের মধ্যে কোনো সংকোচ নেই আর, নেই কোনো দ্বিধা, ভয় কিংবা দূরত্ব। হ্যাঁ মনের দূরত্ব হয়তো এখনো রয়ে গেছে যোজন যোজন। কিন্তু শরীর? সে তো মনের মতো অত জটিল আর একগুঁয়ে নয়, তাকে বশে আনতে খুব একটা বেগ পেতে হয়না। শারীরিক সুখ কি মানসিক কষ্ট লাঘব করতে পারে? কে জানে! কিন্তু বিভা আজ রাতে খুব করে চেয়েছিল শরীর দিয়ে মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। হয়তো পেরেও ছিল কিছুটা। ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর তার মনে হয়েছে, যা হবার ভালোই হয়েছে। এমনটাই বুঝি হবার ছিল। হৃদির ফোনটা আসলো রাত একটায়। বালিশের তলায় মোবাইল রাখা ছিল। হঠাৎ ভাইব্রেট করে ওঠায় ওরা দুজনেই চমকে উঠল। ফোন হাতে নিয়ে হৃদির নামটা দেখলো বিভা। বুক কাঁপলো হালকা। এত রাতে ফোন কেন? কোনো বিপদ আপদ হয়নি তো?

শুয়ে থাকা অবস্থাতেই বিভা ফোন রিসিভ করলো। মাথাটা শুধু সরিয়ে নিল অভিজিতের বুকের ওপর থেকে।

– ‘হ্যালো বিভা?’

– ‘হ্যাঁরে, কী হয়েছে? এতো রাতে? সব ঠিক আছে তো?’

– ‘শোন, কিছুই ঠিক নেই।’

– ‘হয়েছে কী?’ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল বিভা।

– ‘তুই কবে আসতে পারবি বলতো?’

বিভা একটু আমতা আমতা করে বলল, ‘আমি··· কবে আসতে পারবো··· কী যেন ঠিক বলতে পারতেছিনা তো।’

– ‘দোস্ত প্লিজ, অভিজিৎকে একটু ম্যানেজ কর। তোকে আমার খুব দরকার।’

– ‘কী হয়েছে বলবি তো।’

– ‘সামি তো বিয়ের জন্য রাজি হয়ে গেছে।’

– ‘আরে ধুর, রাজি টাজি কিছুনা। ওসব ফালতু কথা।’

-‘ফালতু কথা না মোটেও। তুই বিশ্বাস করতেছিস না?’

– ‘না বিশ্বাস করতেছিনা।’

– ‘সত্যি বিভা, সে তার বাপ মায়েরে জানায় দিছে অলরেডি। দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই এনগেজমেন্ট হয়ে যাবে।’

বিভা একটু সময় চুপ করে থেকে কিছু একটা ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা শোন, তুই চিন্তা করিস না। দেখি আমি চেষ্টা করছি আসার।'

– 'চেষ্টা না। তোকে আসতেই হবে। আর জানিসনা তো, অমৃতা পাগল হয়ে গেছে

– 'ক্যান ওই আবার কী করছে?'

– 'বললে, বিশ্বাস করবিনা। আমার খুব একটা বাজে ধরণের সন্দেহ হচ্ছে। তবে আমি আল্লাহ আল্লাহ করতেছি আমার সন্দেহ যেন সত্য না হয়। কিন্তু ওই ছেমড়ির কোনো কিছু ঠিক নাই। দুনিয়ার সব অদ্ভুত কাণ্ড গুলাই ওর করতে হবে।'

বিভা শিউরে উঠল মনে মনে। উদ্বেলিত হয়ে বলল, 'কী বলতেছিস তুই এসব? আমার তো ভয় লাগতেছে। কী হইছে?'

– 'এখন না, তুই ঢাকায় আয়। তারপর বলবো।'

ফোনটা রাখার পর বিভা কয়েক সেকেন্ড কেমন থম ধরে রইল। অভিজিৎ ওর মুখের ওপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, 'কী ব্যাপার?

বিভা থম ধরা গলায় বলল, 'আমার দেশে যেতে হবে অভিজিৎ!'

-' হঠাৎ কী হল? কোনো দুঃ সংবাদ নয় তো?'

– 'সামির এনগেজমেন্ট হয়ে যাচ্ছে দু এক সপ্তাহের মধ্যেই।'

অভিজিৎ নিভে গেল। মাথাটা নিজের বালিশে ফিরিয়ে নিয়ে নিস্তেজ গলায় বলল, 'ও।'

– 'আপনার আবার কী হল?'

–না মানে, আপনি কি সামির এনগেজমেন্ট খেতে দেশে যেতে চাইছেন?'

– 'সামির এনগেজমেন্টটা যেকোনো উপায়ে বাতিল করতে হবে। এ সম্পর্ক হতে পারেনা!

অভিজিৎ বিস্ফোরিত চোখে তাকালো বিভার দিকে। কী বলছে এই মেয়েটা? মাত্র কদিন আগেই না সে ব্রেকআপ করলো ওই ছেলের সাথে? তাহলে এখন আবার এসব কী হচ্ছে? মেয়েটা পাগল টাগল হয়ে যাচ্ছে নাতো? অভিজিতের ওই অদ্ভুত চাউনিটা দেখে বিভার এতক্ষণে বোধোদয় হল।

– 'ওহো, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। মানে সামির বিয়েটা আসলে হৃদির সাথে হতে হবে। অন্য কারো সাথে নয়।'

অভিজিৎ কথাটা শুনে বিস্ময়ে একদম ঝুম হয়ে গেলো। এমন আজগুবি কথা সে জীবনে আর কোনোদিন শোনেনি যেন। হা হয়ে রইল তার মুখখানা প্রায় মিনিট দুয়েক সময় ধরে। অনেক কষ্টে সে বলল, 'কী বলছেন আপনি? হৃদি কোত্থেকে আসল?'

– 'আসলে এই মুহূর্তে আমি আপনাকে সব কথা বলতে চাইছিনা। আপনি… আপনি শুধু আমার উপর একটু বিশ্বাস রাখুন। প্লিজ!'

– 'বিশ্বাস?'

– 'হ্যাঁ আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। আমি আপনাকে ঠকাবোনা।'

– ‘কবে যেতে চাইছেন?’

– ‘দু একদিনের ভেতরেই।’

অভিজিৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্ষীণ ভাবে বলল, ‘আবার কখনও ফিরবেন কি?’

– ‘না ফিরলেই বেঁচে যান মনে হয়?’

– ‘তাই কি বলেছি?’

– ‘তাহলে এ প্রশ্নটা কেন করলেন? আমার সংসারে আমি ফিরব না?’

অভিজিৎ কথাটা শুনে পাশ ফিরে শুলো। বিভার গালের ওপর একটা হাত রেখে বলল, ‘আপনি কি আমাকে একটু একটু ভালোবাসার চেষ্টা করছেন বিভাবরী?’

– ‘একটুও না। আপনার মতো একটা বোরিং লোককে ভালোবাসবো আমি? ইম্পসিবল।’

২৬

রাত একটায় বাড়ি ফিরে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াতেই আকাশ একটি নারী কণ্ঠের আর্ত চিৎকার শুনতে পেল। সেই সাথে অশ্রাব্য ভাষার গালাগাল। লোকটা জড়ানো গলায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বকে যাচ্ছে, তুই বেশ্যা, তোর গুষ্ঠি বেশ্যা, রেন্ডির ঘরের রেন্ডি··· তোর মারে···’ এসব বাজে কথা শুনতে শুনতে এখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। আজকাল আর গায়ে লাগেনা। তবে বলতে নেই, একটা কেমন ভয় ঢুকে গেছে ইদানিং আকাশের মনে মধ্যে। কেবলই মনে হয় যে কোনো একদিন বুঝি সে বাড়ি ফিরে দেখবে ব্যাটা তার বৌকে খুন করে বসে আছে। আজকেই সেই ভয়ংকর দিনটি নয়তো?

চাবি দিয়ে দরজা খুলল সে। লোকটার হাতে একটা চামড়ার বেল্ট সেই বেল্ট দিয়ে সপাং সপাং করে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে সে মারছে ঝুমকিকে। ঝুমকির ঠোঁট কেটে দরদর করে বেরোচ্ছে রক্ত। যন্ত্রণায় চ্যাঁচাচ্ছে সে প্রাণপণে। তবুও লোকটার মনে এতটুকু দয়া হচ্ছেনা। হবে কী করে? লোকটাতো তখন পাঁড় মাতাল। তার দুচোখ জ্বলছে আগুনের মতো। মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। মানুষ বলে মনে হচ্ছেনা তাকে। মনে হচ্ছে হিংস্র জন্তু। ড্রইং রুমের দরজা ঘেঁষা পর্দার আড়ালে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ঠকঠক করে কাঁপছে মেয়েটা ভয়ে।

আকাশ এগিয়ে গিয়ে পিতার হাত থেকে বেল্টটা একরকম জোর জবরদস্তি করে কেঁড়ে নিল। পিতা এবার চড়াও হল তার ওপর। মরিস না কেন তুই? হ্যাঁ? কেন মরিসনা? তোর মা মরছে, তুই কেন মরিস না?'

লোকটার মুখ দিয়ে ভকভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। কী কুৎসিত! কী কদর্য!

ঝুমকি তখন মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদছে। তার চুল হয়ে আছে পাগলের মতো। পরনের শাড়ি গেছে প্রায় খুলে। ঠোঁট থেকে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। আকাশ ঝুমকির হাত ধরে টেনে তুলল ওকে। কড়া গলায় বলল, 'উঠেন, এখানে বসে থেকে লাভ নাই।'

ঝুমকিকে নিয়ে আকাশ যখন ডাইনিং রুমে আসলো লোকটা তখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে যাচ্ছে সমানে। ঘুম না আসা পর্যন্ত এসব চলতে থাকবে। আজ নিজের ঘরে যাবেনা সে। ড্রইং রুমের সোফার উপরেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘরের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল তারা জড়োসড়ো হয়ে। এ বাড়িতে এসেছে সে বেশিদিন হয়নি। আসার পর

এমন তাণ্ডব এই প্রথম। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল লোকটা তার খালাকে আজকে রাতে মেরেই ফেলবে। আকাশ না আসলে হয়তো এতক্ষণে সত্যিই একটা খুনোখুনির কাণ্ড হয়ে যেত। ঝুমকিকে ধরে ধরে বেড রুমে নিয়ে আসল আকাশ। তারাও আসল পেছন পেছন। তড়িঘড়ি করে এগিয়ে এসে ওড়না দিয়ে সে খালার ঠোঁটের রক্ত মুছে দিতে লাগলো। তার চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ছে। হাত কাঁপছে ঠকঠক করে। আকাশ নিজের ঘরে গিয়ে ফার্স্ট এইড বক্স নিয়ে আসল। তারার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা নাও। এখানে তুলো, স্যাভলন আর ব্যান্ডেজ আছে।'

তারা আকাশের হাত থেকে বক্সটা নিল। ঝুমকি বিছানার ওপর বসে তখনো কেঁদে যাচ্ছে সমানে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। আকাশ একটা চেয়ার টেনে এনে বসলো ওদের সামনে। বেশ কয়েকদিন ধরে সে ভাবছিল ঝুমকিকে কিছু কথা বলবে। মনে হচ্ছে আজ আর না বললেই নয়।

রক্ত থেমে আসার জন্য অপেক্ষা করলো আকাশ। তারপর ধীর স্বরে বলল, 'আপনার সাথে আমার একটু কথা আছে। জরুরি কথা।'

ঝুমকি অবাক চোখে চাইল আকাশের দিকে। এত গুলো বছরে এই ছেলেটি কোনোদিন তার সাথে নিজ থেকে কথা বলতে আসেনি। জরুরি কথা তো দূরে থাক, অতি সাধারণ বাক্য বিনিময় করতেও যেন ছেলেটির রুচিতে বাঁধে। সতীনের ছেলে হলেও ঝুমকি একে নিজের সন্তান হিসেবেই মেনে নিতে চেয়েছিল। আদর দিয়ে, মমতা দিয়ে, নরম গরম কথা বলে নানা উপায়ে একে সে কাছে টানার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পারেনি। এই ছেলে তাকে মানুষ হিসেবেই গণ্য করেনা।

ঝুমকি বিস্ময়টা ঢাকা দিয়ে বলল, 'কী কথা?'

– ‘এসব আর কত দিন চলবে?’ একটু রূঢ় শোনায় আকাশের গলা।

– ‘কীসের কথা বলছ?’

–এইযে রোজ রোজ মারামারি, রক্তারক্তি, আমি এসব আর নিতে পারছিনা। মানুষের সহ্যের তো একটা সীমা থাকে।’

আকাশের মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে পেয়ে ঝুমকি জানেনা কেন এই দুঃসময়েও তার একটু কেমন শান্তি বোধ হল। যাক ছেলেটা তাহলে আজকাল তার কথা একটু একটু ভাবছে। সন্তান হিসেবে নাহয় নাই ভাবলো, মানুষ হিসেবে তো অন্তত ভাবছে!

তারা বসে ছিল ঝুমকির পাশে। পরনে একটি হলুদ রঙের সুতির সালওয়ার কামিজ। চুলে শক্ত করে বিণুনী বাঁধা। চোখজোড়া ভয়, শঙ্কা আর লজ্জা!

ঝুমকি বলল, তোমার বাবা মদ খাওয়ার অভ্যাসটা না ছাড়লে, এসব কোনোদিনও থামবে না।’

আকাশ দৃঢ় গলায় বলল, ‘এই বদ অভ্যাস তার জীবনেও যাবেনা। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।’

– ‘কী ব্যবস্থা?’

আকাশ একটা বড় শ্বাস নিয়ে বলল, 'আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন? রোজ রোজ মার খান। কোনদিন আমার বাপ আপনাকে জানে মেরে ফেলবে তার কোনো ঠিক নেই। তবুও এখানে পড়ে আছেন কেন?

ঝুমকি প্রশ্নটা শুনে কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। তার জল ভেজা চোখ দুটোতে ভেসে উঠল এক প্রবল বিস্ময়। অনেক কষ্টে জিভ নেড়ে বলল, 'পড়ে না থেকে কী করব? আর কী করার আছে আমার?'

– 'আপনার বাবার বাড়িতে চলে গেলেই তো পারেন। আপনাদের না নারায়ণ গঞ্জে একটা বাড়ি আছে? সেখানে যান না কেন?

– 'তুমি··· তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?'

– 'হ্যাঁ বলছি। কারণ এখানে থাকলে আপনি বাঁচবেন না। আপনার উচিৎ এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে গিয়ে নিজেও বাঁচুন, আমাকেও বাঁচতে দিন।'

ঝুমকির গোলগাল, ফর্সা, ধারহীন মুখটা তখন অপমানে টকটকে লাল। ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে। জোরে জোরে পড়ছে শ্বাস।

– 'তুমি··· তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ?' আবারো প্রশ্নটা করলো সে, ফ্যাসফ্যাসে গলায়।

– 'বলছি আপনার ভালোর জন্যই। আর তাছাড়া আমার বাপ তো এখন সংসারে একটা পয়সাও দিতে পারছেনা। ছাই পাশ ব্যবসা না কী যেন ঘোড়ার ডিম করে, তা থেকে যা কামায় তা তো মদ কিনেই সাবাড় করে দেয়। গেল মাসে বাড়ি ভাড়া, বাজার খরচ সব দিতে হয়েছে আমার। আমি বুঝতে পারছিনা যে কেন আমি আপনার দায়িত্ব ঘাড়ে নেব। আপনাকে বিয়ে করার আগে আমার বাবা তো আমার কাছ থেকে পারমিশন নেয় নি! তাছাড়া বৌ চালানোর মত কোনো মুরোদ উনার নাই। আপনার উচিৎ অন্য রাস্তা দেখা।'

ঝুমকি কথাগুলো শুনে পাথরের মত অনড় হয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র যেন এক ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তার বাড়ি, ঘর, সহায় সম্বল সব হারিয়ে গেছে। সে এখন সর্বহারা। অনেকটা সময় সে প্রস্তরীভূত হয়ে বসে থাকার পর ক্ষীণ গলায় বলল, 'ঠিকই বলেছ, আমার দায়িত্ব তুমি কেন নেবে? আমি তোমার কে?

আকাশ বসে বসে নিজের হাতের নখ খুঁটছিল দাঁত দিয়ে। কথাগুলো সে অনেক দিন আগেই বলবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। আজ সাহস করে বলে ফেলার পর ভালো লাগছে। এবার ঝামেলাটা মাথা থেকে নামলেই হয়।

– 'ঠিক আছে, আমি চলে যাব।' একটা বড় শ্বাস ফেলে, ধরা গলায় বলল ঝুমকি।

আকাশ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আপনি তৈরী থেকেন। কাল পরশু সময় করে আমি দিয়ে আসবো আপনাকে নারায়ণ গঞ্জে। আর বাবাকে এখন এসব কিছু বলার দরকার নেই। উনার মাথা ঠিক নাই। মাতাল মানুষের মতামতকে গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

ঝুমকি এবার একটু তীক্ষ্ণ ভাবে বলল, 'তোমার আমাকে কোথাও দিয়ে আসতে হবেনা। আমি নিজেই চলে যাব।'

আকাশ এ কথার পর আর কিছু বলল না। নিজের ঘরে ফিরে গেল। গরম জল দিয়ে একটু গোসল করতে ইচ্ছে হল। রাতের বেলা আজকাল বেশ শীত পড়ে। এই ফ্ল্যাটে গিজার নেই। চুলায় পানি গরম করে নিতে হয়। পানি গরম করতে গিয়ে তাই অনেকটা সময় নষ্ট হল। তারপর সেই গরম পানি দিয়ে গোসল সেরে বেরোতে বেরোতে রাত তিনটে বেজে গেল ঘড়িতে। বেরোনোর পর শুনতে পেল কেউ একজন দরজার কড়া নাড়ছে। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দরজা খুলল আকাশ। তার পরনে একটি কালো ট্রাউজার, খালি গা। দরজা খুলে দেখল তারা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার চোখ মুখ গম্ভীর। তবে একটু আগের ভীত ভাবটি আর নেই বরং একটু তেজের হলকা আছে চাউনিতে।

– 'কী চাই?' আকাশের প্রশ্ন।

তারা কেটে কেটে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়েই কথা বলতে হবে? নাকি ভেতরে আসতে দেবেন?'

আকাশ অপ্রস্তুত হল, 'ও আচ্ছা, হ্যাঁ এসো।'

তার ঘরটা বড়ই অগোছালো হয়ে আছে। বিছানায় ছড়িয়ে আছে বাসি জামা কাপড়। চাদর খানাও কুঁচকানো। পড়ার টেবিলে বইপত্র আর ছাত্রছাত্রীদের পরিক্ষার খাতার বাণ্ডিলের পাহাড়। এরকম অগোছালো ঘরে মেয়েটিকে কোথায় বসতে দেবে তাই

ভেবে সে একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। তারাকে দেখে অবশ্য বোঝা গেল যে সে এখানে বসতে আসেনি, এসেছে জরুরি কিছু বলতে।

– 'আপনার কি মনে একটুও দয়া মায়া নেই? আপনি কি মানুষ?' আচমকা প্রশ্নটা করলো তারা।

~'এটার মানে কী?' গায়ে টিশার্ট চড়াতে চড়াতে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল আকাশ।

– 'আপনি খালাকে চলে যেতে বললেন?'

– 'হ্যাঁ বলেছি, উনার ভালোর জন্যই বলেছি। তোমার কি মনে হয়না যে উনার একটা সুস্থ জীবন যাপনের অধিকার আছে? কেন উনি এভাবে নিজের জীবনটা শেষ করে দেবেন? কতই বা বয়স হবে উনার? চল্লিশ? পঁয়তাল্লিশ? সামনে অনেকটা সময় পড়ে আছে। চাইলে উনি আবার বিয়েও করতে পারবেন। এখানে কেন রাত দিন মার খেয়ে মুখ বুজে সব সহ্য করে পড়ে থাকতে হবে হ্যাঁ? আশ্চর্য!'

তারা ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, 'বিয়ে করবে আবার?'

– 'কেন নয়?'

তারা কিছুক্ষণ অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। তারপর টেনে টেনে বলল, 'আপনি কি কিছুই জানেন না?'

– ‘কীসের কথা বলছ? কিছু জানার কথা ছিল কি আমার?’

– ‘আমার মামারা যে ভালো মানুষ না, এটা কি আপনি জানেন না?’ আকাশ বিস্মিত গলায় বলল, ‘না জানিনা। তোমাদের পারিবারিক ইতিহাস আমি কী করে জানব?’

– ‘আপনি এটাও জানেন না তাইনা? যে খালা কখনো মা হতে পারবেন না?’

আকাশ থমকালো। বুকে কীসের একটা ধাক্কা এসে লাগল আচমকা। হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল, ‘মানে?’

– ‘আমার নানা নানী মারা গেছেন অনেক আগে। আছেন তিন মামা। মামারা মানুষ হিসেবে বেশি সুবিধার না। খালার একটা সমস্যা ছিল বিয়ের আগে থেকেই। সমস্যাটার কথা জানাজানি হওয়ার পর কোনো ভাবেই খালার বিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। মামারা উঠতে বসতে খোঁটা দিতেন। আমি তখন খুব ছোট। এসব গল্প শুনেছি মায়ের কাছ থেকে। শুনেছি যে একমাত্র আপনার বাবা, খালার সমস্যার কথা জানার পরেও তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন। আর খালাও খুশি হয়েছিল আপনাকে পেয়ে। ভেবেছিল নিজের যেহেতু ছেলেপুলে হবেনা কখনো তাই সতীনের ছেলেকেই নিজের সন্তানের মতো মানুষ করবেন।’

আকাশ একদম দৃঢ়ীভূত হয়ে গিয়েছিল কথাগুলো শুনে। তীক্ষ্ণ ফলার মত কী যেন একটা ক্রমাগত আঘাত করে যাচ্ছিল তার কলিজার মধ্যে। কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছিলো না সে। তারা বলল, ‘এই অসহায় মানুষটাকে আপনি কী করে বললেন চলে যেতে? কোথায় যাবে? মামাদের কাছে? আমার মামারা তো আমাকেই বের করে দিতে চাচ্ছিল বাড়ি থেকে।’ এই পর্যায়ে তারার গলাটা একটু ধরে আসল।

আকাশ কোনো রকমে বলল, ‘তুমি··· তুমি কি তোমার মামাদের সাথে থাকো?’

– ‘আমার মা মারা গেছেন গত বছর। বাবা সৌদিআরবে থাকেন। বছর দুয়েক হল তিনি আমার জন্য টাকা পয়সা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে সৌদিআরবের বিয়ে শাদী করে সংসার পেতেছেন। আমার খোঁজ খবর কিছুই নেন না। মামাদের সাথেই ছিলাম আমি। হঠাৎ··· হঠাৎ একটা ঝামেলা হল তাই ওখানেও আর থাকা গেল না।’

আকাশের বুকের ভেতর ক্রমশ একটা ব্যথা ঘনিয়ে আসছিল। তারা খানিকক্ষণ চুপ থেকে অদ্ভুত শীতল গলায় বলল, ‘আমি আপনাদের এখানে আজীবন থাকতে আসিনি। হোস্টেল খুঁজছি। একটা পার্ট টাইম জব বা টিউশনি পেয়ে গেলেই চলে যাব। কিন্তু খালা কোথায় যাবে? মামারা তো তাকে নেবেনা। তার তেমন কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতাও নেই যে নিজে কিছু করে খাবেন। আপনি··· আপনি খালাকে আটকান। উনি এর মাঝেই সুটকেস গোছানো শুরু করে দিয়েছেন। বলেছেন কাল সকালেই আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন।

আকাশ চুপ। নিশ্বাস টান টান। বড় কষ্ট বুকের ভেতর! কী আশ্চর্য! তার যেমন মা নেই, ঝুমকিরও তেমন সন্তান নেই। তার মা কখনো ফিরে আসবেনা··· ঝুমকিরও কখনো সন্তান হবেনা। দুজনের দুঃখ যেন একই সুতোর বুনোটে বাঁধা!

হৃদিকে সামির আব্বা আম্মা নামিয়ে দিয়ে গেছেন ওর বাসায়। বাড়ি যখন ফিরল তখন ঘড়িতে বাজে প্রায় একটা। মা ড্রইং রুমের সোফায় বসে অপেক্ষা করছিলেন। হৃদি ঘরে ঢুকতেই বললেন, ‘আজকাল প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফিরছিস। এসব হচ্ছেটা কী?’

– ‘আজকে তো সামির জন্মদিন ছিল। তুমি বুঝি জানোনা?’ হৃদি বলল নতমুখে।

– ‘তা জন্মদিনের অনুষ্ঠান কি দিনে দিনে করে ফেলা যায়না? এত রাত অবধি কীসের জন্মদিন?’

– ‘উফ মা, রোজ রোজ তোমার এসব লেকচার শুনতে আমার বিরক্ত লাগে!’

– ‘তোর বাবা বলে দিয়েছে, রাত করে বাড়ি ফেরা আর চলবেনা।’

-’ আমাকে সামির আব্বা আম্মা নামিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি ঘুমাওনি কেন? এতো রাত পর্যন্ত জেগে থাকার কী মানে?

– ‘কী মানে বুঝিস না তুই? তোর টেনশনেই তো ঘুমাতে পারছিনা।’

হৃদি ভেতরের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দায়সারা গলায় বলল, ‘অত টেনশনের কী আছে মা? আমি কোথায় যাই, কী করি সব তো তুমি জানো। লুকোইতো না কিছু।’

মা হৃদির পেছন পেছন হেঁটে এসে বললেন,’শোন তোর বড় চাচা ইউ এস এ থেকে আসছেন আগামী সপ্তাহে। আমার মনে হয় এবার উনি মনে মনে কোনো একটা প্ল্যান করে আসছেন।’

হৃদি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কী রকম প্ল্যান?’

– ‘উনি তোর বাবাকে বলেছেন যে, রাহাতের জন্য উনি তোকে পছন্দ করেছেন।

– ‘রাহাত ভাইয়া? পছন্দ করেছেন মানে কী? রাহাত ভাইয়া তো আমার চাচাতো ভাই।’

– ‘তাতে কী?’

– ‘কাজিনদের মধ্যে বিয়ে শাদী হওয়া ভালোনা মা। সমস্যা হয়।’

– ‘ওসব কোনো সমস্যাই না।’

– ‘তুমি কিছুই জানোনা, বড্ড বোকা তুমি।’

মা চোখ মটকে বললেন, ‘হ্যাঁ বুদ্ধি তো সব তোমার ঘটে। যা বলার তোমার বাবাকে গিয়ে বল যাও। তোমার বাবা মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন যে রাহাতের সাথেই তোমার বিয়ে দেবেন।’

– ‘বাবা সিদ্ধান্ত নিলে তো হবেনা মা। সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমার।’

– ‘কেন তোর সমস্যাটা কোন জায়গায়? রাহাত ডাক্তার ছেলে। আমেরিকার মত জায়গায় ডাক্তারি প্র্যাকটিস করে। ওর বাবা তোর আপন চাচা। মাথায় করে রাখবে।
’

হৃদি নিজের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালো। হাতে ধরা পার্সটা ছুঁড়ে ফেলল বিছানার উপর। মা ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হৃদি বুঝতে পারছে মায়ের লেকচার এখানেই শেষ নয়। আরও বেশ কিছুক্ষণ চলবে এই অযথা বকবকানি। হৃদি একটু বিরক্ত গলায় বলল, ‘মা ঘুমোতে যাও। রাত হয়েছে তো অনেক!’

মা তার ডান হাত বাড়িয়ে কী যেন একটা হৃদির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ‘এইটা রাখ। ‘

হৃদি বিস্ময় নিয়ে মায়ের হাত থেকে জিনিসটা নিল। কালো সুতোয় বাঁধা একটি ছোট মাদুলি।

– ‘এটা দিয়ে কী করবো?’

– ‘পীর সাহেবের কাছ থেকে কাল থেকে নিয়ে এসেছি। গলায় ঝুলিয়ে রাখ।’

– ‘কী আশ্চর্য! কেন এটা গলায় ঝুলাবো আমি? কী হবে এটা পরলে?’ মা মিন মিন করে বললেন, ‘ভালো হবে।’

– ‘কীসের ভালো?’

– ‘ভালো চাকরি, ভালো বিয়ে।’

– ‘উফ মা, এসবে কোনো লাভ হয়না। তুমি নামাজ পরে আমার জন্য দোয়া কর, তাতেই হবে।

মা এবার একটু রেগে গেলেন, ‘তুই এত বেশি কথা বলিস কেন? যা বলি তা করতে পারিস না? পর, এখনই তাবিজটা গলায় পর।’

অতএব হৃদিকে জিনিসটা গলায় ঝুলাতেই হল। মা ঘরে উপস্থিত থাকা অবস্থায় পার্সের ভেতর হঠাৎ বাজনাটা বেজে উঠল, ‘তুই বন্ধু হয়ে আমার হাতটা ছুঁলে / আমি এ বিশ্ব সংসার যাবো ভুলে..’ কদিন হল ওরা সব বন্ধুরা রুদ্রর গাওয়া গানটা রিংটোন হিসেবে সেট করেছে। শীত কাল বলে চারপাশ বড় নীরব। ফ্যানের আওয়াজ নেই। নেই এয়ার কন্ডিশনের চিঁচিঁ শব্দ। গানের শব্দটা তাই বড্ড কানে লাগলো। হৃদি দ্রুত ব্যাগ খুলে সেলফোন বের করল। সামি ফোন করেছে। হৃদি ফোন কানে দিয়ে বলল, ‘এই শোন তোকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি। দুই মিনিট পর।’

ফোন কাটতেই মা প্রশ্ন করলেন,’কে?’

– ‘সামি।’

– ‘এতো রাতে ফোন দিচ্ছে কেন?’

হৃদি অবাক চোখে তাকালো মায়ের দিকে,'তোমার আজকে কী হয়েছে মা? আমার বন্ধুদের কি রাত দিনের হিসেব আছে? ওরা তো যখন তখন ফোন দেয়।

– 'এসব বেশি দিন চলবেনা।'

– 'মানে কী?'

– 'সামনে তোর বিয়ে হবে। এরকম রাত বিরেতে ফোন করলে শ্বশুর বাড়ির লোকে কী বলবে?'

– 'ওরকম শ্বশুর বাড়িতে আমি যাবইনা।'

– 'হৃদিতা শোন, সময় থাকতে নিজেকে শুধরে নে। এমন বন্ধু বন্ধু করে জীবনটা শেষ করে দিস না। বিভাকে দেখেছিস? কী সুন্দর সংসার করছে মন দিয়ে? তোকেও এরকম হতে হবে।'

– 'মা, তুমি যাও, ঘুম পাচ্ছে।'

– 'কত ঘুমাবি তা আমার জানা আছে। আমি চলে গেলেই ওই ছেলেটার সাথে ফুসুর ফাসুর করে কথা বলবি। গত রাতে তোরা ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কথা বলেছিস। আমি ফজরের নামাজ পড়তে উঠে তোর গলার আওয়াজ পেয়েছি।'

হৃদি কথাটা শুনে চুপসে গেল। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি কান পেতে আমার কথা শোনো। এটা তো ঠিক না মা।'

মায়ের গলার স্বরটা হঠাৎ কেমন পাল্টে গেল, জরুরি ভাবে বলল, 'হ্যাঁরে, এত কী কথা বলিস তোরা? অন্যরকম কোনো ঘটনা নয় তো আবার?'

হৃদি চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, ‘না অন্যরকম কিছু না। সামির বিয়ে ঠিক হয়েছে। খুব শীঘ্রই ওর বিয়ে হবে।’

– ‘ও, তাই নাকি?’ কথাটা বলে কয়েক সেকেন্ড নিজের মনে নিজে কিছু একটা ভেবে নিয়ে মা চিন্তিত গলায় বললেন, ‘কী জানি বাপু, আজকালকার ছেলে মেয়েদের মতি গতি আমি কিছু বুঝিনা। সারাদিন কথা বলে একজনের সাথে আর বিয়ে করে অন্য একজনকে।’

হৃদি হেসে বলল, ‘মা তুমি কি মনে মনে ভেবে রেখেছিলে যে এমপি রাশেদুল হকের ছেলের সাথে তোমার মেয়ের বিয়ে হবে?’

মা চমকে উঠে বললেন, ‘ছিঃ ওসব কী কথা? আমি কেন মনে মনে অমন ভাববো? তবে হ্যাঁ, তোরা যদি একজন আরেকজনকে পছন্দ করে থাকিস, তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।’

– ‘কী যে বল মা, ওরা কত বড়লোক। ওদের সাথে কি আমাদের মানায়?

সেই সময় সেলফোনটা আবার বেজে উঠল, রুদ্র গাইতে লাগল গিটারের টুং টাং তারের সাথে, ‘তুই বন্ধু হয়ে আমার হাতটা ছুঁলে। হৃদি ফোন হাতে নিয়ে বলল, ‘সামি ফোন করছে মা। মনে হয় জরুরি কোনো কথা আছে।’

মা কথাটা শুনে আর দাঁড়ালেন না। ঘর ছাড়ার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে একবার বললেন, ‘রাত জেগে ফোনে কথা বলার অভ্যাসটা ত্যাগ কর। বিয়ের পর খুব সমস্যায় পড়বি।
’

– 'আচ্ছা ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।'

মা বেরিয়ে যেতেই ঘরের দরজা আটকে দিয়ে হৃদি ফোনটা লাউড স্পিকারে দিল। আলমারি থেকে ঘরে পরার জামা বের করতে করতে বলল, 'কী হইছে তোর, সামি?

সামি ওপাশ থেকে খ্যাক দিয়ে বলে উঠল, কোন জাহান্নামে ছিলি শালী? এতক্ষণ লাগে তোর কল ব্যাক করতে?'

– 'মা ছিল আমার ঘরে।'

– 'তো?'

– 'তো আবার কী? কথা বলতেছিলাম।'

-'কী কথা বলতেছিলি?'

– 'সেটা পরে বলব, আগে বল তোর এমন কী জরুরি দরকার পড়ল যে বার বার ডিস্টার্ব করতেছিস?'

-'কী করতেছিস এখন?'

– 'ড্রেস চেঞ্জ করি।'

– 'মানে কী? তুই কি এখন নেকেড?'

– 'তাতে তোর কীরে হারামজাদা?'

– 'বল না!'

– 'না আমি মোটেও নেকেড না।

– ‘তাহলে তুই ড্রেস চেঞ্জ করতেছিস ক্যামনে?

-‘সামি, তুই কি এসব ফালতু কথা বলার জন্য আমাকে ফোন করছিস?’

-’ না না, শোন, তানিশা আমাকে মাত্র একটা ছবি পাঠাইছে বুঝছস? ছবিটা দোস্ত অনেক খোলামেলা। জোশ অনেক। তুই কি দেখবি?’

হৃদি ঝেঁঝে উঠে বলল, ‘বিয়া করবি তুই, আমি ছবি দেখে কী করব? আর তানিশা কে? ওই ঢঙ্গিটা?’

– ‘কে আবার? আমার ফিয়ন্সে।

– ‘তোর ফিয়ন্সে তোরে কী সব বালের ছবি পাঠাইছে, সেই ছবি আমি কেন দেখব?’

– ‘রুদ্রতো দেখার জন্য পাগল হয়ে গেছে।’

– ‘তোর বৌয়ের ছবি দেখার জন্য ওই পাগল হইছে কেন?’

– ‘জানিনা তো!’

-‘একটা থাপ্পড় মার ওর গালে।’

– ‘তুই কি দেখবিনা?’

– ‘জীবনেও না, আমি কি লেসবিয়ান নাকি?’

– ‘মিস করলি কিন্তু মামা, মাইয়া কিন্তু হট!’

– ‘রুদ্ররে গিয়া বল এইসব ফালতু কথা। আমারে বলতে আসিস না, নিজের বৌকে নিয়ে কেউ এসব কথা বলে?’

– ‘বৌ তো হয়নায় এখনো! রুদ্ররে কি ছবি গুলা দেখাবো?’

– ‘তোর কি মাথা ভর্তি গোবর?’

– ‘আচ্ছা আন্টি তোকে কী বলতেছিল? এতক্ষণ ধরে?’

হৃদি ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুলো। ফোনের লাউডস্পিকার বন্ধ করে কানে নিয়ে বলল, ‘আমার বিয়ে দিতে চায়।’

– ‘তোর বিয়ে?’ সামির কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল হৃদির বিয়ের ব্যাপারটা যেন খুব আশ্চর্যজনক কিছু।

– ‘এত অবাক হওয়ার মত কী হইলো? বিয়ে কি শুধু তোমরাই করবা? আমি করব না?’

– ‘তোরে বিয়ে করবে কে রে? এক রবিন ছাড়া আর কেউ তোর ভাগ্যে জুটবেনা। আর রবিন হইল একটা মস্ত বড় বোকচোদ।’

– ‘ফালতু কথা বলবিনা। আব্বা আমার এক কাজিনের সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা বলতেছে। কাজিন আমেরিকায় থাকে, ডাক্তার।’

সামি হো হো করে এক ডাকাতিয়া হাসি হেসে বলল, ‘ডাক্তার ছেলে বিয়ে করবে তোরে? তাও আবার আমেরিকান সিটিজেন ডাক্তার? আমেরিকায় এত সাদা সাদা সুন্দর হুরপরী ফেলে এসে তোর মত একটা কুৎসিত মেয়েকে সে কেন বিয়ে করবে বল তো? সে কি কানা? আমি তো কোনো লজিক খুঁজে পাচ্ছিনা। তুই তো পড়ালেখায়ও মিডিয়াম। কী দেখে তোকে পছন্দ করবে?’

হৃদির বুকটা হঠাৎ অভিমানে টলমল করে ওঠে। গম্ভীর গলায় বলে, -'সব সময় ফাজলামো করিস কেন, সামি?

– 'ফাজলামো না, সিরিয়াসলি। আই মেন্ট ইচ এন্ড এভরি ওয়ার্ড।'

-' আমি যেমনই হইনা কেন দেখতে, তোর ওই ঢঙ্গি তানিশার থেকে অনেক ভালো আছি।'

– 'তানিশার গায়ের রং দেখছ তুমি? টকটকে লাল টমেটোর মত। ফিগার দেখছ?'

– 'তোর কি আসলেই ওই মেয়েটাকে পছন্দ হইছে সামি? সত্যি করে বল তো?'

–' জানিনা।'

– 'জানিনা মানে কী?'

– 'আমি শুধু জানি, যে বিভাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। ওরে শিক্ষা দেয়ার জন্য আমার বিয়া করা খুব দরকার।

– 'বিভাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেছিস?'

– 'শোন হৃদি, মুভ অন তো করতেই হবে, তাইনা? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে ফেলাই ভালো।'

– 'পছন্দ না হলেও বিয়ে করতে হবে?'

– 'পছন্দ বলতে… ওয়েল টরুলি স্পিকিং মেয়েটারে আমার দেখতে শুনতে ভালোই লাগছে। স্মার্ট, মিশুক, সুন্দরী, লেখাপড়ায় খারাপ না। আর সবচেয়ে বড় কথা আমার মায়ের অনেক পছন্দ, বুঝছিস?'

– 'ওরাও তোদের মতো বড়লোক, তাইনা?'

– 'মেয়ের বাবার শুনছি ভালোই টাকা পয়সা।

– ‘তাহলে তো হয়েই গেল।’

– ‘হুম··· কিন্তু তোর কী হবে হৃদি? ডাক্তার তো তোকে পছন্দ করবেনা।’

– ‘একশ বার করবে।’

– ‘করবেনারে, তুই একটু ফেয়ার এন্ড লাভলি টাভলি মাখলে তো পারিস। মেয়েরা নাকি ওসব মেখে সুন্দর হয়। আচ্ছা শোন তানিশা আগামী মাসে সিঙ্গাপুর যাচ্ছে। ওকে আমি বলে দিব তোর জন্য ভালো ব্র্যাণ্ডের কিছু কসমেটিক্স নিয়ে আসতে। ওগুলো মেখে ডাক্তারের সামনে গেলে হয়তো পছন্দ করলেও করতে পারে।’

– ‘লাত্থি খাবি কুত্তার বাচ্চা! ফোন রাখি।’

– ‘দাঁড়া দাঁড়া, তানিশা আস্ক করতেছিল যে ফ্রেন্ডদের মধ্যে কারো সাথে আমার স্পেশাল কোনো রিলেশন ছিল কিনা। তো আমি বিভার কথা বলছি।’

– ‘ভালো করছিস।’

– ‘আর তোকে যে আমি বিভা মনে করে কিস করছিলাম, এটা কি বলার দরকার আছে?’

– ‘আমি জানিনা। তোর ইচ্ছা।’

– ‘নেক্সট উইকেন্ডে, ও তোদের সাথে মিট করবে বুঝছিস?’

– ‘বেশ।’

– ‘আজকে দোস্ত আমার মনটা অনেক ভালো। নয়মাস পর আব্বারে দেখলাম। ইট ওয়াজ আ গ্রেট সারপ্রাইজ টু মি! আমি প্রথমে বিশ্বাস করতে পারতেছিলাম না।’

– ‘হুম, ক্রেডিট গোজ টু ...’ বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলে ফেলল হৃদি।

– ‘ক্রেডিট গোজ টু হুম?’

– ‘না না মানে আঙ্কেলেরই ক্রেডিট। উনি নিজ থেকে দেখা করছেন তোর সাথে। সো নাইস অফ হিম।’

রাজশাহী থেকে অমৃতার এক দুঃসম্পর্কের চাচা এসেছেন ঢাকায়, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। দু তিন সপ্তাহ থাকবেন তিনি অমৃতাদের ফ্ল্যাটে। দীপার ঘরটা তার জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই দু তিন সপ্তাহ দীপা অমৃতার ঘরে রাত কাটাবে। তার রাত জেগে পড়ালেখা করার বাতিক হয়েছে আজকাল। সামনে সেমিস্টার ফাইনাল। পরীক্ষার কারণে রাত জাগার পরিমাণ বেড়েছে। এদিকে অমৃতার বাতি জ্বালানো থাকলে ঘুম আসেনা। সময় মতো ঘুমোনোটা তার জন্য খুব জরুরি। সকাল আটটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয় রোজ। খুব বেশি রাত জাগা তার পক্ষে কোনো ভাবেই সম্ভব না। রুম শেয়ার করতে গিয়ে তাই দুবোন খুব ভালো মুশকিলে পড়েছে। আজ এতো রাতে বাড়ি ফিরেও অমৃতা দেখলো দীপা ঘরের বাতি জ্বালিয়ে পড়াশোনা করছে।

অমৃতাকে দেখা মাত্র সে বলল, ‘আর এক ঘন্টা পড়ব। সমস্যা হবে তোর?’

অমৃতা একটু হতাশ গলায় বলল, ‘সমস্যা হলেই বা কী করার আছে?’

-’ ড্রইং রুমে চলে যাব?’

– ‘না থাক, এক ঘন্টায় খুব বেশি সমস্যা হবেনা।’

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় পাল্টে এসে বিছানায় গা রাখতে না রাখতেই ফোন এসে গেল। রুদ্রর গাওয়া ‘বৃষ্টিমহল’ বাজতে থাকল ফোনে। মোবাইলের স্ক্রীনে নামটা দেখে বুক চলকে উঠল হালকা। ফোন হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসল সে। দীপা দেখল ওর বেরিয়ে যাওয়াটা, আড়চোখে। ড্রইং রুমের সাথের লাগোয়া বারান্দায় এসে, রেলিং এর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফোনটা ধরলো সে, ‘জ্বি বলুন।’

জানুয়ারির মধ্যরাতের শীতল বাতাসটা গায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে হাত পা ঠান্ডায় শিরশির করে উঠল। তাড়াহুড়োয় গায়ে কোনো গরম কাপড় না জড়িয়েই বাইরে চলে এসেছে সে। পরনে শুধু একটা পাতলা কাপড়ের টিশার্ট আর ট্রাউজার। গলির মুখে একটি নেড়ি কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছিল। আর খানিক বাদে বাদে শোনা যাচ্ছিল নাইটগার্ডের হুইসেলের আওয়াজ। এছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। নিশুতি রাত!

– ‘পৌঁছে গেছো বাসায়?’

– ‘হ্যাঁ, এইতো একটু আগে।

– ‘আকাশ নামিয়ে দিয়েছে তোমাকে?’

– ‘না। আমি আকাশকে নামিয়ে দিয়ে এসেছি।’

হক হেসে বললেন, ‘বাহ, বেশ তো! আজকাল সব কিছু উল্টে পাল্টে যাচ্ছে। আগে ছেলেরা মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসত। এখন মেয়েরা ছেলেদের পৌঁছে দিচ্ছে।
’

– ‘ছেলে মেয়ের আবার আলাদা আলাদা দায়িত্ব আছে নাকি? যাই হোক, আপনি বলুন? এতো রাতে ফোন করলেন কী ভেবে?’

– ‘খুব বেশি অসময়ে করে ফেলেছি কি ফোনটা?’

– ‘আপনার জন্য আমি অলওয়েজ এভেইলেবল।

– ‘আমার জন্য?’

– ‘হ্যাঁ আপনার জন্য।’

হক একটু থেমে থেমে বললেন,'ফোন করেছি, তোমাকে একটা ধন্যবাদ দেব বলে। অমৃতা! আমি বলে বোঝাতে পারবনা যে আমি তোমার কাছে কতটা কৃতজ্ঞ!'

কথাটা শুনে কেন যে অমৃতার এত ভালো লাগল কে জানে! ভালোলাগাটা একদম মুখের কথা কেঁড়ে নিল তার। আপ্লুত হয়ে কী যেন একটা বলতে গিয়েও বললোনা আবার। চুপ করে গেল।

হক বললেন,'তোমাকে একটা উপহার দিতে চাই। তুমি আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়েছ আমার কাছে। একটা পুরস্কার তোমার প্রাপ্য।'

অমৃতার ট্রাউজারের পকেটে সিগারেটের বাক্স রাখা ছিল। সাথে লাইটারও। সে বক্স থেকে সিগারেট বের করে লাইটার দিয়ে আগুন ধরালো। তার বুক কাঁপছিল হালকা। মনে হচ্ছিল ঠিক এই সময়, এই নির্দিষ্ট ফোনটা আসা খুব জরুরি ছিল। এই ফোনটা না আসলে বুঝি কিছু একটা অঘটন ঘটে যাবার সম্ভাবনা ছিল আজ। সময় নিয়ে সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে বলল, 'যা চাইব তা দেবেন তো?'

– 'অবশ্যই! কী চাই তোমার, বল?'

– 'কথা দিলেন কিন্তু, যা চাইব ঠিক তাই দিতে হবে।'

– 'হ্যাঁ কথা দিলাম। তবে আশা করি তুমি আমার সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাইবেনা।

– 'আপনার সামর্থ্যের বাইরে কি কিছু আছে মিস্টার হক? আপনি তো ক্ষমতাবান লোক।

– 'প্রতিটি মানুষেরই কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। আমি মানুষ, দেবতা তো নই।

– 'ঠিক আছে, তাহলে শুনুন আমি কী চাই।'

-‘হ্যাঁ বল, শুনছি।

একটু সময় চুপ করে থেকে অমৃতা চপল গলায় বলল, –’আপনি আমার বন্ধু হবেন?’

– ‘বন্ধু!’

– ‘হ্যাঁ, বন্ধু।’

হক সাহেব অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন এই কথা শুনে। তিনি বুঝতে পারছেন না যে এই মেয়েটা কি ফাজিল? ফচকে? নাকি পাগল? হাসতে হাসতেই তিনি বললেন, ‘কিন্তু অমৃতা, তোমার তো অনেক বন্ধু আছে। হঠাৎ নতুন বন্ধুর প্রয়োজন কেন পড়ল?’

– ‘হ্যাঁ বন্ধু আমার আছে তা ঠিক। বলতে পারেন বন্ধুরা আমার অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু আমার কোনো বিশেষ বন্ধু নেই।

– ‘বিশেষ বন্ধু?’

– ‘হ্যাঁ, বিশেষ বন্ধু।’

– ‘বিশেষ বন্ধু বলতে ঠিক কী বোঝায়? আর সেটা কীভাবে হওয়া যায়?’

– ‘সেটাও আপনি জানেননা?’ অমৃতা হাসে এবার। ফিচেল হাসি!

– ‘না, জানিনাতো!’

– ‘আচ্ছা আমি শিখিয়ে দেব। যদিও আমার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা একেবারেই কম।

– ‘কিন্তু তুমি তো আমার ছেলের বন্ধু! আমার বন্ধু কী করে হবে?’

– ‘সামি আমার শুধুই বন্ধু। বিশেষ বন্ধু নয় তো!

– ‘এত বয়সের তফাতে কি বন্ধু হওয়া যায়?’

– ‘এজ ইজ জাস্ট আ নাম্বার! আপনি কিন্তু আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমি যা চাইব, তাই দেবেন।’

মেয়েটা যে এমন অদ্ভুত আবদার করে বসবে এটা তার ধারণার বাইরে ছিল। হক এবার বেশ একটু বিচলিত বোধ করতে লাগলেন। কিন্তু বিচলিত বোধটার পাশাপাশি বহু বছর পর তার মনের মধ্যে একটি নির্মল আনন্দের সঞ্চার হল। একটা সময় তার অগণিত বন্ধু ছিল। সময়ের ব্যবধানে সেইসব বন্ধুরা আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। কারো সাথে যোগাযোগ নেই। কয়েকজন যাও বা যোগাযোগ রেখেছে তা নিছক প্রয়োজনের খাতিরে। বর্তমানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলেই তাঁর দর্শন লাভ করতে চায় নানা মতলবে, তদবীরে আর স্বার্থের তাগিদে। আজকের এই ভীষণ স্বার্থসম্পন্ন, সঙ্কীর্ণচেতা, আত্মকেন্দ্রী পৃথিবীতে কেউ একজন তাঁর মতো ক্ষমতাবান, প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যক্তির কাছ থেকে উপহার হিসেবে শুধুমাত্র বন্ধুত্ব পেতে চাইছে, এতো ভারী চমকপ্রদ একটি ব্যাপার!

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমৃতা অধৈর্য গলায় বলল, ‘কী হল? কথা বলছেন না যে?’

হক ভাবনার ঘোর থেকে বেরিয়ে এসে কোনো রকমে বললেন, – ‘কিন্তু আমার ছেলে ব্যাপারটাকে কীভাবে নেবে বল তো?’

– ‘ওটা আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। আর আপাতত ওকে কিছু বলার দরকার নেই।’

– ‘আমি তোমাদের জেনারেশনটাকে ঠিক মতো বুঝতে পারিনা!’

– 'তাহলে আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, ঠিক আছে?' তারিয়ে তারিয়ে আমুদে গলায় শব্দগুলো উচ্চারণ করে অমৃতা।

– 'হুম, ঠিক আছে।'

– 'থ্যাংক ইউ!'

হক এই পর্যায়ে অস্বস্তিতে চুপ করে গেলেন। তিনি জানেন না এরপর তার ঠিক কী বলা উচিৎ। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে তিনি বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন। বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলেন তাঁর স্ত্রী। তিনি স্টাডি রুমে বসে কথা বলছিলেন ফোনে। রোমেলা স্টাডিরুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখলেন স্বামীকে। দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে হক একটু অপ্রস্তুত ভাবে অমৃতাকে বললেন, 'এখন তাহলে ছাড়ছি।' কথাটা বলে তিনি অমৃতাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিলেন না। ফোন কাটলেন চট করে। রোমেলা অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কার সাথে কথা বলছিলে?'

হক মোবাইল ফোনটা একেবারে সুইচড অফ করে দিলেন। কেন জানেন না তাঁর মনে হচ্ছিল অমৃতা আবার কল ব্যাক করে বসতে পারে। এই মেয়েটির কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'একটু জরুরি কথা বলছিলাম।

– 'এত রাতে?'

– 'হুম…'

ছোট করে শব্দটা উচ্চারণ করে তিনি উঠে পড়লেন। স্ত্রীর সাথে সচরাচর মিথ্যা কথা বলেননা। প্রয়োজন পড়েনি কখনো। আজকে এই ছোট্ট মিথ্যা কথাটা বলে ফেলে তার মনের ভেতর কেমন পাপ বোধ কাজ করতে লাগল। তবে সেই সাথে একটা অন্যরকম নিষ্কলুষ ভালো লাগা টের পাচ্ছিলেন তিনি ভেতরে ভেতরে। অনেক অনেক দিন তার এই ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে এমন নিষ্কলুষ আনন্দের ছায়া পড়েনি!

২৭

ঢাকা ফেরার আগের দুটা দিন বিভা কাটালো কলকাতায়, সল্টলেকের বাড়িতে। এবারে শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার অন্যরকম রূপ দেখতে পেল। এই মেয়ে যেন কয়েকদিনের তফাতেই হয়ে উঠেছে পরিণত বয়স্ক, সপ্রতিভ এবং দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন। ডুয়ার্স যাবার পূর্বের আটটা মাস বাড়ির লোকের সাথে তার ব্যবহার ছিল অতিথির মত। সারাদিন নিজের ঘরের দোর দিয়ে বসে থাকত। শাশুড়ি মায়ের সাথে শুধু রোজ বিকেলে একটু হাঁটতে বেরোনো আর রাতের বেলায় শ্বশুর মশাইয়ের ঔষধ পত্র প্রেসক্রিপশন দেখে দেখে খাইয়ে দেয়া, এই এতটুকু ছিল তার সাংসারিক দায়িত্ব। খাবার টেবিলে কোনো বাড়তি কথা বলতোনা সে। চুপচাপ খাওয়া শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে পড়ত। আত্মীয়স্বজন, ননদ, দেবররা গল্প করতে আসলে ফ্যালফ্যাল করে তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকত। প্রশ্নের উত্তর দিত হ্যাঁ অথবা না বলে। অভিজিতকে একবার তার মা প্রশ্ন করেছিলেন, বৌমার কোনো মানসিক প্রতিবন্ধকতা নেই তো? কিছু বললে কেমন হা করে চেয়ে থাকে, যেন বাংলা বোঝেনা। জবাবে অভিজিৎ বলেছে, নিজের দেশ ছেড়ে দূরে চলে এসেছে, হয়তো হোমসিকনেস কাজ করছে। ঠিক হয়ে যাবে। বলেছিল ঠিকই, কিন্তু অভিজিৎ মনে মনে জানতো যে, এ কখনো ঠিক হবার নয়। এ সম্পর্ক মিথ্যা সম্পর্ক। শীঘ্রই এই মিথ্যে সম্পর্কের সত্যিকারের ইতি টানা হবে। বাবা মায়ের সামনে স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণ তাকে বিব্রত করে তুলত প্রতি নিয়ত। না পারত কাউকে কিছু বলতে, না পারতো সইতে। কত রাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয়নি শুধুমাত্র এই ভেবে যে সত্য জানতে পারলে বাবা মায়ের কী অবস্থা হবে? তার বাবার বয়স সত্তর। মায়ের পঁয়ষট্টি। বাবার ডায়বেটিস সহ নানার রকম বার্ধক্যজনিত রোগ আছে। বড় দুই দাদা দেশের বাইরে সেটেলড। এক দিদি থাকেন স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে। ছোট ভাইটির এখনো লেখাপড়া শেষ হয়নি। তার সাবলম্বী হয়ে উঠতে আরো বছর পাঁচেক সময় লেগে যাবে। এমতাবস্থায় বাবা মায়ের একমাত্র অবলম্বন হল অভিজিৎ। এই বয়সে বুড়ো বাবা মাকে কেমন করে সে এতবড় দুঃসংবাদটা দেবে এবং এই দুঃসংবাদ জানতে পারার পর তাদের দুজনের ওপর দিয়ে কী ঝড়টা যাবে এই ভেবে ভেবে কত রাতের ঘুম হারাম হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বড় শখ করে বাড়িতে বৌ এনেছিলেন মা। সেই শখের বৌমা প্রথম

তিনটা মাস শাশুড়ির সাথে হেসে একটি কথা পর্যন্ত বলল না। দশটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেত নতুন বৌয়ের কাছ থেকে। কয়েকমাস পর তার মুখে কথা ফুটল ঠিকই কিন্তু সারাক্ষণ একটা কেমন আড়ষ্টতা কাজ করত তার ভেতরে। তবে শ্বশুর, শাশুড়িকে কখনোই সে অসম্মান করেনি। বরং শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছে। ধীরে ধীরে একটা মায়াও জন্মে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মায়ায় আপন আপন গন্ধ ছিলোনা, অধিকার ছিলো না, তার বদলে ছিল একরকম করুণা।

এবার ঘটল সম্পূর্ণ অন্যরকম ঘটনা। বিভাকে এত হাসিখুশি শ্বশুর বাড়ির লোকে এর আগে কখনো দেখেনি। দুটো দিন সে শাশুড়িকে সঙ্গ দিল। ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঘন্টা বাজিয়ে পূজো করল। রান্না করল। শ্বশুরকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। দেবরটাকে সাথে নিয়ে অভিজিৎ আর সে রাত জেগে মুভি দেখলো। সব মিলিয়ে এ যাত্রায় বিভা, অভিজিতের মন প্রাণ একদম ভরিয়ে দিল। সব কথাতো মুখে বলতে হয়না। কিছু না বলেই বিভা বুঝিয়ে দিল যে আপাতত অভিজিৎকে ছেড়ে যাবার কোনো পরিকল্পনা তার নেই। কিন্তু বিভার মতো একটা উড়নচণ্ডী মেয়ের ওপর কতটা ভরসা করা যায়? কী করে নিশ্চিত হবে অভিজিৎ, যে ঢাকা গিয়ে বিভা তার পুরোনো প্রেমিককে দেখতে পেয়ে মন পাল্টে ফেলবেনা? মেয়েটাকে সে যতটা দেখেছে, বুঝেছে যে ভেতরে ভেতরে সে এখনো ছেলেমানুষ রয়ে গেছে। জীবনটা তার কাছে এখনো পুতুল খেলারই মতো। তাই হাসিখুশি, সংসারী বিভাকে দেখে অভিজিতের সুখানুভূতির পাশাপাশি একটু কেমন ভয় ভয়ও লাগছিল। তার পোড়া কপালে এই সুখ খুব বেশিদিন সইবে কি?

বিভা ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলের ওপর বসে ছিল। তার গায়ে হালকা বেগুনি রঙের স্লিভলেস নাইটি। গলায় ঝুলছে স্বর্ণের লকেট। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল গুলো সামনে এনে বাম বুকের ওপর ছড়িয়ে রেখে আস্তে আস্তে চিরুনি বুলাচ্ছিল সে। গোছগাছ করতে করতেই রাত বারোটা বেজে গেছে। প্লেন ছাড়বে সকালে। বাড়ি থেকে বেরোতে হবে ভোর ছটায়। সাড়ে সাতটায় রিপোর্টিং। বিভাকে এয়ারপোর্টে

নামিয়ে দিয়ে অভিজিৎ গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাবে ডুয়ার্সে। আজ অনেক দিন পর বিভার মনের মাঝে এক অনাবিল আনন্দ অনুভূত হচ্ছে। হবেইবা না কেন? প্রায় এক বছর পর সে নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে বাবা মায়ের কাছে, বন্ধুদের কাছে, প্রাণের শহরটার কাছে। ভাবতেই শরীরের প্রতিটি রক্তকণায় তিরতির করে ছড়িয়ে যাচ্ছে এক প্রবল উত্তেজনা। আর তর সইছেনা।

আয়নায় নিজের পেছনে একটি লম্বা ছায়া দেখতে পেল সে হঠাৎ! অভিজিৎ নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পরনে একটি ঘিয়া রঙের ফতুয়া। সাদা পাজামা। চোখে রোজকার মোটা কাচের চশমা। ওকে দেখতে পেয়ে বিভা চিরুনি চালানো বন্ধ করে, সন্দিহান হয়ে বলল, 'কিছু বলবেন?'

অভিজিৎ একটু ম্লান ভাবে বলল, 'তেমন কিছুনা।'

বিভা চুল আঁচড়ানো শেষ করে বডি বাটারের কৌটা হাতে নিয়ে বলল, 'আপনার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি।'

– 'কী বুঝতে পারছেন?'

বিভা হাতে আর গলায় বডি বাটার মাখতে মাখতে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি বলে আপনার মন খারাপ।'

অভিজিৎ মুখে একটা কপট গম্ভীর ভাব আনার চেষ্টা করে বলল, 'না না!'

– ‘না?’

– ‘নাহ!’

– ‘সত্যি না?’

– ‘সত্যি না।’

– ‘মিথ্যে কথা!’

– ‘সত্য কথা! নিজেকে অতটা ইম্পরট্যান্ট ভাবার কিছু নেই।’ অভিজিৎ বলল কপট গম্ভীর ভাবটা মুখে বজায় রেখেই।

বিভা অবাক চোখে তাকাল চশমা ওয়ালা ভালমানুষ চেহারার ছেলেটার দিকে। বাঃ খুব চটাং চটাং কথা বলা হচ্ছে আজকাল!

– ‘তাহলে মুখটাকে ওরকম হাঁড়িপানা করে রেখেছেন কেন সেই তখন থেকে?’ বিভা বলে উঠল তেজালো কণ্ঠে

অভিজিৎ হেঁটে এসে বিছানার ওপরে পা ঝুলিয়ে বসল, বলল, ‘আমার মুখটা একটু হাঁড়ির মতই হয়ে থাকে সবসময়। এ নতুন কিছুনা।’

বিভার মুখে একটা চাপা রাগ গনগন করছিল। সে বডি বাটার মাখা শেষ করে, উঠে এসে দাঁড়ালো অভিজিতের সামনে। চোখা ভাবে বলল, ‘এর মানে আমি চলে গেলে আপনি আমাকে একটুও মিস করবেন না?’

অভিজিৎ স্পষ্ট গলায় বলল, 'আপনাকে মিস করার কোনো কারণ নেই তো! আমাকে দেখাশোনা করার জন্য দূর্গা আছে।'

দূর্গার নামটা শুনে বিভার রাগ যেন আরো দশ গুণ বেড়ে গেল। সে বিষঢালা গলায় বলে উঠল, 'ও আচ্ছা, তাই বলুন! বলি, দূর্গা আপনার মা হয়, নাকি বৌ হয়? যে তার ওপর এতো ভরসা?'

– 'ছিঃ আপনি ভীষণ ন্যারো মাইন্ডেড।'

– 'হ্যাঁ উচিৎ কথা বলতে গেলে তো ন্যারো মাইন্ডেড হবই আমি।' এটুকু বলে বিভা আঙুল তুলে একদম ঝগড়াটে গলায় বলল, 'দেখুন ওই মেয়েটাকে আপনি নিজের বেশি কাছে ঘেঁষতে দেবেননা। আমার এইসব একদম পছন্দ হয়না। বাড়ির কাজের লোক থাকবে কাজের লোকের মতো। অত সারাদিন দাদাবাবু দাদাবাবু করে গায়ের ওপর পড়া কেন শুনি?'

অভিজিৎ হেসে ফেলল এবার। আচম্বিতে হাত বাড়িয়ে বিভাকে কাছে টেনে এনে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে ফেলল। তারপর ওর গালে চকাম করে একটা চুমু খেয়ে ফেলে বলল, 'এত হিংসা পেটে নিয়ে বেঁচে আছেন কী করে?'

বিভা ওই আচমকা চুমুতে লাল হয়ে গেল একদম। রাগটা একটু নরম হল বুঝি। বলল, 'কাজের মেয়েকে হিংসা করব আমি। খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই আমার। আর আপনাকে কতবার বলা লাগবে আমাকে আপনি সম্বোধন না করতে?'

বিভার গা থেকে ভুরভুর করে বডি বাটারের সুগন্ধ ভেসে আসছিল। ওর ডাগর দুটি চোখে তখন কী অদ্ভুত মাদকতা! অভিজিৎ ওই মাদক চোখের দিকে কয়েকটা সেকেন্ড মুগ্ধ ভাবে চেয়ে থেকে বলল, 'তুমি আবার ফিরে আসবে তো? বিভাবরী?'

জানেনা কেন, প্রশ্নটা বিভার হৃৎপিণ্ডকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। মোটা কাচের চশমা পরা, ভালোমানুষি চোখের মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেকে তার গলার কাছে একটা কান্নার ভাব সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল হঠাৎ। কোনো এক অদ্ভুত কারণে এই মানুষটাকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে। ডুয়ার্সের ওই ছোট্ট জংলী গ্রামটায় এই লোকটাকে একদম একলা দিন কাটাতে হবে, এই চিন্তাটা মাথায় আসলেই তার মন কেমন করছে। দেশে ফিরে যাবার আনন্দের জোয়ারে ভাটা পড়ছে। অথচ বিভা ওই গ্রামে যাবার আগে অভিজিৎ ওখানে একলাই থাকত। বিভাকে ছাড়া থাকতে তার কিন্তু খুব একটা সমস্যা হবার কথা নয়। কিন্তু বিভার কেবলই মনে হচ্ছে যে ওই ছোট্ট গ্রামের ছোট্ট সংসারটা তার অভাবে একদম মুষড়ে যাবে, মুষড়ে পড়বে এই মানুষটাও। এক বছর আগে, বিয়ের পর দেশ ছেড়ে কলকাতায় আসার সময় মনে হয়েছিল বুঝি শুধুমাত্র শরীরটাই প্লেনে চড়ে এসেছে এই শহরে। মনটা রয়ে গেছে ঢাকায়, মা বাবার সাথে, বন্ধুদের সাথে, সামির সাথে। তারপর প্রায় অনেক দিন বাদে সেই হৃদয়হীন শরীরে বুঝি আবার নতুন করে একটি মন গজিয়ে ওঠার পায়তারা করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে, বড় ঢিমেতালে নিজের অজান্তে গজিয়ে ওঠা সেই মনে একটু একটু করে সার পড়তে থাকল যেন। এভাবেই একদিন সে তার হৃদয়হীন শরীরটাতে পুনরায় প্রাণের স্পন্দন টের পেল। এখন কলকাতা ছেড়ে যাবার সময় তাইতো তার মনে হচ্ছে, এবারেও সে তার সম্পূর্ণটা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারছেনা। টুকরো টুকরো বিভাকে সে ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এই সল্টলেকের বাড়িতে, ডুয়ার্সের কটেজে, আর অভিজিতের ওই ভালোমানুষি চোখের মাঝে!

অভিজিৎ বিভার কানের ডগায় একটা আলতো চুমু খেয়ে বলল, 'উত্তর দিচ্ছ না যে?'

বিভা উত্তর দিল না, কিন্তু অভিজিতের আদরে সাড়া দিল। বিছানায় অন্তরঙ্গ হবার সময় সে ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে যে ফিরে আসতেই হবে অভিজিৎ! আমার সবটা তো আমি নিয়ে যেতে পারছিনা এ যাত্রায়। যা ফেলে যাচ্ছি, সেই ফেলে যাওয়া অংশটুকু কুড়িয়ে নেবার জন্য হলেও, আমাকে ফিরতেই হবে!'

এয়ারপোর্টে বন্ধুরা চলে আসল সকাল আটটার মধ্যে। অমৃতা আজ কোর্টে যাবেনা। হৃদির ক্লাস নেই। সামি তো এক সপ্তাহ হল চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। ছুটির ব্যবস্থা করতে পারেনি শুধু রুদ্র আর আকাশ। তবে দুজনেই কর্মস' লে জানিয়ে দিয়েছে আজ কাজে যোগদান করতে বিলম্ব হবে। সামি এয়ারপোর্টে আসার ব্যাপারে শুরু থেকেই অনীহা দেখাচ্ছিল। তার অনীহা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে বিভার প্রতি তার রাগটা এখনো রয়ে গেছে। তবে বন্ধুদের জোরাজোরিতে সে বেশিক্ষণ নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারলোনা। ধরে বেঁধে একরকম বগল দাবা করে বন্ধুরা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। সাথে এনেছে ফুলের মালা, এবং ব্লুটুথ স্পিকার। বিভা যখন বের হয়ে আসবে তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক বাজবে। বন্ধুরা নাচতে নাচতে গিয়ে তার গলায় ফুলের মালা পরাবে। গান এবং ফুলের মালার আইডিয়া রুদ্রর। অমৃতা বলেছিল এসব খ্যাত কাজ কারবারের মধ্যে সে নেই। শুনে রুদ্র রেগে গিয়ে বলেছে, খ্যাত হইলে খ্যাত। খ্যাত কাজ কারবার করতেই আমাদের মজা লাগে। তোমার মনে চাইলে থাকো, মনে না চাইলে ভাগো। অর্থাৎ পুষ্পমাল্য পরানোর আইডিয়াটা শেষতক বাতিল করা গেল না।

বিভার আব্বা আম্মা এয়ারপোর্টে আসেননি। উনারা বাড়িতে বসেই মেয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিভা নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল যথা সময়ে। গানের তালে নাচতে নাচতে রুদ্র আর আকাশ তাকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করল। উপস্থিত লোকজন দৃশ্যটিতে বেশ বিনোদন খুঁজে পেতে লাগল। দু জন চ্যাংড়া বয়সী ছেলে উত্তেজনার বশে ভিডিও করা শুরু করল। একজন দাঁত কেলিয়ে হেসে বলল, 'আফায় কি নেত্রী নাকি? কুন দল?'

অমৃতার দাদাগিরিতে অবশ্য উপস্থিত দর্শকরা খুব একটা সুবিধা করতে পারলনা। ভিডিও করতে থাকা ছেলেটির হাত থেকে সে ছোঁ মেরে ফোন কেঁড়ে নিল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘আপনি ভিডিও করার পারমিশন নিয়েছেন? কোথায় পান এত সাহস?’ ছেলেটি অমৃতার হম্বিতম্বি দেখে একটু বুঝি ভয়ই পেলো। মিনমিন করে বলল, ‘আচ্ছা ভিডিও করবোনা। ফোনটা ফেরত দেন।

গলায় দুটি ফুলের মালা পরে রাজ্য জয়ের হাসি হাসতে হাসতে বিভা এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসল। বন্ধুরা সবাই তাকে দেখামাত্র আলিঙ্গন করেছে। শুধুমাত্র সামি বাদে। বিভা নিজ থেকে সামির কাছে এগিয়ে গেছে, জড়িয়ে ধরেছে। সামি কাঠ কাঠ গলায় যে কথাটা প্রথম বলেছে তা হল, ‘তুই কি আমার এনগেজমেন্ট খাইতে আসছিস?’

বিভা কৃত্রিম হাসি হেসে বলেছে, ‘আবার জিগ্‌স্! এনগেজমেন্ট, বিয়া সব একবারে খেয়ে যাবো।’

বিভাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছুলো ওরা গোটা এক ঘন্টার ট্র্যাফিক জ্যাম ঠেলে বিভার বিয়ের পর এই প্রথম বন্ধুদের আসা এ বাড়িতে। বিয়ের দিনটির কথা মনে পড়ছিল সবার। কী এক নিদারুণ কষ্টের দিন ছিল। কেউ কোনোদিন ভুলতে পারবেনা সেই দিনটির কথা। তবে আজ আর সেই দগদগে কষ্টটি নেই। বিভাকে ওরা পুনরায় ফিরে পেয়েছে। প্রকৃতি রোধন ও সমন্বয়নে সর্বদাই পটু। সময়ের সাথে সাথে স্থিরতা আসতে বাধ্য। বহমান সময়ের অমোঘ পরিক্রমায় মানুষের জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে যায়, আবার অনেক প্রাপ্তিযোগ ঘটে। হারিয়ে ফেলা আর খুঁজে পাওয়ার এই দুর্দমনীয় নিরন্তর প্রক্রিয়ার অপর নামই বোধহয় জীবন।

বিভা কি এখন আর সামিকে ভালোবাসেনা? কিংবা সামি বিভাকে? নিশ্চয়ই বাসে। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই ভালোবাসার রকম সকম হয়তো একটু বদলে গেছে। বাস্তবতার ছোবলে স্বর্গীয় প্রেম থেকে নেমে এসে সম্পর্কটা হয়ত মোড় নিচ্ছে বোঝাপড়ার দিকে। বন্ধুত্বের দিকে। বস্তুত, মানুষের হৃদয়রাজ্যের রহস্য সর্বদাই অমীমাংসিত। হৃদয়পুরের অভেদ্য রহস্য বুকে নিয়েই জীবন নামের রঙ্গমঞ্চে যার যার নির্দিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করে যেতে হয়, শেষ নিঃস্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত। হ্যাঁ, এটাই সভ্য ভাবে বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত।

বিভাদের এপার্টমেন্টের নিচে পৌঁছেই সামি বলল, 'আমি আর উপরে না যাই, তোরা সন্ধ্যায় দেখা করিস।'

বন্ধুরা বুঝলো, সামির সংকোচটা আসলে বিভার বাবা মাকে ঘিরেই। বুঝতে পেরে খুব একটা জোর করলোনা ওরা কেউ। তাছাড়া বিভার বাবা মাও সামিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবেন কিনা মেয়ের বন্ধু হিসেবে এ বিষয়ে এখনো সন্দেহ আছে। বাকি বন্ধুরা বিভাদের বাসায় সকালের নাশতা করল। রুদ্র আর আকাশ নাশতা সেরেই বেরিয়ে পড়ল অফিসের উদ্দেশ্যে। এরপর বিভার বেডরুমে বসল তিন বান্ধবীর জরুরী মিটিং। অনেক দিন পর, নিজের ঘরে, নিজের বিছানায় এসে বিভার তখন আনন্দে দম বন্ধ হয়ে আসার অবস্থা। তার মুখ থেকে হাসি আর সরছেইনা!

হৃদি বিভার ঘরের দরজা লক করে গম্ভীর গলায় বলল, 'বিভা কথা আছে তোর সাথে।'

অমৃতা লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল বিভার পাশে। ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা। বাইরে চনমনে রোদ। একজোড়া চড়ুই পাখি অনেকক্ষণ যাবৎ কিচির মিচির করে

ডেকে যাচ্ছে বারান্দার রেলিঙে বসে। সাত তলার ওপরের ফ্ল্যাটেও অনায়াসে ভেসে আসছে রাস্তা থেকে গাড়ির হর্নের আওয়াজ, লোকজনের উচ্চ স্বরের কথাবার্তা।

বিভার চোখমুখ আনন্দে চকচক করছিল। সে জানে সময়টা এখন খুব একটা আনন্দ করার মতো নয়। সামির এনগেজমেন্টের দিন ঠিক হয়ে গেছে। যা করার আজ কালের মধ্যেই করতে হবে। সামি গাধাটাকে বোঝাতে হবে যে এই বিয়ে তার জন্য কোনোভাবেই ফলপ্রসূ নয়। বিয়ে থামাতে হবে। জানে বিভা সবই, তবুও এতদিন পরে দেশে ফিরে এসে, আপনজনদের কাছে পাবার আনন্দটা সে কোনোভাবেই লুকোতে পারছিলোনা। না চাইতেও একটা ভ্যাদভ্যাদে হাসি তার গালে আঠার মতো লেগে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

হৃদি পা তুলে বসলো বিছানার ওপর। কথা শুরু করল অমৃতা, 'শোন বিভা, আমার কিন্তু হৃদিকে নিয়ে কিছু অবজার্ভেশন আছে।'

বিভা হাসতে হাসতেই বলল, 'কী অবজারভেশন?'

হৃদি শানিত চোখে অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে ফেল। আমারও বলার আছে অনেক কিছু তোমার নামে।'

বিভা চোখ সরু করে বলল, 'কাহিনী কী? সালিশ বসাইছিস নাকি তোরা?'

অমৃতা গায়ে পরে থাকা কালো লেদারের জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে, বিছানার ওপর রেখে বলল, 'হ্যাঁ সালিশ বসাইছি।'

– 'বেশ তো, শুরু কর, কোন পক্ষ আগে বলবে?'

অমৃতা বলল, 'আমিই বলতেছি। আমার মনে হয় হৃদির বাচ্চি আমাদের কাছ থেকে কিছু লুকাইতেছে।'

বিভা চোখ কপালে তুলে বলল, 'কী লুকাইতেছে?'

হৃদি মুখ ঝামটা মারলো, 'মাথা আর মুণ্ডু লুকাইতেছি।'

অমৃতা বলল,'শোন, যা বলার সরাসরি বলব, আমার মনে হয় আফটার দ্যাট কিসিং ইন্সিডেন্ট ইন ডুয়ার্স, হৃদি হ্যাজ স্টার্টেড টু হ্যাভ ফিলিংস ফর সামি।'

বিভা কথাটা শুনে হতাশ গলায় বলল, 'ও, এই কথা? এটা তুই এতদিনে বুঝছিস?'

– 'তুই আগেই জানতি?'

– 'হ্যাঁ আমি তো এইটা ডুয়ার্সে থাকতেই বুঝছি।'

অমৃতা হৃদির দিকে চেয়ে কড়া গলায় বলল, 'তুই বিভারে বলছিস, কিন্তু আমারে বলিসনাই? এটা কী ধরণের ফাইজলামি?'

হৃদি একটু অপ্রস্তুত ভাবে বলল, 'আরে বিভারে আমি নিজে থেকে কিছুই বলিনাই।

বিভা অমৃতাকে বলল, ‘তুই ওর উপর রাগ করিস না। ও একটা গাধী নাম্বার ওয়ান। ও আমারে কিছুই বলেনাই, আমি নিজেই বুঝছি।’

অমৃতা বিস্মিত ভাবে বলল, ‘কিন্তু সামি তো বিয়ে করতে যাচ্ছে অন্য মেয়েকে,আমার মাথায় কিছু ঢুকতেছেনা। হৃদির উচিৎ কনফেস করা।’

– ‘এই জন্যেই আমি তাড়াহুড়া করে আসছি দেশে। লিসেন, উই নিড আ প্ল্যান!’

হৃদি হাত তুলে ভাষণ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, ‘শোন আমার কথা তোরা, কোনো প্ল্যান দরকার নাই। সামি আমাকে লাইক করেনা। এটা আমি খুব ভালো মত বুঝে গেছি।
’

বিভা বলল, ‘ছাই বুঝছিস তুই।’

– ‘যা বুঝার ঠিকই বুঝছি। সামির পছন্দটা অন্যরকম বুঝছিস? ও সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে। গ্ল্যামারাস মেয়ে পছন্দ ওর। সেই তুলনায় আমি খুবই সিম্পল। ফ্রেন্ড হিসেবে ও আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসে, কিন্তু এরচেয়ে বেশি কিছু…

অমৃতা বলল, ‘তুই কি কম সুন্দর নাকি?’

হৃদি একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল, ‘আমার মতো সিম্পল মেয়ে ওর পছন্দ না, দ্যাখ আমি ওর খুব কাছের বন্ধু। আমি জানি ওর টেস্ট কী রকম। কোথায় বিভা, আর কোথায় আমি। বিভা কত গ্ল্যামারাস, কী সুন্দর নাচ জানে, আর আমি…’

বিভা ধমকে উঠে বলল, ‘একটা থাপ্পড় খাবি। নিজের সম্পর্কে এতো হীনমন্যতায় ভুগিস কেন তুই সবসময়?’

– ‘নারে দোস্ত, তোরা বুঝতেছিস না, জোর করে কিছু হয়না।’

– ‘জোর করে না, আমার মনে হয় সামিরও তোর জন্য ফিলিংস আছে। কিন্তু লজ্জায় বলতে পারতেছেনা। কিংবা হয়তো ও ভাবতেছে ফ্রেন্ডদের মধ্যে রোমান্টিক রিলেশনে জড়াইলে আবার ঝামেলা হতে পারে, যেহেতু প্রথম বার একটা ঝামেলা হইছে। ওর সাইকোলোজিটাও তো তোর বুঝতে হবে।’ অমৃতা বলল। এরপর একটু থেমে আবার বলল, ‘আমি কি ওর সাথে কথা বলব এ ব্যাপারে?’

হৃদি একদম আঁতকে উঠল প্রশ্নটা শুনে, ‘না না, অসম্ভব! প্লিজ আমাকে ছোট করিস না তোরা। কোনোভাবেই আমি ওকে এটা জানাতে চাইনা যে আমি ওকে পছন্দ করি। প্লিজ!’

বিভা এবার একটু রেগে গিয়ে বলল, ‘বাল! তাইলে আমি আসছি কেন এত দূর থেকে? সামিকে তো বিষয়টা বলতেই হবে আজ নয়তো কাল।’

হৃদি আগের চাইতেও জোরালো গলায় বলল, ‘অসম্ভব! তোরা কেউ কিচ্ছু বলবিনা। আমার ইমেজ খারাপ করবিনা বলে দিলাম। খবরদার।’

অমৃতা আর বিভা একজন আরেকজনের মুখের দিকে চাইল একবার। অমৃতা বলল, ‘কাউকে ভালো লাগাটা তো দোষের কিছু না, ভালোবাসার কথা জানানোর মাঝে ছোট হওয়ার কী আছে?’

হৃদির যেন হঠাৎ মনে পড়ল খুব জরুরি একটা কথা, ‘বিভা, তোরে আমি এখানে ডাকছি অন্য কারণে। একটা সিরিয়াস বিষয় নিয়ে তোর সাথে কথা বলাটা খুব দরকার।’

– ‘কী বিষয়?’ উৎকণ্ঠা নিয়ে প্রশ্ন করল বিভা। হৃদি অমৃতাকে একবার আগাগোড়া দেখে নিয়ে নালিশ করার ভঙ্গিতে বিভাকে বলল, ‘ওরে জিগা তো, সামির বাপের লগে ওর এতো কীসের মাখামাখি আর হাসাহাসি?’

প্রশ্নটা শুনে থতমত খেয়ে গেল বিভা। বিস্ময়ে একশা হয়ে গিয়ে বলল, ‘সামির বাপ?’

অমৃতা তখন মুখ নিচের দিকে নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে নিজের হাতের নখ দেখছিল। হৃদির কথা গুলো যেন তার কানেই যায়নি। হৃদি ক্ষুব্ধ ভাবে বলল, ‘হ্যাঁ সামির বাপ। ওরে তুই এখনই জিজ্ঞেস কর, কাহিনীটা কী?’

বিভা দিশাহারা হয়ে বলল, ‘আমার মাথায় কিছুই ঢুকতেছে না। সামির বাপের সাথে আবার অমৃতার কী কাহিনী থাকতে পারে?’

– ‘এটা তো বলতে পারবে শুধুমাত্র আমাদের অমৃতা চৌধুরী। পৃথিবীর সমস্ত আজব কাহিনী তো তার সাথেই ঘটে।’ বলল হৃদি চাপা রাগে গর্জন করতে করতে।

অমৃতা এবার ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। মুখ তুলে দেখল দুই বান্ধবীকে, নির্বিকার ভাবে বলল, ‘কী? কী হইছে তোদের? কী সমস্যা?’ হৃদি চিবিয়ে চিবিয়ে

বলল, ‘বুইড়া ব্যাটার সাথে এতো কিসের রঙ্গ রসিকতা তোর, হ্যাঁ? আমরা কিছু বুঝিনা মনে করছিস?’

অমৃতা তীব্র ভাবে বলল, ‘কে বুইড়া ব্যাটা? কার কথা বলতেছিস তুই? আমি কিছুই বুঝতেছিনা।

– ‘ইশ! এখন সে কিছুই বুঝতেছেনা! ন্যাদা বাচ্চা আসছে। দুদু খায়! কার কথা বলতেছি আবার? সামির বাপ। তোমার মিস্টার হক!’

অমৃতা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল,’সে বুড়া হতে যাবে কেন? ওর মতো হ্যান্ডসাম পুরুষ মানুষ তুই দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টা দেখছিস? আমি তো দেখিনাই! হি ইজ দ্যা মোস্ট হ্যান্ডসাম গাই, আই হ্যাভ এভার সিন ইন মাই লাইফ!’

কথাটা শুনে দুই বান্ধবীর হার্ট এটাক করার অবস্থা হল। বিভার মুখখানা অনেকক্ষণ অবধি হা হয়ে রইল। নিশ্বাস নিতে ভুলে গেল সে। বড় বড় ডাগর আঁখি দুটি মার্বেলের মতো গোল হয়ে গেল বিস্ময়ে। হৃদিকে দেখে মনে হল তার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। সে বুকে হাত দিয়ে কঁকিয়ে উঠে বলতে লাগল, ‘ও আল্লাহ! তুমি আমাকে এইটা কী শুনাইলা? আল্লাহ তুমি বাঁচাও!’

অমৃতা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল দুই বান্ধবীর কীর্তি দেখে। অবাক গলায় বলল, ‘মানে কী? এরকম মৃগি রোগীর মতো করতেছিস ক্যান? পাগল হয়ে গেছিস নাকি?’

হৃদি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘পাগল হইছ তুমি! বুড়া ব্যাটারে নিয়া এসব ফালতু কথা বলতে তোমার লজ্জা করেনা?’

অমৃতা হৃদির দিকে আঙুল তাক করে শাসানোর গলায় বলল, ‘আরেকবার বুড়া বললে তোরে লাথি মাইরা সাত তলার উপর থেকে ফালায় দিব।’

বিভা এতক্ষণে, অনেক কষ্টে, কোনো রকমে বলতে পারল, ‘অমৃতা! হ্যাভ ইউ লস্ট ইওর মাইন্ড? তুই এগুলা কী বলতেছিস?’

অমৃতা অকপটে বলল, ‘যা বললাম বাংলায়ই তো বললাম, হিব্রু ভাষায় তো বলিনাই। না বুঝার কী হইল?’

– ‘বন্ধুর বাবাকে তোর কাছে হ্যান্ডসাম লাগতেছে কেন? তোরে কি পাগলা কুত্তায় কামড়াইসে?’ আতঙ্কে জমে গিয়ে বিভার গলার স্বর তখন ফাঁপা বাঁশের মতো শোনাচ্ছে।

অমৃতা কী একটা বলার জন্য মুখ খুললো, তারপর দুই বান্ধবীর অগ্নি মূর্তি লক্ষ্য করে চুপ করে গেল। কয়েক সেকেন্ড পর নিষ্প্রভ ভাবে বলল, ‘লিসেন ফোকস, যদি তোরা এরকম ওভার রিএক্ট করিস তাহলে আমি কিছুই শেয়ার করতে পারবনা তোদের সাথে। ডোন্ট প্লে মাই মম, জাস্ট ট্রাই টু বি মাই ফ্রেন্ড। ফরগেট এভরিথিং। সে কে, কার বাবা, কার হাজবেন্ড এগুলো সব ভুলে যা।’

অমৃতার এই গম্ভীর কথা গুলো ওদের দুজনকে কেমন কাঁপিয়ে দিল। বিভা কম্পিত বুক নিয়ে হৃদির দিকে তাকাল একবার। দুজনের চোখেই রাজ্যের বিস্ময়, ভয় আর উত্তেজনা। বিভা একটা ঢোঁক গিলে, নরম গলায় বলল, 'আচ্ছা, ওভার রিএক্ট করবনা, তুই বল। তোর কথা শুনি আগে।'

অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। জিনসের পকেটে হাত রেখে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে বলল, 'ওকে, দ্যা থিংগ ইজ, আই হ্যাভ নেভার ফেলট দিজ ওয়ে বিফোর। আই থিংক, আই এম ফলিং ইন লাভ!'

বিভা আর হৃদি একত্রে আর্তনাদ করে বলে উঠল, 'উইথ হুম?'

অমৃতা পায়চারি থামিয়ে বন্ধুদের দিকে চেয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দ্যা গাই উই আর টকিং এবাউট।'

– 'সামির বাপ?'

– 'হুম।' বলে অমৃতা আবার হাঁটা শুরু করল।

কথাটা শুনে হৃদি আর বিভার মূর্ছা যাবার মতো অবস্থা হল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত আর্তনাদ সূচক একটি গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল তারা দুজনে। যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাদের গলা টিপে ধরেছে শক্ত করে। শ্বাস আটকে আসছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছেনা। চোখ উল্টে যাবার উপক্রম। অমৃতা ওদের দুজনের এই নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখে

হতভম্ব হয়ে গেল। অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে বলল, তোরা কি আমার ফ্রেন্ড? নাকি অন্য কিছু?'

হৃদি আর বিভার তখন কিছু বলার মতো অবস্থা নেই। হৃদির চোখ এর মাঝেই হয়ে উঠেছে ঝাপসা। বেশ অনেকক্ষণ পর সে কাঁদো কাঁদো গলায় অমৃতাকে বলল, দোস্ত, তোর কি একটু এজেড লোক পছন্দ? আমি তোর জন্য ডি ক্যাপ্রিওকে নিয়ে আসবো হলিউড থেকে, ব্র্যাড পিট আর শাহরুখ খানরে নিয়া আসব' এটুকু বলে হৃদি আচমকা অমৃতার পা জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলতে লাগলো, 'তুই শুধু সামির আব্বারে ছাইড়া দে দোস্ত! প্লিজ লাগে, প্লিজ!'

অমৃতা এবার খুব বিরক্ত হয়ে গেল, হৃদির কাছ থেকে নিজের পা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'আরে আজব, এসব এত বলে কয়ে হয় নাকি?'

এবার বিভাও উঠে আসল, অমৃতার হাত ধরে কাতর গলায় বলল, 'দোস্তো! ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা কর। লোকটা তোর ফ্রেন্ডের বাবা। অন্য কেউ হলে কোনো সমস্যা ছিলোনা। তুই সত্তর বছরের বুড়ার সাথে প্রেম করলেও আমাদের কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এই লোকটা দোস্ত তোর জন্য প্রহিবিটেড। লোকটা তোর বন্ধুর বাবা। বন্ধুর বাবা তো নিজের বাবার মতো হয়। প্লিজ নিজের মনটাকে কন্ট্রোল কর।'

– 'এসব ফালতু কথা বলিস নাতো। আমি তো কিছু ইচ্ছে করে করিনি। হয়ে গেছে।

বিভা অমৃতার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার ঢঙে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তোর মনে একটু ওরকম ভাবনা এসেছে এটা তেমন দোষের কিছুনা। ভুলে গেলেই হবে।

আমরা এরপর থেকে এটা নিয়ে আর কথা বলবনা। তুই এসব নিয়ে ভাববি না আর।
’

– ‘আমার দ্বারা সম্ভব না। আমি অনেক চিন্তা করে দেখেছি। আই ক্যান্ট স্টপ থিংকিং এবাউট হিম।’

হৃদি চট করে নিজের মোবাইলে ইনস্টাগ্রাম খুলে একটা ছেলের ছবি বের করে বলল, ‘অমৃতা দ্যাখ, এই ছেলেটা আমাদের পাশের বাসায় থাকে। ও লইয়ার, জানিস? হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করে। আমি কয়দিন থেকেই ভাবতেছিলাম তোর সাথে একে পরিচয় করায় দিব। দেখতে কিন্তু হেব্বি। কথা বলবি তুই?’

অমৃতা তাচ্ছিল্যের নজরে ছবিটা একবার দেখে নিয়ে শুকনো গলায় বলল, ‘এইসব লাল্টু পোলাপাইন আমার কখনোই পছন্দ হয়না। আমি ম্যাচিওর্ড মানুষজন পছন্দ করি। ম্যানলিনেস পছন্দ করি।’

বিভা মাথায় হাত দিয়ে বিছানার ওপর বসে পড়ল ধপ করে। অত্যন্ত হতাশ গলায় বলল, ‘তুই সামির কথাটা একবারও ভাবতেছিস না অমৃতা! সামি জানতে পারলে কী হবে?

অমৃতা স্পষ্ট ভাবে বলল, ‘কী হবে আবার? ও আমার বন্ধু। বন্ধু কি বন্ধুকে বুঝবেনা?’

হৃদির চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল, ‘কী বুঝবে? তুই কি আশা করছিস যে, ও নাচতে নাচতে বলবে, যা তুই আমার বাবার সাথে প্রেম কর?’

– ‘সেটা কেন? বাট আমার মনে হয় ও আমাকে বুঝবে।’

– ‘অমৃতা, দোস্ত বাবা মা মানুষের সবচেয়ে সেনসিটিভ জায়গা। মানুষ ওই একটা জায়গা নিয়ে কখনো আপোষ করতে পারেনা!’ বিভা বলল আকুলি বিকুলি হয়ে।

অমৃতা তাৎক্ষণিক ভাবে কিছু বলল না। ঘরের ভেতর চিন্তিত মুখ নিয়ে আরো কিছুক্ষণ পায়চারি করল। তারপর ক্লান্ত ভাবে বিছানার ওপর বসে, ম্লান গলায় বলল, ‘সামি… সামি যদি আমাকে না বোঝে… তখন কী হবে?’

হৃদি এগিয়ে এসে অমৃতার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসল মেঝের ওপর, ‘এই জন্যেই দোস্ত ব্যাপারটাকে আর এগোতে দেয়া ঠিক হবেনা। এখানেই দাঁড়ি টানতে হবে।’ বিভাও এসে বসল হৃদির পাশে, অমৃতার পায়ের কাছে। বলল, ‘হ্যাঁ, হৃদি ঠিকই বলছে। এখানেই স্টপ করতে হবে। আর… তুই কি উনার সাথে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলেছিস? মানে উনার ভাবসাব কেমন? উনার তো বৌ আছে, এতো বছরের পুরোনো সংসার। তুই বললেই তো আর ওই লোক তোর সাথে প্রেম করবেনা, তাইনা?’

অমৃতা নিস্তেজ ভাবে বলল, ‘না, আমরা এখন শুধুই বন্ধু।’

– ‘বন্ধু?’ হৃদি অবাক।

– ‘হ্যাঁ বন্ধু।’

– ‘অনেক হয়েছে। আর কথা বলবিনা তুই উনার সাথে। কেমন?’ ছেলেভোলানোর গলায় বলে বিভা।

– ‘সম্ভব না।’

– ‘অমৃতা, জিদ করিস না।’

– ‘জিদ করছিনা। আমার একটা দিন উনার সাথে কথা না বললে ভালো লাগেনা। তোরা তো আমাকে চিনিস, এর আগে কোনোদিন আমার সাথে এরকম হয়নায়… এখন আমি কী করবো?’

– ‘তুই একটা বার শুধু সামির কথা চিন্তা কর। সামি জানতে পারলে কী পরিমাণ কষ্ট পাবে তুই বুঝতে পারছিস?’

– ‘সামি কষ্ট পাবে কেন? সামি আমার বন্ধু, শত্রু তো না। বন্ধু বন্ধুকে না বুঝলে কে বুঝবে?

– ‘সামি ওর মাকে ভালোবাসে। তোর জন্য যদি ওর মা কষ্ট পায় তাহলে, তুই কি মনে করছিস ও তোকে কখনো ক্ষমা করবে?’

শুনে অমৃতা চুপ করে গেল। হৃদি, বিভাও চুপ করে থাকল খানিকক্ষণ। অমৃতা কিছু সময় পরে ভারী করুণ গলায় বলল, ‘আচ্ছা, বন্ধু হতে তো দোষ নেই তাইনা? বন্ধু হয়ে থাকি?’

হৃদি আর বিভা অমৃতার ওই বিষণ্ণ, কাতর মুখখানার দিকে চেয়ে থেকে আর কিছু বলতে পারলনা।

২৮

আজকের রাতটি বাস্তবিকই রুপালি। মধ্য আকাশে একটি রুপোর থালার মতো গোল চাঁদ ভেসে আছে। গত দুদিন ধরে শীত পড়ছে জমিয়ে। ঢাকা শহরের উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলোর গায়ে ঝুলে আছে কুয়াশা মাকড়সার জালের মত। ঘিঞ্জি গলির ভেতরও শীত বুড়ি ঢুকে পড়ছে অনায়াসে। দালান কোঠার মানুষগুলোকে হয়তো এই শীতের ছোবল খুব একটা কাবু করতে পারছেনা। লেপের তলায় ঢুকে বা রুম হিটার চালিয়ে তারা শীতের সাথে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছে। কিন্তু এই প্রবল শীত রাস্তার গৃহহীন দুঃখী মানুষ গুলোর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশের রুপালি শোভা তাই রাজধানীর ফুটপাথের বাসিন্দাদের ভেতর কোনো মুগ্ধতার সঞ্চার করতে পারছিলোনা। গরীবের দেশে শীত মানে ঘন ঘোর বিপদ 1 কত লোকের যে প্রাণ কেড়ে নেবে এই সর্বনাশা মাঘী শীত তা কে জানে!

কিন্তু প্রকৃতি বৈচিত্র ভালোবাসে। একই স্থানে, একই সময়ে, একই মঞ্চে একত্রে সংঘটিত হতে থাকে বিচিত্র সব ঘটনাবলী। এসব ঘটনার কোনোটা দুঃখের, কোনওটা সুখের, কোনওটা আবার নৃশংস! কোথাও জন্ম, কোথাও মৃত্যু, কোথাও প্রাপ্তি, কোথাও ত্যাগ,এই সমস্তকে একযোগে বহন করে অবিরাম ছুটে চলেছে সময় মহাকালের অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। তাইতো শীতের এই শুষ্ক, জারিত, জীর্ণ রাত্রিটিতে ছয় বন্ধুর দলটি হৈচৈ করে বেরিয়ে পড়ল লং ড্রাইভের উদ্দেশ্যে। আকাশের রুপালি চাঁদ থেকে চুঁইয়ে পড়া থৈ থৈ নীল জোছনা, এই বন্ধুপাগল বন্ধুদের শেষ অবধি গৃহত্যাগী করেই ছাড়ল।

সামি গাড়ি ড্রাইভ করছিল। ওর পাশে বসেছে অমৃতা। তারা যাচ্ছে আশুলিয়া। গতবছরের সেই কক্সবাজার যাত্রার পর তাদের আর একসাথে গাড়িতে চড়া হয়নি। পেছনে চারজন গাদাগাদি করে বসেছে। বিভা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বলেছে, 'আমরা ছয়জন অনেক দিন পর একসাথে হইছি। সেই আনন্দে আমি কি একটা চিৎকার দিতে পারি?' সামির লাল মার্সিডিজ বেঞ্চ তখন ওদের এপার্টমেন্টের গলি

থেকে বেরোচ্ছে সবেমাত্র। বিভার প্রশ্নের উত্তরে আকাশ বলেছে- 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, চিৎকার দেয়া তো এখন বাধ্যতামূলক। একটা চিৎকার দিতেই হবে সবাই মিলে। নইলে গুরুতর অপরাধ হয়ে যাবে।'

যেই বলা সেই কাজ। সামি বাদে বাকি পাঁচজন আনন্দে আটখানা হয়ে এক গগন বিদীর্ণকারী চিৎকার দিয়ে উঠল। গাড়ির জানালার গ্লাস নামানো ছিল বিধায় আশেপাশের লোকজনের কানে চিৎকারটি নির্দ্বিধায় পৌঁছে গেল। গলি থেকে বেরোনোর মুখেই একজন ষন্ডা চেহারার লোক গাড়ির সামনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে হাত দেখিয়ে থামবার নির্দেশ দিল। সামি ভ্রু কুঁচকে জানালা দিয়ে ঘাড় বের করে বলল, 'কী ব্যাপার?'

ষন্ডা চেহারার লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'এই গাড়ি থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল মাত্র। সব কিছু ঠিক আছে?'

সামি কিছু বলার আগেই অমৃতা ওপাশ থেকে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'তাতে আপনার কী?'

অমৃতার প্রশ্নের ধরণ দেখে লোকটা একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে, ভাবলাম কোনো বিফদ, আফদ হইল নাকি আবার।'

লোকটার মুখ থেকে বিফদ আফদ শব্দদুটো শুনে বন্ধুরা হাসি আটকে রাখতে পারলনা। অমৃতা ত্যাড়া গলায় বলল, 'আপনি কি এই পাড়ার মস্তান?'

সামি হাত উঁচু করে ‘আরে থাম তো’ বলে অমৃতাকে থামিয়ে দিল। তারপর লোকটাকে বলল, ‘ভাই আমরা ঠিক আছি। কোনো বিপদ হয়নি। ধন্যবাদ আপনাকে।’

কথাটা শেষ করে সে এক্সেলেরেটরে চাপ দিল। গাড়ির কাঁচ দিল তুলে। অমৃতাকে একটা ছোটোখাটো ধমক দিয়ে বলল, ‘সবখানে ঝগড়া করতে যাস কেন? একদম টিপিক্যাল লইয়ার হয়ে যাচ্ছিস তুই। যেখানে সেখানে কিচকিচ।’

হৃদি পেছন থেকে বলল, ‘ঠিকই আছে। আমাদের মন চাইছে আমরা চিৎকার করব। ওই ব্যাটার তাতে কী প্রব্লেম? এটা স্বাধীন দেশ মামা। যার যত ইচ্ছা চিক্কুর পাড়বে।

আকাশ বলল, ‘লোকটা তো উপকার করতেই আসছিল। তোরা কৃতজ্ঞ না হয়ে উল্টা কিচকিচ শুরু করছিস। এই জন্যেই বাঙালি জাতির উন্নতি হবেনা।’

রুদ্রর হাতে প্রিঙ্গেলস চিপ্সের কৌটা ধরা ছিল, সে চিপস চিবোতে চিবোতে বলল, ‘গাইজ, এসব ফালতু প্যাঁচাল বাদ দিয়া এইটা বল রাতের খাবারটা আমরা কোথায় খাবো।’

– ‘বিভা যেখানে খেতে চাইবে। সে অনেক দিন ভালো মন্দ খায়না। তাই ওর ইচ্ছাটাই প্রায়োরিটি পাবে।’ আকাশ বলল উদাস গলায়।

বিভা চোখ কটমটিয়ে বলল,’কে বলেছে আমি ভালোমন্দ খাইনা? আমার জামাই কি আমারে না খাওয়ায় রাখছে নাকি?’

– ‘কী খাওয়াবে? ওরা খাইতে জানে? গেছি না তোর বাসায়? সব তরকারি মিষ্টি!’

আকাশের কথা শুনে বাকি বন্ধুরা না চাইতেও হেসে ফেলল অনুচ্চ স্বরে। বিভা খুব রেগে গেল, ‘এতো খাররররাফ কেন তোরা? দূর্গা বেচারি কত কষ্ট করে রান্না করছে তোদের জন্য। আর তোরা ওর রান্নার দুর্নাম করতেছিস? কী রকম নিমকহারাম!’

রুদ্র বিভার একদম গা ঘেঁষে বসে ছিল। বিভার রাগী রাগী কথাগুলো শুনতে পেয়ে সে ওর হাতের ওপর একটা হাত রেখে, আবেগে ভেসে গিয়ে বলল, ‘দোস্ত, এইজন্যেই কি তুই শুকায় গেছিস? না খাইতে পাইয়া?’

– ‘কুত্তার মতো কথা বলতেছিস ক্যান?’ রাগে অন্ধ হয়ে গেল বিভা।

– ‘কোন কুত্তা তোরে আজ পর্যন্ত জিগাইছে যে তুই শুকায় গেছিস কেন? মাথায় কোনো বুদ্ধি নাই তোর।’

– ‘আমি শুকাইছি কারণ আই এম অন আ ডায়েট। কিটো ডায়েট করতেছি একমাস ধরে।’

সামি স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, ‘কী করবে বেচারি খাওয়া দাওয়া পছন্দ হয়না, খাইতে না পাইয়া শেষে ডায়েট করা শুরু কইরা দিছে।’

বিভা দৃঢ় গলায় বলল, ‘মোটেও না, আমার শাশুড়ি মায়ের রান্না অপূর্ব!’

অমৃতা পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, ‘মাইরি! কী বলচেন দিদি?’

আকাশ বলল, ‘তা দিদি, আপনি কি খেয়ে এসেচেন নাকি যেয়ে খাবেন? বিভা পেছন থেকে সামির মাথায় একটা গাট্টা মেরে বলল, ‘ওই এসহোলের বাচ্চা, গাড়ি থামা!’

সামি আর্তনাদ করে বলে উঠল, ‘আরে আজব একসিডেন্ট করব তো!’

– ‘থামা গাড়ি! যাব না আমি তোদের সাথে।’

হৃদি বিভার পিঠে সান্ত্বনার হাত রেখে বলল, ‘আরে চেতিস ক্যান? মজা নিতেছে ওরা।’

– ‘এত মজা নিতে হবেনা। তোদের এসব বাঙ্গাল কথা শুনেও আমার শ্বশুর বাড়ির লোকজন মজা নেয়। ঠিকাছে?’

এবার বিভার ক্রোধ দেখে কেউ আর দুষ্টুমি করার সাহস করল না। ডিনার করতে আসল আশুলিয়ার লিটল ইটালি পিৎজা রেস্টুরেন্টে। একটা ছয় চেয়ারের টেবিল দখল করে হুড়াহুড়ি করে খাবার অর্ডার করলো ওরা। তারপর বিভা গদগদ গলায় বলল, ‘অনেকদিন পর আমরা ছয়জন একসাথে ডিনার করব। এই উপলক্ষ্যে আজকের দ্বিতীয় চিৎকারটা হয়ে যাক?’

বন্ধুসকলে সমস্বরে বলে উঠল, ‘আলবৎ! হয়ে যাক!’

অতএব গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল সবাই। সামি কিন্তু এসবের কিছুতেই অংশ নিচ্ছেনা। গালে হাত রেখে উদাস নয়নে সে বন্ধুদের বাঁদরামি দেখে যাচ্ছে। টানা দুই মিনিট সময় ধরে চলল এই চিৎকার। চিৎকার শুনে রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্যার সব ঠিক আছে?'

সামি ঠান্ডা স্বরে বলল, 'সব ঠিক আছে। শুধু উনাদের মাথায় একটু ডিস্টার্ব আছে তো, তাই একটু পর পর চিৎকার মারে।

ম্যানেজার সামির উত্তর শুনে হতভম্ব হয়ে গেল। এই ম্যানেজার সামিকে খুব ভালো মত চেনে। সামি এখানকার নিয়মিত কাস্টমার। সে কার ছেলে কী তার পরিচয় কোনো কিছুই এই ম্যানেজারের অজানা নেই। চেনাশোনা বলেই চট করে রেগে গেল না সে। যথেষ্ট সমীহ নিয়ে বলল, 'ইয়ে আসলে এভাবে চিৎকার করলে আমাদের রেস্টুরেন্টের পরিবেশ নষ্ট হবে তো, অন্য কাস্টমাররা কমপ্লেইন করবেন। তাই… '

– 'আগে কমপ্লেইন করুক, তারপর বলতে আসবেন।'

ম্যানেজার আর কথা না বাড়িয়ে অসন্তুষ্টি নিয়ে ছেড়ে গেল জায়গাটা। পাশের টেবিলে একজন মেয়ে একা বসে ছিল। এছাড়া রেস্টুরেন্টে আর তেমন কোনো অতিথি নেই। একাকী মেয়েটির পরনে একটি পেঁয়াজ রঙের শিফন শাড়ি। গলায় কানে ঝুলানো মুক্তোর গয়না। মুখে প্রসাধনের কমতি নেই। টেবিলের ওপর ল্যাপটপ রাখা। পাশে পাস্তার একটি খালি ডিশ। বোঝা যাচ্ছে তার খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ। মনোযোগ দিয়ে সে ল্যাপটপে কাজ করছিল। চিৎকার শোনার পর থেকে সে থ বনে গেছে। কাজ থামিয়ে ডবডবে চোখে তাকিয়ে আছে বন্ধুদের দিকে। মুখে খেলছে আতঙ্ক। যেন এমন তাজ্জব ব্যাপার সে জীবনে এই প্রথম দেখল।

বিভা মহিলার ওই ডবডবে চোখ দেখে বিড়বিড় করে বলল, ‘তাকিয়ে আছে ক্যামনে দ্যাখ না। অন্যদিকে তাকা বেটি! চোখ গেলে দেব একদম!’

হৃদি শুনে ফেলল কথাটা। ফিক করে হেসে দিয়ে বলল, ‘কথাটা সামনা সামনি বলতে পারলে তোরে নগদ পাঁচশ টাকা দিব।’

ঠিক সেই সময় মেয়েটি গনগনে ভাবে বলল, ‘আপনারা অযথা চিৎকার করে উঠলেন কেন?’

শুনে বিভা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘মনে চাইছে তাই চিৎকার দিছি। আরো দিব। তাতে তোর কী?’

রুদ্র মুখে একটা গদগদ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘না আসলে আমাদের এক বন্ধুর মাথায় একটু সমস্যা আছে তো তাই…’

– ‘মাথায় সমস্যা আছে? পাগল টাগল নাকি?’ মেয়েটি কাঠ কাঠ গলায় প্রশ্ন করল।

রুদ্র আগের চাইতেও নরম হয়ে গেল, বলল, ‘জ্বি, একটু পাগলই বলতে পারেন। একটু পর পর চেঁচিয়ে ওঠে, অন্যদেরও চ্যাঁচাতে হয় ওর সাথে, নইলে খুব মারে!’

– ‘মারে?’

– ‘জ্বি মেরে একদম হাড্ডি গুঁড়িয়ে দেয়, কী করবে বেচারি, মাথা ঠিক নেই!’

আকাশ মাঝখানে ফোড়ন কাটল, 'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।' বিভা ত্যাড়া গলায় আকাশকে বলল, 'যা, পা ধইরা মাফ চা।'

বিভার কথাগুলো মেয়েটির কানে অনায়াসে পৌঁছে গেল। শুনতে পেয়ে সে ভয়ংকর চোখে তাকাল বিভার দিকে, যেন এখনই সে বিভাকে কুটুরমুটুর করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। বিভা হৃদিকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'পাঁচশ টাকা দিবি তো?'

– 'নিশ্চয়ই!'

বিভা মেয়েটির দিকে সরাসরি চেয়ে ফট করে বলে বসল, 'এমনে চায়ে আছস ক্যান? অন্যদিকে তাকা! চোখ গেলে দেব একদম!'

রেস্টুরেন্টে যেন মিসাইল পড়ল এই মাত্র। উপস্থিত সকলের মুখ ঝুলে গেল। যাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলা সেই মেয়েটির চেহারা তখন হয়ে গেছে বাংলার পাঁচের মতো। মুখখানি প্রবল বিস্ময়ে হা। নিশ্বাস গেছে আটকে। বেশ কয়েকটা সেকেন্ড ওরকম হা হওয়া মুখ নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে থেকে, একসময় সে ক্রোধে ফেটে পড়ে বলল, 'কী বললি তুই?'

রুদ্র উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। মহিলার সামনে এসে হাতজোড় করে বলল, 'ম্যাডাম সরি! এটাই আমার সেই পাগল বান্ধবী। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড!'

রুদ্রর পেছন পেছন আকাশও উঠে এসেছে। সে মেয়েটির উল্টোপাশের চেয়ারটা হাত দিয়ে টেনে নিয়ে ঝপ করে বসে পড়ল। তারপর ওর আকাশময় সুন্দর হাসিটা হেসে

বলল, 'ও পাগলা গারদ থেকে ছাড়া পেয়েছে গতকাল। ওর কথায় কিছু মনে করবেন না।'

রুদ্র আর আকাশের নম্র, ভদ্র ব্যবহার দেখে মেয়েটির রাগ বুঝি একটু কমল। ঢকঢক করে এক গ্লাস পানি খেয়ে বলল, 'এর তো প্রচন্ড খারাপ অবস্থা! এর চিকিৎসা দরকার। খুব ভালো চিকিৎসা। আপনারা এরকম পাগল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেন?'

আকাশ একটা হতাশ নিশ্বাস ছেড়ে ভারী করুণ গলায় বলল, 'কী আর বলব বলেন? পাগলেরও তো সাধ আহ্লাদ থাকে। বলল কতদিন পিৎজা খায়না। পিৎজা খেতে খুব ইচ্ছা করছে। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বন্ধুর ইচ্ছে পূরণ করতে আসলাম!'

রুদ্র টেবিলের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল। সুযোগ বুঝে সে বলে ফেলল, 'ম্যাডাম কি একা? আর কেউ নেই?'

মেয়েটি ল্যাপটপ বন্ধ করে ব্যাগে গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'না একা নই, ঐযে ম্যানেজারকে দেখলেন, উনি আমার স্বামী।'

আকাশ কথাটা শোনা মাত্র তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, চিঁ চিঁ করে বলল, 'কাজ করেন ম্যাডাম, আমরা পাগলটাকে সামলাই।'

ততক্ষণে খাবার চলে এসেছে টেবিলে। ম্যানেজারের বৌ আড়চোখে একবার দেখে নিল বিভাকে। বিভা তখন ফ্যালফ্যাল করে তার দিকেই চেয়ে আছে। মেয়েটি তার

দিকে তাকাতেই সে জিভ বের করে একটা ভেংচি কাটল। মেয়েটি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে রাগী কণ্ঠে বলল, 'ভয়ংকর পাগল দেখছি!'

আকাশ আর রুদ্র তখন সুড়সুড় করে নিজেদের টেবিলে ফিরে এসেছে। অমৃতা ওদের দেখে শিস দিয়ে উঠে বলল, 'মানে কী একটা অবস্থা, যেখানেই দেখিবে নারী, করিতে হইবে বাড়াবাড়ি!'

হৃদি ফোড়ন কেটে বলল, 'মাইয়া দেখলে এইগুলার মাথা ঠিক থাকেনা। খালি কিচকিচ!'

– 'একটা শব্দ পাইলে সেটা যেখানে সেখানে ইউজ করবিনা। কিচকিচ শব্দটা এখানে প্রযোজ্য নয়।' বিরক্ত গলায় বলে উঠল সামি।

– 'আসছে একজন ভাষাবিদ!' ঠাট্টার ছলে বলল হৃদি।

বিভা এবার হেসে হেসে আবৃত্তির ঢঙে বলল, 'অমৃতা জোশ বলছিসতো! যেখানেই দেখিবে নারী, করিতে হইবে বাড়াবাড়ি!' একটু থেমে সে আবার বলল, 'ধুর এইসব বাদ দে। আমার কথা শোন। গাইজ, তোরা কি জানিস? আই এম নট আ ভার্জিন এনিমোর!'

শুনে বন্ধুরা সব হৈহৈ করে উঠল। রুদ্র টেবিল চাপড়ে বলে উঠল, 'ওয়াও দোস্ত! কেমন ছিল?'

– ‘অসাম মামা! অসাম!’

সামি হঠাৎ খুব গম্ভীর গলায় বলল, ‘তুই কি এসব ফালতু কথা বলার জন্য বাংলাদেশে আসছিস?’

– ‘না, এসব বলার জন্য আসব কেন? আসছি তো তোর বিয়া খাইতে!’

– ‘তাহলে এইসব কেন বলতেছিস আমাদেরকে?’

– ‘ওমা, ফ্রেন্ডদের বলব না তো কাকে বলব?’

– ‘তুই কার সাথে শুইয়া আসছস, এইসব বুলশিট ইনফরমেশন জেনে আমরা কি বাল ফালাব?’

সামির গলা চড়ে গিয়েছিল। অমৃতা ওর পিঠে একটা হাত রেখে বলল, ‘দোস্ত, আস্তে! মানুষ শুনবে।’

সামি আগের চাইতেও জোরালো গলায় বলল, ‘শুনলে শুনুক! আমি কি ডরাই নাকি কাউরে।’

বিভাকে দেখে কিন্তু একটুও বিচলিত মনে হল না। সে সরাসরি সামির চোখে চোখ রেখে ঠাণ্ডা ভাবে বলল, ‘দ্যাখ, এত ওভার রিএক্ট করার কিছু নাই। আর আমি যার তার সাথে শুইয়া আসিনাই। আমার বরের সাথে শুইছি। দুইদিন পর তুমিও তোমার বৌয়ের সাথে শুবা। এইটা নিয়ে এত তিড়িং বিড়িং এর কিছু নাই। আমি মুভ অন করছি, তুমিও মুভ অন কর।’

সামির চোখ দিয়ে তখন আগুন বেরোচ্ছিল, 'মুভ অন করা এতো সোজা না। সবাই তোমার মতো ফালতু না।'

রুদ্র মনোযোগ দিয়ে টরটিলিনি পাস্তা খাচ্ছিল। খেতে খেতে ভারী গুরুগম্ভীর গলায় বলল, 'এইসব কথা এখন বাদ দে। খেয়ে নে। তারপর ঝগড়া করিস। খাওয়া সামনে রেখে ঝগড়া করতে হয়না।'

ওর কথাটা বন্ধুরা কেউ খুব একটা পাত্তা দিলোনা।

বিভা বলল, 'আরেকটা কথা হচ্ছে, আমি অভিজিতের মতো ভালো মানুষ পাইছি বলে তুমিও যে ভালো মানুষ পাবা এটা কিন্তু কোন কথা না। তোমার ফিয়ন্সের ছবি দেইখা আমার একটা ফোঁটাও পছন্দ হয়নায়। কুটনি মার্কা একটা চেহারা। দেখলেই মনে হয় এই মাইয়া সারাদিন ঝগড়া করে আর মুখে মেকআপ ঘষে, তোমার উচিৎ ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া।'

এ কথার পর সামি আর বসে থাকতে পারলনা। খাবারের প্লেটটা এক ধাক্কায় দূরে সরিয়ে দিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ল সে। কপাল কুঁচকে বন্ধুদের বলল, 'এই ছেমড়ির আজকে কী হইছে? তখন থেকে উল্টাপাল্টা কথা বইলা যাইতেছে।'

বিভা একটুও না দমে বলল, 'তোর উচিৎ আশেপাশে একবার তাকানো। ওই কুটনি মেয়েরে বিয়ে করতে হবে কেন? তুই তো হৃদিকে বিয়ে করলেই পারিস!'

হৃদি তখন বরফ ভাসা কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র তার কাশি উঠে গেল। টেবিলের ওপর মুখ থেকে ছিটকে পড়ল তরল পানীয়। রুদ্র খাবার মুখে নিয়ে স্থিরচিত্র হয়ে গেল। ভুলে গেল চিবোতে। আকাশ হতভম্ব। শুধু অমৃতাকেই একটু স্বাভাবিক দেখাচ্ছিল। সামি বিস্ময়ে কাদা কাদা হয়ে গিয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! হৃদিকে কেন বিয়ে করব আমি?'

বিভা নির্বিকার গলায় বলল, 'করলে সমস্যা কী? কিস করতে পারলে বিয়ে করতে পারবিনা?'

সামি টেবিলের ওপর দুহাত রেখে বিভার দিকে একটু ঝুঁকে বলল,'তোকে আর কয়বার বলতে হবে যে, দ্যাট ওয়াজ আ ফাকিং এক্সিডেন্ট?'

বিভা পরিষ্কার গলায় বলল, 'এক্সিডেন্ট হবে কেন? মে বি দ্যা ইউনিভার্স ইজ ট্রাইং টু টেল ইউ সামথিং। এটা এক্সিডেন্ট ছিল না। হয়তো একটা সাইন ছিল।'

সামি ক্রুর চোখে বিভার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আর একটিও বাক্য ব্যয় না করে বেরিয়ে পড়ল। ও উঠতেই বিভা হৃদিকে বলল, 'তুই যা তো, দ্যাখ গাধাটা কী করতেছে।'

– 'তোর এত কথা বলার কী দরকার ছিল? বেশি বেশি করিস তুই!'

বিভা হৃদিকে ঠেলে ঠুলে পাঠিয়ে দিল বাইরে। কুয়াশায় তখন চারপাশ আবছা। হৃদির গায়ে একটা চেরি ফুল রঙের জ্যাকেট ছিল। সাথে সাদা জিন্স। ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে হাতদুটো সে প্যান্টের পকেটে পুরে রেখেছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আশেপাশে কোথাও সামিকে দেখা গেলোনা। কাঁচা মাটির পথ ধরে অন্ধকারে একটু এগিয়ে গেল

সে। সামনেই হাইওয়ে। প্রবল গতিতে একটার পর একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে হাইওয়ে ধরে হুশ হুশ শব্দ তুলে। একটু হাঁটতেই সামিকে পাওয়া গেল। রাস্তার ধারের টঙের চায়ের দোকানে বসে আছে সে। কাঠের বেঞ্চের ওপর। পা নাচাতে নাচাতে সিগারেট ফুঁকছে। হৃদি গিয়ে বসলো ওর পাশে। সামির গায়ে কালো লেদারের জ্যাকেট। দাড়ি কামানো। কোঁকড়া চুলগুলো আঁচড়ানো পাট করে। বেশ ফিটফাট একটা ভাব। কিন্তু চোখদুটো তার বড়ই অপ্রসন্ন। মস্তিষ্কে খেলতে থাকা দুশ্চিন্তা যেন স্পষ্ট ভাবে ভেসে উঠছে অস্থির চোখের পাতায়। হৃদি যে পাশে এসে বসেছে, তা সে খেয়ালই করেনি। রাস্তায় খুব একটা আলো নেই। তবে গাড়ির হেডলাইটের আলোতে খানিক বাদে বাদে স্পষ্ট হয়ে উঠছে চারপাশ।

– ‘এত রাগ করতেছিস কেন?’ হৃদির প্রশ্নটায় ঘোর ভাঙলো তার। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে শীতল গলায় বলল, ‘বিভার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ও এসব কী বলতেছে আবোল তাবোল?’

– ‘কোন ব্যাপারটা তোর কাছে আবোল তাবোল লাগল?’

– ‘সে তার বরের সাথে কী করছে না করছে, সেইসব হিস্ট্রি আমাদেরকে কেন শুনাইতেছে?’

– ‘বন্ধুদের সাথে তো মানুষ সবই শেয়ার করে তাইনা? তোর খারাপ লাগছে কারণ তোর ভেতরে আসলে এখনো ওর জন্য ফিলিংস রয়ে গেছে।’ সামি বিষাদ মাখা কণ্ঠে বলল,’কোনো ফিলিংস নাই আমার ওর জন্য। মেয়েরা এমনই। রং পাল্টাইতে বেশি সময় লাগেনা।’

– ‘এভাবে বলিস না। দ্যাখ বিভা অনেক কিছু সহ্য করছে এই একটা বছর ধরে। অনেক কষ্ট পাইছে মেয়েটা। এখন ফাইনালি সে একটু লাইফে সেটেল হইতে চাইতেছে, তুই মাঝখান থেকে ঘাপলা লাগাইস না।’

– ‘কেউ ঘাপলা লাগাইতেছেনা। ওকে বলবি আমার সাথে যেন এইসব উল্টাপাল্টা কথা না বলে। কী সব ফালতু কথা বলতেছে। আমার নাকি তোরে বিয়ে করা উচিত। এটা কোনো কথা হইল?’

হৃদি মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। গলায় জোর করে একটা নিস্তরঙ্গ ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে বলল, ‘ওর ধারণা হয়েছে ওই ঘটনার পর থেকে তোর আর আমার মধ্যে কিছু চলতেছে।’

সামি ভারী অবাক চোখে তাকাল হৃদির দিকে। বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলল, ‘এরকম কেন মনে হল?’

হৃদি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে রেখেই বলল, ‘জানিনা, আমি ওকে অনেকবার বলেছি, যে তোর টেস্ট অন্যরকম। তুই কখনোই আমাকে পছন্দ করবিনা। আমার মতো সিম্পল মেয়েকে তুই ভালোবাসবি, এটা হতেই পারেনা।’

সামি বেশ কিছুক্ষণ সময় হৃদির পাশ ফিরে থাকা মুখটার দিকে বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল। গাড়ির হেডলাইটের আলো আসছে, যাচ্ছে। হর্ন বাজছে, বাতাস বইছে সাঁই সাঁই করে। শীতের খর বাতাস ছুঁয়ে দিচ্ছে হৃদির খোলা চুল। হঠাৎ সেই পাহাড়ি গ্রামের অন্ধকারাচ্ছন্ন মেয়েটির কথা পড়ল। সেই মেয়েটি তো বিভা ছিলো না, আবার ঠিক হৃদির মতোও ছিলোনা। অথচ মেয়েটিকে যখন সে কাছে টেনে নিল, মনে হল যেন কত সহস্র বছরের চেনা একজন মানুষ!

– ‘আর তুই?’

হৃদি ফিরে তাকাল সামির দিকে।

– ‘আমি?’

– ‘হ্যাঁ, তুই আমাকে পছন্দ করবি?’

হৃদি হাসার চেষ্টা করে বলল, ‘মাথা খারাপ? ওরকম কিছু হলে তো তোর কান কেটে ফেলতে হবে। সামিউল হক হয়ে যাবে কান কাটা সামি। সেটা কি কখনো সম্ভব?’

সামি হেসে ফেলল। একটুখানি চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলো। ততক্ষণে চায়ের কাপ চলে এসেছে তার হাতে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সে একটু অন্যরকম গলায় বলল, ‘আচ্ছা হৃদিতা, একটা প্রশ্ন করি তোকে?

হৃদি কৌতূহল নিয়ে বলল, ‘কী প্রশ্ন?’

– ‘তোকে যখন আমি চুমু খেয়েছিলাম, তুই তো জানতিস যে ওটা আমিই ছিলাম, তাইনা?’

হৃদি কেঁপে উঠল হালকা। খুব নিস্তেজ ভাবে বলল, ‘হ্যাঁ জানতাম। কেন?’

সামির একহাতে চায়ের কাপ, অন্য হাতে সিগারেট। সে সিগারেটে টান দিল সময় নিয়ে। সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। চোখজোড়া হাইওয়ের ছুটন্ত এক ট্রাকের উপর নিবদ্ধ রেখে বলল, ‘তাহলে আমাকে বাধা দিস নি কেন?’

হৃদি বরফের মতো জমে গেল কথাটা শুনে। একটা ভয়ংকর অস্বস্তি চেপে ধরল তাকে। দুরুদুরু করে কাঁপতে লাগল বুক।

– ‘আমি আসলে অনেক শকড ছিলাম। কিছু বলতে পারার মতো অবস্থা ছিলো না।’ অনেক কষ্টে বলল সে।

– ‘হুম, সাউন্ডস রিজনেবল। ওকে, ওয়ান কুইক কোয়েশ্চন ফর ইউ। হাও ওয়াজ ইট?’

হৃদি চমকে তাকাল, ‘কী? কীসের কথা বলছিস?’

– ‘সব কিছু বানান করে বুঝিয়ে বলতে হয় কেন?’

হৃদি সত্যিই অবাক হয়েছিল সামির প্রশ্ন শুনে। সামির অন্ধকার মাখা মুখটার দিকে সরু চোখে চেয়ে থেকে সে অবিশ্বাসের গলায় বলল, ‘এটা কোনো প্রশ্ন হল?’

– ‘উত্তর দে! এতো কথা বলিস কেন?’

– ‘গ্রস ছিল।’

সামি হাসে, ‘হুহ, সিরিয়াসলি?’

– ‘সিরিয়াসলি।’

– ‘মিথ্যা কথা। আই এম আ গুড কিসার। আই নো দ্যাট। বিভাকে জিজ্ঞাসা করিস।

– ‘ফালতু। সিগারেট খাওয়া কালো ঠোঁট!’

– ‘ও আচ্ছা, তোর কী রকম পছন্দ? লিপস্টিক দেয়া লাল ঠোঁট? গে নাকি?’

– ‘চুপ থাক! তোর কী রকম লেগেছিল? তুই কিন্তু বলছিলি, তোর জীবনের সবচেয়ে সঠিক কাজটা তুই করছিস সেদিন। তুই বলছিলি, মনে আছে তোর?’

সামি থমকাল হালকা। মনে ছিল না, কিন্তু মনে পড়ল এই মুহূর্তে। বলল, ‘আমি তো ভাবছিলাম ওটা বিভা।’

– ‘জানি।’

– ‘কিন্তু জানিস? ওটা বিভা ছিল না, তুইও ছিলিনা। ছিল অন্য কেউ। হৃদি হতভম্ব হয়ে গিয়ে বলল, ‘এটার মানে কী?’

– ‘সত্যি, ওটা অন্য কেউ ছিল।’

হৃদি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মুখ ঝামটা মেরে বলল, ‘ওটা মনে হয় তোর ফিয়ন্সে ছিল। তানিশা!’

সামি হেসে ফেলল, ‘হতে পারে!’

– ‘আমি যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া সব ঠাণ্ডা হয়ে যাইতেছে। রাক্ষস গুলা মনে হয় সব খায়াও ফেলছে এতক্ষণে। এখন না গেলে কিসু পাবিনা। তাড়াতাড়ি আয়।’

– ‘পরশু দিন তানিশার সঙ্গে তোরা মিট করতেছিস, মনে আছে?’

– ‘হ্যাঁরে ভাই, মনে আছে।’

২৯

সে রাতে ওরা সবাই রুদ্রদের ফ্ল্যাটেই থেকে গেল। এই ফ্ল্যাটে বিভার প্রথমবার আসা। কে জানত যার জন্য সামি বাবা মায়ের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই চার রুমের ফ্ল্যাটে এসেছিল, সেই মেয়েটিই একদিন অভিজিতের স্ত্রী হিসেবে এ ফ্ল্যাটে পা রাখবে। বিভার ব্যবহার সত্যি মুগ্ধ করছে সবাইকে। তার কথা বার্তায়, কাজ কর্মে এত বেশি সাবলীল ভাব, যে কেউ বলতে পারবেনা সামির সাথে তার বন্ধুত্বের বাইরেও অন্যরকম একটি সম্পর্ক ছিল। কেউ বলতে না পারলেও হৃদি বুঝতে পারে, বিভার এরকম নির্বিকারত্বের কারণটা হল সে নিজে। হৃদিকে বিভা মন প্রাণ দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে সামির জন্য তার মনের ভেতরে বিন্দু পরিমাণ অনুভূতিও আর টিকে নেই। বোকা মেয়েটা আকাশ কুসুম কল্পনা করে যাচ্ছে। কী করে বোঝাবে মেয়েটাকে হৃদি, যে সামি কখনোই তাকে বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু ভাবতে পারেনি। এমন কি ডুয়ার্সের সেই সন্ধ্যাবেলার ঘটনাটিও সামির মনে প্রভাব ফেলেছে অন্যরকম ভাবে। সে বিশ্বাস করে সেই মেয়েটি হৃদি ছিলোনা। সে চুমু খেয়েছিল অন্য এক অপরিচিতা মেয়েকে। অতএব সামির জীবনে হৃদি কোথাও নেই, কোনোভাবেই নেই। বিভাকে এই বাস্তব সত্যটা কে বোঝাবে?

এলেক্সা গান বাজাচ্ছিল,'লোকা লোকা লোকা!'

ড্রইং রুমে কার্পেটের উপর হাত পা ছুঁড়ে নেচে যাচ্ছিল, আকাশ, অমৃতা আর রুদ্র। সোফার ওপর বসে ব্যাক্কলের মত তাকিয়ে তাকিয়ে ওদের নাচ দেখছিল বিভা, হৃদি আর সামি। অমৃতার ফোনটা সোফার ওপরে রাখা ছিল। ফোনের ভাইব্রেশনটা টের পেলো হৃদিতা। হাতে নিয়ে দেখলো একটা টি এন টি নম্বর থেকে ফোন আসছে। কোনো নাম লেখা নেই। তবে নম্বরটা একটু চেনা।

হৃদি ফোনটা হাতে নিয়ে নাচনে ওয়ালাদের দিকে এগিয়ে গেল। অমৃতা খুব আনন্দ নিয়ে হাত পা ছুঁড়ছিল। হৃদি ওর মুখের সামনে ফোনটা ধরে গম্ভীর গলায় বলল, ‘এই যে ডিস্কো ড্যান্সার, ফোন আসছে আপনার।’

অমৃতা ফোনটা হাতে নিল। হৃদি অমৃতার হাতে ফোনটা দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল আগের জায়গায়। আকাশ পেছন থেকে ওর হাত ধরে ফেলল, বলল, ‘কই যাচ্ছিস? নাচ নাচ!’ এরপর সে বিভা আর সামিকে ইশারা দিয়ে ডাকল, ‘বসে আছিস কেন?’

খানিক বাদে বিভাও উঠে আসল ড্যান্স ফ্লোরে। ওদিকে বেডরুমে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে ফোন ধরল অমৃতা। হক ওপাশ থেকে উদ্বেগ নিয়ে বললেন,’তোমাদের গাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে এসেছিল কেন? কোন ঝামেলা হয়নি তো?’

অমৃতা বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল, ‘ও তাই বলেন, ওই মাস্তান লোকটা আপনার চামচা ছিল। তাইনা?’

– ‘প্রশ্নের উত্তর দাও। সব ঠিক আছেতো?’

– ‘সব ঠিক আছে।’

– ‘এরকম হাঁপাচ্ছ কেন?’

– ‘নাচতেছিলাম!’

– ‘কী করছিলে?’

– ‘নাচতেছিলাম আরকি, ফ্রেন্ডরা মিলে।’

হক হেসে ফেললেন। অমৃতা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, ‘হাসছেন কেন? নাচ জিনিসটা কি হাসির ব্যাপার?’

– ‘না না হাসির ব্যাপার হবে কেন? আচ্ছা শোনো, ফোন দিয়েছি একটা প্রয়োজনে।

– ‘আমি জানি, দরকার ছাড়া আপনি আমাকে ফোন দেন না। কখনো দেননি।’

– ‘কখনো দেইনি?’

– ‘না, দেন নি, অথচ বন্ধুকে প্রয়োজন ছাড়াই ফোন দিতে হয়।’

-’ আমি বন্ধুত্বের অত কিছু বুঝিনা।’

– ‘বোঝেন না কেন? আপনার কোন বন্ধু নেই?’

– ‘আছে।’

– ‘গার্লফ্রেন্ড আছে?’

হক প্রশ্নটা শুনে থমকে গেলেন। এরকম একটা ফাজিল কথা বলার জন্য তাঁর কি উচিৎ না মেয়েটিকে একটা বড়সড় ধমক দেয়া এই মুহূর্তে? কিন্তু তিনি ধমক দিতে পারলেন না। অমৃতার কথা শুনে আজকাল তাঁর রাগ হয়না। কেবলই বিস্ময় বোধ হয়। তিনি কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে অত্যধিক ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ‘আমার ওয়াইফ আছে। গার্লফ্রেন্ড দিয়ে কী করব?’

অমৃতা ফিচেল হাসল, ‘ওয়াইফ থাকলে কি গার্লফ্রেন্ড থাকা মানা? আপনি জানেন আমার সিনিয়রের ওয়াইফ আর গার্লফ্রেন্ড দুটোই আছে?’

– ‘তুমি ভীষণ পাকা মেয়ে!’

অমৃতা হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমি তো জোক করলাম। আপনার সেন্স অব হিউমার একেবারে লো।'

– 'তুমি অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছ অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। আসল কথাটাই বলা হল না। এখন আমার হাতে আর সময় নেই। তুমি কি কাল একবার আমার সাথে দেখা করতে পারবে?'

বুক ধড়ফড়িয়ে উঠল ওই আচমকা প্রস্তাবটা পেয়ে। দম বন্ধ করে অমৃতা বলল,

– 'কালকে··· কখন?'

– 'লাঞ্চ টাইমে?'

অমৃতার আগামীকাল দুপুর দুটায় একবার এন জি ও' র অফিসে যেতে হবে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম, কাজ পাগল মেয়েটা তার কাজের কথা বেমালুম ভুলে বসে থাকল। কলকল করে বলে উঠল, 'শিওর, কোথায় দেখা করবেন?'

– 'আমার অফিসে চলে এসো।

তারপর, অনেক অনেকক্ষণ ধরে অমৃতার মুখে চিলতে হাসিটা লেগে রইল। মধ্য রাত অবধি বন্ধুরা সবাই কার্ড খেলল, উনো খেলল। খেলায় পর পর দুইবার লাড্ডুগুড্ডু হয়েও অমৃতার মুখ থেকে হাসি সরলনা। আজকে সে বড়ই অন্যমনস্ক, আনমনা।

রাত তিনটার পর ঘুমোতে যাবার আগে বিভা অমৃতাকে প্রশ্ন করল, 'তর মনে এত হাওয়া লাগছে কেন? সেই তখন থেকে হাইসাই যাইতেছিস। কাহিনী কী মামা?'

অমৃতা পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল। রুদ্রর ঘরে মেয়েরা আর সামির ঘরে ছেলেরা থাকছে আজ। অমৃতা দুই বান্ধবীর দিকে চেয়ে খুশিতে ঝুমঝুম হয়ে বলল,'গেস হোয়াট? কালকে দেখা হচ্ছে!'

হৃদি হতভম্ব গলায় বলল, 'কার সাথে?'

অমৃতা এক লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল, 'কার সাথে আবার? আমার উনার সাথে! যাকে আমি ভালোবাসি!'

বিভা নাক মুখ কুঁচকে বলল,'তোর লজ্জা করেনা?'

অমৃতা লাজ শরমের মাথা খেয়ে বলল, 'ভালো যখন বেসেই ফেলেছি, এখন আর লজ্জা পেয়ে কী হবে বল?'

হৃদি খুব রেগে গেল। রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'ওই ব্যাটার সমস্যা কী? তোর সাথে দেখা করতে চায় কেন?

বিভা বলল, 'আমার মনে হয় লোকটা অমৃতাকে ইউজ করতেছে। আমি শিওর। অমৃতা দোস্ত, তুই মনে করিসনা, যে ওই লোক তোকে পছন্দ করে। সে গ্রেফ তোকে কাজে লাগাইতেছে।'

হৃদি কপালে কুঞ্চন রেখা নিয়ে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। অমৃতা স্মার্ট, বুদ্ধিমতী, তাই লোকটা তার ছেলের পেছনে স্পাই হিসেবে লাগাইছে ওরে। আর এই গাধী মনে করতেছে অন্য কিছু।'

অমৃতা পরিষ্কার গলায় বলল, 'আমি মোটেও অন্যকিছু ভাবতেছিনা। আমি জাস্ট… জাস্ট এনজয় করতে চাচ্ছি আমার ফিলিংসটাকে। কাম অন, আই নো ভেরি ওয়েল যে আমার লাইফে আর কখনো এই জিনিসটা হবেনা। আমি আমাকে চিনি। তাই আর কিছু হোক আর না হোক আমি চাই আমার অনুভূতিটাকে চেরিশ করতে।'

– 'মরবি তুই শালী, সাথে আমাদেরকেও মারবি।' হৃদি বলল দাঁতে দাঁত চিবিয়ে।

.

সকাল আটটায় হঠাৎ ডোরবেল বেজে উঠল। ওরা তখন নাশতার টেবিলে। সামি অবশ্য তখনও ঘুমোচ্ছে। তার চাকরি বাকরি নেই। সে এখন রোজ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। দরজা খুলতে গেল আকাশ। দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির গায়ে ফিরোজা রঙের সুতির শাড়ি। চুল খোঁপা করে বাঁধা। মুখটা কী ভীষণ স্নিগ্ধ! আর সবচেয়ে নজরকাড়া ওর চোখ দুটি। কেমন যেন অন্যরকম। সাগরের মত গহন! এরকম সাগর চোখের মেয়ে, আকাশ এর আগে কোনোদিন দেখেনি!

মেয়েটি আকাশের দিকে চেয়ে সুন্দর হাসল, মিষ্টি করে বলল, 'রুদ্র কি বাসায় আছে? আমার নাম মনীষা। রুদ্রর সাথে একটু দেখা করা যাবে?'

আকাশ তাৎক্ষণিক ভাবে কোন প্রত্যুত্তর করতে পারল না। তার মুখে লেপ্টে থাকা হতভম্ব ভাবটা মনীষাকে বিব্রত করে তুলল। সে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট গলায় বলল, 'সরি, আমি কি ভুল সময়ে চলে আসলাম?'

আকাশের যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে আসল,

– ‘না না, ভুল সময় হবে কেন? আসুন না, প্লিজ আসুন।’

বলে আকাশ দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল। মনীষা একটু সংকোচের সাথে ঢুকল ভেতরে। আকাশ সোফা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘বসুন। আমি রুদ্রকে ডাকছি।’

মনীষা সোফায় বসতে বসতে হাসি মুখে বলল, ‘তুমি নিশ্চয়ই আকাশ?’

আকাশ সত্যি অবাক হয়ে গেল, ‘আপনি কী করে চিনলেন আমাকে? ছবি দেখেছেন?’

– ‘না ছবি দেখিনি। তবে রুদ্রর বর্ণনা ছবির চাইতে কোনো অংশে কম ছিলোনা। তোমার হাসি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আকাশ। তোমাদের সবার এতো গল্প করেছে রুদ্র যে, এখন আমাকে বলে দিতে হবেনা কে কোন জন। দেখামাত্র চিনে ফেলব।’

– ‘আসলেই?’

– ‘আসলেই।’

– ‘ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক। আমি ডাকছি সবাইকে।

– ‘পরীক্ষা দেবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত আমি।’

ডাইনিং রুমের পর্দা টানা ছিল। টেবিল চেয়ারে বসে চার বন্ধু নাশতা করছিল। আকাশ পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকতেই হৃদি বলল, কে আসছে রে?’রুদ্র তখন নিবিড় মনোযোগের সাথে কাওয়ান পরোটা দিয়ে ডিমভাজি খাচ্ছিল আর টেবিলের

ওপর রাখা খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিল। আকাশের মুখে একটা চাপা খুশি উপচে পড়ছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'বিশ্বাস করবিনা!'

অমৃতা আর হৃদি একত্রে বলে উঠল, 'কী বিশ্বাস করবোনা?'

আকাশ আনন্দে কাদা কাদা হয়ে গিয়ে বলল, 'একজন গেস্ট আসছে। তোদের সাথে দেখা করবে। তাড়াতাড়ি চল।'

রুদ্র পরোটা, ডিম ভাজা চিবোতে চিবোতে গম্ভীর গলায় বলল, 'খাওয়া শ্যাষ কইরা নেই। খাওয়া হচ্ছে একধরণের ইবাদাত। খাওয়া আগে, অন্য সব পরে।'

আকাশ রুদ্রর কথা পাত্তা না দিয়ে অমৃতা আর হৃদিকে বলল, 'সামিরে ডাইকা তুল।

অমৃতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'কাহিনী কী? কে আসছে?'

আকাশ বলল, 'দাঁড়া, সবাই এক সাথে দেখবি। সামি আসুক আগে।'

অমৃতা কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও আর কোনো প্রশ্ন করল না। সামির ঘরের দিকে এগোল। নব ঘোরাতেই খুলে গেল দরজাটা। জানালা, দরজা সব আটকানো বলে ভেতরে সূর্যের আলো প্রবেশ করেনি এখনো। জানালায় ঝুলতে থাকা লাল পর্দার লালচে ছায়ায় ভরে আছে চারপাশ। মনে হচ্ছে যেন ছবিঘর। সামি দরজা খোলার শব্দ পেয়েই নড়ে উঠেছে। লেপের তলা থেকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'উফ বিরক্ত করিস না। দূর হ!'

অমৃতা ওর কথা পাত্তা না দিয়ে গটগট করে বিছানার দিকে হেঁটে গেল। ডান হাত বাড়িয়ে এক টানে সামির গায়ের ওপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। সামি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল বিছানায়, বিভীষণ গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'এই বেয়াদব মহিলা! কোন সাহসে তুই আমার কম্বল টাইনা নিলি?'

অমৃতা নির্বিকার গলায় বলল, 'উঠে পড়।'

সামি বিছানার ওপর বসে থাকা অবস্থায় ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে মেঝে থেকে কম্বলটা তুলে নিল, বলল, 'অসম্ভব। কিছুতেই উঠব না আমি।'

অমৃতা কোমরে হাত দিয়ে ঝগড়াটে গলায় বলল,'কেন উঠবিনা? সকাল হইছে কতক্ষণ আগে খেয়াল আছে তোর? সবাই উঠছে তুই উঠবিনা ক্যান? তোর ঘুম শ্যাষ হয়না ক্যান?'

সামি কম্বল মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। খুব গম্ভীর ভাবে বলল, 'ঘুম শেষ হইছে। এখন একটু রেস্ট নিব।'

– 'মানে কী?'

– 'অনেকক্ষণ ঘুমাইছি! এখন আমার একটু রেস্ট দরকার।'

অমৃতা কথাটা শুনে ব্যাক্কল বনে গেল। হৃদি এসে দাঁড়িয়েছে তখন ঘরের দরজায়। অমৃতা হৃদিকে দেখে উত্তেজিত ভাবে বলল, 'এই গাধার বাচ্চা, ঘুম থেকে উঠে রেস্ট নিচ্ছে।'

হৃদি হেসে ফেলল, 'ঠিকই আছে। ঘুমানোও তো একটা কাজ। ঘুম থেকে উঠে সবারই একটু রেস্ট নেয়া উচিৎ। আজকের পর থেকে তুইও নিস।'

অমৃতা ঘর থেকে বেরোনোর আগে বলল, 'গাধাটারে বল ড্রইং রুমে গিয়া বইসা বইসা রেস্ট নিতে। আমরা ওয়েইট করতেছি। তাড়াতাড়ি আয় তোরা।' সামি কম্বলের তলা থেকে আবারও মুখ বের করল, 'তোদের কি মানুষের সুখ সহ্য হয়না?'

– 'না হয়না। এখন ওঠ, একজন বিশেষ গেস্ট আসছে। আকাশ চায় আমরা সবাই যেন তার সাথে একত্রে দেখা করি।' বলতে বলতে হৃদি জানালার পর্দা একপাশে সরিয়ে দিল হাত বাড়িয়ে।

আরো দুই মিনিট বিছানায় গড়াগড়ি করে সামি উঠল শোয়া থেকে, অবশেষে। বলল, 'বিশেষ গেস্টটা আবার কে?'

সে তখনো চোখ খুলতে পারছেনা ঘুমের ভারে। চুল হয়ে আছে উস্কখুস্ক। হৃদি হেঁটে এগিয়ে গেল ওর কাছে। এলোমেলো কোঁকড়া চুল গুলো হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দিয়ে আদুরে গলায় বলল, 'চল, গেলেই দেখতে পাবি।'

সামি ঘুমের ভারে ছোট হওয়া চোখ দুটো পিটপিট করে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলতো ভাবে বলল, 'আজকে একটা স্বপ্ন দেখছি, জানিস?'

– 'কী স্বপ্ন?'

সামি ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটি উচ্চতায় তার চেয়ে খাটো। সে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আয়নায় নিজের মুখখানি দেখল একবার। এলোমেলো চুল গুলি হাত দিয়ে সুবিন্যস্ত করতে করতে বলল, 'স্বপ্নটা কেমন যেন অদ্ভুত!'

হৃদি বিছানায় ছড়িয়ে থাকা এলোমেলো কম্বলটা ভাঁজ করে রাখছিলো। সামির কথা শুনে সে হাতের কাজ থামিয়ে বলল, 'কী রকম অদ্ভুত?'

– 'ডুয়ার্সের সেই মেয়েটকে দেখলাম।'

– 'কোন মেয়েটা?'

– 'সন্ধ্যাবেলার মেয়েটা।' সামি ঘুরে তাকালো হৃদির দিকে।

-'কী বলছিস পাগলের মত?'

– 'হ্যাঁ, ওই মেয়েটাকে আজকে স্বপ্ন দেখলাম।'

হৃদি স্তম্ভিত গলায় বলল,'সেই মেয়েটার চেহারা তোর মনে আছে?'

– 'চেহারা সেদিনও দেখিনাই, আজকে স্বপ্নেও দেখিনাই, কিন্তু কী করে যেন মেয়েটাকে চিনে ফেললাম।'

হৃদি এতো বেশি অবাক হয়ে গেল যে বেশ কিছু মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারলোনা। দুহাতে কম্বলটা আঁকড়ে ধরে থেকে স্থবির হয়ে চেয়ে রইল সামির দিকে।

– 'স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল যে ওই মেয়েটাকেই যেন আমার চাই!'

.

পাঁচ বন্ধু পর্দার আড়ালে জড়ো হয়ে দাঁড়ালো। সবার মুখে খেলছে বিরক্তি। তারা বুঝতে পারছেনা আকাশের সমস্যাটা কী?এমন কোন মহামান্য অতিথি এসেছে যার সামনে সবাইকে লাইন ধরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? পর্দার ফাঁক দিয়ে অমৃতা অতিথির শাড়ির আঁচলের কিছু অংশ দেখতে পেল। সে চোখা গলায় আকাশকে বলল, ‘তোর গার্লফ্রেন্ড আসছে নাকি?’

আকাশ অমৃতার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঝুলে থাকা পর্দাটা হাত দিয়ে একটু সরিয়ে দিল। এক গাল হেসে বলল, ‘সবাই চলে আসো একে একে

ছয় মূর্তি ঘরের ভেতর উপস্থিত হওয়া মাত্র মনীষার মুখখানা এক উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বসা থেকে উঠে দাঁড়াল সে। আকাশ বলল, ‘এবার চটপট সবার নাম বলে দিন।’

বন্ধুদের সবাই বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল। একটা নির্বাক কৌতূহল খেলছিল সবার চোখে মুখে। রুদ্রর চেহারা হয়েছিল দেখার মতো। সে প্রথমটায় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলনা। বিড়াল চোখ দুটোকে ড্যাবড্যাব করে মেলে ধরে অবিশ্বাসের গলায় বলল, ‘আপনি?’

– ‘আমার এক চাচার বাসায় এসেছিলাম। আর দুটা বিল্ডিং পরেই উনার বাসা। কিন্তু বেশি সকালে চলে এসেছি। চাচা এখনো মর্নিং ওয়াক থেকেই ফেরেন নি। তাই ভাবলাম এই ফাঁকে তোমাকে একবার দেখে যাই। এখন মনে হচ্ছে খুব ভালো সময়ে এসেছি। তোমার সব বন্ধুদের সাথে দেখা হয়ে গেল।

আকাশ বলল, ‘আপনাকে একে একে সবার নাম বলতে হবে।’

মনীষা প্রথমেই অমৃতার দিকে চেয়ে বলল, ‘এই ছোট চুলের মেয়েটা হল অমৃতা চৌধুরী।’ নিজের নামটা মনীষার মুখে শুনতে পেয়ে অমৃতা বিশ্ব জয়ের হাসি হাসল। হাত তালি দিয়ে বলে উঠল, ‘রাইট!’

– ‘টানা চোখের সুন্দর মেয়েটা হল, বিভাবরী।’

প্রশংসা শুনে বিভা একদম লাল টাল হয়ে গিয়ে বলল, ‘থ্যাংক ইউ!’

– ‘নায়িকা কাজলের মতো দেখতে মেয়েটা হল হৃদিতা বিনতে জামিল। আর এই লম্বা, হ্যান্ডসাম ছেলেটা সামিউল হক। কি ঠিক বলেছি?’

হৃদি খুশিতে ঝুমঝুম হয়ে বলল, ‘কী করে চিনলেন আপনি সবাইকে? ছবি দেখেছেন কি?’

– ‘না ছবি দেখিনি। রুদ্রর কাছ থেকে তোমাদের গল্প শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

সামি বলল, ‘আপনি বসুন না, দাঁড়িয়ে কেন?

মনীষা বসলো। তার উল্টো দিকের দুটো সোফায় বন্ধুরা বসল পাশাপাশি, মনীষার মুখোমুখি।

রুদ্র লক্ষ্য করছিল মনীষাকে দেখার পর থেকে তার বন্ধুদের মধ্যে একটা গদগদ ভাব চলে এসেছে। প্রত্যেকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে মেয়েটার দিকে। দেখে

মনে হচ্ছে যেন একেকটা ক্যাবলাকান্ত। এমনকি ব্যক্তিত্ববান, স্মার্ট অমৃতাও বেকুবের মতো দাঁত বের করে হাসছে। অর্থাৎ মনীষার জাদু সবার উপর কাজ করে গেছে। মনীষা হাসি হাসি মুখ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে সবাইকে। একটা সময় সে বলল, 'তোমরা অনেক কিউট!'

হৃদি হে হে করে বলে উঠল, 'আপনিও…' রুদ্র একদম ঠিক বলেছিল!'

মনীষা সন্দিহান হয়ে বলল, 'রুদ্র কী বলেছিল?'

রুদ্র চমকে তাকালো হৃদির দিকে। এই গাধীর বাচ্চি এখন কী বলতে কী বলে বসবে আল্লাহ জানে! এদের মাথা পুরাপুরি আউট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে মনীষা রুদ্রর ক্রাশ না শুধু, এদের সবার ক্রাশ। নিশ্বাস বন্ধ করে সে হৃদির দিকে চেয়ে রইল। বেফাঁস কিছু বলে না দেয়, গাধীটা।

হৃদি গলায় পূর্বের হেহে ভাব বজায় রেখেই বলল, 'ওমা, রুদ্র তো সবসময়ই বলে যে আপনি কত সুন্দর, আপনার চোখ…' অমৃতা ওর পাশেই বসে ছিল। চট করে সে হৃদির হাতে একটা চিমটি কাটল। চিমটি খেয়ে হৃদি উপলব্ধি করলো যে সে নিশ্চয়ই অসংযত কিছু বলে ফেলেছে। ঢোঁক গিলে কথাটা পেটে পুরে ফেললো চকিতে।

মনীষা আড়চোখে রুদ্রকে একবার দেখল। রুদ্র নিজের এক আঙুল সমান লম্বা দাড়ি ওয়ালা গালটা হাতড়াচ্ছিল। চোখে মুখে অস্বস্তি নিয়ে চেয়ে ছিল মেঝের দিকে। মনীষা উৎসুক গলায় বলল, 'আমার চোখ?'

হৃদি বেকায়দায় একবার তাকালো রুদ্রর দিকে। সে যে বড়সড় একটা ভুল করে ফেলেছে এটা বুঝতে পেরে তার এখন কান্না পেয়ে যাচ্ছে। রুদ্রর মুখখানা বড়ই থমথমে। সে কখনো হ্যাংলার মতো মুখের ওপর মনীষার রূপের প্রশংসা করেনি। এমন কি মনীষা হয়তো জানেওনা যে রুদ্রর চোখে সে কতটা সুন্দর, কতটা অসাধারণ। আজ পর্যন্ত একটাবারের জন্যেও মনীষার ওই সাগর চোখের দিকে চেয়ে রুদ্র বলতে পারেনি, যে ওই চোখদুটো তার কতটা প্রিয়। বন্ধুদের সাথে সে খোলামেলা এবং প্রগলড়ভ এ কথা ঠিক। কিন্তু বাইরের লোকের সামনে যতটা সম্ভব আত্মসম্মান বজায় রেখেই চলার চেষ্টা করে।

হৃদি অনেক কষ্টে বলল, 'না··· কিছুনা।'

অমৃতা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গ পাল্টালো, 'আপনি দেশে ফিরেছেন কবে?'

– 'এইতো হল এক সপ্তাহ।'

– 'আপনার ছেলে কেমন আছে?'

মনীষা একটা হতাশার শ্বাস ফেলে বলল, 'খুব একটা ভালো নেই। মন টিকছেনা ওখানটায়। আসলে কখনো আমাকে ছেড়ে একলা থাকেনি তো।'

– 'ঠিক হয়ে যাবে ধীরেধীরে। প্রথম দিকে সবার ভেতরেই একটু হোমসিকনেস কাজ করে।'

বিভা বলল, 'আমি শুনেছি আপনি খুব ভালো গান করেন। আপনার গান শুনতে পাবো কবে? রুদ্র আর আপনি ডুয়েট গান করবেন। আমরা আপনাদের গান একসাথে শুনতে চাই।'

– 'ডুয়েট?' শব্দটা উচ্চারণ করে এক ভ্রু উঁচিয়ে রুদ্রর দিকে তাকাল মনীষা। রুদ্র অপ্রস্তুত হাসল। এই গাধার বাচ্চা গুলা আজকে তার মান সম্মান ডুবিয়েই ছাড়বে বলে মনে হচ্ছে।

মনীষা বিভাকে বলল, 'আমিও কিন্তু জানি যে তুমি খুব ভালো নাচতে পার। যেদিন তোমার নাচ দেখাবে, সেদিনই আমি গান শোনাবো তোমাদের।'

– 'আমাদের সামির সামনেই বিয়ে। আপনি সামির বিয়েতে গান করবেন, কেমন?'

রুদ্র এতক্ষণে কথা বলল, 'হ্যাঁ, সামির এনগেজমেন্ট এ আপনার দাওয়াত রইল।'

– 'যার বিয়ে সে তো দাওয়াত দিচ্ছেনা!'

সামি খোঁচাটা বুঝতে পেরে মুচকি একটা হাসি হেসে বলল, 'নিশ্চয়ই আসবেন।'

এরপর বন্ধুরা আর কোনো কথা খুঁজে পেলোনা। সবাই হাসি হাসি মুখ আর চিকচিক করা চোখের মণি নিয়ে তাকিয়ে রইল মনীষার দিকে। অতএব রুদ্রকেই আতিথেয়তার দায়িত্বটুকু পালন করতে হল। একটু আড়ষ্টতা নিয়ে বলল, 'আপনি কী খাবেন? চা দেই?'

মনীষা রুদ্রর প্রস্তাব শুনে খুব একচোট হাসল, বাব্বাহ তুমি দেখি একদম পাকা সংসারী হয়ে উঠেছ। চা বানাতে পারো?

রুদ্র বলল, 'আমি পারিনা, কিন্তু আমার বন্ধুরা প্রত্যেকে পারে।'

সামি বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বানাচ্ছি চা।'

মনীষা বলল, 'আরে না। তোমরা ছোট মানুষ, এসব ঝামেলা করতে হবেনা। বসে থাকো।'

সামি মনীষার বারণ শুনল না। বলল, 'আপনি প্রথমবার এসেছেন। কিছু তো খেতেই হবে।'

সামির দেখাদেখি আকাশও উঠল। উঠে পড়ল অমৃতাও। অগত্যা হৃদি আর বিভাকেও উঠতে হল। মনীষা একটু অবাক গলায় বলল, 'তোমরা সব কোথায় যাচ্ছ?'

আকাশ বলল, 'আমার দশটার সময় একটা ক্লাস আছে।যেতে হবে।'

– 'ও আচ্ছা, আমি আসলে খুব বাজে একটা সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছি। রুদ্ররও তো অফিসে যেতে হবে, তাইনা?'

রুদ্র হালকা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

মনীষা সোফায় রাখা ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিতে নিতে বলল, 'আমি তাহলে আজ উঠি। অন্য একদিন চা খাবো।'

আকাশ বলল, 'চা করতে পাঁচ মিনিটও লাগবেনা। আপনি বসুন প্লিজ। আমরা সবাই একসাথে চা খাবো।'

বন্ধুরা চলে যাবার পর মনীষা ব্যাগের চেইন খুলে একটা খাম বের করে রুদ্রর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার লাস্ট মাসের স্যালারি। অনেক দেরি হয়ে গেল। দুঃখিত।
'

– 'আপনি এটা দিতে এসেছেন?' একটু ত্যাড়া ভাবে প্রশ্ন করলো রুদ্র।

– 'ভাবলাম এদিকটায় যেহেতু আসা হল।এই সুযোগে দিয়ে যাই টাকাটা।'

রুদ্র বসা থেকে উঠে হাত বাড়িয়ে খামটা নিল। নিয়ে আবার সোফায় এসে বসলো। মনীষার মুখোমুখি। সাগর চোখের মনীষা তখন বিড়াল চোখের রুদ্রকেই দেখছিল। ওর দাড়ি গোফের জঙ্গল ওয়ালা আউলবাউল মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছিল কেমন অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে। রুদ্র কিছুতেই স্থির হতে পারছিলোনা। বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে যাচ্ছে সমানে। এই অপ্রত্যাশিত স্নিগ্ধ সুন্দর ঘটনাটির সত্যতা মেনে নিতে তার বেগ পেতে হচ্ছে। ফিরোজা রঙের শাড়ি পরা পরীটা যেন বাস্তবে আসেনি তার বাসায়, এসেছে স্বপ্নে।

– 'তুমি তোমার বন্ধুদেরকে কী বলেছ? আমার চোখের কথা?'

রুদ্র সতর্কতার সাথে বলল, 'ওদের কথাবার্তার কোনো ঠিক নেই। আবোল তাবোল বলে।

– ‘তাই?’

– ‘হুম তাই।’ ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে থাকা এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করতে করতে বলল রুদ্র।

– ‘তোমার সব কেমন চলছে?’

– ‘চলছে একরকম। আপনি কেমন আছেন?’

– ‘মোটামুটি।’

– ‘একা একা থাকতে সমস্যা হচ্ছেনা তো কোনো?’

মনীষা এ প্রশ্নের উত্তরে অদ্ভুত হাসলো, ‘সমস্যা হলেই বা কী করার আছে?’

রুদ্র চুপ করে রইল। এ বিষয়ে তার কিছু বলাটা সমীচীন হবেনা ভেবেই চুপ থাকলো, কিন্তু আদতে এই সমস্যা সমাধানের উপায় আছে। মনীষার বয়স তেত্রিশের আশেপাশে হবে। তার সামনে এখনো পড়ে আছে অনেকটা সময়। বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। বাস্তবিক অর্থেই সে একেবারে একা। জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারাটা খুব জরুরি। একদম একা একা জীবন কাটানোটা কোনো মানুষের পক্ষেই সহজ কাজ নয়। কিন্তু মনীষাকে এসব কথা বলার মতো কোন অধিকার তার নেই। সে কে?

– ‘আমার বাসাটা পাল্টে ফেলব। রাইয়ানের তো প্রায় দুই বছর লেগে যাবে পড়া শেষ হতে। তো এই দুটা বছর ছোট একটা বাসা ভাড়া করে থাকব। ধরো দুই রুম হলেই চলবে।’

– ‘কোন দিকে যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?’

– ‘ভাবছি অফিসের কাছাকাছি কোথাও উঠব।’

-’ হুম, ঠিক আছে আমি বাসা খুঁজে দেখবো।’

– ‘হ্যাঁ প্লিজ, পেলে জানাবে। অনেক জায়গায় আবার সিঙ্গেল মহিলাকে ভাড়া দিতে চায়না। এর মাঝেই বেশ কয়েক জায়গা থেকে আমাকে রিজেক্ট করেছে সিঙ্গেল বলে।
’

রুদ্র হাতে ধরা খামটার দিকে নিবিড় চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, ‘আমি চাকরি পেলে আপনাকে একটা ট্রিট দেবার কথা ছিল, মনে আছে?’

মনীষা হাসল, ‘মনে আছে।’

– ‘কবে ফি আছেন?’

– ‘যেকোনো উইকেন্ডে।

অমৃতা পর্দার ফাঁক গেলে মাথা বের করে বলল, ‘আপু, একটু আসুন প্লিজ। চা খেয়ে যান।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অমৃতা নিজেকে দেখছিল। এভাবে এমন গভীরভাবে এর আগে কোনোদিন সে নিজেকে দেখেনি। প্রয়োজনই পড়েনি কখনও! আজকেও বা ঠিক কী প্রয়োজন তা অমৃতা জানেনা। কিন্তু কেন যেন আজ জীবনে প্রথমবারের মতো নিজের চেহারা খানা যাচাই করে নেবার তাগিদ অনুভব করছে ভেতর থেকে। সে কোনোদিনই নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। কপালের কাছের চুলগুলো

একটু লম্বা হয়ে গেছে। পেছনে দিকেও চুল ঘাড় ছুঁয়ে ফেলেছে। সে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে স্বগতোক্তি করল, 'চুল কাটতে হবে।'

বিছানায় বিভা বসে ছিল হাতে মোবাইল নিয়ে। অভিজিতের নম্বরে পর পর তিনবার ফোন করল। অভিজিৎ লাপাত্তা। থেকে থেকে তার ডুয়ার্সের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল তার একার ছোট্ট সংসারটার কথা। চায়ের কাপ থেকে শুরু করে ঘরের খুঁটিনাটি প্রতিটি জিনিসের প্রতি একটা টান অনুভব করছিল ভেতরে ভেতরে। দূর্গা সব কাজ মন দিয়ে করছে কিনা, অভিজিৎ সকালের চা' টা সময় মতো পেল কিনা, পোষা পায়রাগুলোকে নিয়ম মতো খাবার দেয়া হল কিনা, এমনই সব অনর্থক দুশ্চিন্তারা অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছে মনের কিনার ঘেঁষে। অমৃতার বিড়বিড় করে বলা কথাটা শুনে তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। সে মুখ তুলে তাকাল অমৃতার দিকে এবং এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে রীতিমত চমকে উঠল। অমৃতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যত্নের সাথে নিজের চুল আঁচড়াচ্ছে! এটা কী করে সম্ভব? সে বিস্ফোরিত চোখে দৃশ্যটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর থমকানো গলায় বলল, 'তুই… কী করতেছিস?'

অমৃতা বিভার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার চুল গুলি একটু লম্বা হয়ে গেছে তাইনা? অদ্ভুত দেখাচ্ছে?'

বিভার ঠোঁট দুটো হা হয়ে গেলো বিস্ময়ে। এই মেয়েটাকে চেনে সে প্রায় পনেরো বছর ধরে। এই পনের বছরের সুদীর্ঘ সময়ে অমৃতা কোনোদিন ভুলে একটিবারের জন্যও নিজের চেহারা সম্পর্কে কোনো মতামত জানতে চায়নি বন্ধুদের কাছে। অমৃতার সাজ হল কোনোরকমে গায়ে একটি ঢোলা শার্ট জড়ানো আর ঘাসের ন্যায় ছোট করে ছাটা চুল গুলোতে চটপট হাত বুলিয়ে নেয়া। ব্যাস এটুকুই।

বিভাকে ব্যাক্কলের মতো চেয়ে থাকতে দেখে অমৃতা বলল, ‘কী হইল?’

– ‘তুই··· তুই জানতে চাইতেছিস তোকে কেমন দেখাচ্ছে?’

– ‘অদ্ভুত দেখাচ্ছে চুলের জন্য?’ অমৃতা বেশ সিরিয়াস।

বিভা হতভম্ব ভাবটা কাটিয়েই উঠতে পারছেনা। তার মুখে কোনো কথা নেই। অমৃতা আর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে নিজের কাজ করতে লাগল।

কোর্টে যাবার পোশাক হল সাদা শার্ট, কালো কাপড়ের প্যান্ট আর কালো কোট। হাতে থাকে ইয়া বড় লম্বা কালো ভূতের মত গাউন। আজ ঠিক এগারোটায় সি এম এম কোর্টে তার একটা শুনানি আছে। সকালবেলা চা খেতে খেতে সে রোজ একবার মামলার নথি পত্র গুলোয় চোখ বুলায়। আজ মনীষা থাকার কারণে সেই কাজটা করা গেল না। তাছাড়া আজ তৈরী হবার পেছনেও একটু বেশি সময় লাগছে। সে মুখে কোনো প্রসাধন মাখছেনা। কিন্তু জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ অবধি অকারণে দাঁড়িয়ে আছে আয়নার সামনে। একটু বাদে হৃদি আসলো ঘরে। অমৃতার ভাবসাব দেখে নিয়ে সে মন্তব্য করল, ‘দ্যাখ না, মনে হইতাছে যেন ডেটে যাইতাছে।
’

বিভা বলল, ‘অনেক হইছে, বুইড়ার সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য তোমার অতো সাজতে হবেনা।’

অমৃতা ফোঁস করে উঠে বলল, ‘তোদেরকে না বুইড়া বলতে মানা করছি? আর কোনোদিন আমার উনাকে বুইড়া বলবি না।’ ’

বিভা হাহাকার করে বলে উঠল,'এর তো মাথা পুরাই খারাপ হয়ে গেছে!'

হৃদি দু পা এগিয়ে এসে অমৃতার মুখোমুখি দাঁড়াল। সরাসরি ওর চোখে চেয়ে বলল, 'তুই আসলে কী করতে চাচ্ছিস?'

-'কী করতে চাইব আবার?'

– 'সেই তখন থেকে আয়নার সামনে দাঁড়ায় আছিস কেন? সাজগোজ করবি?'

অমৃতা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে বলল, 'আজাইরা কথা বলিস কেন? আমি কি সাজগোজ করি নাকি কখনো?'

– 'তাহলে করতে চাচ্ছিস কী?'

– 'জাস্ট ট্রাইং টু ফিগার ইট আউট যে আমাকে আসলে দেখতে কেমন লাগতেছে?'

বিভা চোখ ছোট করে বলল,'তোকে দেখতে পিকিউলিয়ার লাগে। বুঝছস? তোর উচিৎ আউটলুক চেঞ্জ করা। এরকম অদ্ভুত বেশভূষা নিয়ে ঘুরতে থাকলে কোনো ছেলে তোরে পছন্দ করবেনা। আংকেলরাও পছন্দ করবে না।'

শুনে অমৃতার চোখে একটা হালকা ছায়া পড়লো। একটু আহত গলায় বলল, 'দ্যাখ, তোরা যদি প্রত্যেকটা কথায় আমাকে এরকম খোঁটা দিস, মানে বুইড়া তারপর আংকেল, এসব দোস্ত কন্টিনুয়াসলি চলতে থাকলে আমি তোদের সাথে এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কথাই বলবো না।

– 'বুইড়াকে বুইড়া বলবো নাতো কী বলবো? হ্যান্ডসাম হিরো?'

– 'ডেফিনিটলি হি ইজ হ্যান্ডসাম। ওটা বলতে না পারলে কিছুই বলিস না। ডোন্ট হার্ট মাই ফিলিংস। অকে?'

বিভা একটু ত্যাড়া ভাবে বলে উঠল, 'কিছু না বলাই ভালো। কারণ ব্যাপারটা মনে পড়লেই আমার গায়ের মধ্যে শুয়ো পোকা কামড়ায় উঠে। বুঝছস? তুই এই ফালতু বিষয়টা নিয়া আমাদের সাথে আর কথা বলিস না। সেটাই ভালো হবে।

হৃদিও বিভার সুরে সুর মেলালো। বলল, 'আসলেও, আজকের পর থেকে বিষয়টা নিয়ে আমরা আর কোনো কথা বলবো না। মনে পড়লে আমার বমি আসে। বিশ্বাস কর!'

অমৃতা কিছুক্ষণ ব্যথাতুর চোখে দুই বান্ধবীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর আর একটিও কথা না বলে ধীরে ধীরে গায়ে কালো কোটটা পরে নিল। পায়ে মোজা, জুতো পরল। ফাইল পত্র গুছিয়ে নিল ব্যাগে। এই পুরো সময়টাতে বিভা আর হৃদি কোনো কথা বলল না। নিশ্চুপ হয়ে, নিবিড় চোখ মেলে অমৃতার কাজ কারবার দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে তাদের দুজনেরই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আজকে যদি কোনো সাধারণ মানুষকে অমৃতা ভালোবাসতো, তাহলে এই প্রথম দেখার দিনটি কতই না মধুর, সুন্দর আর অন্যরকম ভালোলাগার হতে পারত। তারা বন্ধুরা এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষায় ছিল এই দিনটির। অমৃতা কারো প্রেমে পড়বে এই বিষয়টা চিন্তা করেই মনের ভেতর শিহরণ খেলে যেত তাদের। অমৃতার প্রেমে পড়াটা ছিল তাদের কাছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য তুল্য একটি বিষয়। হায়, সেই বহু কাঙ্খিত দিনটি আজ এলো সত্যিই, কিন্তু এলো ভয়ঙ্কর জীর্ণ রূপ নিয়ে। এই ভয়ংকর সত্যকে স্বাগত জানানোর মতো কোনো ইচ্ছা, রুচি কিংবা সাহস এর কোনওটিই তাদের নেই।

বিভা আর হৃদির আচরণ অমৃতার ভেতরে একটা হতাশার ভাব উদ্রেক করে দিয়েছিল। মনের দিক থেকে সে সর্বদাই শক্ত পোক্ত। ভেঙে পড়ার মতো মেয়ে সে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সে তার বন্ধুদেরকে পাশে পেয়েছে। তার পৃথিবী এক দিকে আর বন্ধুরা অন্যদিকে। এই প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করল যে, এবারের পথটিতে সে সম্পূর্ণ একা। পৃথিবীতে দ্বিতীয় কোনো মানুষ নেই যে তাকে বুঝবে। বন্ধুরাই বুঝল না, অন্য লোকে কী করে বুঝবে?

হয়তো ভুল পথেই পা বাড়িয়েছে সে। কিন্তু ভুল সঠিক নির্ধারণ করার যথাযথ মানদণ্ড কোনটি? মানুষের বিবেক? কার কখন কাকে ভালো লাগবে কিংবা খারাপ লাগবে এই বিশেষ অনুভূতি টিকে বিবেক দিয়ে কি কখনো নিয়ন্ত্রণ করা যায়? কে যেন কবে বলেছিল, এভরি থিঙ ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। অমৃতা কথাটা এখন শত ভাগ বিশ্বাস করে। অন্য কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, তার কিছু এসে যায়না। তবে তার মনে এখনও আশা আছে, যে বন্ধুরা একদিন তাকে ঠিকঠিক বুঝবে। সামিও বুঝবে। সামির কাছ থেকে তো সে তার বাবাকে ছিনিয়ে নিতে চায়নি! তাদের সংসারও ভাঙতে চায়নি। শুধুই ভালোবেসেছে। এতকাল সবাই বলেছে একটা প্রেম কর, প্রেম কর! আরে ভাই, প্রেম কি বললেই করা যায় নাকি, ওসব তো হয়ে যায়। যখন হল… হায়! সারা দুনিয়া চলে গেল তার বিপক্ষে। কপাল!

না, ভালো লাগছিলোনা। বুকজোড়া এক গহন হতাশা বোধ! পৃথিবীটা এমন কেন? সমাজটাই সব? মনের কোনও দাম নেই?

৩০

দুপুর দেড়টায় অমৃতা এসে পৌঁছুল হকের অফিসে। তার কেমন যেন সংকোচ হচ্ছিল। অথচ সংকোচের তো কোন কারণ নেই। লোকটা নিজেই ডেকেছেন তাকে। এমন তো নয় সে যেচে পড়ে দেখা করতে এসেছে। এসেছে কাজে। অযথা গল্প করার জন্য তো আসেনি!

রিসিপশনে যে মেয়েটি বসে আছে তার সাজগোজের কমতি নেই। চেহারাখানাও ভালো। হঠাৎ দেখায় মনে হয় যেন বিজ্ঞাপনের মডেল। চুলে ব্লন্ড কালারের হাইলাইট করা। ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। গা থেকে ভেসে আসছে কড়া পারফিউমের ঘ্রাণ। একেবারে এলাহী কাণ্ড! সে অমৃতার কথা শুনে কঠিন মুখে বলল, ‘স্যার তো মিটিং এ। এখন তো দেখা করা সম্ভব না।’

– ‘আমার উনার সাথে ঠিক এই সময় দেখা করার কথা ছিল। উনিই ডেকেছেন। আপনি কি একটু ফোন করে বলবেন?’

– ‘দেখুন মিটিং এর মাঝখানে ফোন করার নিয়ম নেই। স্যার খুব রেগে যান কেউ এ সময় বিরক্ত করলে। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।’

– ‘মিটিং কখন শেষ হবে?’

–’ তা বলা যাচ্ছেনা।’

কী আশ্চর্য! লোকটা তার সাথে দেখা করার বিষয়টা বেমালুম ভুলে গেল? মিটিংই যদি থেকে থাকে তাহলে অমৃতাকে আসতে বলা কেন? অমৃতা ওয়েটিং রুমের সোফায় গিয়ে বসল। হকের নাম্বারে ফোন করলো পর পর দুবার। ফোন ধরলেন না তিনি। একটা ডাইনি রাগ ক্রমশ তার শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছিল। আজকে তার এন জি ও’ র অফিসে গিয়ে মামলার আপডেট দেয়ার কথা ছিল। এই লোকের

সাথে দেখা করার জন্য অসুস্থতার বাহানা দিয়ে অফিস কামাই করল। সে তো নিজের জরুরি কাজ ফেলে রেখে চলে এসেছে লোকটার সাথে দেখা করতে। অথচ লোকটা … নাহ খুব রাগ হচ্ছে তার। অধৈর্য হয়ে রিসিপশনের মেয়েটিকে বলল, ‘আপনি আপনার স্যারকে একটাবার ফোন করুন। উনি বলেছেন উনার জরুরি দরকার আছে আমার সাথে। আমি যে এখানে এসেছি এই তথ্যটা উনার জানা প্রয়োজন।’

মেয়েটি তার গাঢ় লিপস্টিক দেয়া ঠোঁটে একটা খটখটে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘সরি ম্যাডাম, আমি এ মুহূর্তে কিছুতেই ফোন করতে পারবনা। স্যার প্রচন্ড রেগে যাবেন। চায়না থেকে বায়ার এসেছে। খুব ইম্পরট্যান্ট মিটিং। উনার যদি জরুরি দরকার থাকে তাহলে মিটিং শেষে উনি নিজেই আপনাকে ডেকে নেবেন। আর তাছাড়া খুব জরুরি কিছু হলে উনি আগেই আমাদেরকে বলে রাখতেন। যেহেতু বলেন নি, এর মানে…’

– ‘এর মানে?’ অমৃতার গলা চড়ে গেল।

রিসিপশনিস্ট অমৃতার তেজি ভাবটা লক্ষ্য করছিল অনেকক্ষণ ধরে। পুরুষ মানুষের বেশভূষার এই ওভার স্মার্ট মেয়েটিকে প্রথম থেকেই তার খুব একটা পছন্দ হচ্ছেনা। একটা অহংকারী ভাব আছে মেয়েটার মধ্যে। সে অহংকারী মেয়েটিকে জব্দ করার সুযোগ হাতছাড়া করল না, কড়া ভাবে বলল, ‘বলতে চাইছি সেরকম জরুরি কোনো কাজ থাকলে স্যার নিজেই আপনাকে ডেকে নেবেন। মিটিং এর মাঝখানে উনাকে বিরক্ত করার কোনো নিয়ম নেই। আপনি অপেক্ষা করুন।

অমৃতা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, ‘আপনাকে বললাম তো একবার ফোন দিন আপনি।
’

– ‘সরি, আমি পারব না।’

অমৃতাও নাছোড়বান্দা,’কেন পারবেন না?’

– ‘আশ্চর্য! আমি কি চাকরি খোয়াবো নাকি আপনার জন্য? বললাম তো অপেক্ষা করুন। হয়তো পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই মিটিং শেষ হয়ে যাবে। এতো অস্থির হচ্ছেন কেন?’

অমৃতা একটা বড় নিশ্বাস টেনে রাগ দমন করার চেষ্টা করল। এক প্রকট অপমান বোধ জোয়ারের মতো তেড়ে এসে ক্রমশ ডুবিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তাকে। কারো হুকুম মেনে চলার অভ্যাস তার একেবারে নেই বললেই চলে। আর একটি মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে গটগট করে হেঁটে অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে আসল সে। এক ভয়ঙ্কর করাল রাগে চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে আসছিল তার। নিজের প্রতি তীব্র ঘেন্নায় গা বিষিয়ে উঠছিল। কী দরকার ছিল কাজ কর্ম ফেলে রেখে লোকটার সাথে নাচতে নাচতে দেখা করতে আসার? ওই অহংকারী ডাঁটিয়াল লোকটা তো তার আসবার কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে। কান্নাকাটির সাথে খুব একটা সখ্যতা নেই অমৃতার। শেষ বার কবে কেঁদেছিল মনে পড়েনা। আজ বহু দিন পর কান্নার মতো কী যেন একটা বিঁধছিল গলার কাছে। অফিস বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে শীতের পিঙ্গল ধুলোটে আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে সে কান্নাটাকে ঢোঁক গিলে ফেলার চেষ্টা করল। তার মনটা আজ ভয়ংকর খারাপ!

আচ্ছা, আজ কি একটু বৃষ্টি নামবে? হঠাৎ মনে হল এই মুহূর্তে বৃষ্টি নামলে বুঝি তার মন ভালো হয়ে যেত। কিন্তু আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। বৃষ্টি নামার লক্ষণ নেই কোনো। শুধুমাত্র বৃষ্টিমহল ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানেই ইচ্ছে মতো বৃষ্টি নামানো যায়না। বৃষ্টিমহলের বন্ধুরা চাইলেই বৃষ্টি নামাতে পারে। কিন্তু আজ

বৃষ্টিমহলেও বৃষ্টি নামবে না। কারণ বৃষ্টিমহলে একা একা বৃষ্টি নামানো যায়না। আজ তার বড় বেশি একা একা লাগছে। সারাটা মন জুড়ে দাপাদাপি করছে এক ভয়ঙ্কর একা ভাব!

– ‘এক্সকিউজমি ম্যাডাম!’

ডাকটা শুনে পেছন ফিরে তাকাল অমৃতা। খাঁকি পোশাক পরা মোটাসোটা এক সিকিউরিটি গার্ড অফিস বিল্ডিং এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অমৃতা তাকাতেই সে বলল, ‘ম্যাডাম, আপনাকে স্যার ডাকছেন।’

মন খারাপের অতল গভীর কূপ থেকে দুটা শব্দ প্রতিধ্বনির মতো বেরিয়ে আসল অমৃতার স্বরনালি দিয়ে,’কে ডাকছেন?’

সিকিউরিটি গার্ড বিনয়ের সাথে বলল, ‘আমাদের স্যার ডাকছেন আপনাকে। উনার মিটিং শেষ হয়েছে। রিসিপশনিস্ট আপা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে ভেতরে।

ব্যাপারখানা বুঝে উঠতে অমৃতার কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গেল। যখন বুঝল তখন টের পেল যে এই ডাকটা আজকে এই মুহূর্তে না আসলে ভয়ংকর কিছু ঘটে যেতে পারত তার জীবনে। এমন বাধঁছেড়া একাকীত্ব এবং অপমান বোধ একই সাথে এর আগে কখনো তাকে ঘায়েল করেনি। মন খারাপ হলেই খুব দৌড়োতে ইচ্ছে করে। সমস্ত কিছুকে পেছনে ফেলে তীরের বেগে সাঁই সাঁই করে ছুটতে ইচ্ছে করে ওর। গতির মধ্যে এক প্রবল মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায় সে। কিন্তু এ মুহূর্তে হাতে জরুরি কাগজ পত্রের ব্যাগ, ল্যাপটপ, ওকালতির পোশাক এই সমস্ত কিছু সঙ্গে নিয়ে কোনো

ভাবেই তার পক্ষে দৌড়নো সম্ভব হচ্ছিল না। অথচ মনে হচ্ছিল যেন দৌড়োতে না পারলে সে মরে যাবে। তাই এই ডাকটা সেই এক টুকরো সুনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আপাতত বাঁচিয়ে দিল তাকে।

একটা ঘোর কাজ করছিল ভেতরে। সিকিউরিটি গার্ডের পেছন পেছন নিঃশব্দে হেঁটে ফিরে আসল বিল্ডিং এর ভেতর। রিসিপশনিস্ট তাকে দেখতে পেয়ে একটু ধারালো ভাবে বলল, 'মিটিং মাত্র শেষ হয়েছে। আপনি তো অপেক্ষা না করেই চলে গেলেন ম্যাডাম! এতো অধৈর্য হলে কি হয়?'

অমৃতা খোঁচাটা এড়িয়ে গেল। লিফটে ঢুকে ছয় নম্বর বোতাম চাপল। তিনি বসেন সাত তলায়। এর আগেও একদিন এসেছিল অমৃতা তাঁর ঘরে। ওঁর চামচারা জোর করে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছিল তাকে। সেদিন বুকের ভেতর ছিল ক্রোধের আগুন আর তীব্র ঘেন্না। অথচ আজ আশ্চর্য এক ফিনফিনে তরল অনুভূতিতে ডুবে আছে মন। লিফ্টের বন্দি বাক্সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অমৃতা ভাবছিল যে, সত্যিই মানুষ বেঁচে থাকলে বদলায়, আর মরে গেলে পঁচে যায়। প্রকৃতির সাথে মানুষের একটি বিশেষ মিল হল, প্রকৃতির মতই মানুষও ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টায়। শুধু তফাৎ এ জায়গায় যে প্রকৃতির ঝরে যাওয়া রূপ বারে বারে ফেরত আসে। কিন্তু মানুষ হাজার চাইলেও, একবার যা হারায়, তা আর ফিরে পায়না।

দরজায় করাঘাত করল অমৃতা। একবার, দুবার··· তিনবারের সময় ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে আসল।

– 'কাম ইন!'

অমৃতা দরজার নব ঘুরিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। হক সাহেব বসে আছেন টেবিল সংলগ্ন রিভলভিং চেয়ারে। তিনি একা নন, তাঁর মুখোমুখি বসে আছেন আরো দুজন ভদ্রলোক। হক কথা বলছিলেন লোক গুলোর সাথে। অমৃতাকে দেখতে পেয়ে তিনি কথা থামিয়ে বললেন, 'এসো। ভেতরে এসো।'

অমৃতা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজাটা আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিল। হক উপস্থিত ব্যক্তি দুজনের সাথে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে গেলেন আবার। অমৃতা একটু অস্বস্তি নিয়ে দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেঁটে গিয়ে সোফার ওপর বসল। এই ঘরটা বেশ প্রশস্ত আর খোলামেলা। পশ্চিমের দেয়াল জুড়ে বিশাল বড় এক জানালা। সে জানালার থাই এলুমিনিয়াম কাচের গায়ে মাঘ মাসের মিঠা দুপুরটা আলতো ভাবে লেপটে আছে। জানালার ওপারে পিঙ্গল আকাশ। তার ঠিক নিচেই দেখা যাচ্ছে ঢাকার ব্যস্ত রাস্তা। রাস্তায় চলেছে সারি সারি গাড়ি, সি এন জি, রিকশা। ফুটপাতের ওপর হাঁটছে অগণিত মানুষ। ওই যান্ত্রিক কোলাহলের ছিটেফোঁটাও এই চকচকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস রুমে এসে পৌঁছচ্ছে না। এ ঘরে আসবাব বলতে আছে বড় একখান কাঠের টেবিল, সোফা সেট আর কাচের সেন্টার টেবিল। এক কোণায় একটি ছোট টেবিলের ওপর প্রিন্টার আর কম্পিউটার রাখা। দেয়াল জুড়ে টাঙানো বেশ কিছু দামি পেইন্টিং। সিলিং এ চমৎকার একটি ঝাড়বাতি ঝুলে আছে। ঝাড়বাতির হলদে আলোয় ঝকঝক করছে চারপাশ। অবশ্য ঘরটায় সূর্যের আলোর উপস্থিতি এতো প্রকট যে ঝাড়বাতি জ্বালানোর কোন প্রয়োজনই পড়েনা।

অমৃতা হাতে ধরা গাউনটা সোফার ওপর রাখল। তাকাল সম্মুখে বসা আলোচনারত মানুষগুলোর দিকে। লোকটার পরনে একটি অফ হোয়াইট ফুল হাতা শার্ট। গলায় কালো টাই। গালভর্তি বরাবরের মতোই ছিটে ছিটে দাড়ি। ছোট করে ছাটা চুল। চোখ দুটো…' বলতে কী, অমৃতার সবচাইতে ভালো লাগে ওই গভীর, বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। ভালো লাগে কথা বলার ভঙ্গিটা। নাকি সবচেয়ে ভালো লাগে ওঁর গলার স্বর?...' কিংবা কথার ফাঁকে হঠাৎ চিন্তিত ভাবে ঠোঁট টিপে ফেলা?

লোকটা হাত নেড়ে নেড়ে কোন জরুরি কথা বলছেন সামনে বসা মানুষদুটোর সাথে। ফাইল ঘাঁটছেন,ল্যাপটপ ঘাঁটছেন, কী সব লিখছেনও আবার কাগজে খসখস শব্দ তুলে। হঠাৎ কী কারণে যেন একটু রেগে গেলেন। খিটখিটে গলায় ধমক দিয়ে বসলেন মানুষ দুজনকে। আশ্চর্য জনক ভাবে এই ধমকটাও অমৃতার ভালো লেগে গেল। সোফার পিঠে হেলান দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে, পা নাচাতে নাচাতে সে বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল লোকটার দিকে। হঠাৎ গভীর চোখ দুটি অমৃতার চোখের ওপর পড়ে গেল। থমকে গেল অমৃতা। পা নাচানো বন্ধ করে নড়ে চড়ে উঠে ভদ্রভাবে বসার চেষ্টা করল।

ভদ্রলোক দুজন মিনিট পাঁচেক পর উঠে চলে গেল। এরপর প্রশস্ত খোলা মেলা ঘরটায় শুধু অমৃতা, আর ওই মানুষটা। অমৃতা তখনো সোফাতেই বসে ছিল। তিনি টেবিলের ওপর রাখা ফাইল পত্র গুছিয়ে রাখলেন। ল্যাপটপ সুইচড অফ করলেন। তারপর অমৃতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার চেষ্টা করে বললেন, 'কী খবর?'

– 'এইতো।' অমৃতা বলল মৃদু স্বরে।

হক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হেঁটে অমৃতার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'লাঞ্চ করেছ?'

– 'না।'

– 'আমিও করিনি। কী খাবে?'

অমৃতা সংকোচের গলায় বলল, 'একটা কিছু হলেই হয়।'

অমৃতার সংকোচ হচ্ছে এটা একটা বিরল ব্যাপার। হক সেই বিরল ব্যাপারটা আড়চোখে দেখলেন একবার। মেয়েটাকে এমন নরম সরম এর আগে কখনো লাগেনি। আজকে একে একটু কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে। সেই অন্যরকম ব্যাপারটা আদতে কী তা তিনি ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারলেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন, ‘চল!’

– ‘যাবো?’

– ‘হ্যাঁ!’

– ‘কোথায়?’

– ‘লাঞ্চ করতে!’

– ‘ও আচ্ছা!’

অমৃতা বসা থেকে উঠল। দ্রিমদ্রিম শব্দে ক্রমাগত একটা বাজনা বেজে যাচ্ছিল বুকের ভেতর। কোন কথা না বলে হাতে গাউন আর ব্যাগ নিয়ে লোকটার পেছন পেছন বেরিয়ে আসল সে। লিফ্টের সামনে দাঁড়াতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল ওরা। মুখের ওপর বন্ধ হল দরজা। তারপর ছোট্ট চারকোণা যান্ত্রিক বাক্সটার ভেতর শুধু ওরা দুজন। অমৃতা অস্বস্তিতে কাঁটা হয়ে রইল। লিফট নামতে থাকল নিচে। হক সাহেবের ফোন বেজে উঠল এর মাঝেই। তিনি ফোনে কথা বলা শুরু করলেন। লিফ্ট গন্তব্যে এসে পৌঁছুল। হককে দেখে রিসিপশনের মেয়েটি সহ ফ্রন্ট ডেস্কে বসে থাকা আরো তিনজন কর্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল। রিসিপশনের মেয়েটির তীক্ষ্ণ নজর টের পাচ্ছিল অমৃতা। এই নজরের প্রকৃত অর্থ কী তা সে জানেনা, তবে বুঝতে পারছিল কোম্পানির কর্ণধারের সাথে তার এই একত্রে বেরিয়ে আসাটা মেয়েটি ঠিক সাদামাটা ভাবে দেখছেনা। তার চোখে খেলা করছে সীমাহীন কৌতূহল।

বিল্ডিং এর সামনে একটি মিতশুবিশি পাজেরো রাখা ছিল। ওরা নিচে নামতেই ড্রাইভার সসম্মানে পেছনের সিটের দরজা খুলে দিল। হক ফোনে কথা বলতে বলতেই গাড়ির পেছনের গদিতে উঠে বসলেন। অমৃতা বুঝতে পারছিলনা তার ঠিক কোথায়

বসা উচিৎ? লোকটার পাশাপাশি বসতে তার কেমন কুণ্ঠা বোধ হচ্ছে। খুব বেশি কিছু চিন্তা না করে সে সামনের সিটে উঠে বসল, ড্রাইভারের পাশে। গাড়ির ব্যাক মিররে দেখল অমৃতা, লোকটা মনোযোগ দিয়ে ফোনেই কথা বলে যাচ্ছেন। অন্য কোনদিকে নজর নেই তাঁর। খানিক বাদে গুলশান দুইয়ের একটি ফাইভ স্টার হোটেলের গেটের ভেতর গাড়ি ঢুকল। ধনী লোকদের সাথে মেলামেশা করার এই এক যন্ত্রণা। বিলাসবহুল জায়গা ছাড়া এরা হ্যাংআউট করতে পারেনা। সত্যি বলতে জায়গাটা অমৃতার পছন্দ হল না। এতো বেশি আড়ম্বর পূর্ণ স্থান তার কখনওই পছন্দ না। কিন্তু কিছু বলার নেই। লোকটা যে এখানে প্রায়ই আসেন সেটা বোঝা গেল তখন, যখন তাঁকে দেখে হোটেলের রিসিপশনের লোকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসল। ক্ষমতাবান ব্যক্তির সামনে পড়লেই এদেশের সাধারণ মানুষের মুখে তেলতেলে হাসি ফুটে ওঠে। অযথা ব্যাক্কলের মতো হাসতে থাকে। এই হোটেলের লোকজনও তার ব্যতিক্রম নয়। সাদা শার্ট আর কালো টাই পরা এক কর্মচারী হাত কচলে অতিরিক্ত বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, 'স্যার, আপনি এসেছেন খুবই ভালো লাগছে। আজ কি কোনো মিটিং হবে?'

হক কান থেকে ফোন সরালেন এতক্ষণে। বললেন, 'না কোনো মিটিং নেই। লাঞ্চ করব। লাঞ্চের ব্যবস্থা করুন।'

কর্মচারী বিনয়ে কাদা কাদা হয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার। আজকের সব স্পেশাল লাঞ্চ আইটেম পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

হক একটু বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'স্পেশাল কিছু পাঠাতে হবেনা। আমার জন্য শুধু সাদা ভাত আর সবজি। আর এই বাচ্চাটা কী খাবে তা ওর কাছে থেকে জেনে নিন।

শব্দটা কানে লাগল অমৃতার, 'বাচ্চাটা!'

হোটেলের এই কর্মচারী হকের সাথে অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখে একটু সন্দিহান হয়ে উঠেছে। তার চোখে তখন অনুসন্ধানী দৃষ্টি। জানা মতে এম পি সাহেবের নিজের কোন মেয়ে নেই। আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে তিনি এই হোটেলে সচরাচর খেতে আসেন না। বেশির ভাগ ধনী ব্যক্তিদের অল্পবিস্তর মেয়েমানুষের দোষ থাকে। এই হোটেলে অনেকেই শহরের দামি দামি কলগার্লদের নিয়ে আসে। রাত কাটায়, ফূর্তি করে। কিন্তু এম পি সাহেবের সেরকম কোনো দোষ নেই। এতো দিন অন্তত ছিল না। তাছাড়া এই মেয়েটিকে দেখতে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতোও না। এর পোশাক আশাক চলন বলন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এতো কিছু মনে মনে ভেবে ফেললেও মুখে পূর্বের সেই বিনয়মাখা হাসিটি বজায় রেখেই সে অমৃতার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমাদের বুফে আছে। ম্যাডাম বুফে ট্রাই করে দেখতে পারেন।’

অমৃতা ছোট করে বলল, ‘না।’

মাঝারি সাইজের টেবিলে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসলো ওরা। অমৃতা এই হোটেলের ভেতরে আগে কখনো আসেনি। বাইরে থেকে দেখেছে শুধু। সাজসজ্জা অত্যন্ত আধুনিক এবং ঝাঁ চকচকে। পাঁচতারা হোটেল গুলো সাধারণত যেমন হয় আরকি। সুন্দর একটা মসৃণ হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে চারপাশে। টেবিলের ওপর প্লেট, কাঁটাচামচ, ন্যাপকিন সাজানো। হালকা সুরে মিউজিক বাজছে। আশেপাশের সবগুলো টেবিল খালি। মিউজিকের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। ওয়েটার মেনু নিয়ে আসতেই অমৃতা চটপট অর্ডার দিয়ে দিল। সাদা ভাত, সবজি, ডাল আর মুরগির মাংস।

ওয়েটার চলে যাবার পর অমৃতা টের পেল লোকটা বুদ্ধিদীপ্ত চোখ মেলে তার দিকেই চেয়ে আছেন। গায়ের কোট আর গাউন সে গাড়িতে রেখে এসেছে। এখন তার পরনে সাদা ঢোলা শার্ট। এতই ঢোলা যে তাকালে বোঝা যায়না ওই পোশাকের আড়ালে একটি চমৎকার গড়নের নারী শরীর লুকিয়ে আছে। এমনকি এই পোশাকের কারণে একটু দূর থেকে দেখলে তাকে কোন অল্পবয়সী তরুণ বলে ভ্রম হয়। কিন্তু মুখখানা তার বড়ই মিষ্টি। ভ্রুপ্লাক সে কখনো করেনা কিন্তু জন্ম থেকেই তার ভ্রু দুটোর আকৃতি নির্ভুল এবং নিখুঁত। সূচাল সুন্দর দুটি ভ্রুর নিচে ছোট ছোট পুতুলের মতো দুটি চোখ। টিকলো নাক আর পাতলা দুটি ঠোঁট। সে লিপস্টিক দেয়না, বরং সিগারেট খায় রোজ, তবুও তার ঠোঁটজোড়া কালচে নয়, গোলাপি!

বুদ্ধির ঝিলিক দেয়া গভীর এবং অভিজ্ঞ চোখ দুটোর সামনে অস্বস্তি লাগছিল অমৃতার। সে নার্ভাস ভাবে এদিক সেদিক চাইতে লাগল। লোকটা কোন কথা বলছেনা কেন? তার নিজেরই কি কথা শুরু করা উচিৎ?

– ‘আপনি কেন ডেকেছেন আমাকে?’ অনেক কষ্টে প্রশ্নটা করল অমৃতা। হক পানির জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে নিলেন। কয়েক ঢোঁক পানি চুমুক দিয়ে খেয়ে গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে গম্ভীর ভাবে বললেন, ‘আমি খবর পেয়েছি বিভা বাংলাদেশে এসেছে।’

– ‘হ্যাঁ এসেছে।’

– ‘কেন?’

– ‘আশ্চর্য! নিজের দেশে আসবেনা?

– ‘কিন্তু এই মুহূর্তে কেন? সে কি জানে যে সামির এনগেজমেন্টের তারিখ পড়ে গেছে?’

– ‘জানে। সামির এনগেজমেন্ট খেতেই এসেছে সে।’

হক এ কথা শুনে ভালোই অবাক হলেন। বিস্মিত ভাবে বললেন, ‘বলছ কী?’

– ‘হ্যাঁ ঠিকই বলছি।’

– ‘আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে। মেয়েটার অন্য কোন মতলব নেইতো?’

– ‘কী ধরণের মতলব? আপনার ছেলেকে কিডন্যাপ করবে নাকি?’

হক খুব চিন্তিত ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, ‘ব্যাপারটা তা না। মেয়েটাকে দেখে সামি যদি তার সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে? এই বয়সে কখন মাথায় কী ভূত চাপে তার কোন ঠিক আছে নাকি? আর আমার ছেলেটার মাথার তার এমনিতেই ছেঁড়া।’

– ‘সামি সিদ্ধান্ত বদলাবে কি বদলাবে না তা আমি জানিনা। তবে এটুকু জানি যে সামি আর বিভার মধ্যে এখন বন্ধুত্বের বাইরে অন্য কোন সম্পর্ক নেই

– ‘তুমি শিওর?

অমৃতা দৃঢ় গলায় বলল, ‘হ্যাঁ শিওর।’

– ‘সামি আবার হুট করে বিয়েটা নাকচ করে দেবেনা তো?’

– ‘আপাতত এরকম কোন সম্ভাবনা নেই। তবে সুনিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যাচ্ছেনা। সামির কোন ঠিক ঠিকানা নেই।

– ‘খুবই দুশ্চিন্তায় আছি। এই ছেলে শেষ মেষ আমার মান সম্মান ডোবায় কিনা আল্লাহ মালুম।’

– ‘মান সম্মান ডুবানোর কথা কেন আসছে?’

– ‘একটা পরিবারের সাথে কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। এখন যদি সে হুট্ করে বেঁকে বসে তাহলে সামাজিক ভাবে আমাদের অপদস্থ্ হতে হবে।’

অমৃতা গোমড়া মুখে বলল, ‘আপনার সমাজকে অনেক ভয়, তাইনা?’ হক প্রশ্নটা শুনে একটু থমকে গেলেন। এটা কোনো সাধারণ প্রশ্ন নয়। কোনো সাধারণ মানুষ এমন প্রশ্ন করতেও পারেনা। মেয়েটি সাধারণ নয় বলেই এর কথাবার্তার ধরণ অন্যরকম। বয়সের এতো তফাৎ থাকা সত্ত্বেও এর সাথে অনায়াসে মন খুলে কথা বলা যায়। যা কিনা কোন সমবয়সী পরিণত বয়স্ক লোকের সাথেও সব সময় বলা যায়না।

– ‘সমাজ নিয়েই তো আমাদের চলতে হয়।’

– ‘সামি বিয়েটা নাকচ করে দিলে কি আপনি এবং আপনার স্ত্রী খুব কষ্ট পাবেন?’

হক দিশাহারা হয়ে বললেন, ‘বলছ কী? নাকচ করার চান্স আছে নাকি? সামি কি এরকম কিছু বলেছে তোমাকে?’

অমৃতা একটা হতাশ নিশ্বাস ছাড়ল, ‘কিছুই বলেনি আমাকে। আমি প্রবাবিলিটির কথা বলছি। সমাজ নিয়ে অত ভাববেন না। সমাজের চাইতে মানুষের অনুভূতির দাম অনেক বেশি।’

চিন্তার রেখাটা হকের চোখ মুখ থেকে সরলনা। জানালা ভেদ করে দূরে দৃষ্টি রেখে তিনি অতি গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছেলেটাকে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা।'

– 'আমার মনে হয় আপনার উচিৎ ছেলের ওপর একটু বিশ্বাস রাখা।'

– 'করতে তো চাই। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছিনা কেন যেন। আমার ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল মনে হয় ওকে। কখন কী করে বসে ঠিক নেই।'

খাবার চলে এসেছে ততক্ষণে। ওয়েটার ওদের প্লেটে খাবার সার্ভ করে দিল। ওই সময়টা কেউ কোনো কথা বলল না। ওয়েটার চলে যাবার পর অমৃতা বলল, 'আপনার কি মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে?'

– 'সামির মায়ের তো খুব পছন্দ হয়েছে।' ভাত আর সবজি চিবোতে চিবোতে বললেন তিনি।

– 'আমি আপনার কথা জানতে চাইছি।'

হক অমৃতার চোখে চেয়ে স্মার্ট গলায় বললেন,'মেয়েটি শিক্ষিত। ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ভাল। অপছন্দ করার তো কোনো কারণ নেই।'

– 'মেয়েটির বাবার নিশ্চয়ই অনেক টাকা?'

– 'এটা কেন জানতে চাইছ?' হক সাহেবের চোখের দৃষ্টি সরু হয়ে আসল।

– ‘না মানে, আপনি নিশ্চয়ই সম্পদশালী হওয়াটাকে একটা যোগ্যতা বলে মনে করেন?

হক খাওয়া থামিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে খানিক ক্ষণ। তারপর একটু কেটে কেটে বললেন,

– ‘ধনবান হওয়াটা কোনো যোগ্যতা কিনা জানিনা তবে আমি নিশ্চয়ই চাইব এমন একটি পরিবারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে যারা কিনা আমার সোসাইটিতে বিলং করে। সামাজিক মর্যাদা বলে তো একটা কথা আছে।’

অমৃতা খেতে খেতে চোখা ভাবে বলল, ‘এইসব সমাজ টমাজ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেন না আপনি তাইনা? সামি যদি কোন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েকে পছন্দ করত, তাহলে কী করতেন? মেনে নিতেন?’

হকের কাছে প্রসঙ্গটা ভাল লাগছিলনা। এই মেয়েটি নিতান্তই বাচ্চা। সে এখনো বুঝে ওঠেনি যে আবেগ দিয়ে জীবন চলেনা। আজকের পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে আবেগ টাবেগ সব বিসর্জন দিয়ে তারপরেই যুদ্ধে নামতে হয়। তিনি অনেক অল্প বয়স থেকে টাকার পেছনে ছুটছেন, সাফল্যের পেছনে ছুটছেন। আজকে যা কিছু তিনি অর্জন করেছেন তা রক্ত জল করা পরিশ্রমের বিনিময়ে এসেছে, এমনি এমনি আসেনি। তাই এতো কষ্টের বিনময়ে অর্জিত অর্থবিত্ত আর খ্যাতির কী মূল্য বা ওজন তা এই অল্পবয়সী মেয়েটি কিছুতেই বুঝবেনা। তিনি প্রসঙ্গ পাল্টাবার নিমিত্তে একটু লঘু গলায় বললেন, ‘তোমার কি কোন কারণে মন খারাপ? একটু আপসেট দেখাচ্ছে তোমাকে।’

অমৃতা ভেতরে ভেতরে চমকে উঠল। কী আশ্চর্য! এই একটা মাত্র প্রশ্ন শোনার জন্য তার মনটা অনেক অনেক ক্ষণ ধরে তৃষ্ণার্ত হয়ে ছিল। মন খারাপের সময় গুলোতে কেবলই মনে হয় পাশে বসে থাকা আপন মানুষটি একবার অন্তত প্রশ্ন করুক, তোমার কি মন খারাপ? প্রশ্নটা ওষুধের মতো কাজ করে। শোনা মাত্র অনেকখানি কষ্ট লাঘব হয়ে যায়।

অমৃতার আজ সকাল থেকেই মন খারাপ। কিন্তু চোখ মুখ দেখে সেই মন খারাপ আঁচ করে ফেলার মত কোন আপন মানুষ তার পাশে ছিল না সারাদিন। সামনে বসা মানুষটা তার কাছের কেউ নয়। কিন্তু অসম্ভব প্রিয় একজন মানুষ। তাই এই প্রিয় মানুষটার মুখ থেকে যখন বিশেষ ঔষধি প্রশ্নটা শুনতে পেল, তখন তার মনের জানলা দরজা গুলি আপনা আপনি খুলে গেল। এক ঝাপটা হিমেল বাতাস মুহূর্তের মাঝে ছুটে এসে ছুঁয়ে গেল তার অন্তরের অন্তর্দেশ।

সে নরম চোখে তাকাল লোকটার দিকে, 'সকাল থেকেই মন খারাপ।'

– 'কেন?'

অমৃতা কিছু বলল না। চেয়েই রইল।

– 'মন খারাপের কারণটা কি আমাকে বলা যাবে?'

– 'আচ্ছা, আপনার কি কখনো একা একা লাগে?'

হক বেশ একটু অবাক হলেন প্রশ্নটা শুনে। তার মনে পড়েনা এমন অর্থহীন প্রশ্ন শেষ বার তাঁকে কে কবে করেছে। তার এই সীমাহীন ব্যস্ত জীবনে একা একা

লাগলেও সেই একাকীত্বকে খুব বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেবার সময় আছে নাকি? তিনি তো এখন পুরোপুরি মানুষ নন। মানুষ কম যন্ত্র বেশি। যন্ত্রদের কি কখনো একা লাগে?

তিনি বললেন, 'প্রতিটি মানুষই একা! তবে একা একা লাগার বয়সটা আমি অনেক আগে পার করে এসেছি।'

– 'ধুর, সব সময় ওরকম মুরুব্বিদের মতো কথা বলবেন না তো! একা লাগার আবার বয়স আছে নাকি?'

– 'আমি তো মুরুব্বিই।'

– 'মুরুব্বি না ছাই, আপনি আমার বন্ধু। ভুলে গেছেন?'

এই অসম্ভব অবাস্তব কথাটা শুনে হক না হেসে থাকতে পারলেন না।

– 'হাসছেন কেন?'

– 'বন্ধুর বাবার সাথে কখনো বন্ধুত্ব করা যায়?

– 'কেন যাবেনা? এইতো করে ফেললাম।' অমৃতাও হাসছে এখন। তার মনের মেঘ কেটে গেছে।

– 'তুমি বেশ পাগল আছ।'

– 'পাগল ছাড়া দুনিয়া চলেনা। বলুন না, আপনার কি কখনো একা লাগে?'

– 'চান্স কোথায়? সারাদিন ব্যস্ত থাকি। একা লাগার অবকাশ নেই তো!'

– 'আপনার কখনো মন খারাপ হয়?'

– 'প্রায়ই হয়।'

– ‘মন খারাপ হলে আপনি কী করেন?’

– ‘খুব মজার একটা কাজ করি।’ মুচকি হাসি হেসে বললেন তিনি।

-‘কী কাজ?’

– ‘মন খারাপ হলেই আমি খাঁচা বন্দি পাখি কিনে আনি। তারপর পাখি গুলোকে একে একে আকাশে উড়িয়ে দিই। বন্দি পাখিগুলি মুক্ত হয়ে আকাশে উড়ে যাবার সাথে সাথে আমার মনটাও ভালো যায়।’

– ‘তাই?’ গালে হাত রেখে মুগ্ধ চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে অমৃতা।

– ‘হ্যাঁ তাই। তুমি ট্রাই করে দেখতে পারো। কথা দিচ্ছি, মন ভালো হয়ে যাবে। পাখির জায়গা হচ্ছে খোলা আকাশে। পাখি কেন খাঁচা বন্দি থাকবে? আমার সামর্থ্য থাকলে পৃথিবীর সব খাঁচা বন্দি পাখিকে মুক্তি দিয়ে দিতাম।’

– ‘দারুণ তো ব্যাপারটা!’

– ‘হুম। এর পেছনে অবশ্য একটা গল্প আছে। আমার চাচা একবার একদম বাচ্চা একটা পাখিকে ধরে নিয়ে আসলেন কোত্থেকে যেন। পাখিটা তখনো উড়তে শেখেনি। সেই উড়তে না পারা সদ্য জন্মানো পাখিটির জীবন শুরু হল খাঁচার মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই উড়তে শিখলোনা পাখিটা। একে একে কেটে গেলো দশটি বছর। সেই খাঁচার ভিতরেই পাখিটি মৃত্যু বরণ করল। তুমি চিন্তা করতে পারো একটি পাখি তার সারা জীবনে একটাবারের জন্যেও আকাশে উড়তে পারল না! এই অপরাধ কি ক্ষমা করা যায়? সেই ঘটনাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এরপর থেকে আমি রাস্তা ঘাটে খাঁচা বন্দি পাখি দেখলেই কিনে ফেলি। তারপর উড়িয়ে দেই খোলা আকাশে। মনটা ভালো হয়ে যায়।’

– ‘ওয়াও!’ এই একটা শব্দ পিছলে আসল অমৃতার মুখ দিয়ে, অনেকক্ষণ পর।

– ‘তোমার মন খারাপ হলে তুমি কী কর?’

– ‘দৌড়াই।’

– ‘হ্যাঁ?’

– ‘দৌড়াই, খুব দৌড়াই।’

– ‘কোথায়?’

– ‘রাস্তায়। লেকের ধারে।’

– ‘এতে মন ভালো হয়ে যায়?’

– ‘হ্যাঁ ভালো হয়ে যায়।’

– ‘গুড।’

– ‘আপনি ওয়ার্ক আউট করেন?’

– ‘নাহ, সময় কোথায়?’

– ‘করেন না? কিন্তু আপনি তো বেশ ফিট! কীভাবে সম্ভব?’

– ‘নিয়ম মেনে চলি। হেলদি খাওয়া দাওয়া করি। হয়তো এ কারণেই।’ একটু থেমে হক জরুরি গলায় বললেন, ‘শোনো অমৃতা, সামিকে বল বাড়ি ফিরে আসতে। তোমার উপর এই দায়িত্বটা দিলাম। কেমন?’

– ‘আমি বললে হবেনা। আপনি বলুন।’

– ‘আমি বলেছি অলরেডি।’

– ‘আবার বলুন। আমরাও বলব।’

– ‘এই সপ্তাহের মধ্যেই ছেলেকে আমি বাড়িতে ফেরত পেতে চাই।’

– ‘আমার কী করার আছে এখানে?’

– ‘তুমি তোমার বন্ধুকে বোঝাও।’

আকাশ বাড়ি ফিরলো বিকেল চারটায়। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তারা বলল, ‘ভাইয়া আপনি কি খেয়ে এসেছেন?’

– ‘না, খাইনি তো! কেন?’

তারা এ প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলল না। মুখটা একটু নিচু করে অন্যদিকে সরে গেলো। ডাইনিং রুমে ঝুমকি বসে ছিল। আকাশ লক্ষ্য করল অন্যান্য দিনের মতো আজকে টেবিলের ওপর খাবার বাড়া নেই। শুধু দুটা পাউরুটির টুকরো পড়ে আছে।

‘আপনারা খেয়েছেন?’ আকাশের প্রশ্ন ঝুমকির উদ্দেশ্যে।

ঝুমকি থমথমে মুখে বলল, ‘বাড়িতে তো কোন বাজার নেই, তোমার আব্বা বাজার করার নাম করে সকালে বের হল বাসা থেকে, এরপর তো হাওয়া। একটু আগে ফোন দিলাম, বলল বারে গিয়ে মদ গিলছে। বাজার টাজার করতে পারবেনা।’

দুটো মানুষ সকাল থেকে অভুক্ত অবস্থায় আছে এটা চিন্তা করে ভীষণ খারাপ লাগল আকাশের। তার উচিত ছিল খেয়াল করে গতকাল সন্ধ্যায় বাজারটা করে রাখা। পিতৃদেব আজকাল কোন দায়িত্বই ঠিকঠাক পালন করেন না। ওই লোকটা তার জীবনে থাকা আর না থাকা একই কথা। সংসারের বোঝাটা না চাইতেও তার ঘাড়ে চেপে গেছে। এখন এই বোঝা হাজার চাইলেও সে ঘাড় থেকে নামাতে পারবেনা অত সহজে। সেদিন রাতে ঝুমকি বাসা ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল। আকাশ যেতে দেয়নি। একজন অসহায় মহিলাকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে শেষ মেষ তার বিবেকে বেঁধেছে। ওই বিবেকের বশবর্তী হয়েই আকাশের আজ নিজের কান্ডজ্ঞানহীন, মাতাল, লম্পট বাবার বিবাহিত স্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে বিবেক টিবেক সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে খুব স্বার্থপর হতে মন চায় তার। সে ফ্যাকাশে মুখে বলল, ‘সরি আমার একদম মাথায় ছিল না বাজারের ব্যাপারটা। ভুলে গিয়েছিলাম।’

– 'আমাকে সরি বলার কিছু নেই, আমার না খেয়েও দিব্যি দিন কেটে যাবে। কিন্তু তুমি কী খাবে? সারাদিন পর এসেছ। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে খুব?'

আকাশ একটুক্ষণ কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, 'না আমি ঠিক আছি। চলুন আমরা বাইরে কোথাও গিয়ে খেয়ে আসি।'

ঝুমকি থমকালো। বলতে কী, তার পুরো জীবনে সে কোনো দিন বাড়ির বাইরে খেতে যায়নি। বিয়ে বাড়িতে খেয়েছে অসংখ্য বার কিন্তু রেস্তোরাঁয় গিয়ে টাকা খরচ করে খাওয়া হয়নি কখনো। তার যৌবন কেটেছে ভাইদের সংসারের ঘানি টানতে টানতে। ভাইদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলেও রেস্টুরেন্টে খেতে যাবার মতো শৌখিন মানসিকতা তাদের কখনও ছিল না। আজকাল ভাইয়ের বাচ্চা কাচ্চারা বায়না করলে তাদের মাঝে মাঝে রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ানো হয় বলে শুনেছে সে। কিন্তু এর আগে তাদের পরিবারে এই চলটা কখনো ছিলনা। বিয়ের পর তার দিন কেটেছে স্বামীর লাথি ঝাঁটা খেয়ে। বাইরে গিয়ে খাবার খাওয়ার মত বিলাসবহুল ব্যাপার স্যাপার সে ভাবতেই পারেনা।

একটু অপ্রস্তত গলায় বলল, 'তুমি যাও, গিয়ে খেয়ে এসো।'

– 'না, গেলে সবাই একসাথেই যাব। আসার সময় বাজার করে নিয়ে আসব। যা যা লাগবে আপনি নিজে দেখে কিনে নিলেন। আমার চেয়ে আপনিই ভালো বুঝবেন।'

ঝুমকিকে কেমন যেন বিব্রত দেখাতে লাগল। বাইরের দুনিয়াটার সাথে তার যোগাযোগ একেবারেই ক্ষীণ। গত সাত মাস ধরে সে এ বাড়ির বাইরে বেরোয়না।

প্রয়োজনও পড়েনা। লেখা পড়া তার জানা নেই খুব একটা হাতে টাকা পয়সাও থাকেনা যে অযথা বাইরে গিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ করবে। তাই অনেক অনেক দিন বাদে হঠাৎ বাইরে যাবার প্রস্তাবটা পেয়ে সে কেমন যেন বোকা বনে গেল।

আকাশ বলল, 'তৈরি হয়ে নিন। এখুনি বেরোবো।'

ঝুমকি একটু ভয়ে ভয়ে তাকাল আকাশের দিকে। সেদিনের পর থেকে ছেলেটা আশ্চর্যজনক ভাবে তার সাথে ভালো ব্যবহার করছে। যে ছেলে গত দশ বারো বছরে বোমা পড়লেও একটা কথা বলেনি তার সাথে, সেই ছেলে এখন কারণে অকারণে সেধে সেধে তার সাথে কথা বলছে।

আকাশ তাড়া দিয়ে উঠে বলল, 'কী হল? বসে আছেন কেন?'

তারা রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। আকাশ ওকে বলল, 'তুমিও চল!'

– 'আজকে কি কোনও বিশেষ দিন?'

– 'না কোনো বিশেষ দিন নয়।'

– 'হঠাৎ ট্রিট দিচ্ছেন?'

– 'বাড়িতে খাবার নেই বলে।'

– 'আপনারা যান। আমার পড়তে হবে। এক্সাম আছে।'

– ‘কী পরীক্ষা তোমার?’

– ‘অনার্স ফাইনাল চলছে।’

– ‘কাল পরীক্ষা আছে?’

– ‘পরশু আছে।’

– ‘তাহলে চল। পড়ার সময় আছে অনেক।

– ‘না থাক’

–আরে মেয়ে! কথা শোনো না কেন? বড়দের কথা শুনতে হয়!’

সন্ধ্যের মুখে মুখে ওরা তিনজন বেরিয়ে পড়ল। ঝুমকির গায়ে সাদা রঙের এক বোরখা। সাদা রংটা অনেকটাই মলিন হয়ে গেছে। হলদে ছোপ ছোপ দাগ বেশ কয়েক জায়গায়। আকাশের মনে হল ঝুমকিকে এবার একটা নতুন বোরখা কিনে দেয়া দরকার। গত সাত আট বছর যাবত এই মহিলাকে সে একই বোরখা গায়ে দিয়ে আসতে দেখেছে। ওদিকে তারা একটা হালকা আকাশী রঙের জর্জেট সালওয়ার কামিজ পরেছিল। কিন্তু কামিজটা একেবারেই আধুনিক ডিজাইনের নয়। আকাশের বন্ধুরা কেউ এ ধরণের জামা পরেনা। তার মনে হল বিভা আর হৃদি তারার চাইতে আরও অনেক বেশি স্মার্ট, পরিপাটি এবং স্টাইলিশ। আর অমৃতার সাথে তো কারো তুলনাই হয়না। তারাকে সে এর আগে কখনো এমন নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করেনি, যেভাবে আজ করল। মেয়েটা অতি মাত্রায় সাধারণ। হ্যাঁ, হৃদির চাইতেও সাধারণ। লম্বাটে রোগা চেহারা। বড় দুটি চোখ আর ঠোঁটের নিচে একটি গাঢ় কালো তিল। রোগা ভাবটা না থাকলে মেয়েটিকে আরো অনেক বেশি সুন্দর দেখাতো বলে মনে হল আকাশের।

দুইটা রিকশা ভাড়া করে ওরা চলে আসল স্টার হোটেলে। ঝুমকির ভালো লাগছিল। তার ভীষণ রকমের এই একঘেয়ে জীবনটাতে আজ একটু অন্য রকম কিছু ঘটল অন্তত। ভালো লাগছিল আকাশেরও। টানা পোড়েনের মধ্যবিত্ত জীবনে আসলে ভালো লাগানোর জন্য খুব বেশি টাকাপয়সার প্রয়োজন হয়না, প্রয়োজন শুধু একটু আন্তরিকতার। কাচ্চি বিরিয়ানি খেতে খেতে তারার সাথে আড্ডাটাও খুব জমে গেল। আকাশ ওর বন্ধুদের গল্পই বেশি করছিল। তারা একসময় আকুল হয়ে বলে উঠল, 'আকাশ ভাইয়া, আপনার বন্ধুদের খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। কবে দেখা করাবেন?'

– 'হবে হবে, সামনেই সামির এনগেজমেন্ট। তোমাদেরকে ওর এনগেজমেন্টে নিয়ে যাব। তখন সবার সাথে দেখা হয়ে যাবে।'

বলে আকাশ হাসে। হাসে চোখ। সুন্দর দেখায়!

হক সাহেবকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে, মিতশুবিশি পাজেরো অমৃতাকে তার বাসায় ড্রপ করে দিল। চলে আসার সময় অমৃতা ড্রাইভারের সামনেই লাজ শরমের মাথা খেয়ে বলে ফেলল, 'আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

প্রশ্নটা শুনে অনেক বছরের পুরোনো ড্রাইভারের সামনে হক ব্রিত বোধ করলেন। খুব ছোট করে বললেন, 'দেখি।' এটুকু বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না। ওই ড্যাম কেয়ার ভাবটা অমৃতার বিরক্ত লাগল। সারা দিনের ভালো লাগাটা যেন ওই ক্ষুদ্র এক টুকরো উদ্ধত আচরণেই অনেক খানি লাঘব হয়ে গেল। বাসায় ফেরার পর অনেকক্ষণ অবধি তার আর কোন কাজেই মন বসল না। সবকিছু কেমন বিষণ্ন লাগছিল। এই বিষণ্নতার কোন কারণ নেই। আজ দুপুরেই লোকটার সাথে দেখা করে আসল। অথচ এই কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মনে হচ্ছে যেন কত বছর দেখা হয়না!

বিকেল পাঁচটার দিকে ডোর বেল বেজে উঠল। দরজা খুলল অমৃতা সিকিউরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে দুটি পাখির খাঁচা। প্রতি খাঁচায় এক জোড়া করে মুনিয়া পাখি। কিচির মিচির করছে পাখি গুলি অনবরত। গার্ড বলল, 'আপা, একজন লোক এসে এই পাখি গুলা দিয়ে গেছে আপনার জন্য।'

অমৃতা আনন্দে আটখানা হয়ে পাখির খাঁচা দুটি তুলে নিল হাতে। দৌড়ে চলে গেল ছাদে। তারপর খাঁচা থেকে ছোট্ট সুন্দর, ছটফটে পাখি গুলোকে বের করে এনে, একে একে উড়িয়ে দিল আকাশে। ডানা ঝাপটে উড়ে গেল পাখি গুলি, মিশে গেল শেষ বিকেলের আগুন রঙের আকাশে। অমৃতার মনে হল এতো সুন্দর দৃশ্য কোনদিন বুঝি দেখেনি সে! ভালো লাগতে লাগলো। ভীষণ ভালো!

৩১

সামির জন্য আজ একটি বিশেষ দিন। বিশেষ হবার কারণ দুটি। প্রথম কারণ হল আজ তানিশার সাথে বন্ধুদের দেখা হবে। দ্বিতীয় কারণটি হল আজ রাতে সে দীর্ঘদিন পর বাড়িমুখো হবে। আজ তার বাবা মায়ের সাতাশতম বিবাহ বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে সন্ধ্যের পর বাড়িতে বেশ কিছু অতিথি আসবেন। অতিথিরা স্বাভাবিক ভাবেই বাড়ির একমাত্র ছেলের উপস্থিতি প্রত্যাশা করবেন। তাছাড়া বাবার সাথে সামির আর তো কোন বিরোধ নেই। যে বিরোধটুকু ছিল বাপ ব্যাটার মধ্যে, তা চুকে বুকে গেছে। তাই এখন বাড়ি ফিরে যেতে আর তেমন কোন আপত্তি নেই তার। ফিরে যাবে সে, নিজের বাবা মায়ের কাছে, পুরোনো জীবনের কাছে, অর্থবিত্ত আর প্রাচুর্যের কাছে। যার জন্য ছেড়েছিল এই সমস্ত কিছু, সেই মানুষটি তো দিব্যি আছে হেসে খেলে। এবার সামিও দেখিয়ে দেবে তাকে, ভালো থাকা কাকে বলে!

আজকের দিনে অবশ্য আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে তার বন্ধুদেরও দাওয়াত করা হয়েছে বাড়িতে। মা নিজে ফোন করে

সব বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। এমনকি বিভাকেও যেতে বলেছেন তিনি। প্রথমবারের মতো বাবা মা তার বন্ধুদেরকে এতটা সম্মান দেখাল। বাড়িতে সর্বদাই বন্ধুদের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু কখনোই পারিবারিক মিলনায়তনে তাদের জায়গা হয়নি। আজ বন্ধুদের প্রতি মায়ের এই মার্জিত এবং আন্তরিক আচরণ তাকে মুগ্ধ করছে। সকাল থেকে তাই মনটা ভরে আছে একদম! স্নিগ্ধ হয়ে আছে! সেই স্নিগ্ধতার সাথে আবার বিদ্যুতের মতো একটা চমক লেগে গেল তখন, যখন আচমকা তানিশা এসে হাজির হল তার দুপুরবেলার শুনশান একলা ফ্ল্যাটে। গালে শেভিং ফোম মেখে দাড়ি কামাচ্ছিল সে। আদুর গা, পরনে শুধু ছাই রঙের এক ট্রাউজার। রুদ্র গেছে অফিসে। সারা ঘরময় দস্যি ছেলের ন্যায় একা একা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভর দুপুরের চড়া রোদ্দুর। সামি গাল ভর্তি শেভিং ফোম আর আদুর গা নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ডোর হোলে চোখ রেখে দেখল কে এসেছে। দেখা মাত্র স্নিগ্ধতায় মাখামাখি মনটায় এসে ধাক্কা খেলো বিদ্যুতের মতো এক চনমনে চমক। মেয়েটি একটার পর একটা বেল দিয়ে যাচ্ছে। এখুনি দরজা না খুললে যেন সে দরজা ভেঙে ফেলবে। সামি আরেকবার চোখ রাখল ডোর হোলে। আসলেই কি তানিশা এসেছে?

দরজা খুলল সে। হ্যাঁ, মূর্তিমানই বটে! সামির সাদা ফেনাওয়ালা মুখখানা দেখে হতভম্ব মূর্তিটা অবাক গলায় বলল, ‘এই অবস্থা কেন?

তানিশা একটা হালকা নীল রঙের গাউন পরেছে। তার ছিপছিপে দেহের সাথে গাউনটা লেগে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। মুখে হালকা প্রসাধন। রং করা চুল ছড়িয়ে আছে পিঠময়। গা থেকে ভুরভুর করে উড়ে আসছে দামি পারফিউমের ঘ্রাণ। পায়ে হাই হিল জুতো। তার রূপ বড়ই উত্তপ্ত এবং উত্তেজক। হাঁটার ভঙ্গিটি ভারী ছন্দময়। প্রতিটি দেহভঙ্গিতে তরঙ্গায়িত যৌবন প্রকট এবং প্রকাশ্য। সব মিলিয়ে চোখে ধাঁধা লেগে যায় একদম!

সামি দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘তুমি?’

– ‘হ্যাঁ আমি। ভেবেছিলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দেব, কিন্তু এখন তো উল্টা আমিই সারপ্রাইজড হয়ে গেলাম।’

তানিশা ওর হাই হিল জুতোয় টকটক আওয়াজ তুলে ঢুকল ঘরের ভেতর।

সামি বলল, ‘তুমি একটু বসো। আমি আসছি।’

– ‘এখানে বসে থাকতে হবে? তোমার ঘরে যাওয়া বারণ?’

সামি অপ্রতিভ ভাবে বলল, ‘না না, বারণ কেন হবে? তুমি চাইলে আসতে পার।’

তানিশা হাই হিলে টুকটুক শব্দ তুলে সামির পেছন পেছন হেঁটে আসল বেডরুমে। ঘরের অবস্থা যা তা। বিছানার চাদর কুঁচকে আছে। কম্বল পড়ে আছে মেঝেতে। টেবিলের ওপর দুনিয়ার হাবিজাবি জিনিস। একটা আধ খাওয়া কোকের ক্যান উল্টো হয়ে পড়ে আছে পড়ার টেবিলের ওপর। ক্যানের ভেতর থেকে পানীয় গড়িয়ে পড়ে ভেসে গেছে টেবিল। ভিজে গেছে বইপত্র, প্রয়োজনীয় চিঠির খাম, মোবাইলের চার্জার। ঘরের এই বেহাল অবস্থা দেখামাত্র তানিশা ভ্রু কুঁচকে বলল, ‘এটা তোমার ঘর?’

– ‘হ্যাঁ এটাই আমার ঘর।’ সামি বাথরুমে ঢুকে দরজা দেয়ার আগে ছোট করে বলে গেল। মিনিট পনেরো পরে, গোসল সেরে বেরোনোর পর দেখলো তানিশা কুঁচকানো চাদরের ওপর দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে আরামসে মোবাইল টিপছে মনোযোগ

দিয়ে। ঘরের কোন জিনিস সে এদিক সেদিক করেনি। সব আগের মতই আছে। হৃদি হলে কিন্তু এতক্ষণে সব গুছিয়ে ফেলত। সামি গোসল সেরে বেরোনো মাত্র চোখের সামনে আবিষ্কার করত পরিচ্ছন্ন এক ঘর। হৃদি এই ফ্ল্যাটে আসলে সবকিছু একদম পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখে যায়। শুধু এই ঘর না, ড্রইং রুম থেকে শুরু করে রুদ্রর ঘর, রান্না ঘর, সব! এমন কি, সামির মনে হল, অমৃতা থাকলেও এতক্ষণে বিছানার চাদরটা অন্তত টান টান করে রাখত। কোকের ক্যান থেকে টেবিলে গড়িয়ে পড়া তরল পদার্থটুকু মুছে নিত। কিন্তু তানিশা এলোমেলো ঘরের মাঝেই রাজরাণী হয়ে বসে আছে। মেয়েরা এত অগোছালো হলে একটু কেমন যেন লাগে!

সামি তোয়ালে দিয়ে ওর কোঁকড়া চুল গুলো মুছতে মুছতে বলল, ‘চা কফি কিছু খাবে?’

সামির পরনে একটা সাদা টিশার্ট আর কালো ট্রাউজার ছিল। দাড়ি কমানোর পর তার ফর্সা গাল আরো বেশি ফর্সা লাগছে। আফটার শেভের ঘ্রাণে ম ম করছে চারপাশ। তানিশা ওর কান্তিময় মুখখানার দিকে কিছুক্ষণ অপলক চেয়ে থেকে বলল, ‘তুমি কি আজ তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাবে?’

– ‘মে বি।’

– ‘তোমার মা আমাকেও ইনভাইট করেছেন। আজকের পার্টিতে।’

– ‘গ্রেট!’

সামি তোয়ালেটা চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রেখে আয়নার সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করছিল হাত দিয়ে। তানিশা সন্তর্পণে ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি ভালোই

লম্বা। তার উপর যুক্ত হয়েছে হাইহিল জুতো। তার উচ্চতা এখন সামির গলা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

– 'আমি যে তোমাকে সারপ্রাইজ দিলাম, তুমি খুশি হওনি?'

সামি ঘুরে দাঁড়িয়ে তানিশার চোখে চোখ রেখে বলল, 'খুশি হবোনা কেন?' তানিশা আরো এক পা এগিয়ে আসল সামির কাছে। দুহাত বাড়িয়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে লাস্যময়ী হাসি হেসে বলল, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না খুশি হয়েছ।'

মেয়েটি কাছে আসতেই সামি তার ধমনী দিয়ে বয়ে যাওয়া রক্তে একটা উষ্ণ উচ্ছ্বাস টের পেলো। সে তানিশার কৃশকায়, বঙ্কিম ঢেউ যুক্ত কোমর খানিতে একটি হাত রেখে আলতো ভাবে বলল, 'খুশি হয়েছি।'

কথাটা বলা শেষ করে সামি মাথা নত করে তানিশার লিপস্টিক দেয়া ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে থেমে যেতে হল মাঝপথে। রোদ ডোবা ওই ফকফকা দুপুর বেলায়, সুন্দরী হবু স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ তার চোখের সামনেটা কেমন সন্ধ্যার মত আবছা হয়ে আসল। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল সেই আশ্চর্য সন্ধ্যাবেলা, ভেসে উঠল সেই শাড়ি পরা, চুল খোলা অপরিচিতা মেয়েটার আবছা অবয়ব। ঠোঁটে ফিরে আসল সেই অলৌকিক চুম্বনের স্বাদ!

আচ্ছা, তার কি কোন অসুখ করেছে? ভয়ংকর কোন অসুখ?

সামিকে অমন পাথরের মতো থমকে যেতে দেখে তানিশা অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল, ‘কী হল তোমার?’

সামির চোখের তারায় তখন সন্ধ্যা!... চোখের তারায় কুয়াশা!... চোখের তারায় শাড়ি!..., খোলা চুল, খুব চেনা আবার চির অচেনা রহস্যময়ী এক নারী···, যে নারীকে সে কখনো চোখ মেলে দেখেনি কিন্তু অনুভব করেছে তার সমস্তটা দিয়ে!

তানিশার বাহু বন্ধন থেকে নিজের গলা ছাড়িয়ে নিয়ে স্তিমিত গলায় বলল, ‘আজ থাক।’

তানিশার মুখে একটা গনগনে ভাব ফুটে উঠল চকিতে। তিরিক্ষি গলায় বলল,’হোয়াটস রঙ উইদ ইউ? ওই দিনও তুমি একই কথা বলেছিলে। আমাদের বাসায়। ক্যান ইউ রিকল?’

সামি নিশ্চুপ। মাথা নত

– ‘সিরিয়াসলি, প্রব্লেমটা কী তোমার? লিসেন, ইওর প্রব্লেম উইল নেভার গো এওয়ে আনটিল ইউ ডিল উইথ ইট। আমি জানতে চাই প্রব্লেমটা কি মেন্টাল নাকি ফিজিক্যাল? নাকি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনা?’

সামি হতাশ ভাবে বলল, ‘আমি তোমাকেই বিয়ে করতে চাই তানিশা! তুমি··· তুমি কি আমাকে একটু সময় দিতে পারবে?’

– ‘দুদিন পরে আমাদের এনগেজমেন্ট। এখন তুমি সময় চাইছ?’

সামি খুব বিচলিত ভাবে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল। হ্যাঁ তানিশা ঠিকই বলেছে সেদিনও হুবহু এরকম ঘটনাই ঘটেছিল তানিশাদের বাসায়। তানিশা কাছে আসতেই ডুয়ার্সের ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। তারপর হাত পায়ে নেমে আসল এক অসাড় ভাব। সব কিছু বিস্বাদ! সেদিনও তানিশাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে। এমন কি ডুয়ার্সে বিভাকে আদর করতে যাবার সময়ও এই একই কান্ড ঘটেছিল। এমন কেন হচ্ছে তার সাথে? এই অসুখ নিয়ে সে বেঁচে থাকবে কী করে?

সামি একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে তানিশার দিকে চাইল। নিজের সমস্ত চেতনাকে জড় করে সম্পূর্ণ ভাবে মনোনিবেশ করতে চাইল সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে। এই বাজে অসুখ থেকে তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে। যে করেই হোক! তানিশা হঠাৎ একটু বাঁকা ভাবে বলল, ‘তুমি কি তোমার এক্স গার্লফ্রেন্ডকে এখনো ভুলতে পারোনি?’

সামি সজোরে মাথা নেড়ে বলে, ‘আরে না, ওসব তো কবেই শেষ!

-’ তুমি কি আসলেই আমাকে বিয়ে করতে চাও?’

সামি এগিয়ে এসে তানিশার একটা হাত ধরল, অত্যন্ত নরম গলায় বলল, ‘খুব চাই। বিশ্বাস কর!’

– ‘বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে।’

– ‘ইচ্ছেটা পূরণ কর। প্লিজ!’

– ‘তোমার বন্ধুরা কি আজকে আমার সাথে মিট করবে?’

বন্ধুদের প্রসঙ্গ উঠতেই সামির চোখের তারা একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দে চিকচিক করে উঠল। সে ব্যস্ত ভাবে বলল, ‘হ্যাঁ, বিকেল পাঁচটায় ওদের আসার কথা।’

– ‘আমার ফ্রেন্ডসরাও আসবে। কোথায় আসতে বলব ওদের?’

– ‘এখানেই আসতে বল। রাতে তো সবাই আমাদের বাসায়ই যাচ্ছি একসাথে যাওয়া যাবে।’

.

বন্ধুরা আসল ঠিক সন্ধ্যে নামার আগে। আজ তানিশার সাথে প্রথমবারের মতো দেখা হবে বলে হৃদি আর বিভা বেশ একটু সাজগোজ করেছে। বিভার মধ্যে গ্ল্যামার ব্যাপারটা খুব প্রত্যক্ষ ভাবেই আছে। ওর সাজসজ্জায় সর্বদাই একটা জাঁকজমক লেগে থাকে। অন্যদিকে হৃদি যতই সাজুক না কেন লাক্সারি বা জাঁকজমক জিনিসটা তার মাঝে কখনোই আসেনা। একটু কেমন মোলায়েম আর কোমল ওর সৌন্দর্যটা। চট করে চোখে ধরা পড়েনা। কিন্তু সময় নিয়ে ওই মুখটার দিকে চাইলে ওর মসৃণ সৌন্দর্যটা সারাটা মনে হাওয়াই মিঠাইয়ের মিষ্টতার মতো লেগে থাকে, অনেকক্ষণ!

বিভা একটা সি গ্রীন কালারের টপ আর লং স্কার্ট পরেছিল। তার টপটা কিন্তু বেশ দামী। বেছে বেছে সবচাইতে দামি কাপড়টাই আজকে পরে এসেছে। জামার সাথে রং মিলিয়ে গলায় একটা স্টোনের পেন্ডেন্ট পরেছে। চোখ সাজিয়েছে যত্ন করে।

কোন দিক দিয়েই যেন তাকে তানিশার চেয়ে কম সুন্দর না লাগে সেই প্রচেষ্টা সে ষোলো আনাই করেছে। লাগছিলোও তাকে সব চাইতে সুন্দর। হ্যাঁ, বিভা প্রকৃত অর্থেই সুন্দরী। সেই সত্যটা সামি অনুভব করল তখন, যখন বিভা ওর সমুদ্র সবুজ সাজ নিয়ে টিউব লাইটের সাদা আলোর নিচে তানিশার সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। বিভার ওই মোহনীয় রূপের কাছে ধনীর দুলালি, স্টাইলিশ, স্মার্ট তানিশাও হঠাৎ ফুঁস করে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

হৃদি একটা পেঁয়াজ রঙের কুর্তা পরেছিল সাদা ডিভাইডারের সাথে। কানে মুক্তোর দুল। সাজেনি খুব একটা। শুধু চোখ ভর্তি করে কাজল দিয়েছে। কিন্তু তার কাজল কালো চক্ষু জোড়া গোঁড়াতেই এক রকম গলদ বাঁধিয়ে দিচ্ছিল। ফ্ল্যাটে ঢোকার সাথে সাথে তানিশা নামের মেয়েটা বলল, 'ফাইনালি, তোমরা এসেই গেলে। আমি সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি তোমাদের জন্য।

টং করে বুকে বাড়ি খেল কথাটা। দুপুর থেকে? এই ফ্ল্যাটে তো সারাদিন শুধু সামি ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। এর মানে মেয়েটা সামির সাথে এতটা সময় একদম একলা একলা ছিল? চিন্তাটা মাথায় খেলতেই হৃদির চোখ কেমন ঝাপসা হয়ে আসছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। কান্না করলেই কাজল যাবে লেপ্টে। আজকের দিনে অন্তত লেপ্টে যাওয়া কাজল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে চায়না সে।

তানিশার সাথে বন্ধুদের পরিচয় পর্ব শেষ হতে না হতেই তানিশার তিন বন্ধু এসে হাজির হল। দুজন মেয়ে, একজন ছেলে। মেয়ে দুজনের সাজসজ্জা চোখ ধাঁধানো। আঁটোসাঁটো লো কাট পোশাক, গাঢ় লিপস্টিক, রিপড জিন্স! রুদ্র আর আকাশ একদম আনন্দে বাক বাকুম হয়ে গেল মেয়েদুটোকে দেখে। তাদের চোখে মুখে ঈদের খুশি ঝিলমিল করতে লাগল। তারা মুগ্ধ, আপ্লুত এবং কৃতজ্ঞ!

তানিশার ছেলে বন্ধুটি চশমা পরা লাজুক চেহারার যুবক। চেহারা লাজুক হলে কী হবে, কথা বলা শুরু করার পর বোঝা গেলো সে বেশ সপ্রতিভ। ড্রইং রুমেই বসেছিল সবাই। তানিশা আর সামি একটি গদিতে পাশাপাশি বসেছে। তানিশা সামির হাত ধরে আছে। দুজনে বসেছে খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে। দৃশ্যটা হজম করতে কষ্ট হচ্ছিল হৃদির। বিভাও তানিশা মেয়েটাকে এক রত্তি পছন্দ করতে পারছেনা। মেয়েটার মধ্যে একটা লোক দেখানো ভাব আছে। বোঝাই যাচ্ছে সামির সাথে ঢলাঢলিটা সে ইচ্ছাকৃত ভাবে করছে। বিভাকে দেখাচ্ছে যে, তোমার এক্স এখন আমার হাতের মুঠোয়!

হৃদি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা কী খাবে? চা নাকি কফি?'

তানিশা কটাক্ষ করে বলল, 'তুমি কোথায় চললে? এটা কি তোমার বাসা নাকি?'

প্রশ্নটা অনাকাঙ্ক্ষিত, রুক্ষ এবং অপমানজনক। হৃদি প্রশ্নটা শুনে একদম স্তম্ভিত হয়ে গেল। সামিকেও বেশ বিচলিত দেখাল। সে বুঝতে পারছে তার কিছু একটা বলা উচিৎ এ মুহূর্তে কিন্তু মাথায় কোন শব্দ আসছেনা। উত্তরটা দিল অমৃতা। পরিষ্কার গলায় বলল, 'বন্ধুর বাসা তো নিজের বাসাই। বন্ধু কি পর নাকি?'

কথাটা বলা শেষ করে অমৃতা হৃদির হাত ধরে টেনে নিয়ে আসল পাশের ঘরে। বিভাও বসে থাকল না। দুই সখীর পেছন পেছন এগিয়ে গেল। এদিকে আকাশ আর রুদ্র মেয়েদুটির সাথে বেশ ভালোই জমিয়ে দিয়েছে। ছেলেটিও খুব কথা বলছিল। কিন্তু মেয়েদুটির প্রতি আকাশ, রুদ্রর অভিনিবেশ ছিল বেশ প্রকাশ্য এবং বিকশিত।

রান্না ঘরে এসে হৃদি গজগজ করতে করতে বলল, 'অসহ্য রকমের পাবলিক কতগুলা। বিরক্তিকর!'

বিভার রাগও নিছক কম নয়। চাপা গর্জন করে সে বলে উঠল, ‘এই বেটি তো পুরাই ডাইনি একটা। ভাব দেখে মনে হইতেছে সামির কোলে উইঠা যাবে পারলে। অসম্ভব! সামির পাশে আমি কিছুতেই একে সহ্য করতে পারবোনা। এতো কিসের ঘেঁষাঘেঁষি?’

অমৃতা হেসে বলল, তোরা এতো হিংসুটে কেন? দুইদিন পরে ওদের বিয়ে হবে। এখন ঘেঁষাঘেঁষি করবেনা তো কখন করবে?’

অমৃতার কথায় হৃদির মন নরম হল না। রাগে আর অপমানে তার কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকে এখানে না আসলেই ভালো হত। শুধু শুধু এসেছে মরতে!

হাতে চা সমেত ট্রে নিয়ে ওরা তিনজন আসল ডাইনিং রুমে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল মেয়ে দুটি রুদ্র আর আকাশের সাথে আলাদা ভাবে বসে আছে। গল্পে মশগুল প্রত্যেকেই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে বসার ঘরে এখন তিনটি জুটি উপস্থিত। সামি-তানিশা, রুদ্র -তানিশার বান্ধবী, আকাশ- তানিশার বান্ধবী। তাদের সাথে একটি মাত্র নিঃসঙ্গ যুবক। যে কিনা মনোযোগের সাথে টিভি দেখছে। গোটা দৃশ্যটা দেখতে পেয়ে রাগে গ তিন বান্ধবীর পিত্তি জ্বলে খাঁক হয়ে যাবার উপক্রম হল।

বিভা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘আকাশ আর রুদ্ররে দেখছিস? কেমন ক্যালাইতেছে সেই তখন থেকে? মেয়ে দেখে আমাদেরকে ভুইলাই গেছে। মানে একদম লুইচ্চা দি গ্রেট!’

অমৃতা বলল, ‘আসলেই, মানে প্রব্লেম কী এদের? এমন হে হে করতেছে কেন মাইয়া গুলারে দেখার পর থেকে?’

বিভা চক্রান্তকারীর গলায় বলল, ‘দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা! সব গুলার প্রেম বের করতেছি।

-‘কী করবি?’

– ‘কী আর করব? ডিস্টার্ব করব। যাতে প্রেম করতে না পারে।’

কথাটা বলা শেষ করেই সে চট করে দুই ঘরের মাঝখানের পর্দাটা সরিয়ে দিল হাত দিয়ে। তারপর দ্রুত গতিতে ড্রইং রুমের মূল বাতি দিল নিভিয়ে। জ্বালালো হালকা সবুজ আলোর ডিম লাইট। উপস্থিত তিন জুটি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। এমন মধুর সময়ে বিরক্ত করার জন্য আকাশ মনে মনে একটা গালিও দিয়ে ফেলল বিভাকে। বিভা কারো দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে সাইড টেবিলের ওপর রাখা এলেক্সাকে উঁচু গলায় হুকুম করল গান চালিয়ে দিতে। তৎক্ষণাৎ সবুজ বাতি জ্বলে উঠল এলেক্সা নামক স্পীকারটার গায়ে। প্রথমে হুকুমকারীকে যান্ত্রিক গলায় উত্তর দিল সে, তারপর বাজাতে শুরু করল একটি ইংরেজি গান। বিভা হাত নেড়ে অমৃতা আর হৃদিকে ডেকে বলল, ‘দাঁড়ায় রইলি ক্যান? আয় নাচি।’

অমৃতা আর হৃদি সময় নষ্ট না করে বিভার কথা মতো কাজ করল। কার্পেটের উপর এসে নাচ শুরু করল হাত পা ছুঁড়ে। তানিশা বিস্মিত হয়ে সামিকে বলল, ‘ওদের কী হয়েছে? ওরা কি পাগল হয়ে গেছে?’

সামি তার বন্ধুদের পাগলামি দেখে অবাক হল না। এরা যে পাগল সেটা সবাই জানে। তানিশাও জানবে ধীরে ধীরে। সে কিছু না বলে চুপ করে রইল। রুদ্রর পাশে বসা মেয়েটির নাম জোয়ানা। জোয়ানার গায়ে একটি লো কাট, বড় গলার ব্লাউজ আর রিপড জিন্স। একটু ঝুঁকলেই তার বুকের অনেকখানি অংশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ফকফকা টিউব লাইটের আলোয় রুদ্র ওর বারংবার নানা বাহানায় ঝুঁকে কথা বলাটা উপভোগ করছিলো। বিভার বাচ্চি হঠাৎ এসে বাতি নিভিয়ে দিয়ে তার বিনোদন মাটি

করে দিল রেগেমেগে তাই মনে মনে সে বিভার চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে লাগল। জোয়ানা ভারী অবাক গলায় রুদ্রকে বলল, 'তোমার বান্ধবীদের কী হল হঠাৎ?'

রুদ্র স্বগতোক্তির মত বলল, 'মৃগী ব্যারাম হইছে মনে হয়।

জোয়ানা ঠিক ঠাক কথাটা শুনতে না পেয়ে প্রশ্ন করল, 'কী বললে?'

রুদ্র কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই বিভা ঝড়ো বাতাসের মত উড়ে এসে রুদ্রর হাত খামচে ধরে টেনে তুলল বসা থেকে। বলল, 'বইসা আছোস ক্যান? নাচতে আয়।'

মিনিটের মধ্যেই হৃদি টেনে নিয়ে আসল সামিকে আর অমৃতা আকাশকে। খানিক বাদে দেখা গেলো ওরা ছয় বন্ধুই দুনিয়াদারি ভুলে গিয়ে নাচে মত্ত হয়ে গেছে। অতিথিরা থ মারা চোখ মেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে সেই নাচ।

ডিম ডিম সবুজ আলোটায় একটু কেমন সন্ধ্যা সন্ধ্যা ভাব ছিল। সেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা আলোটায় খোলা চুলের হৃদির দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই, সামির অন্তরাত্মা আচমকা কেন যে অমন থরথর করে কেঁপে উঠল কে জানে! হৃদিকে এখন অনেকটা সেই মেয়েটার মত লাগছে। কী আশ্চর্য হৃদি তো তার বন্ধু! হৃদিকে সে ভালোবাসে ঠিক, কিন্তু সেই ভালোবাসায় কোন তরঙ্গ ছিলোনা কখনো। আজকে এই সবুজাভ ফিকে আলোয় হৃদিকে হঠাৎ অমন অচেনা মেয়ে বলে হচ্ছে কেন? তার নিজের ভেতরে কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

গানের ট্র্যাক বদলে গেছে। এলেক্সা তখন বাজাচ্ছিল, We got that Coca Cola bottle shape, shape, shape

জোয়ানাকে নাচের নেশায় পেয়ে গেছে। সে ড্যান্স ফ্লোরে এসে শরীর দুলিয়ে চমৎকার নাচ নাচতে লাগল। ওর নাচের দমকে সবাই চমকে গেল একদম। থম ধরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই উদ্দাম নৃত্য। রুদ্র আর আকাশ তো নাচ দেখে হা হয়ে গেছে। কী চমৎকার নাচের ভঙ্গি! কী ভীষণ এক্সপ্রেশন! নায়িকাদেরকেও হার মানায়!

সন্ধ্যা সাতটার সময় ওরা সবাই সামিদের বাসায় যাবার জন্য তৈরী হল। নিচে নামার পর দেখা গেল তানিশার বন্ধুদের প্রত্যেকের সাথে একটি করে প্রাইভেট কার আছে। অর্থাৎ চারজন মানুষের চারটা গাড়ি। এদিকে সামির বন্ধুদের কারো সাথে গাড়ি নেই। ওর এক মার্সিডিজ বেঞ্চই সবার ভরসা। তানিশা খোঁটা দেয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করল না। সে সবার সামনে চোখ কপালে তুলে মেকি গলায় বলল, ‘তোমার বন্ধুরা কেউ গাড়ি আনেনি?’

সামি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, ‘না!’

– ‘কেন? এতজন যাবে কিভাবে?’

রুদ্র হড়বড় করে বলল, ‘আমার গাড়ি নাই। আকাশ অমৃতারও গাড়ি নাই। হৃদি আর বিভার আছে। কিন্তু ওদের দুজনের বাবাই ভীষণ কিপটা গাড়ি দিতে চায়না।’

রুদ্রর কথা শুনে বিভার ইচ্ছে হল পায়ের স্যান্ডেলটা খুলে ছুঁড়ে মারে ওর মাথায়। বোকামির একটা সীমা থাকা উচিৎ! তানিশা আগের চাইতেও বেশি ন্যাকা গলায় বলে

উঠল, ‘অ··· এই অবস্থা? ইশ··· আমি তোমাদেরকে রাইড দিতে পারি। আমাদের সাথে চারটা গাড়ি।’

সামি বলল,’তোমার রাইড দিতে হবেনা। ওরা আমার সাথেই যেতে পারবে।’

– ‘একটা মাত্র গাড়িতে এতজন! সিরিয়াসলি?’

– ‘আমাদের অভ্যাস আছে।’ সামি বলল।

গাড়িতে উঠে বসল সবাই। শুধু অমৃতা উঠল না। বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, ‘সামি! দোস্ত আমার একটু বাসায় যাইতে হবে। বাবা ডাকতেছে, কী নাকি দরকার আছে।’

– ‘মানে কী? তুই যাবিনা আমার বাসায়?’ সামি অবাক।

– ‘না দোস্ত। আমাকে বাদ দে আজকে।’

সামি ম্লান গলায় বলল, ‘আজকে এতদিন পর আমি বাসায় যাচ্ছি। তুই আমার পাশে থাকবিনা?’

অমৃতা একটা বড় শ্বাস ফেলল। ওই লোকটার এনিভার্সারি সেলিব্রেট করার মতো কোন মন মানসিকতা যে এই মুহূর্তে অমৃতার নেই তা সামিকে কে বোঝাবে? শুধু সামি কেন, পৃথিবীর কোন মানুষকেই বোঝানো সম্ভব না। দায়টা শুধুই অমৃতার একার। একাই বইতে হবে আজীবন!

যা হবার হোক, সবার আগে বন্ধুত্ব! সামি তাকে পাশে চায়। এটাই মুখ্য, বাকি সব গৌণ! সে সামির করুণ মুখখানার দিকে চেয়ে ক্ষীণ গলায় বলল, ‘আচ্ছা যাচ্ছি, চল!’

ঢাকার উত্তরায় সামিদের প্রাসাদতুল্য বাড়িটি যেন এই ব্যস্ত নগরীর কোনও অংশ নয়। ওই অট্টালিকার দিকে আচমকা চোখ পড়লে মনে হয় এই মাত্র আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য হাতের করতলে করে প্রাসাদটি বয়ে এনে বসিয়ে দিয়েছে রাজধানীর বুকে। একটা সময় বন্ধুরা ঘন ঘন আসত এ বাড়িতে। কে কখন আসল আর গেল তা দেখার মতো উপায় বা সময় কোনটিই বাড়ির মালিক বা মালকিনের ছিল না। এ বাড়ির মনিবের সাথে রোজ অসংখ্য দর্শনার্থী আসে দেখা করতে নানা তদবিরে আর কাজে। সামির বন্ধুরা সেইসব গড়পড়তা দর্শনার্থীদের ভিড়েই মিশে ছিল আজীবন। বিশেষ কোন আপ্যায়ন তাদেরকে কখনো করা হয়নি।

আজকের দিনটি অবশ্য একটু অন্যরকম। কারুকার্য খচিত কালো রঙের দামি কাঠের তৈরি সদর দরজার সামনে, পোর্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার এবং মিসেস হক, তাদের একমাত্র পুত্রকে বরণ করার নিমিত্তে। গাড়িবারান্দার ঘাসযুক্ত মাটি থেকে শুরু করে শ্বেত পাথরে বাঁধানো চার ধাপের প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, পোর্চ পর্যন্ত। সেই সিঁড়ির ধাপে ধাপে সারি বেঁধে ফুল হাতে দাঁড়িয়ে আছে সামির নানা বয়সী কাজিনরা। আজ টানা নয়মাস পর এ বাড়ির একমাত্র অমূল্য মানিক রত্নটির গৃহপ্রবেশ ঘটবে। এটা কোনো যেন তেন ঘটনা না। বাবা মা দুজনেই এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চান। ছেলের ফিরে আসা উপলক্ষে আজ সকাল থেকে পাচঁজন মৌলবী ডেকে এনে, বাড়িতে কোরআন খতমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোরআন খতমের পর বিশেষ মোনাজাত করা হবে। অতএব আজকের উৎসবটি নাম কা ওয়াস্তেই হক এবং তাঁর স্ত্রীর বিবাহবার্ষিকী। আদতে আজ তাদের পুত্রের গৃহপ্রবেশ। তবে বিবাহ বার্ষিকীর জন্যে যে একেবারে কোন আয়োজন করা হয়নি তা কিন্তু নয়। বিশাল সাইজের এক কেক নিয়ে এসেছেন সামির ছোট খালা এবং খালু। নানা রকম উপহার সামগ্রী হাতে নিয়ে এর মাঝেই হাজির হয়েছেন কাছের আত্মীয় স্বজন থেকে

শুরু করে দূর পাল্লার নানা চেনা লোকজন। উচ্চ পদস্থ কিছু অফিসিয়াল লোকজনদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দলের বড় বড় নেতা কর্মীরা এসে হাজির হবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। পঞ্চাশ জনের ওপরে লোক খাবে আজ বাড়িতে। খাবার অর্ডার দেয়া হয়েছে বাইরে থেকে। বাড়িতে কিছুই রান্না করা হয়নি।

সামির গাড়ির পেছন পেছন আসছিল তানিশাদের তিন গাড়ি। সবগুলো গাড়ি লাইন ধরে এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনের ড্রাইভ ওয়েতে। কেয়ার টেকার সুলেমান দৌড়ে গিয়ে সামিকে বলল, 'ছোট সাহেব, আপনি নাইমা যান। ড্রাইভার গাড়ি রাখবে গ্যারেজে।'

অতএব আর কথা না বাড়িয়ে সামি নেমে আসল গাড়ি থেকে। নামল তার বন্ধুরাও। বিভার একটু অস্বস্তি লাগছিল। শেষবার এ বাড়িতে যখন এসেছিল তখন বুকের মধ্যে ছিল অন্যরকম এক স্বপ্ন। এখানেই শেষবারের মতো চুমু খেয়েছিল তাকে সামি। এই বাড়ির হল রুমে। গভীর রাতে! সেই রাতটার কথা মনে পড়লে আজও মেরুদণ্ডে একটা শিরশিরানি ভাব টের পায় সে। কষ্টের মতো কী যেন একটা খাবি খায় মনে। অথচ সব কিছুতো পাল্টে গেছে, তাইনা? তার জীবনে এখন অভিজিৎ আছে। সামির আছে অন্য কেউ। প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না। খালিঘর পূরণ করে দেয় কোনও না কোন উপায়ে। সামির বাবা মায়ের সামনে যেতে একটু সংকোচ হচ্ছে তার। তাদের কাছে তো কিছুই অজানা নেই। এতকিছুর পরেও বিভা নাচতে নাচতে চলে এসেছে সামির এনগেজমেন্ট খেতে, এ ব্যাপারটা তারা সহজ ভাবে নিচ্ছেন কি? তাঁরা তো বুঝবেন না যে বিভার কাছে প্রেমের চাইতেও বড় হল বন্ধুত্বটা। বন্ধুত্বের খাতিরে তাকে পুরোনো সব হৃদয়ঘটিত ইতিহাস ভুলে গিয়ে, সংকোচ গিলে ফেলে সামির পাশে থাকতে হবে, যে করেই হোক!

বাড়ির একমাত্র ছেলের গৃহপ্রবেশ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। ঢোকার সময় ওদের সবার মাথায় গাঁদা ফুলের পাঁপড়ি ছড়িয়ে দিয়েছে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেমেয়েরা। বাড়িতে ঢোকার পর সবাই মাথার চুলে আটকে থাকা সেই ফুলের পাঁপড়ি ঝেড়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে গেল। তানিশার আজ প্রথম আসা এ বাড়িতে। বাড়ির জাঁকজমক এবং আড়ম্বরপূর্ণ শোভা দেখে তার চোখ মুখ থেকে খুশি উপচে উপচে পড়ছে। সামির আম্মা আনন্দে আটখানা হয়ে তানিশাকে সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রথমেই। পরিচয় করিয়ে দিলেন সামির বন্ধুদেরকেও। এই প্রথমবারের মতো!

এ বাড়ির বৈঠকখানাটি বিশাল। ঢোকার মুখেই চোখে পড়ে দেয়ালজুড়ে বাঁধাই করা ভার্টিক্যাল গার্ডেন। নানারকম পাতাবাহার ঝুলে আছে সেই দেয়াল থেকে। এস্টোরিয়া গ্র্যান্ডের তিন সেট সোফা এঁটে গেছে অনায়াসে। ঘরের মাঝখানে কালো কাঠের কাজ করা লম্বাটে সেন্টার টেবিল। তার ওপর পোর্সেলিনের চমৎকার দুটি নীল রঙের ফুলদানি। ফুলদানির মাথা আলো করে উঁকি দিয়ে আছে এক গুচ্ছ তাজা লাল এবং সাদা গোলাপ। ঘরের পশ্চিম দিকে মেঝে থেকে সিলিং অবধি উঁচু হয়ে উঠে গেছে একটি বড়সড় কাচের দরজা। দরজায় ঝোলানো পর্দা সরালেই ওপাশের ফুলের বাগান দেখা যায়। বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লাল মাটির একটি নারী মূর্তি। সেই মূর্তি ঘিরে তৈরী হয়েছে জলের ফোয়ারা। দিনের বেলা এই ঘরটার সৌন্দর্য একদম অন্যরকম। আলোর বন্যায় ভেসে যায় চারপাশ। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সোফায় বসে নিভৃতে বাগানের ফুল আর জলের ফোয়ারা দেখতে দেখতে মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

এখন রাতের বেলার দৃশ্যটিও অবশ্য কম নজরকাড়া নয়। বাড়ির একমাত্র ছেলের এনগেজমেন্ট উপলক্ষে বাগানে লাইটিং করা হয়েছে। জলের ফোয়ারায় নানা রঙের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। স্ট্রিং লাইট ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে গাছের ডালে ডালে, ফুটে থাকা ফুলের গায়ে গায়ে।

বৈঠকখানা নানা বয়সী লোকজনে গিজগিজ করছে। এতো ভিড় ভালো লাগছিলোনা সামির। আজ অনেক দিন পর সে নিজের জায়াগায় ফিরলো। তার জন্ম হয়েছে এই বাড়িতে। সে সময় এটা নিতান্তই পুরোনো আমলের সাদামাটা এক বিল্ডিং ছিল। দাদা সাহেব বেঁচে ছিলেন তখন। এখানেই কেটেছে সামির শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের বেশ কিছু সময়। এতদিন পর নিজের একান্ত আপন ভুবনটিতে ফিরে এসে তার মনের ভেতরে ক্রমশ একটি পেলব, কোমল অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছিল। শান্তি আর স্বস্তির সাথে সমান তালে তাকে পেয়ে বসেছিল নস্টালজিয়ায়। দিন গুলো কী দ্রুত কেটে যাচ্ছে! বিরতিহীন ট্রেনের ন্যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সময়। তার মনে হচ্ছিল নিজের বাবা মায়ের মতো এই অনেক দিনের পুরোনো ইট, কাঠ, পাথরের বাড়িটিও বুঝি আজ তাকে ফিরে পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে আছে। এ বাড়িরও বুঝি প্রাণ আছে। হ্যাঁ সামি আজ এই ভরা মজলিশে একদম চুপচাপ বসে থেকে, সমগ্র চেতনা দিয়ে, এই বাসভবনটির প্রাণের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল।

– ‘সামি, বাবা বসে না থেকে তানিশাকে বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাও!’

মায়ের কথাটা তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটালো। কয়েক সেকেন্ড লেগে গেল তার কথাটা পুরোপুরি আত্মস্থ করতে। করার পর উঠে দাঁড়িয়ে তানিশাকে বলল,

বলল, ‘এসো আমার সাথে।’ একটু থেমে কী মনে করে যেন বন্ধুদের বলল, ‘তোরাও আয়।’

সামির আম্মা ফোড়ন কেটে বললেন, ‘ওরা কি এ বাড়িতে নতুন নাকি? তুমি তানিশা আর ওর বন্ধুদের নিয়ে যাও।’

আকাশ বলল, 'আমরা ঠিক আছি। তুই যা সমস্যা নাই।'

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সামি আবার ফেরত আসল। হেঁটে হেঁটে হৃদির সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই কি চার্জারটা আনছিলি?'

বসুন্ধরার ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার আগমুহূর্তে হৃদি, সামিকে মোবাইলের চার্জার সাথে নেয়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। সামি তবুও চার্জারটা সঙ্গে নেয়নি। হৃদি মনে করে ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল জিনিসটা। সামি জানতো যে, হৃদি নিবেই। তাই নিজে বয়ে নিয়ে আসার প্রয়োজন বোধ করেনি।

হৃদি তড়িঘড়ি করে করে ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে চার্জার বের করতে করতে বলল, 'নিজের জিনিস নিজে গুছায় রাখতে পারিস না? আমি না আনলে কী করতি এখন?'

সামি দায়সারা গলায় বলল, 'না আনলে মাইর দিতাম তোরে। আমি আনব কেন? তুই আছিস কীসের জন্য?'

তানিশা একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে সরু চোখে পুরো ঘটনাটা অবলোকন করল। সামি চার্জার হাতে নিয়ে ফিরে আসার পর সে আগুন গরম গলায় বলল, 'তোমার ফোনের চার্জার ওর কাছে কেন?'

সামি প্রশ্নটা শুনে চোখ মেলে তাকাল তানিশার দিকে। খুব স্বাভাবিক ভাবে বলল, 'ওর কাছে থাকবে না তো কার কাছে থাকবে?'

– ‘এটার মানে কী?’

– ‘মানে ও আমার ফ্রেন্ড!’

পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল ওরা। তানিশা এবার একটু উঁচু স্বরে বলল, ‘এতো ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড কর কেন সবসময়? ফ্রেন্ড কি আমাদের নাই? শুধু তোমার একারই ফ্রেন্ড আছে?’

প্রায় অনেকক্ষণ যাবৎ সামির মনের ভেতর একটা বিরক্তি ভাব বুদবুদের মতন ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিরক্তির কারণটা এতক্ষণ অস্পষ্ট থাকলেও এই মুহূর্তে তানিশার কথাটা শোনা মাত্র কেমন করে যেন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল। সে বুঝল বিরক্তির কারণ হল তানিশা। মেয়েটার কথাবার্তা আজকে দুপুর থেকেই বিরক্ত লাগছে তার। সিঁড়ির মাঝখানে থেমে পড়ে ঠান্ডা গলায় বলল,

– ‘তানিশা শোনো, একটা ব্যাপার তোমার জেনে রাখা উচিৎ যে, আমার বন্ধুরা একদিকে আর পৃথিবী অন্যদিকে। তাই এরপর থেকে আমার বন্ধুদের নিয়ে কিছু বলার আগে দশবার ভেবে নেবে।’

তানিশার মুখটা কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল কথাটা শুনতে পেয়ে। সামি আর কিছু না বলে ওপর তলায় উঠে আসল। তানিশা এবং তার বন্ধুদের ঘুরে ঘুরে দেখাল প্রতিটা ঘর, বারান্দা, মিউজিক প্যাড, জিম এবং ছাদের ওপরের সুইমিং পুল। কিন্তু তানিশার মুখ থেকে দুশ্চিন্তার ছাপটা সরছিল না। এক অবিদিত আশংকায় তার মনটা অস্থির হয়ে আছে।

ওরা নিচতলায় ফিরে আসার পর মৌলবী সাহেব মোনাজাত করলেন। অনেক সময় নিয়ে। মোনাজাতের পর শুরু হল কেক কাটার পালা। সামির আব্বা বরাবরের মতোই জানিয়ে দিয়েছেন কেক টেক তিনি কাটবেন না। এইসব আনুষ্ঠানিকতা তাঁর কখনোই পছন্দ না। অতএব বাবার হয়ে মায়ের সাথে কেক কাটবে সামি। বাবা দাঁড়িয়ে থাকবেন পাশে, কিন্তু কেকের ছুরিতে হাত লাগাবেন না। কেক কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাইরে লনে। সবুজ লনের ওপর টেবিল পেতে, সেই টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে তিন তলা কেক। কেকের চারপাশে ভিড় করে আছে নানা রকম স্ন্যাক্স এবং শীতকালীন পিঠা। চা কফিরও ব্যবস্থা আছে। স্ট্রিং লাইটের মনোরম আলোতে চারপাশ এখন বেশ ঝলমলে এবং রোমান্টিক। হালকা সুরে মিউজিক বাজছে। সন্ধ্যে নামার পর শীতটাও জমেছে বেশ। জালের মত সাদা কুয়াশা আটকে আছে শূন্যে। সব মিলিয়ে বেশ ভালো লাগার মত এক পরিবেশ। লনে ভিড় করেছে প্রায় জনা পঞ্চাশেক মানুষ। কেউ বসে আছে চেয়ারে, কেউ দাঁড়িয়ে। বন্ধুরা ভিড় থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে বসেছে। ঘাসের ওপর চেয়ার পেতে, গোল হয়ে।

সামি তার বাবা মায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিল। টেবিলের চারপাশে অতিথিরা জড়ো হয়ে আছে। হরেক লোকের ভিড়ের মাঝে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল অমৃতা। গায়ে একটা ধূসর রঙের শাল জড়িয়ে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছেন ছেলের পাশে। লোকটার স্ত্রী সেজেছেন খুব। একেবারে বিয়ে বাড়ির সাজ।

আকাশ, অমৃতা পাশাপাশি বসেছিল। ওদের মুখোমুখি বসেছে হৃদি, বিভা আর রুদ্র। আকাশ বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ অমৃতাকে লক্ষ্য করছিল। এখানে আসার পর থেকেই অমৃতা অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ হয়ে গেছে। মুখখানা ম্লান, চোখ দুটোতে কেমন বিষণ্ণতা। মনে হচ্ছে যেন তার দেহটাই শুধু আছে এখানটায়, কিন্তু মন পড়ে আছে অন্য কোথাও। আকাশ হঠাৎ করেই প্রশ্নটা করলো, 'এই অমৃতা, তোর কী হইছে?'

অমৃতা ভ্রু কুঁচকে বলল, 'আমার আবার কী হবে?'

– 'কেমন যেন লাগতেছে তোকে।'

– 'কেমন লাগতেছে?'

– 'কেমন জানি বিরহ বিরহ ভাব।'

অমৃতার কথাটা ভালো লাগল না। কিছুক্ষণ করাল চোখে আকাশের দিকে চেয়ে থেকে সে ঠান্ডা গলায় উত্তর দিল, 'ফালতু কথা বলিস না!' কথাটা বলে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। আকাশ পেছন থেকে প্রশ্ন করল, 'কই যাস?' অমৃতা কোন উত্তর দিল না। হনহন করে হেঁটে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল।

বিভা আর হৃদির অবস্থান ছিল খুব কাছাকাছি। দুজনে একনিষ্ঠ ভাবে সামির পুরো পরিবারটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল অনেকক্ষণ ধরে। বিভা এক পর্যায়ে হৃদির কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দোস্ত, একটু কূটনামি করি চল।'

হৃদি নড়েচড়ে বসল, 'ভালোই বলছিস, আমারও একটু কূটনামি করতে মনে চাইতেছে।'

বিভা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে চাপা গলায় বলল, 'আমি যা ভাবতেছি, তুইও কি তাই ভাবতেছিস?'

– 'তুই কী ভাবতেছিস?'

বিভা ঘাড় ঘুরিয়ে আশপাশটা একবার দেখে নিল। তারপর গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'ভাবতেছি অমৃতা লোকটার মধ্যে এমন কী মধু দেখল?'

– 'আল্লাহ! কসম দোস্ত! আমিও এই কথাটাই ভাবতেছিলাম। বিশ্বাস কর!'

– 'হুম, কী দেইখা অমৃতা এমন দিওয়ানা হইয়া গেল সেটাই বুঝার চেষ্টা করতেছি।
'

হৃদি আগের চাইতেও তীক্ষ্ণ নজরে সামির পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকাল। উচ্চতায় লোকটা সামিকেও ছাড়িয়ে গেছে। ছিপছিপে শরীর। গায়ে ধূসর রঙের শাল। গালে ছোপ ছোপ দাড়ি। হৃদি ধীরস্বরে বলল, 'ওয়েল, আমি মনে হয় একটু একটু বুঝতেছি। আগে তো উনাকে দেখছি বন্ধুর বাপ হিসেবে। এখন দেখতেছি বন্ধুর ক্রাশ হিসেবে। দুইটা তো আলাদা!'

বিভা অনেকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'দোস্ত, একটা কথা স্বীকার করতেই হবে উনারে দেখলে বোঝা যায়না যে উনার সামির বয়সী একটা ছেলে আছে।'

হৃদি অপরাধীর গলায় বলল, 'আরেকটু কূটনামি করি?'

– 'কর। অল্প, বেশি না কিন্তু!'

– ‘ওর বৌকে ওর থেকে বয়স্ক লাগে।’

– ‘ঠিকই বলছিস। আগে কখনো সেভাবে খেয়াল করিনাই, তবে আজকে মনে হচ্ছে, আসলে উনি… থাক দোস্ত কিছু বলব না। আমার শ্বশুর হইলেও হইতে পারত।’

হৃদি মিনমিন করে বলল ‘ফ্রেন্ডের বাপরে আবার কেউ অত খেয়াল করে নাকি? কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে ব্যাটা দেখতে জোশ!’

– ‘থাক এসব বলিস না। সামির সাথে তোর বিয়ে হইলে ব্যাটা তোর শ্বশুর হবে। ’ বিভা বলল সতর্ক ভাবে।

– ‘হইলে হবে। তাতে কী? শ্বশুরের প্রশংসা করতে পারব না? আর তাছাড়া সামি বিয়ে করতে যাচ্ছে ওই তানিশা নামের উইকেড হুইচকে। আমার সাথে ওর বিয়ে হবেনা।

– ‘মনে রাখিস অমৃতাকে কিন্তু কোন ভাবেই প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা। ওর সামনে এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন কথাই তুলবিনা। আরেকটা ব্যাপার কি জানিস? অমৃতা শুধু চেহারা দেখে পাগল হয়নায়।

– ‘তাহলে কী দেখেছে? টাকা?’

– ‘আরেনা, লোকটা বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। আমার জানা মতে অসম্ভব কাজ পাগল একজন মানুষ। অমৃতাও কাজপাগল, জানিসই তো।’

– ‘পছন্দ হইলেই তো হবেনা। লোকটার বৌ আছে। ছেলে আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা উনার ছেলে অমৃতার বন্ধু। তাও যেন তেন বন্ধু না। খুব কাছের বন্ধু।’

– ‘সেটাই, ধুর, এই জিনিসটা মাথায় আসলে আমার আর কিছুই ভালো লাগেনা জানিস? একবার চিন্তা কর তোর বাবার সাথে যদি এরকম হত?’

কথাটা শুনে হৃদি খিলখিল করে হেসে উঠল, ‘আমার টাক্কু ভুঁড়ি ওয়ালা বাবা, আর অমৃতা? আল্লাহ!’

– ‘আরেনা, অমৃতা হবে কেন? ধর অন্য কেউ। যদি কেউ একজন হুট্ করে এসে তোদের ফ্যামিলিতে অশান্তি করে তখন তোর কেমন লাগবে?’

– ‘কেমন লাগবে আবার, মেরে ফেলব একদম।’

– ‘সেটাই, অমৃতাকে বোঝাতে হবে। এখানে আসার পর ওর চেহারা দেখছিস? কী রকম আপসেট হয়ে আছে?’

– ‘দেখছি রে, আমার তো কেমন খারাপ লাগতেছিলো ওকে দেখে। এই পর্যায়ে আকাশ অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, ‘তোরা কী ফিসফাস করতেছিস সেই তখন থেকে?’

বিভা আর হৃদিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই, রুদ্র প্রায় আর্তনাদ করে উঠে বলল, ‘খাওয়া দিচ্ছেনা কেন? মনটা সেই তখন থেকে খাই খাই করতেছে।

– 'রাক্ষসদের মন সব সময়ই খাই খাই করে। তাদের শুধু পেটের খিদা না, মনেরও খিদা থাকে।' হৃদি বলল ত্যাড়া গলায়।

রুদ্র খোঁটাটা পাত্তা না দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা স্ন্যাক্স গুলোর দিকে একমনে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গম্ভীর ভাবে বলতে লাগল, 'কী খাই?কী খাই? কীইইই খাই? কীইই যে খাই!'

তাকে দেখে মনে হল সে কী খাবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়াটা এ মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আকাশ এদিক সেদিক তাকিয়ে রস টইটম্বুর কণ্ঠে বলল, 'আমাদের পাখিগুলা কই মামা?'

রুদ্রর ও যেন হঠাৎ মনে পড়ল, 'আসলেই তো কই গেলো পক্ষী গুলা?' বোঝা গেলো ওরা তানিশার বান্ধবী দুজনকেই পক্ষী বলে সম্বোধন করছে।

– 'আচ্ছা তোদের প্রব্লেমটা কী হ্যাঁ? মাইয়া দেখলেই খালি লুইচ্চামি করিস কেন?' হৃদি বলল ক্যাটক্যাট করে।

– 'লুইচ্চামির কী আছে আজিব! তুই দেখছিস মেয়ে দুইটারে? কী ফিগার মামা!' চোখ গোল করে রুদ্র বলল।

আকাশ রুদ্রর কথায় তাল মিলিয়ে বলল, 'আসলেই! সাইজ দেখছিস তুই? সেই রকম …'

হাত টাত নেড়ে আকাশ আরো কী কী যেন বলতে যাচ্ছিল। বিভা একটা খ্যাঁক দিয়ে উঠে বলল, 'চুপ থাক, ফাজিলের গাছ! এতো খাররররাফ নজর তোদের। ছিঃ ছিঃ ছিঃ তোরা আসলে মানুষ না, তোরা হচ্ছিস লুনুষ।'

– 'সেটা আবার কী?'

বিভা খুব গম্ভীর ভাবে বলল-'লুইচ্চা মানুষদেরকে বলা হয় লুনুষ। লুইচ্চা প্লাস মানুষ ইকুয়েল টু লুনুষ।'

শুনে বন্ধুরা সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

৩২

ড্রইং রুমে এ মুহূর্তে তেমন কেউ নেই। অতিথিরা সবাই লনে। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মেয়ে ছুটোছুটি করে খেলছে সারা ঘরময়। অমৃতা চুপ করে বসে আছে সোফার ওপর। চোখ দুটি শূন্যে রাখা। নীড় নষ্ট হয়ে যাওয়া পাখির মতো অসহায় সেই চোখের দৃষ্টি। অনেক ক্ষণ যাবৎ তীক্ষ্ণ কাঁটার মত কী যেন একটা লেগে আছে বুকে। প্রতিবার নিশ্বাস নেবার সময় সেই কাঁটাটা বিঁধছে হৃদযন্ত্রে। কষ্ট হচ্ছে!

পৃথিবীটা এমন অদ্ভুত কেন? কেন যে যাকে চায়, তাকে পায়না? আবার যাকে পায়, তাকে চায়না? চাওয়া আর পাওয়া এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটানো কি এতটাই কঠিন ব্যাপার? অমৃতা তো বোকা নয়, অবিবেচক নয়, অশিক্ষিতও নয়, তবু কেন সে তার মনকে বশে আনতে পারছেনা? এখানে আসার পর থেকে লোকটা একটাবারের জন্যেও তার চোখে চোখে তাকায়নি। অমৃতাকে যেন তিনি চেনেনেই না। এমনকি

গতকাল রাতে লোকটা তার ফোন ও রিসিভ করেননি। পাখিগুলোর জন্য একটা ধন্যবাদ দিতে চেয়েছিল শুধু সে। সেই সুযোগটা পাওয়াই গেল না শেষ পর্যন্ত। ভোর পর্যন্ত জেগেছিল অমৃতা। নিশাচর শ্বাপদের মতো নিশ্ছিদ্র অপেক্ষা তাকে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমাতে দেয়নি। একটা ফোনের অপেক্ষা করেছিল সে সারা রাত। কিন্তু ফোন আর আসেনি। এমন কি কোন মেসেজও না। ভোর হওয়া খুব একটা দেখা হয়না। গতকাল সে ভোর হওয়া দেখল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। দেখল উদিত সূর্যের বিপরীতে উড়ে যাওয়া পাখিদের ঝাঁক। দেখল পূবের আকাশে দিনমণির বর্ণাঢ্য, স্নিগ্ধ আগমন। তারপর সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করতে পারল যে, আসলে প্রয়োজন ছাড়া মানুষটা তাকে কোন দিন ফোন দেয়নি, দেবেও না। তাঁর ছেলে বাড়ি ফিরে আসছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এখন অমৃতাকে তাঁর আর প্রয়োজন নেই। হৃদযন্ত্রে বিঁধে থাকা কাঁটার সূচাল মাথায় ঘর্ষণ খেয়ে একটি রক্তাক্ত দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসল তার বুক চিরে। আসলে কী, সবার জীবনে ভালোবাসা আশীর্বাদ হয়ে আসে না। কারো কারো জীবনে আসে অভিশাপ হয়ে!

৩৮১

দামী কার্পেট মোড়া মেঝের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে অমৃতা ভাবছিল যে, লোকে বলে ভালোবাসা নাকি এক মন থেকে অন্য মনে উড়ে চলে যায়। এটাই ভালোবাসার অলৌকিক শক্তি। যদি তাই হয় তাহলে লোকটা কেন বোঝে না যে অমৃতা তাকে কতটা চায়? তার বুকের ভেতরের ভালোবাসা কেন চুম্বকের মতো মানুষটাকে টেনে আনে না কাছে?

– 'তুমি ঠিক আছ?' হঠাৎ কানে এসে লাগা প্রশ্নটা ধরাধামে ফিরিয়ে আনল অমৃতাকে। ঘোর লাগা চোখ মেলে তাকাল সামনে। চকিতে তার নিষ্প্রভ চোখের তারা দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কয়েকটা দমবন্ধ করা, উদ্বেল মুহূর্ত কাটার পর অমৃতা কোনও রকমে বলতে পারল, ‘আমি ঠিক আছি।’

– ‘ইউ লুক অ’ ফুলি পেইল।’

– ‘ডু আই?’

– ‘ইয়েস ইউ ডু!’

তিনি সামনে এসে দাঁড়াতেই একটি অভ্রভেদী কুহকী ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে যাচ্ছিল চারপাশে। অমৃতার মাথায় চট করে একটা লাইন চলে আসল, Meeting you wasn’t a coincidence, it was a miracle! হ্যাঁ মিরাকেলই তো! এইযে তাঁকে দেখামাত্র অমৃতার বুকের ভেতর একটা শিরশিরে অনুভূতির সৃষ্টি হয়, চট করে রং পাল্টে ফেলে পৃথিবী, সেটাও একটা মিরাকেল। মিনিট না গড়াতেই বাড়ির ভেতর হুড়মুড়িয়ে এক গাদা লোকজন ঢুকে গেল। মাত্র প্রবেশ করা দলটার মধ্যে দুজন মাত্র নারী। বাদ বাকি সবাই পুরুষ। এদের মধ্যে আছেন দেশের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রথিতযশা ভদ্রলোক। খবরের কাগজে এবং টিভির পর্দায় এদেরকে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। একজন ভদ্রলোককে তো অমৃতা বেশ ভালোভাবে চেনে। তিনি সুপ্রিম কোর্টের এপেলেট ডিভিশনের জাস্টিস। একবার সে তার সিনিয়রের সাথে গিয়েছিল এই জাস্টিসের চেম্বারে একটি আপিল বিভাগের মামলার ব্যাপারে পরামর্শ করতে। অতিথিরা ভেতরে ঢুকতেই হক সাহেব তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। অমৃতা উঠে দাঁড়াল বসা থেকে। বোঝা যাচ্ছে এই দলটা হকের দাপ্তরিক লোকজনে ঠাসা। অমৃতার আর এখানে থাকা মানায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে প্রস্থানোদ্যত হয়ে পা বাড়িয়েছিল। হঠাৎ পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর তার নাম ধরে ডেকে ওঠায় থেমে যেতে হল তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ইউনিভার্সিটির এক চেনা বড় ভাই।

– ‘আরে, তুর্য ভাইয়া! আপনি এখানে?’

৩৮২

– ‘আমারও তো একই প্রশ্ন, তুমি এখানে কী কর? -’এটাতো আমার ফ্রেন্ডের বাসা।

– ‘তাই নাকি?’

–হ্যাঁ, কিন্তু আপনি?’

–

– ‘আমি তো এই বাড়ির মালিকের কোম্পানিতে জব করি। ল অফিসার।’

– ‘ও তাই? আপনি কোম্পানি ল নিয়ে কাজ করছেন জানতাম না তো!’

– ‘খুব বেশি দিন হয়নি জয়েন করেছি। আমি এসেছিলাম স্যারের কাছে একটা কাজে। একটা কন্ট্রাক্ট পেপারে উনার সাইন দরকার ছিল। এসে দেখি পার্টি হচ্ছে। স্যার বললেন খাওয়া দাওয়া করে যেতে।’

– ‘গ্রেট! নাইস টু সি ইউ ভাইয়া।’

– ‘তোমার খবর কী? যাচ্ছ কোথায়? বসো, বসো, কথাবার্তা বলি। কত দিন পর দেখা!’

অমৃতা আড়চোখে হককে একবার দেখে নিল। তিনি পায়ের ওপর পা তুলে বসে অতিথিদের সাথে কথা বলছেন। অমৃতাও বসে পড়ল টুপ করে তুর্যর পাশে। এমনিতেও যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভাগ্যিস তুর্যর সাথে দেখা হয়ে গেল!

টাক মাথার একজন ভদ্রলোক বেশ উঁচু গলায় কথা বলছিলেন। বোঝা যাচ্ছে তিনি সরকার পক্ষের লোক। এই মজলিশ অবশ্য খুব স্বাভাবিক ভাবেই সরকারি আমলাদের উপস্থিতিতে ঠাসা। টাক মাথা ভদ্রলোক কথা বলছেন ভাষণ দেবার ভঙ্গিতে। নানা ভাবে তিনি সরকারের প্রশংসা করে যাচ্ছেন। অমৃতা কোন দল করেনা। কিন্তু এক তরফা প্রশংসা তার কখনওই মনঃপূত হয়না। ভদ্রলোক কথা বলছেন রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে। রোহিঙ্গা সংকট সরকার কী চমৎকার ভাবে সামলে নিয়েছে এবং নিচ্ছে এই বিষয়টিই তিনি ইনিয়ে বিনিয়ে প্রকাশ করতে চাইছেন। উপস্থিত সকলে চুপচাপ তার কথা শুনছে। কয়েকজনের চেহারায় দ্বিমতের আভাস ফুটে উঠেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলছেনা। অমৃতা বরাবরই খোলামেলা কথা বলতে ভালোবাসে। কারো ভালো লাগুক আর না লাগুক, নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সে কোনদিন পিছপা হয়না। আজকে এত বয়স্ক জ্ঞানী-গুণী লোকের সভায় চট করে মুখ খোলাটা ঠিক হবে কিনা ভাবছিল সে। কিন্তু ভাবতে পারল না খুব বেশিক্ষণ, তার আগেই ঠোঁটকাটা মুখটা আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, ‘দেখুন, গরীব দেশ হয়েও শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে আন্তর্জাতিক

৩৮৩

ভাবে হয়ত বাংলাদেশ বেশ কিছু প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে, কিন্তু আমি বলব এই বিষয়ে সরকার একটি ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। আরো স্ট্রিং রুলস এন্ড রেগুলেশন দরকার ছিল।’

অমৃতার পরিষ্কার স্বরের দৃঢ় মন্তব্যটি ঘরভর্তি লোকজনের দৃষ্টি কাড়ল। টেকো ভদ্রলোক ঘুরে তাকালেন তার দিকে। এতক্ষণ ভিড়ের মাঝে তিনি এই তরুণী মেয়েটিকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নি। কয়েক সেকেন্ড সরু চোখে অমৃতার দিকে

চেয়ে থেকে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ‘ত্রুটিযুক্ত পরিকল্পনা বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন আপনি?’

অমৃতা একটু কেশে নিয়ে বলল, ‘শরণার্থীদের শুরুতেই নিবন্ধনের ব্যবস্থা করা হয়নি কেন? এর সুযোগ নিয়ে তো অনেক রোহিঙ্গাই সাধারণ জনগণের সাথে মিশে গেছে। একটা দেশ এথনিক ক্লিনজিং করছে, সেই দায়ভার সম্পূর্ণটা আমাদের ঘাড়ে এসে কেন পড়বে? এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দিকে একবার চোখ মেলে তাকান, এরা আসলে কারা? মায়ানমার এদেরকে জাতিগত ভাবে কোন স্বীকৃতি দেয়নি। এদের পাসপোর্ট নেই, শিক্ষা নেই। এরা খুব ভালো মতো জানে যে বাংলাদেশটা এদের নিজের দেশ নয়। ইতোমধ্যেই স্থানীয়দের সাথে রোহিঙ্গাদের সম্পর্ক তেমন ভালো না। ভালো হবার কোন চান্সও নেই। হ্যাঁ মানবতার খাতিরে তাদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কঠোর পরিকল্পনার আশ্রয় নেয়া উচিত ছিল। এখন যেভাবে বিষয়টা চলছে, এতে মনে হচ্ছে এই বিশাল জনগোষ্ঠী দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি হুমকি বৈ কিছুইনা। লাভের মধ্যে লাভ যা হয়েছে বিদেশী মুদ্রা আসছে দেশে সমানে। এটাই একমাত্র বেনিফিট বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।’

অন্য কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হক বললেন, ‘তাহলে এই বড়সড় জনগোষ্ঠী নিয়ে কী করা উচিৎ ছিল বলে তোমার মনে হয়? কেটে ভাসিয়ে দেয়া উচিৎ ছিল জলে? নাকি হিটলারের মতো গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে মেরে ফেলা উচিৎ ছিল?’

হুট করে এই মানুষটাকে কথা বলে উঠতে দেখে অমৃতা একটু ভড়কে গেল এবং প্রথমবারের মতো আবিষ্কার করল যে, সে মনে হয় মানুষটাকে একটু একটু ভয় পায়। নইলে অমন করে বুক কাঁপল কেন লোকটার প্রশ্ন শুনে? সে একটু মিন মিন করে বলল, ‘না, তা কেন হবে? আমি বলতে চাইছি পলিসিটা আরেকটু স্ট্রিক্ট হওয়া

উচিৎ ছিল। যে সমস্যা গুলোর মুখোমুখি এখন হতে হচ্ছে সেগুলোর প্রিকশন নেয়া উচিৎ ছিল আগে

থেকেই। শরণার্থী শিবিরের অবস্থা তো বড়ই করুণ। যে শিশু গুলো ওখানে বেড়ে উঠছে তাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। ত্রাণ সরবরাহ করা হচ্ছেনা ঠিক মত।'

হক বললেন, 'হ্যাঁ, অসংখ্য নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ মানবতার খাতিরে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে তোমাদের জেনারেশনের ছেলেমেয়েদের তো গর্বিত হওয়া উচিৎ। মাত্র কিছুদিনের মধ্যে যখন কোন দেশে অন্য দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ গিয়ে উপস্থিত হয় তখন সেই পরিস্থিতি তাৎক্ষণিক ভাবে সামলে ওঠা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়। একাত্তরে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। তার মধ্যে অসংখ্য মানুষ বর্ডার ক্রস করে পাশের দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সীমান্ত অতিক্রম করেও কিন্তু সেইসব মানুষেরা ভালো ছিল না। ভারতের পক্ষে সেই বিশাল জনগোষ্ঠীকে লালন পালন করাটা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিম বাংলার শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা দেখে মার্কিন কবি এলেন গিন্সবার্গ লিখেছিলেন সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড। রোহিঙ্গা ক্রাইসিস একাত্তরের ক্রাইসিসের তুলনায় কিছুইনা। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের জীবনে কী দুর্যোগটা নেমে আসে তা বাঙালি জাতির চাইতে ভালো করে মনে হয় কেউ জানেনা। আমরা ভুক্তভোগী। এরপরেও তুমি বলছ নিরীহ মানুষগুলোকে আশ্রয় না দেয়াটাই হতো বুদ্ধিমানের কাজ? আমাদের প্রধান মন্ত্রী বলেছেন প্রয়োজনে আমরা খাদ্য ভাগ করে খাবো। একজন দেশপ্রধানের মুখে কিন্তু এরকম কথাই মানায়!

– 'আপনি ভুল বুঝছেন মিস্টার হক, আমি একবারও বলিনি আশ্রয় দেয়াটা উচিৎ হয়নি। আমি বলেছি রুলস এন্ড রেগুলেশনের কথা। আর তাছাড়া একাত্তরের

শরণার্থীদের অনেকেই দেশে ফিরে এসেছে। এদের কিন্তু ফিরে যাবার কোন চান্স নেই।'

– 'মানবিকতার কোনো রুল, রেগুলেশন হয় না অমৃতা। পররাষ্ট্র মন্ত্রী তো বলেছিলেন বাংলাদেশ শরণার্থী কনভেনশনে সাক্ষর করা কোন দেশ নয়। তাই বাংলাদেশের কোন দায় নেই। তুমি কি তাঁর এই কথাটা সমর্থন কর? দেখবে কাশ্মীরি মুসলিমদের জন্য যে আন্দোলন হবে সেটা রোহিঙ্গাদের জন্য হবেনা। কারণ রোহিঙ্গাদের জন্য তো জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। স্বার্থে যখন টান পড়ে তখন ধর্মের সূতাও ঢিলা হয়ে যায়।'

অমৃতা একটু ধীরস্বরে বলল,'যেকোনো উপায়ে ওদেরকে নিজের দেশে ফেরৎ পাঠাতে হবে। এটাই একমাত্র সমাধান।'

বৃষ্টি মহল (২)-২৫

৩৮৫

– 'ফেরৎ পাঠানোর চেষ্টা তো করা হচ্ছে। মায়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে নানা ভাবে। আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত বিষয়টা গড়িয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।'

টেকোভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বললেন, 'আসলে এটা ভীষণ কন্ট্রোভার্শিয়াল একটা ইস্যু। একেকজন একেকরকম মতামত দিচ্ছে। কিন্তু ইয়াং লেডি তোমার কথাবার্তা আমার পছন্দ হয়েছে। তোমার পরিচয়টা কী বল তো?'

অমৃতা হাসি মুখে নিজের সম্পর্কে বলল, সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায়।

ভদ্রলোক পরনের কোটের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে নিজের একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন অমৃতার দিকে। বললেন, 'আমি ইউ এন ডিপি তে আছি। তুমি আমার সাথে দেখা করো তো সময় করে। তোমাদের মত শার্প ছেলেমেয়ে খুব দরকার, বুঝলে?'

অমৃতা খুশি হয়ে কার্ডটা হাতে নিল। তাকাল একবার হকের দিকে গর্বিত চোখে। হক কিছু বললেন না। গম্ভীর ভাবে ঠোঁট টিপলেন শুধু একবার। রাজনৈতিক আলাপ আরো অনেকক্ষণ অবধি চলল। পুরুষালি বেশভূষার বিচক্ষণ, স্মার্ট তরুণীটি খানিক বাদে বাদে স্পষ্ট বক্তব্য পেশ করে সবাইকে চমকে দিচ্ছিল। এই মজলিশে সে সর্ব কনিষ্ঠা। কিন্তু তার আচার আচরণ এবং কথাবার্তা অতিশয় পরিপক্ক, সুশীল এবং সপ্রতিভ। তবে আলোচনায় তার উৎসাহে ভাটা পড়লো তখন, যখন রোমেলা হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ঘর ভর্তি মানুষের সামনে তার স্বামীকে বললেন, 'এইযে, একটু শুনবে?

হক অতিথিদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে উঠলেন। স্ত্রীর পেছন পেছন পাশের ঘরে হেঁটে গেলেন।

অমৃতা ম্লান চোখ মেলে নিঃশব্দে চেয়ে দেখল সেই চলে যাওয়া। নিজেকে সে এতকাল প্রখর যুক্তিবাদী হিসেবেই জানত। অথচ আজ এক অনির্বচনীয় মহাপাতক অনুভূতির দৌরাত্ম্য তার যুক্তিবাদী মনটাকে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বানিয়ে ছাড়ছে।

খাওয়া দাওয়ার পালা নির্বিঘ্নেই সমাপ্ত হল। ঠিক হল রাতে সব বন্ধুরা এই বাড়িতেই থাকবে। সামির আম্মার অনুরোধেই থাকার সিদ্ধান্তটা নেয়া হয়েছে। বৌয়ের বাড়িতে

যেসব তত্ত্বব পাঠানো হবে সেগুলো গোছগাছ করার জন্য নাকি সাহায্য দরকার। হঠাৎ কী কারণে সামির আম্মা, পুত্রের

৩৮৬

বন্ধুদের ব্যাপারে এতটা সদয় হয়ে উঠলেন তার কারণ নির্ণয় করা কিছুটা কঠিন। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, তিনি অল্প বিস্তর বুঝতে পেরেছেন যে সামির জীবনে তার বন্ধুদের ভূমিকা বা দখল কতখানি। তাই তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন ছেলের মন জুগিয়ে চলার।

খাওয়া দাওয়ার পর ছাদের ওপর, পুল সাইডের পাশে ঘাসের ওপর বসেছিল ওরা। শীত শীত আমেজটা ভালো লাগছিল সবার।

তানিশা হঠাৎ উপস্থিত হল জায়গাটায়। এসেই খুব জরুরি গলায় সামিকে বলল, 'আমি যাচ্ছি। তুমি কি একটু আসবে আমার সাথে? নাকি বন্ধুদের সাথে বসে থাকবে এখানে?'

সামি তানিশার ওই আগুন গরম কথায় একটু ভড়কে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে থতমত খেয়ে বলল, 'হ্যাঁ আসছি।'

নিচে নেমে আসল ওরা। গাড়িতে উঠতে যাবার আগ মুহূর্তে বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে তানিশা সামিকে বলল,'শোনো, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?'

সামি একটু বিব্রত ভাবে বলল, ‘কী প্রশ্ন?’

– ‘তুমি কি এভরি নাইট হৃদির সাথে ফোনে কথা বল?’

সামি বিস্মিত গলায় বলল, ‘এটার মানে কী?’

– ‘মানে হচ্ছে, আমি প্রায়ই তোমার ফোন ওয়েটিং এ পাই। জিজ্ঞাসা করলে বল যে, ফ্রেন্ডের সাথে সাথে কথা বলি। নাও আই ওয়ান্ট টু নো, যে সেই ফ্রেন্ড টা কে? হৃদি নাকি বিভা?’

– ‘তোমার সমস্যাটা কী? আমি কোন ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলি সেই কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে হবে?’

– ‘নিশ্চয়ই হবে।’

– ‘যদি না দেই?’

– ‘না দিলে…’ তানিশাকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখায় এক মুহূর্তের জন্য। বড় করে শ্বাস নেয় সে একটা। তারপর দৃঢ় গলায় বলে, ‘না দিলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না।
’

– ‘হোয়াট দ্যা ফাক

– ‘শুনো সামি, হৃদির সাথে গভীর রাতে তুমি ফোনে কথা বলতে পারবা না।

সামির চোখের তারায় প্রথমে ফুটে উঠল সীমাহীন বিস্ময়। এরপর তার মুখখানা তীব্র এক রোষের ঝংকারে আলোড়িত হয়ে উঠল। সিংহের ন্যায় গর্জে উঠে বলল, ‘কী বললা তুমি?’

৩৮৭

– ‘তুমি হৃদির সাথে রাতের বেলা ফোনে কথা বলতে পারবা না। এটাই আমার শেষ কথা।’ এটুকু বলে তানিশা আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। চট করে উঠে পড়ল গাড়িতে।

সামি বাড়ি ফিরে আসল বিধ্বস্ত অবস্থায়। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র সে কোন ভয়ংকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এসেছে কিংবা শুনে এসেছে কোন দুঃসংবাদ। তার বাবা মা দুজনে সদরের সামনে দাঁড়িয়ে একজন অতিথিকে বিদায় জানাচ্ছিলেন। ছেলের এই উৎসন্ন, সর্বনাশা অবস্থা দেখে তাঁদের আত্মা কেঁপে উঠল। সামির আম্মা ছেলের পেছন পেছন দৌড়ে গেলেন। পেছন থেকে ডাকতে লাগলেন ছেলেকে নাম ধরে। কোনো লাভ হলোনা। একটা বারও পেছন ফিরে তাকালো না ছেলে। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরতলায় নিজের ঘরে ঢুকে গেল। দড়াম করে আটকে দিল দরজাটা মায়ের মুখের ওপরে। তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সমানে দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ‘কী হয়েছে? বাবা দরজাটা খোল! কী হয়েছে আমাকে বল!

প্রতি রাতে হৃদির সাথে ফোনে কথা বলাটাকে কখনো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হয়নি তার আজ পর্যন্ত। বিভার সাথে সম্পর্ক থাকাকালীন সময়েও রোজ রাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হৃদির সাথে ফোনে কথা হত। প্রয়োজনে নয়, অভ্যাসের খাতিরে। কথা বলতেই হবে এমন কোন তাগিদ কখনো ছিলোনা। বললে চলে, না বললেও চলে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যেই না তানিশা নিষেধাজ্ঞা জারি করল, যে আজ থেকে হৃদির সাথে রাতের বেলা ফোনে কথা বলা যাবেনা ঠিক সেই মুহূর্ত থেকে তার মনে হচ্ছে প্রতি রাতের ওই অংশটুকু আসলে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ!

না না কোথাও কিছু ভুল হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ আসলে তার বন্ধুত্ব। সে বন্ধুদের সাথে রাতের বেলা কথা বলবে, নাকি চাঁদে অথবা মঙ্গলে গিয়ে কথা বলবে সেটা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার। তানিশা কে এসব নিয়ে কথা বলার? মা তখনও দরজা ধাক্কাচ্ছেন। সামি দরজা খুলল। মায়ের পাশে বাবাও দাঁড়িয়ে আছেন এখন। দরজা খুলতেই ব্যস্ত ভাবে ঘরের ভেতর ঢুকলেন তাঁরা। দুজনের চোখজোড়া উৎকণ্ঠা। রোমেলা ছেলের শুকনো মুখটার দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে বলে উঠলেন, ‘কী হয়েছে তোমার?’

– ‘তানিশা তো আবোল তাবোল কথা বলছে।’ সামি বলল হতাশ ভাবে।

৩৮৮

কথা শুনে বাবা মায়ের বুক কেঁপে ওঠে। দুদিন বাদে এনগেজমেন্টের তারিখ ঠিক করা হয়েছে। এখন কি ছেলে বেঁকে বসবে নাকি? রোমেলা নিশ্বাস বন্ধ করে প্রশ্ন করলেন, ‘কী বলেছে?’

– ‘সে বলছে আমি নাকি রাতের বেলা হৃদির সাথে ফোনে কথা বলতে পারবোনা।
’

বাবা মা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। ছেলেকে দেখে মনে হচ্ছে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এতো ক্ষুদ্র একটি ব্যাপারে এমন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয়। গোটা একটা মিনিট ধরে বাবা মা দুজন ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেন। তাঁরা বুঝে পেলেন না যে এ ধরণের পরিস্থিতিতে ছেলেকে ঠিক কী বলা যায়।

হক স্ত্রীর দিকে তাকালেন একবার অসহায় ভাবে। রোমেলাই কথা শুরু

করলেন,

– ‘হৃদির সাথে রাতের বেলা ফোনে কথা বলতে বারণ করেছে তো হয়েছে কী? বলবে না। দিনের বেলা বলবে।’

সামি বিস্ফোরিত চোখে তাকাল মায়ের দিকে। হক বললেন,

– ‘বাবা শোনো, কোনো মেয়েই তার স্বামীর মেয়ে বন্ধুদেরকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিতে পারেনা। এটা খুব সিম্পল একটা ব্যাপার। আর তানিশা তো বলেনি তোমাকে তোমার বন্ধুদেরকে ছেড়ে দিতে। সে একটা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেছে। আমার মনে হয়না এমন কোনো অযাচিত কিছু সে বলে ফেলেছে।

কথাটা বলে শেষ করে তিনি ছেলের পাশে এসে বসলেন। ছেলের মাথায় একটা হাত রেখে বললেন, ‘একটা সম্পর্কে অনেক কিছু মানিয়ে চলতে হয় বাবা! মানিয়ে চলার মতো মনটাকে প্রথম থেকেই তৈরী করে নিতে হবে।’

সামি গোঁ ধরা গলায় বলল, ‘আমি কখন আমার ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলব সেটা আমি ডিসাইড করবো। সে কে এসব নিয়ে কথা বলার?’

’

রোমেলা বললেন, ‘তোমার জীবন নিয়ে কথা বলার শতভাগ অধিকার আছে তোমার স্ত্রীর।’

হক সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কুঞ্চিত ভ্রূ নিয়ে। তাঁর হঠাৎ মনে হচ্ছে ছেলের বিয়ের ব্যাপারে একটু তাড়াহুড়া করা হয়ে গেছে। এ মুহূর্তে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছেন যে তার ছেলে এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। বুঝতে পেরে তার মনটা বড়ই অশান্ত হয়ে উঠল। আশ্চর্য হলেও

৩৮৯

সত্য, যে দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অমৃতার কথা মনে পড়ল। মনে হল মেয়েটার সাথে একবার কথা বলতে পারলে ভালো হত। আদতে তার ছেলের মনের মধ্যে চলছে কী? এ ব্যাপারে কি অমৃতা কিছু জানে? সঠিকভাবে কিছু জানাতে না পারলেও, অমৃতার কথাবার্তায় কী যেন একটা আছে। দুশ্চিন্তা কমে যায়। এই

প্রথমবারের মতো তাঁর মনে হল, অমৃতাকে ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নয়, বরং নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করবার জন্যেই ভারী দরকার এই মুহূর্তে!

সামি উঠে পড়ল। হঠাৎ তার মনের মধ্যে একটা বিষয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। হৃদি কি তানিশাকে ডুয়ার্সের ঘটনাটা নিয়ে কিছু বলেছে? যদি না বলেই থাকে তাহলে তানিশা হঠাৎ হৃদির পেছনে লাগল কেন? দ্রুত পায়ে সে ছাদের ওপর উঠে আসল। পুল সাইডের পাশে তখনো বসে আছে ওরা। শুধু বন্ধুরাই। আর কেউ নেই। সামি দলটার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটু ভারী গলায় হৃদিকে বলল, 'আচ্ছা তুই কি তানিশাকে ডুয়ার্সের ঘটনাটা নিয়ে কিছু বলছিস?'

হৃদি হতবাক হয়ে গেল, 'কেন বলতে যাব? আমারে কি কুত্তায় কামড়াইছে?'

– 'তাহলে তানিশার সমস্যাটা কোন জায়গায়? ও আমারে তোর সাথে ফোনে কথা বলতে মানা করতেছে। বলতেছে আমার চার্জার কেন তোর কাছে থাকবে? ব্লা ব্লা ব্লা, এসবের মানে কী?

হৃদি স্তব্ধীভূত গলায় বলল, 'আমার সাথে ফোনে কথা বলতে মানা করছে?'

– 'হ্যাঁ, রাত্রে বেলা নাকি তর সাথে ফোনে কথা বলা যাবেনা।'

রুদ্র স্বগতোক্তি করল, 'খাইছে, বিয়ার আগেই এত নিয়মকানুন। বিয়ার পর কী হবে মামা?'

হৃদির বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। সামির সাথে তাহলে এখন থেকে আর ফোনেও কথা বলা যাবেনা? এত বড় শাস্তি? গলায় স্বাভাবিক ভাব আনার চেষ্টা করে সে বলল, ‘বেশ তো, কথা বলতে নিষেধ করছে তো হইছে কী? কথা বলবিনা!’

সামি ত্যাড়া চোখে তাকায় হৃদির দিকে, ‘কথা বলব না?’

– ‘তোর বৌ নিষেধ করছে। ক্যামনে বলবি বল?’

– ‘তোর কোনো আপত্তি নাই এ ব্যাপারে?’

৩৯০

হৃদি ঢোঁক গিলে বলল, ‘আমার আবার কিসের আপত্তি। ফোনে কথা বলাটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না।’

– ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না?’ সামি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে

পারছেনা।

– ‘না!’ হৃদি বলে মিনমিন করে।

সামিকে কয়েকটা সেকেন্ড কেমন বিভ্রান্ত দেখায়। তারপর, আকস্মিক··· খুব আকস্মিক ভাবে সে বিভার দিকে চেয়ে ধারালো কণ্ঠে বলে ওঠে, 'তুই জানিস? সব দোষ তোর! সব তোর দোষ!'

কথাটা বলে সে আর দাঁড়ায়না। ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে যায় ছাদ থেকে। তার শেষের বলা কথাটা বন্ধুদের সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তারা থম ধরে বসে রইল প্রত্যেকে। অনেকটা ক্ষণ!

শীত শর্বরীর পেলব নির্জনতা ভেদ করে, বিভার মোবাইলের রিংটোন বেজে উঠল আচমকা। রুদ্রর গাওয়া গান, 'বৃষ্টিমহল!'

ফোনের স্ক্রিনে অভিজিতের নাম। বিভা মোবাইল হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধুদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ছাদের রেলিঙে।

– 'হ্যালো!'

– 'বিভাবরী! আছেন কেমন?'

– 'সারাদিনে এই আপনার সময় হল?'

– 'ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম।'

– 'রাতে খেয়েছেন?'

– 'হুম খেলাম তো!'

'কী রান্না করেছে আজ দূর্গা?'

– ‘চিংড়ির চচ্চড়ি, আলুর দম।’

-’ বাহ্, বেশ ভালোই তো।’

– ‘আপনার কী খবর?’

– ‘আমরা এখন সামিদের বাসায়। দুদিন বাদে ওর এনগেজমেন্ট। আন্টি বলেছেন আমাদের আজ রাতটা থাকতে হবে, উনাকে হেল্প করতে হবে মেয়ের তত্ত্বব গোছানোর কাজে।’

– ‘তাই?’

– ‘হুম। আপনি কবে আসছেন?

৩৯১

– ‘কোথায়?’

– ‘ঢাকায়?’

– ‘আমি আসব কেন? আমি তো নেমন্তন্ন পাইনি।’

বিভা একটু ফ্যাকাশে হাসল, ‘দাওয়াত পেলে আসবেন কি?’

– ‘সে ভেবে দেখা যাবে। আগে পেয়ে নিই।’

– ‘তা আপনার সব ঠিকঠাক চলছে, তাইনা?’

অভিজিৎ ধীরে ধীরে বলল, ‘ঠিক না থাকলে খুশি হতেন বুঝি?’

– 'না, তা কেন?'

– 'আপনার বন্ধুরা কেমন আছে?'

– 'ভালোই।'

– 'আপনি যে মিশন নিয়ে ঢাকা গেলেন। সেই মিশন তো সাকসেস ফুল হল না।
'

– 'সে আশায় গুড়ে বালি! হৃদি তো সামির কাছে কনফেস করবে না। আর সামি এমন গাধার বাচ্চা গাধা, সে বুঝতেই পারছেনা যে সে আসলে হৃদিকেই চায়।'

– 'সে বোঝেনি, আর আপনারা সবাই মিলে বুঝে বসে আছেন। চমৎকার!'

– 'আপনার আমাকে তুমি সম্বোধন করার কথা ছিল।'

অভিজিৎ চুপ। বিভাও চুপ। খানিক দূরে বন্ধুদের দলটায় হাসির হিড়িক লেগেছে। হো হো করে ডাকাতিয়া হাসি হাসছে সবকটা মিলে। অভিজিৎ সেই হাসির শব্দ শুনতে পেয়ে বলল, 'খুব মজায় আছ দেখছি তোমরা।'

– 'হুম, ঐগুলার আর কোনো কাজ নাই সারাদিন হি হি করা ছাড়া। তুমি চলে আসো। ভালো লাগবে।'

– 'আচ্ছা বিভা, তুমি কি আমাকে মিস করছ?'

বিভা বিষাদ মাখা গলায় বলল, 'মিস করছি বলেই তো বার বার আসতে বলছি। তুমি কি এটা বোঝোনা?'

– 'আমি আসলে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছিনা।'

– 'কী বুঝতে পারছোনা?'

– 'তোমার এক্স বয়ফ্রেন্ডের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা সময়ে তুমি আমাকে মিস করছ? এটা কী করে সম্ভব?'

৩৯২

বিভা এ প্রশ্নের উত্তরটা তাৎক্ষণিক ভাবে দিতে পারল না। এখানে আসবার পর থেকে সে একটা সূক্ষ্ম ব্যাপার খুব ভালো মত টের পাচ্ছে যে, শারীরিক ভাবে কাছে আসা আর মানসিক ভাবে কাছে আসার মধ্যে আসলে বিস্তর তফাৎ। অভিজিতের সাথে একই ছাদের নিচে বসবাস কালীন সময়ে তারা দুজনে শুধুমাত্র শারীরিক ভাবেই কাছে এসেছিল। মানসিক ভাবে নয়। কিন্তু এত দূরে চলে আসার পর, শরীর যখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল তখন হাত বাড়িয়ে সে কেবল ওই মানুষটার মনটাকেই ছোঁয়ার চেষ্টা করল। কতটুকু পারল কে জানে! কিন্তু তার মনে হল যেন শারীরিক দূরত্ব কিছুটা হলেও মানসিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে।

–চুপ করে আছ যে?’

– ‘সামির বিয়েটা আমার মধ্যে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলছেনা।’

– ‘এটা মিথ্যে কথা। নিজেকে ধোঁকা দিচ্ছ তুমি বিভাবরী!

– ‘মিথ্যে নয়। জানিনা কাল পরশু কী রকম লাগবে, তবে আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে হচ্ছে যে ভগবান যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। এখানে আসবার পর থেকে বন্ধুদের সাথে এবং বাবা মায়ের সাথে খুব ভালো সময় কাটাচ্ছি এ কথা ঠিক। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ছে। এই মনে পড়াটাকে তুমি কিভাবে সংজ্ঞায়িত করবে জানিনা। এটা যদি মিস করা হয় তাহলে হ্যাঁ, আমি তোমাকে মিস করছি।’

অভিজিৎ চুপ করে থাকে। বিভা বলে, ‘তোমার কি আমাকে মনে পড়ে?’ অভিজিৎ একটা বড় শ্বাস ফেলে, ‘পড়ে!

– ‘সেই মনে পড়াটা কি শারীরিক, নাকি মানসিক?’

– ‘আমাকে কি তোমার শরীর সর্বস্ব বলে মনে হয়?’

– ‘না, তা কেন?’

– ‘তাহলে এই প্রশ্নটা কেন করলে?’

– ‘বুঝতে চাইছি তোমাকে। বুঝতে চাইছি যে আমার প্রতি তোমার আকর্ষণটা শুধুই ফিজিক্যাল নাকি মনের দিক থেকেও কোন টান আছে।’

– ‘মন এবং শরীর তো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল, তাইনা? চন্ডীদাসের রজকিনী প্রেম বলতে তো কোন বস্তু আসলে বাস্তব পৃথিবীতে নেই।’

– ‘রজকিনী প্রেম কী?’

– চন্ডীদাস বলেছেন, রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।’

– ‘ও বুঝতে পেরেছি। প্লেটোনিক লাভ।’

৩৯৩

– ‘হ্যাঁ প্লেটোনিক লাভ। আসলে ওসব ন্যাকামো ছাড়া কিছুইনা। শরীর বর্জিত প্রেম সম্ভব না। আবার মনের প্রভাব না থাকলে রোমান্টিসিজম ব্যাপারটা আসবেনা। রবীন্দ্রনাথই যথার্থ বলেছেন যে, প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়। লোভের কাছে তার স্থুল মাংস।’

1

বিভা চুপ করে থাকে। অভিজিৎ বলে, ‘এই সবকিছুর বাইরে মানুষের সাথে মানুষের আরেকটি সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কটা বিশ্বাস, স্বস্তি এবং নির্ভরশীলতার। আমি তোমাকে সেই সম্পর্ক দিয়েই বাঁধতে চাই বিভা এইযে তুমি এতো দূরে তোমার প্রাক্তন প্রেমিকের বাড়িতে গিয়ে সময় কাটাচ্ছ, বিষয়টি ভালো না লাগলেও, এ নিয়ে

তোমাকে আমার কিছুই বলার নেই। কারণ আমি জানি, এক সঙ্গে বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে বিশ্বাস আমার করতেই হবে। সংসার করার জন্য রোমান্টিকতার চাইতেও বেশি জরুরি হল বোঝাপড়া। বোঝাপড়া থেকেই স্বস্তি আসে, আর স্বস্তি থেকে সুখ। ’

বিভা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘এতো কঠিন কঠিন কথা এখন বলতে ভালো লাগছেনা অভি! তুমি চলে আসো। আমার… আমার তোমাকে প্রয়োজন।

অভিজিৎ জানে, বিভা আর যাই করুক না কেন, মিথ্যা কথা বলা তার ধাতে নেই। মনে পড়ে, বছর দেড়েক আগে বাংলাদেশে এক গ্রীষ্মের দুপুরে একটি অসম্ভব সুন্দর মেয়েকে ময়ূরের মত নাচতে দেখেছিল সে। সেদিন থেকে সেই মেয়েটিকে নিজের করে পাবার এক অদম্য বাসনা চেপে বসেছিল মন গভীরে। সেই মেয়েটা আজকে থেকে তার!

৩৯৪

নিজের বেডরুমে এসে রোমেলা স্বামীকে বললেন, ‘ছেলের মতিগতি তো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। চিন্তায় আমার মাথা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে। প্লিজ তুমি কিছু কর!’

হক গায়ে জড়ানো চাদরটা খুলে চেয়ারের হাতলে রাখলেন। কুঞ্চিত ভ্রু নিয়ে বসলেন চেয়ারে। দুশ্চিন্তায় তার মাথার রগ দপদপ করছে। আগামী কাল বেলা এগারোটায় সংসদে অধিবেশন আছে। বিকেলে আছে আরো দুই জায়গায় সভা। বেশ কিছু কাজ তার আজ রাতের মধ্যে গুছিয়ে নেয়া দরকার। বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় ফোন কল করা দরকার দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে। এসব কিছুই করার মতো মনোবল

পাচ্ছেন না তিনি। একটু আগে ফোন এসেছে তার ফুপু আম্মার শরীর বিশেষ ভালো না। ডাক্তার আর মাস চারেকের মতো সময় বেঁধে দিয়েছে। এটি একটি বড় ধরণের দুঃসংবাদ। এই দুঃসংবাদ শোনার পর থেকে তাঁর মনটা অত্যধিক খারাপ হয়ে আছে। তিনি স্ত্রীকে বললেন,

– ‘ফুপু আম্মার শরীর ভালো না। ডাক্তার বলেছে সময় খুব একটা নেই হাতে।’

রোমেলা অস্ফুটে বললেন, ‘আহারে! ইশ!’

– ‘ফুপু আম্মাকে এই কয়েক মাস আমার বাড়িতেই রাখতে চাই। এ সময় গ্রামে গেলে চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটবে। আগামীকাল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে।

– ‘সামনে আমার ছেলের বিয়ে। এ সময় বাড়িতে একটা অসুস্থ মানুষ এসে পড়ে থাকবে। কেমন লাগে ব্যাপারটা?’

– ‘তাহলে কী করা উচিৎ বলে মনে হয় তোমার?’

– ‘আমার প্রব্লেম ছিল না। কিন্তু একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা। তুমি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছনা?’ এটুকু বলে তিনি একটু থামলেন। পরমুহূর্তেই আবার অধৈর্য ভাবে বলে উঠলেন, ‘কিন্তু আমার ছেলেটার কী

৩৯৫

হবে? নিজের ছেলেটাকে নিয়ে একটু ভাবো, বুঝলে? সারা জীবন তো শুধু মানুষের জন্যেই করে গেলে।’

হক একটা প্রলম্বিত নিশ্বাস ফেললেন। এই রমণীটি সংসারের কোন সমস্যাই নিজ উদ্যোগে, নিজ বুদ্ধিতে সমাধান করতে পারেন না। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি স্বামীর উপর নির্ভরশীল। মাঝে মাঝে তাঁরও তো ইচ্ছে করে মাথার দুশ্চিন্তা গুলো সরিয়ে রেখে অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে। ছেলেটিও হয়েছে আস্ত একটা রাম গাধা। ভেবেছিলেন, পড়াশোনা শেষ হলে ব্যবসার কোন একটা দিক ছেলের হাতে তুলে দেবেন। তা করা গেলে অন্তত একটা দিক দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারতেন। ছেলের যে যোগ্যতা নেই তা কিন্তু না। ছেলের মাথা ভালো। প্রপার গাইডনেস পেলে ছেলেটা তাঁর ঠিকই মানুষের মতো মানুষ হত। তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই ক্যারিয়ারের পেছনে ছুটেছেন। ছেলেকে সেভাবে সময় দিতে পারেন নি। মা হিসেবে রোমেলা যদি সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারত, তাহলে আজ এই দিন হয়তো তার দেখতে হতো না।

তিনি স্থির কিন্তু তীক্ষ্ণ ভাবে কিছুক্ষণ রোমেলার দিকে তাকিয়ে থেকে কখনো যা বলেন না, আজ তাই-ই বলে ফেললেন,

– ‘আমার কী করার আছে এখানে? তুমি তো মা! খোলামেলা কথা বললেই পারো নিজের ছেলের সাথে। আর এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নেবার আগে তোমার কি উচিৎ ছিল না, ছেলের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া?’

রোমেলা ঝেঁঝে উঠে বললেন, ‘এখন আমার দোষ?’

– ‘দোষ গুণের কথা নয়!’

– ‘তাহলে আমাকে কথা শোনাচ্ছ কেন তুমি? তোমার ছেলের ঐসব বন্ধুবান্ধবীর দলটাকে আমি শুরু থেকেই পছন্দ করিনা। এইসব মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলেমেয়েরা মনের মধ্যে নানারকম ধান্ধা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সারাক্ষণ। কে জানে হৃদি মেয়েটা ইচ্ছে করে কোন ষড়যন্ত্র করছে কিনা! আমার তো সন্দেহ হচ্ছে।’

হক চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে গালে হাত দিয়ে বসে ছিলেন। সামির বন্ধুদের তিনিও খুব একটা পছন্দ করতেন না কোন কালে বরং সব সময় এই দলটা থেকে ছুটে আসার পরামর্শই দিয়ে এসেছেন তিনি নিজ পুত্রকে। কিন্তু ইদানিং তাঁর মনে হয় ওই ছেলেমেয়ে গুলো আর যাই করুক না কেন, সামির কোন ক্ষতি সাধন করা তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হবেনা। সামিকে ওরা বাস্তবিকই ভালোবাসে।

৩৯৬

রোমেলা বলতে থাকলেন, ‘ওর বন্ধুগুলা একটার থেকে একটা কিম্ভুত। রুদ্র ছেলেটাকে দেখেছ তুমি? কী রকম পাগলের মতো চুল দাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। আর আরেকজন তো ছেলে নাকি মেয়ে তা বুঝে ওঠাই মুশকিল। মেয়েমানুষ হয়ে ছেলেদের পোশাক পরে ঘুরে বেড়ায়। কী অদ্ভুত লাগে দেখতে! আজকে আবার দেখি ড্রইং রুমে পায়ের ওপর পা তুলে বসে সব মুরুব্বিদের সাথে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলছে! ভারী বেয়াদব কিন্তু মেয়েটা। আমার একদম পছন্দ না ওই মেয়েটাকে।’

হক একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে হাত ঘড়ি দেখলেন। প্রসঙ্গটা তাঁর ভালো লাগছিলো না। বিশেষ করে অমৃতাকে নিয়ে তাঁর স্ত্রীর মাত্র বলা কথা গুলোয় তিনি কোন ভাবেই একমত হতে পারলেন না মনে মনে। বসা থেকে উঠে পড়লেন। কাজ গুলো এখন সেরে না নিলেই নয়।

রোমেলা আর কথা না বাড়িয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে নিজের সাজসজ্জা খুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি জানেন তাঁর স্বামীর সাথে এখন কোন সাংসারিক আলাপ করা বৃথা। উনাকে এখন কাজে পেয়েছে। এই লোকের একটাই দোষ, কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না ইনি। কাজ নিয়ে কেমন নেশাড়ু মাতাল হয়ে থাকে সারাটাক্ষণ। মাঝে মাঝে রোমেলার মনে হয় এই মানুষটা যেন অন্য জগতের বাসিন্দা। ধন, সম্পদ, প্রাচুর্য সমস্ত কিছু দিয়েও লোকটা যেন কিছুই আদতে দেয় না তাকে। জীবনের রাস্তায় দুজনে চমৎকার ভাবে পাশাপাশি হেঁটে গেছেন বছরের পর বছর, কিন্তু মনের রাস্তাটা বরাবরই ছিল বড় কুহেলিকা ময়, ঝাপসা! তবে এসব নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবেন না। লোকটা একটু অমন ধারাই। তাঁর জীবনের একমাত্র ভালোবাসা হল কাজ, কাজ আর কাজ। সাংসারিক দায়িত্ব পালনে তাঁর কোন কার্পণ্য নেই। স্ত্রী, পুত্রের প্রতি তিনি সর্বদা যত্নশীল। তাদের সাধ আহ্লাদ পূরণে কখনওই কোন কমতি রাখেননি। পরিচিত জনদের মধ্যে অনেকেই রোমেলার কপাল দেখে হিংসে করে। এমন রাজরাণীর নসিব সবার হয় না। তাঁর স্বামী সুদর্শন, সম্পদশালী, খ্যাতিমান এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। সবকিছুর এমন চমৎকার কম্বিনেশন কজনের জীবনে থাকে? তাছাড়া লোকটার চরিত্রগত দিক দিয়ে কোন সমস্যা নেই। অনেক সময় অনেক মেয়েরা তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করেছে, রোমেলা সে খবর রাখে। কিন্তু তাঁর স্বামীর মেয়েমানুষের বাতিক নেই। এই একটা দিক দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। ভালোবাসাটা সেরকমভাবে টের পান নি কোনদিন লোকটার প্রতি

৩৯৭

এ কথা সত্য, কিন্তু ভরসা আছে ষোল আনা। তবে ভালোবাসা রোমেলার জীবনেও এসেছিল। আবার চলেও গেছে থাক ওসব ভেবে আর কাজ নেই। এক জীবনে সবার সব কিছু মন মতো হয়না। যা গেছে তা একেবারেই গেছে! তিনি তো দিব্যি ভালো আছেন। শুধু ছেলেটার জন্যেই একটা দুশ্চিন্তা বুকের মধ্যে কাঁটার মতো লেগে থাকে সর্বক্ষণ। আল্লাহ তাঁর ছেলেটার একটু সুমতি দিক।

ড্রইং রুমের কার্পেটের ওপর এক গাদা শাড়ি কাপড় বোঝাই করে রাখা হয়েছে। সাথে আছে নানা ধরণের নামি দামি বিদেশী ব্র্যাণ্ডের কসমেটিক্স। হরেক রঙের, হরেক আকারের ডালা কুলায় শাড়ি, সালওয়ার কামিজ, কসমেটিক্স একে একে গুছিয়ে রাখা হবে এখন। যে পরিমাণ জিনিস আছে তাতে মনে হয় পঞ্চাশটার মতো ডালা লেগে যাবে। সামির খালাতো বোন গত সপ্তাহে ইন্ডিয়া থেকে সমস্ত শপিং করে এনেছে। সেই খালাতো বোন নিজে এখন উপস্থিত নেই। জিনিস পত্র বাঁধাই করছে সামির বন্ধুরা। সামিও উপস্থিত আছে। রোমেলা খানিক বাদে বাদে এসে তদারক করে যাচ্ছেন। বন্ধুরা হাসিমুখে কাজ করছে। হৃদিকে শুধু অত্যধিক ম্লান দেখাচ্ছে। তার একটা বড় দোষ হল সে কান্না লুকোতে জানেনা। যেখানে সেখানে, যখন তখন ঝরঝর করে ঝরতে থাকে অশ্রু ধারা। কোন মতেই চোখের জলের লাগাম টেনে ধরতে পারেনা সে। এখন ঝাপসা চোখে কসমেটিকসের ডালায় ইস্কচটেপ লাগাচ্ছে। ছাদের ওপর সামির বলা শেষ কথাটা বুকের পাঁজরে ঠক ঠক করে পেরেক ঠুকে যাচ্ছিল ক্রমাগত। বিভার সব দোষ, এই কথাটা দিয়ে সামি কী বোঝাতে চাইল? প্রথমে মনে হয়েছিল হৃদির সাথে ফোনে কথা বলায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে বলেই তার রাগ। কিন্তু সবশেষে বিভার ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়া থেকে কি এটাই প্রকাশ পায় না, যে বিভার প্রতি সে এখন অবধি দুর্বল? হ্যাঁ তাই তো! এ কথাতো দিনের আলোর মত পরিষ্কার যে সামি এখনো বিভাকে, শুধু বিভাকেই ভালোবাসে! হৃদি কোথাও কখনো ছিল না। থাকবেও না!

বসার ঘরে সবার সামনে ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে সে মনে মনে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। সে ঠিক করল সামির সাথে রাতের বেলা কেন, কোন বেলাতেই সে আর কোন দিন ফোনে কথা বলবেনা। বন্ধু হলেই যে ফোনে কথা বলতে হবে এমন নিয়ম নেই। ফোনে কথা না বলেও বন্ধু হয়ে থাকা যায়।

হৃদির কান্নাটা সকলের দৃষ্টি কাড়ল। সামি বিরক্ত গলায় বলল, 'সব সময় এরকম ফিচফিচ কইরা কান্দস ক্যান তুই? এখন ক্যান কানতেছিস?'

আকাশ উঠে এসে হৃদির পাশে বসল। ওর মাথায় একটা হাত রেখে কোমল ভাবে বলল, 'দোস্ত, কী হইছে তোর? মন খারাপ হইছে কেন? আমাদেরকে বল।'

হৃদি কিছুই বলল না। ঠোঁট কামড়ে কান্না গেলার বৃথা চেষ্টা করল শুধু। অমৃতা বলল- 'তানিশার কথাটা ওর খারাপ লাগছে। এইজন্যেই কানতেছে।

সামি অসহিষ্ণু গলায় হৃদিকে বলল, 'আরে আজব, তানিশা বললেই কি আমি তানিশার কথা শুনতেছি নাকি? আমি কি একবারও বলছি যে আমি

তোর সাথে কথা বলা বন্ধ করব?'

– 'তুই কে বলার হ্যাঁ? আমি বলতেছি তুই শুনে রাখ কান খুলে। আজকের পর থেকে আর কখনো তুই আমাকে ফোন দিবিনা। খবরদার! তোর সাথে আমি মরে গেলেও কখনো ফোনে কথা বলব না।'

চিৎকার করে কথাগুলো বলা শেষ করে, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ঘর ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল হৃদি। সামি পাথর হয়ে গেল। তার মুখখানা কিঞ্চিৎ হা। চোখ বিস্ফোরিত।

বাকি বন্ধুরাও বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কেউ কোনো কথা বলতে পারছিল না। বেশ অনেকটা ক্ষণ পরে সামি দিশাহারা হয়ে স্বগতোক্তি করল, ‘আমি কী করলাম বুঝলাম না। মানে আমার ফল্টটা কী?’ কথাটা বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। মনের সাথে সাথে তার শরীরটাও এখন খারাপ লাগছে। ক্লান্তি আর অবসাদে ভেতরটা বিধ্বস্ত।

হৃদি কেন তার ওপরে রাগ করছে? এখানে তার দোষটা কোথায়? দোষ করেছে তানিশা কিন্তু শাস্তি পাচ্ছে সে। এটা কি ঠিক? নিজের মনে মাথা নাড়ে সামি। কিছু একটা গড়মিল হচ্ছে। হিসাব মিলছেনা। না মেলা হিসেবটা তার স্বস্তি কেঁড়ে নিচ্ছে। হৃদিকে ক্রমাগত ফোন করে যাচ্ছে সে। হৃদি ফোন ধরছেনা। এ বাড়িটা এতো বড় যে, এর সীমানার ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা খুব সহজ। হৃদি কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে আল্লাহ জানে! সামি নিজের মনে বিড়বিড় করে, ‘আশ্চর্য মেয়েতো! উধাও হয়ে গেল নাকি?’

এরপর দিশাহারা হয়ে সারা বাড়িময় পাগলের মতো খুঁজতে লাগল সামি সেই আশ্চর্য মেয়েটাকে

৩৯৯

রোমেলা এক বস্তা কাপড় চোপড় নিয়ে উপস্থিত হলেন ঘরের ভেতর। বস্তা থেকে শাড়ি বের করতে করতে বললেন, ‘মেয়েরা শাড়ি বেছে নাও তোমাদের পছন্দ মতো। ’

অমৃতা তো শাড়ি পরেনা। আর হৃদি এখানে উপস্থিত নেই। তাই বিভাই এগিয়ে এলো। মনোযোগ দিয়ে শাড়ি বাছতে লাগল। বাছতে বাছতে অমৃতাকে বলল, ‘অমৃতা, সামির এনগেজমেন্ট উপলক্ষে তুই একটা শাড়ি পর।’

অমৃতা হাসে, ‘মাথা খারাপ!’

সামির আম্মা বললেন, ‘হ্যাঁ, তোমার জন্যেও একটা শাড়ি রেখেছি আমি। বেছে নাও। তুমি না পরলে তোমার মা কিংবা বোনকে দিয়ে দিও। আমার তরফ থেকে উপহার।

রোমেলার হাসি মুখের মিঠা কথা শুনে কেউ ধারণাও করতে পারবেনা একটু আগে তিনি নিজের বেডরুমে বসে এই মেয়েটিকে নিয়ে কতটা কঠোর সমালোচনা করেছেন। অমৃতার অবশ্য এসব কিছুতেই মন লাগছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিলো যে এতো কাছে থেকেও একটা মানুষ কী করে এতটা দূরের হতে পারে! সে জানে ওপরতলাতেই তিনি আছেন। চাইলে এক ছুটে দৌড়ে চলে যেতে পারে সে মানুষটার কাছে। কিন্তু দুজনের মাঝখানে এতো বড় অদৃশ্য এক সীমানা কাটা আছে যে, হাজার চাইলেও সেই সীমানা অতিক্রম করা সম্ভব না। থেকে থেকে সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। এমনই অন্যমনস্ক যে নিজের কাজের কথাও ভুলে যাচ্ছিল বারংবার। কাল বেলা তিনটায় তার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুট কোর্ট ক্লাবে যেতে হবে। সেখানে একটা প্রেজেন্টেশন আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে টানা পাঁচটা বছর সে নিয়মিত মুটার ছিল। একবার আন্তর্জাতিক পর্যায়েও বিজয়ী হয়ে এসেছে। এখনো ক্লাব থেকে প্রায়ই ডাক পড়ে নানা সেমিনারে কিংবা প্রতিযোগিতায়। কালকের প্রেজেন্টেশনের জন্য তার প্রস্তুতি প্রয়োজন। সকালে কোর্টে যেতে হবে অতএব সকাল বেলা প্রস্তুতি নেবার

কোন সময় পাওয়া যাবেনা।

দেখা গেল ছেলেদের জন্যেও আছে পাঞ্জাবি। রুদ্র আর আকাশকে বলা হল পাঞ্জাবি পছন্দ করে নিতে। কিন্তু পাঞ্জাবির দিকে তাদেরকে সেরকম মনোযোগ দিতে দেখা গেল না। ওদের ভাবসাব দেখে মনে হল পাঞ্জাবি পছন্দ করার চাইতে ডালা প্যাকিং করাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক।

অমৃতা দীপার জন্য একটা শাড়ি বেছে নিল। সাদা নেটের ওপর সোনালী এমব্রয়ডারি কাজ করা। দিপাকে এক্ষুণি সে শাড়িটার ছবি তুলে

৪০০

পাঠাবে। ছবি দেখেই দীপা খুশিতে বানভাসি হয়ে যাবে। ছবি তোলার জন্য পকেট হাতড়ে মোবাইলটা বের করতে গেল সে। কিন্তু মোবাইল সেখানে নেই। খুব সম্ভবত পাশের ঘরে ডাইনিং টেবিলের ওপর রেখে এসেছে। শাড়িটা বুকে জড়িয়ে ধরে বসা থেকে উঠে দাঁড়াল সে। ড্রইং রুম থেকে বেরোতেই সদর দরজার সামনে মানুষটার মুখোমুখি পড়ে গেল, দৈবাৎ! হৃৎপিণ্ড খামচে ধরল কে যেন। এক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস গেল আটকে

– ‘হাই!’

– ‘হ্যালো।’ হাসলেন তিনি।

– ‘কোথায় যাচ্ছেন?’

– ‘যাচ্ছি আমার লাইব্রেরীতে। একটা কাজে। তুমি আমার লাইব্রেরীটা দেখেছ কখনো?’

– ‘না!’

– ‘চাইলে আসতে পার।

বুকের সাথে দুহাত দিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে ধরে রেখে অমৃতা আগ পিছ কিছু চিন্তা না করেই পা বাড়ায় সামনে। সদ্য বয়ঃসন্ধি পেরোনো কিশোরীর মতো অকারণ উচ্ছ্বাসে উথলে উঠে ঘোর লাগা গলায় বলে, ‘চলুন!’

৩৩

‘অনেক কাজ করছি। আর না!’ কথাটা বলে রুদ্র গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে থাকা আউল বাউল চুলগুলো হাত দিয়ে সুবিন্যস্ত করার চেষ্টা করল। তারপর গোমড়া মুখে বলল, ‘এখন কিছু খাওয়া দরকার।’

– ‘কীসের কাজ শেষ? আরো কত কিছু পইড়া আছে দ্যাখোস না?’ ঝেঁঝে উঠল বিভা।

রুদ্র মুখে গম্ভীর ভাবটা বজায় রেখেই আদেশ দিল, ‘ঐগুলা সবাই ভাগাভাগি কইরা বাড়িত নিয়া যা।’

আকাশ সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, চোখ বড় করে বলল, ‘নট আ ব্যাড আইডিয়া!’

– ‘এসব কথা বলিস না, পরে সামির আম্মা তোদের চোর বলবে।’ অনেকটা ফিসফিস করে বলল বিভা।

– ‘বললেই কী? এতক্ষণ এত কিছু গুছায় দিলাম এখন এই কয়টা জিনিস আমরা ভাগা ভাগি কইরা নিতেই পারি। তবে সব তো মাইয়াদের জিনিস আমাদের তো নেয়ার মত কিসু নাই।’

আকাশ বলল, ‘নিয়া নে, মনীষারে গিফট কইরা দিস।’

বিভা একটা মাঝারি আকারের ডালায় তখন পান সাজাচ্ছিল। আকাশের কথাটা শুনে হাতের কাজ থামিয়ে সে নাক কুঁচকে বলল,’তোদের এই অবস্থা কেন? এতদিন মেয়ে দেখলে লুনুষগিরি করছস। এখন মেয়েদের জিনিস দেইখাও লুনুষগিরি করতেছস। প্রব্লেম কী?’

রুদ্র বিভার কথা পাত্তা দিলোনা, খুব করুণ ভাবে বলল, ‘খাওয়া দরকার কিছু।

বিভা রুদ্রর পাতলা গড়নের শরীরটার দিকে তাকিয়ে খিটখিট করে উঠল, ‘এতো খাস, তাও মোটা হস না কেন? তোর পেটে কি কৃমি আছে?’

রুদ্র চোখ পাকিয়ে বলল, ‘ফালতু কথা বলিস কেন?’

– ‘ফালতু কথা না, সত্যি। সারা দিন রাক্ষসের মত খাই খাই করিস, কিন্তু শরীরে লাগেনা কিস্স! নিশ্চয়ই পেটে কৃমি আছে।’

রুদ্র ভীষণ বিরক্ত গলায় বলল,’মোটেও আমার পেটে কৃমি নাই। তর পেটে আছে। শালী মুটকি! আমার স্লিম ফিগার দেইখা হিংসা হয়, না? সব বুঝি।’

বিভা রাগে ফেটে পড়ে একদম, 'কী বললি? আমি মুটকি? আমাকে তর মুটকি লাগে দেখতে?'

– 'তা নয়তো কী? মনীষারে দেখছিস তুই? কী ফিট! ঐরকম হইতে পারিস না?'

বিভা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'রুদ্রর বাচ্চা, আমি একটুও মোটা না। আমার সব কিছু ঠিকঠাক আছে।'

রুদ্র বাঁকা ভাবে বিভার পেটের দিকে চোখ দিয়ে বলল, 'তর যে ভুঁড়ি হইছে সেই খবর আছে?

বিভা চকিতে নিজের পেটের দিকে তাকাল। পরনের টপ আঁটসাঁট হয়ে লেগে আছে কোমরের সাথে। বসার ভঙ্গির কারণে তল পেটের দিকটা একটু ফেঁপে আছে। সে নড়েচড়ে বসে, নাকের পাটা ফুলিয়ে, ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আমি গত এক মাস ধইরা ডায়েট করতেছি। তর মত সারাদিন খাই খাই করিনা। মেপে মেপে খাই। আমার মোটা হওয়ার কোন চান্সই নাই। তুমি তো অপুষ্টিতে ভুগো। তোমার পেটের কৃমি সব পুষ্টি নিয়ে নেয়। এইজন্যে আমার সুঠাম সুন্দর সবল দেহ দেখে তোমার হিংসা হচ্ছে।'

– 'আহা হা হা! যা সুঠাম দেহ! তর বডি স্ট্রাকচারে প্রব্লেম আছে। তুই সেটা জানিস না।'

বিভা হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ায়। কোমরে হাত রেখে রোষানলে জ্বলতে জ্বলতে আকাশকে বলে, ‘তুই দেখছিস? ও কেমনে আমাকে অপমান করতেছে? তুই কিছু বলবিনা?’

আকাশ উদাস গলায় বলল, ‘অপমানের কী আছে? ওর কাছে যা মনে হইতেছে, তাই বলতেছে। এইটা নিয়ে এতো কিচকিচ করার কী আছে?’

বিভা দাঁত কিড়মিড় করে রুদ্রকে বলল, ‘তুই একটা এসহোলের বাচ্চা। তর পেটে যে শুধু কৃমি আছে, তাইনা। তুই নিজেও একটা কৃমি। ফালতু, নষ্ট, লুনুষ দি গ্রেট… ’ রুদ্র একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘হায়রে সত্য বলাই পাপ এই দ্যাশে। ফ্রিডম অফ স্পিচ বইলা কিছু নাই আসলে।’

বিভা তখনও রাগে গজগজ করতে করতে গালি দিয়েই যাচ্ছে, ‘লুনুষ নাম্বার ওয়ান! মনীষার উচিৎ তরে উঠতে বসতে লাখি মারা। জীবনেও ওই মেয়ে তোর সাথে প্রেম করবেনা। অভিশাপ দিলাম আমি। আমার অভিশাপে ছারখার হয়ে যাবি তুই। আমাকে মোটা লাগে তোর? দেখিস তোর বউ হবে আস্ত একটা হাতি। তারপর সারাদিন তুই আর তোর হাতি বৌ মিলে খাই খাই খাই খাই করবি। খাবি আর ফুলবি।’

সামির আম্মা ঘরের ভেতর পুনরায় প্রবেশ করলেন। ঢুকেই বললেন, ‘শাড়ি গুলো সামির কাজিনরা এসে প্যাক করবে আগামী কাল। তোমরা শুধু কসমেটিক্স গুলোই কর আজ। কেমন?’

কথাটা বলে তিনি সোফার ওপর বসলেন। বিভা রোমেলাকে দেখে রাগটা হজম করল কোনোমতে। কার্পেটের উপরে বসে পড়ে পুনরায় কাজে হাত দিল। আকাশ আর রুদ্রও কাজে লেগে গেল।

– ‘বাকিরা সব কোথায়?’ রোমেলার প্রশ্ন।

বন্ধুরা উত্তর দিতে পারল না। তারা জানেনা অমৃতা, সামি আর হৃদি এই মুহূর্তে কোথায় কী করছে? বিভা ফোন হাতে নিয়ে বলল, ‘আমি দেখছি।’

হৃদি আর সামিকে ফোন করে পাওয়া গেল। তারা জানালো মিনিট দশেকের মধ্যে আসছে। পাওয়া গেল না শুধু অমৃতাকে। ফোন করতেই তার মোবাইল বাজতে লাগলো ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর। অর্থাৎ মোবাইলটা এখন তার সাথে নেই।

রোমেলা চুপচাপ বসে বিভাকে দেখছিলেন। বিভা মনোযোগ দিয়ে পানের ডালা সাজাচ্ছে। এই মেয়েটি নিঃসন্দেহে সুন্দরী। কিন্তু রূপবতী হলে কী হবে? নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। অন্য ধর্মের না হলে এর সাথে তার ছেলের বিয়ে হয়তো কোনো ভাবেই আটকানো যেতো না। কিন্তু সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে এই মেয়েটির পরিবার কোন ভাবেই তাদের সাথে মানানসই নয়। ভাগ্যিস ছেলেকে শেষমেশ ফেরানো গেল। তার একটা মাত্র ছেলে। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যে এই মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়েটির ছত্র ছায়া থেকে তার ছেলে বেরিয়ে এসেছে। তার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে গেল, অজান্তে।

হৃদিকে পাওয়া গেল দোতলার লিভিং রুম সংলগ্ন ঝুল বারান্দায়। এই বারান্দাটা পেছন দিকে। বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে সারি বদ্ধ ভাবে বেড়ে ওঠা তিন চারটি

কৃষ্ণচূড়া গাছ। গাছ গুলোর ওপাড়ে একটা ছোট গোল বারান্দা ওয়ালা দোচালা ঘর। হৃদি ওই ঘরটাতে কোন দিন যায়নি। এমনকি ওই জায়গায় যে একটি ঘর আছে এ তথ্যটাই তার জানা ছিল না এতকাল।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল সে বারান্দার রেলিং এ ভর দিয়ে। কানে মোবাইল। মা ফোন করেছেন।

– 'ওই ছেমড়ি! কী করতেছিস?'

সামির ধারালো প্রশ্নটা শুনে ঘাড় ঘুরালো হৃদি। ফোন কানে ধরেই বলল, 'আচ্ছা এখন রাখি··· হ্যাঁ কাল দুপুরের মধ্যে চলে আসব··· ঠিক আছে। ভালো থাকো।'

সামি তারস্বরে পুনরায় প্রশ্ন করল, 'কার সাথে কথা বলিস?'

হৃদি কান থেকে ফোন নামিয়ে বলল, 'মা।'

– 'ও।'

– 'রাহাত ভাই আসছে দেশে। কালকে আমাদের বাসায় আসবে।'

– 'রাহাত ভাইটা আবার কে?'

– 'আমার কাজিন।'

– 'ও, সেই ডাক্তার?'

– 'হুম।'

–কেন আসবে তোদের বাসায়?’

– ‘বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবে মনে হয়।’

– ‘বিয়ে করার জন্য এতো পাগল হইছিস ক্যান?’

– ‘তোরা সবাই বিয়া কইরা ফেলতেছিস। আমি বইসা থাকব?’

– ‘অমৃতা, আকাশ, রুদ্র ওরা তো বইসাই আছে। তোর এতো কী?’

– ‘ফ্যামিলি থেকে প্রেশার আসতেছে।’

– ‘তুই কেন বলছিস আমার সাথে ফোনে কথা বলবিনা?’ হঠাৎ অন্যরকম শোনায় সামির গলা।

– ‘তোর বউ নিষেধ করল, শুনিসনাই?’

– ‘আমার বৌরে কি তুই জীবনের দেবতা বানাইছস? কবে থেকে বানাইলি?’

হৃদি একটু ম্লান ভাবে বলল,’দেবতা বানানোর কিছু নাই। আফটার অল সে তোর লাইফ পার্টনার হইতে যাচ্ছে। সো আমাদের উচিত তার ইচ্ছা অনিচ্ছা এবং মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।’

– ‘বিয়া কি আমি করতেছি নাকি তুই করতেছিস?’

– ‘তুই করতেছিস, আর তোর উচিত তোর বৌয়ের মতামতকে প্রাধান্য দেয়া।’

– ‘আমি আমার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ করতে পারব না।’ গোঁ ধরা গলায় বলে সামি।

-'ফ্রেন্ডের চাইতে লাইফপার্টনারের গুরুত্ব অনেক বেশি।'

-' বেশি কথা বলবিনা। ফোন দিলে ফোন ধরবি।

– 'জীবনেওনা।'

– 'মানে কী?'

– 'মানে আমি মনে মনে শপথ নিয়া ফ্যালাইছি। তোর সাথে আমি ফোনে কথা বলব না আর।'

সামি অবাক হয়। বলে,

– 'আমার সাথে কথা না বলে তুই থাকতে পারবি?'

– 'থাকতে তো হবেই। তাছাড়া বিয়ের পর তোর অত সময়ও থাকবেনা।

সামিকে একটু কেমন বিভ্রান্ত দেখায়। সে দ্বিধাগ্রস্ত চোখে হৃদির দিকে চেয়ে থাকে, অন্ধকারে। ধীরে ধীরে মস্তিষ্ক ভরে যায় এক টুকরো সন্ধ্যেবেলার স্মৃতিতে। সেই সন্ধ্যাবেলাটা একটা ভুল ছিল সে জানে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল আজকাল তার সেই ভুলটার কথা মনে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথার মতো সূক্ষ্ম সুখানুভূতি হয়। হৃদিকে কি বলবে সামি তার অসুখটার কথা? বলবে কি যে, সেদিনের পর থেকে তার সব কিছু কেমন উল্টেপাল্টে গেছে? এখন যে কোন মেয়ের কাছাকাছি গেলেই তার চোখের সামনে দমকা হাওয়ার মতো উড়ে আসে সেই স্মৃতি। কিন্তু সেই মেয়েটাতো হৃদি না। হৃদি তার বন্ধু। তবুও হৃদিকে দেখলেই কেন কারণে অকারণে আজকাল সেই মেয়েটার কথা মনে পড়ে? নিজের ভেতরটা নিজের কাছে বড় দুর্বোধ্য ঠেকতে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার চোখ পড়ল কৃষ্ণচূড়া গাছের পেছনের দোচালা ঘরটার দিকে। ঘরের সামনে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। গোল বারান্দায় একটা টিম টিমে হলদে বাল্ব জ্বলছে। সেই আলোতে সে বাবার পেছনে গুটিশুটি হয়ে অমৃতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভারী অবাক গলায় বলল, 'অমৃতা কী করে বাবার সাথে?'

হৃদি ঘাড় ঘুরিয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যটা দেখল। বুক কেঁপে উঠল তার। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত সে কোন কথা বলতে পারলনা। বিস্ফোরিত চোখে চেয়ে রইল শুধু দৃশ্যটার দিকে। সামিও ভ্রু কুঁচকে চেয়ে আছে সেদিকে। হৃদি ভীত কম্পনযুক্ত বক্ষ নিয়ে বলল, 'ওই ঘরটা কিসের?'

– 'দাদা সাহেবের লাইব্রেরি ছিল। এখন পরিত্যাক্ত ভাবে পড়ে আছে। বাবা ছাড়া কেউ ওই ঘরে যায়না।

– 'ও তাহলে মনে হয় অমৃতা বই টই কিছু আনতে গেছে।' বলল হৃদি,অনেক কষ্টে।

সামিকে দেখে মনে হল হৃদির কথাটা তার খুব একটা যৌক্তিক মনে হয়নি। সে প্রশ্নবিদ্ধ চোখে দেখতে লাগল দোচালা ঘরটার সামনে দাঁড়ানো মানুষ দুটোকে। একটা সময় মানুষ দুজন ঘরের ভেতর ঢুকল। সেকেন্ড না গড়াতেই বন্ধ হয়ে গেল ঘরের দরজা।

লাইব্রেরি ঘরটা মূল দালান থেকে একটু দূরে। দেউড়ির ঠিক উল্টো দিকের গাড়ি বারান্দা ধরে হেঁটে, বাগান পেরিয়ে একটি পুরোনো দোচালা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন হক। ঘরটির সামনেই রয়েছে একটি গোল বারান্দা। মেঝের রং লাল।

সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে চাবি দিয়ে দরজার তালা খুললেন তিনি। অমৃতার বুকটা কেমন ঢিপঢিপ করছিল। ভয়, আনন্দ, সংকোচ, উৎকণ্ঠা… এতরকম বিচিত্র অনুভূতির সমাহার তার জীবনে এইই প্রথম! লোকটার পেছন পেছন চুপচাপ হেঁটে এসেছে সে। এত বছর ধরে এ বাড়িতে তার যাতায়াত, কিন্তু এপাশটায় কখনো আসা হয়নি।

ঘরের ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালালেন তিনি। ঘরটি চারকোণা এবং প্রশস্ত। চারিদিকের দেয়াল জুড়ে ঠেসে আছে শুধু বই আর বই! দক্ষিণ দিকে রয়েছে তিন পাল্লার পুরনো আমলের একটি কাচের জানালা। জানালার গ্রিলের ওপর ঝুলে আছে বাগান বিলাসের লতানো ডাল। হাওয়ায় দুলছে মৃদু ভাবে। ঘরটির মাঝ বরাবর একটি লম্বা সেগুন কাঠের টেবিল। টেবিলের একপাশে রাখা আছে দুটি কাঠের চেয়ার এবং অন্য পাশে একটি রেক্সিনের গদিযুক্ত রিভলভিং চেয়ার। টেবিলের ওপর বোঝাই হয়ে আছে ফাইলপত্র, কলমদানি, পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া কাগজ, পানির জগ এবং গ্লাস।

অমৃতা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, 'এই সব গুলো বই আপনার?'

হক ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন। জানালার দুটি পাল্লা দিলেন খুলে। বললেন, 'না। সব আমার নয়। বেশিরভাগই আমার বাবার।'

অমৃতা মুগ্ধ চোখে দেয়াল জোড়া বইগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, 'বিশাল সংগ্রহ! সামি তো কখনো বলেনি ওর বাড়িতে এত বড় একটা লাইব্রেরি আছে!'

ঘরের কোণায় মেঝের উপর একটি আগরবাতির স্ট্যান্ড রাখা ছিল। হক প্রথমেই ম্যাচের কাঠি দিয়ে আগরবাতি গুলো জ্বালিয়ে দিলেন। তারপর টেবিল সংলগ্ন

রিভলভিং চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'সে নিজে জানে কিনা তা নিয়েই আমার সন্দেহ আছে।'

দেয়ালের তাক গুলো মেঝে থেকে শুরু করে সিলিং অবধি উঠে গেছে। প্রতি খোপে বই সাজানো। আছে রবীন্দ্র রচনাবলীর বিশাল ভাণ্ডার। শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, শেক্সপিয়ার, চার্লস ডিকেন্স সবই আছে। অমৃতা সাহিত্য অত বোঝেনা। তার চোখ গিয়ে পড়ল অর্থনীতি এবং দর্শন শাস্ত্রের বই গুলোর ওপর। আইনের বই নেই দেখে মনে মনে একটু আফসোসও হল। বুকের সাথে শাড়ির প্যাকেটটা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে রেখে মুগ্ধ হয়ে বই দেখছিল সে। দেখতে দেখতে মনটা একদম অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। হৃদয় কপাট খুলে গিয়ে বিশুদ্ধ বাতাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল ভেতরটা।

একটা সময় তার চোখজোড়া বইয়ের সমাহার থেকে দূরে সরে আসল, গিয়ে পড়ল কিঞ্চিৎ দূরে বসে থাকা দীর্ঘকায় মানুষটার ওপর। ধূসর রঙের আলোয়ান গায়ে জড়ানো তাঁর। একটু আনমনা ভাবে চেয়ে আছেন জানালার বাইরে। কপাল কুঞ্চিত। এপাশ থেকে চেহারাটা বেশ ধারালো দেখাচ্ছে।

– 'আপনি এখানে কোন কাজে এসেছেন?'

– 'না, ঠিক কাজ নয়।' অন্যমনস্ক গলায় উত্তর দিলেন তিনি। অমৃতা ঘুরে তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ এই রাতের বেলা লাইব্রেরি আসলেন যে?'

হক পাঞ্জাবির পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে টেবিলের ওপর রাখলেন। একটু গম্ভীর ভাবে বললেন, 'দুশ্চিন্তার সময় গুলোতে আমি বাবার এই ঘরটায় এসে

আগরবাতি জ্বালিয়ে বসে থাকি মাঝে মাঝে। ভালো লাগে। বাবার আগরবাতির ঘ্রাণ খুব প্রিয় ছিল।'

অমৃতা হেঁটে এসে মানুষটার মুখোমুখি বসল, কাঠের চেয়ারে।

– 'আপনার কি মন খারাপ?'

হক ভেতরে ভেতরে একটু চমকে উঠলেন মেয়েটির প্রশ্ন শুনে। অনেক অনেক দিন বাদে তাকে কেউ এমন আন্তরিক প্রশ্ন করল। তাঁর ভেতরেও যে মন বলতে কিছু আছে সে বিষয়টি তিনি প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন। দুশ্চিন্তা হওয়া আর মন খারাপ হওয়া এই দুটোতে বিস্তর ফারাক আছে। মন খারাপের মতো বাহুল্য অনুভূতিকে প্রশ্রয় দেবার মতো সময় তাঁর ব্যস্ত জীবনে আছে নাকি? বাবা মারা গেছেন চার বছর আগে। বাবার মৃত্যুতেই শেষ বারের মতো মন খারাপ হয়েছিল তাঁর। এরপর থেকে মন খারাপ আর হয়না, হয় দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা।

– 'মনে হয়না মন খারাপ।'

– 'মন খারাপ হলে পাখি ওড়াচ্ছেন না কেন?'

হক হাসলেন, 'আমার মন খারাপ হয়না আজকাল। দুশ্চিন্তা হয়। তবে পাখি আনার জন্য লোক পাঠিয়েছি। ভোরের আকাশে পাখি ওড়ানো হবে।'

– 'কী নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন?' অমৃতা শুধোয়

টেবিলের ওপরে রাখা একটি পাথরের পেপার ওয়েট হাত দিয়ে অযথা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি বললেন, 'ছেলেটাকে নিয়েই দুশ্চিন্তা হচ্ছে!'

– 'আবার কী হল?'

– 'তোমাদেরকে কিছু বলেনি সে?'

– 'তানিশার ব্যাপারে?'

হক চোখ তুলে চাইলেন অমৃতার দিকে, 'হ্যাঁ, তানিশার ব্যাপারে। কিছু বলেছে কি?'

– 'তানিশা, হৃদির সাথে ফোনে কথা বলা নিয়ে অবজেকশন দিয়েছে। এইতো?'

– 'হুম, ব্যাপারটা নিয়ে আমার ছেলে দেখলাম ভীষণ আপসেট হয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারছিনা যে এতটা আপসেট হওয়ার কারণ কী? তোমার কী মনে হয়?'

অমৃতা তাৎক্ষণিক ভাবে প্রশ্নটার কোন উত্তর দিল না। এতক্ষণে একটা বিষয় তার কাছে পরিষ্কার হল যে লোকটা তাকে এখানে ডেকে এনেছেন নিজ পুত্র সম্পর্কে এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করার নিমিত্তে। এতকাল ভাড়া করা গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখতেন ছেলের পেছনে। এখন ছেলের সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে দিয়ে সেই গোয়েন্দাগিরির কাজটা বিনে পয়সায় করিয়ে নিচ্ছেন। চমৎকার! বিষয়টা মাথায় আসতেই মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল তার।

মন খারাপ হলেও রাগ করতে পারে না অমৃতা। বরং কুয়াশার মতো আবছা একটা তৃপ্তি বোধ টের পায় সে ভেতরে ভেতরে। মনে হয় ক্ষতি কী তাকে কয়টা প্রশ্ন করে মানুষটা যদি একটু শান্তি পায়? এইযে সামনে বসে একান্তে দুটা কথা বলছে তার

সাথে, এটাও তো কম পাওয়া নয়! সে ধীর স্বরে বলল, ‘আমার যা মনে হয় তা আপনাকে খোলা মেলা ভাবে বলব?’

– ‘হ্যাঁ, প্লিজ বল।’

– ‘আমার মনে হয় সামি নিজেকেই নিজে বুঝতে পারছে না।’

– ‘আমার কাছেও মনে হয়েছে সে চরম সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ওর মধ্যে ম্যাচিওরিটি জিনিসটা একেবারেই গ্রো করেনি।’

অমৃতা, হক সাহেবের চোখে চেয়ে পরিষ্কার গলায় বলল, ‘আপনারাই তো তাড়াহুড়ো করলেন। বিয়ের জন্য হঠাৎ এত প্রেশার দেয়া শুরু করলেন কেন?’

– ‘ভুল বলছ তুমি। আমরা মোটেও প্রেশার দেইনি। সে নিজেই বলেছে বিয়ে করবে এবং এটাও বলেছে যে বিয়েটা সে খুব শীঘ্রই করতে চায়।’

– ‘আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?’

– ‘কর।’

– ‘সামি যদি এখন হুট করে বলে বসে যে সে তানিশাকে বিয়ে করতে চায় না। তাহলে আপনারা কী করবেন?’

– ‘সে কি এ ব্যাপারে কিছু বলেছে তোমাকে?’

অমৃতা হতাশ নিশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘এই দেখুন, কিছু বললেই আপনি উত্তেজিত হয়ে যান। এভাবে কি কথা বলা যায়?এতো দুশ্চিন্তা করলে হয় নাকি?’

– ‘দুশ্চিন্তা করব না বলছ? ছেলে যদি এখন বিয়ে নাকচ করে দেয় তো সোসাইটিকে কী জবাব দেব আমরা?’

– ‘সোসাইটিকে আপনার কেন জবাব দিতে হবে? এটা তো আমি বুঝলাম না।’

হক নিজের মাথায় একটা হাত রেখে, ভারী গম্ভীর ভাবে বললেন, ‘সেটা তুমি বুঝবেনা।’

– ‘আপনার কাছে আপনার ছেলের চাইতে আত্মীয়-স্বজন আর সমাজ বড় হয়ে গেল?’

– ‘বড় ছোটোর কথা না। হাজারের ওপর মানুষ দাওয়াত দেয়া হয়ে গেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকদের নিমন্ত্রণ করা হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এই ছেলে যদি কোন ঝামেলা বাঁধায় ...’

অমৃতা দৃঢ় গলায় বলল, ‘আমাকে একটা কথা বলেন তো, আপনি আসলে কোনটা চান? আপনার ছেলের সুখ? নাকি নিজের সম্মান বা সামাজিক মর্যাদা?’

মাথা থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে চোখ তুলে তাকালেন তিনি অমৃতার দিকে, ‘দুটোই।

– ‘না যে কোন একটা বেছে নিতে হবে আপনাকে।’

– ‘নিশ্চয়ই আমি চাই আমার ছেলেটা যেন ভালো থাকে।’

– ‘তাহলে আমার কথা শুনুন। এসব নিয়ে দুশ্চিন্তা করা একদম বাদ দিন।’

– ‘বাদ দিব?’

– 'হ্যাঁ বাদ দিন। সামির ওপর ছেড়ে দিন পুরো ব্যাপারটা। আর তাছাড়া বিয়ে করবে না এমন কথা তো ও এখনো বলেনি তাইনা? আগে থেকেই কেন এতো দুশ্চিন্তা করছেন আপনারা বুঝতে পারছিনা।'

– 'দুশ্চিন্তা শুধু একটা বিষয় নিয়ে নয়। আমি ভেবেছিলাম এ বছর সামি আমার অফিসে জয়েন করবে। ইয়াং ছেলে কোনো কাজ টাজ না করে ঘরে বসে থাকে। তার বাবার এতো বড় ব্যবসা থাকতে সেই ব্যবসায় যোগদান না করে সে স্কুল শিক্ষকের চাকরি করতে গেল। সেই চাকরিটাও টিকিয়ে রাখতে পারল না। ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি খুবই শঙ্কিত।'

– 'এতো টেনশনের কিছু নেই।'

হক চিন্তাযুক্ত দৃষ্টি মেলে জানালায় নুইয়ে পড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন বাগানবিলাসের দিকে চেয়ে ছিলেন

অমৃতা ডাকল, 'হ্যালো! মিস্টার! আপনার সাথে কথা বলছি… শুনতে পাচ্ছেন?'

হক ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। অমৃতার কথার ধরণ তার ঠোঁটে হালকা হাসির উদ্রেক করল। তিনি হেসে বললেন, 'জি শুনতে পাচ্ছি, বলুন।'

– 'দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি সামির সাথে কথা বলব এ ব্যাপারে।'

– 'কোন ব্যাপারে?'

– ‘আপনার অফিসে কাজ শুরু করার ব্যাপারে।’

– ‘ও তোমার কথা মেনে নেবে বলে মনে হয়?’

অমৃতা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, ‘নিশ্চয়ই নেবে। আপনি শুধু আরেকটু ধৈর্য ধরুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তা করবেন না। আমি আছি।’

হক সাহেবের চেহারায় একটা নিগূঢ় ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল। তাঁর মনে হল এই মূহুর্তে বুঝি তিনি ঠিক এরকম প্রত্যয় মিশ্রিত কিছু কথাই শুনতে চাইছিলেন আদতে। বড্ড প্রয়োজন ছিল এই আশ্বাস বাণীটুকুর! খুব করে চাইছিলেন কেউ একজন ভরসা দিয়ে বলুক, চিন্তা কর না, আমি আছি। তিনি কৃতজ্ঞতার চোখে তাকালেন মেয়েটির দিকে। একটা সাদা গেঞ্জির ওপরে লাল, কালো ফুল হাতা চেক শার্ট পরে আছে মেয়েটা শার্টের বোতাম গুলো খোলা। খোলা বোতামের ভেতর দিয়ে সাদা রঙের ঢিলাঢালা গেঞ্জিটা স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে। বয়কাট চুল গুলো সামনের দিকে একটু উষ্কখুষ্ক হয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন ওই চুলে চিরুণী চালানো হয়নি। এলোমেলো ঘাসের মত ছোট চুল গুলি হালকা উড়ছে জানালা দিয়ে আসা হিম হিম হাওয়ায়। লোকটাকে ওভাবে চেয়ে থাকতে দেখে অমৃতার মুখখানা একটু একটু করে আরক্ত হয়ে উঠছিল। ধনুকের মত বাঁকা ভ্রুর নিচের পুতুল পুতুল ছোট্ট চোখদুটিতে ক্রমে ভর করছিল একটি লাজুক ভাব। পাতলা গোলাপি ওষ্ঠাধর কাঁপছিল অস্বস্তিতে। একটা সতেজ লাবণ্য শিখায় ঢলঢল করছিল তার মিষ্টি মুখটা।

– ‘তোমার হাতে এটা কী?’

শাড়ির প্যাকেটটার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি প্রশ্ন করলেন।

– ‘শাড়ি, আন্টি দিলেন।’

– 'তুমি শাড়ি টারি পর নাকি?'

অমৃতা চোখ নামাল নিচে, 'কখনো পরিনি।'

– 'কেন? পরলেই তো পারো মাঝে মাঝে।

অমৃতা আরক্ত মুখে বলল, 'আপনি বলছেন পরতে?'

হক এবার ওর মুখের লালিমা টুকু লক্ষ্য করলেন। অপ্রস্তুত হলেন সামান্য। বুঝতে পারলেন যে, তার হয়তো এ ব্যাপারে কথা বলাটা ঠিক হয়নি। কিন্তু বুঝতে পারার পরেও, তিনি অনিচ্ছাসত্বে শব্দ দুটো উচ্চারণ করে ফেললেন,'কেন নয়?'

অমৃতা মৃদু গলায় বলল, 'আচ্ছা।'

হক জানতেও পারলেন না, সামনে বসে থাকা মেয়েটির তাঁর কথায় হুট করে শাড়ি পরার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাটা যে কত বড় একটা সাংঘাতিক ঘটনা! খুব ছোট বেলায় একটা বাজে লোকের হাতে উৎপীড়িত হবার পরে সে মন প্রাণ দিয়ে শপথ করেছিল যে জীবনে আর কোনো দিন মেয়েদের পোশাক পরবে না। মেয়েদের মতো চলাফেরা করবেনা। মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই তার কাছে মনে হয়েছিল একটা অপরাধ। এতো গুলো বছর ধরে সে তার শপথ রক্ষা করে এসেছে। ভাঙ্গেনি। কিন্তু আজ, জীবনের ছাব্বিশটা বসন্ত পার করবার পরে, প্রথমবারের মতো, এই একটা মানুষের জন্য সে তার নারীত্বকে পুনরায় ফিরে পেতে চাইছে!

কেউ কোন কথা বলছিল না। একটা কেমন অস্থিরতা মিশে ছিল আগরবাতির খুশবু ওয়ালা হাওয়াটায়। অমৃতা বুকের ধুকপুক শব্দটা নিজের কানে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল!

একটা সময় তিনি বললেন- 'আমার কিছু জরুরি ফোন কল করতে হবে।'

বুঝল অমৃতা। এ কথার মানে হল, তুমি এখন যেতে পার। তার মুখটা একটু শুকিয়ে গেল। চট করে বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।'

– 'না না, তোমাকে যেতে বলিনি। তুমি চাইলে বসতে পার। আমি তোমার সামনে কথা বলতে পারব। নো প্রব্লেম।'

অমৃতার শুকনো মুখখানা চকিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হেসে বলে, -'না থাক। আমি আসি। ফোন নিয়ে আসিনি। বন্ধুরা হয়তো খুঁজছে আমাকে। এই জায়গাটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। মাঝে মাঝে আমি এখানে আসতে পারব?'

– 'নিশ্চয়ই।'

তিনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছে মেয়েটা আরো কিছুক্ষণ এখানটায় বসে থাকলে বুঝি ভালো লাগত। এমনটা মনে হওয়ায় কি কোন গোপন পাপ আছে? কিংবা কোন গোপন আনন্দ?

অমৃতা বলল, 'আরেকটা কথা।'

– 'হুম, বল।' অমৃতার চোখে চোখে তাকালেন তিনি।

– ‘আপনার নাম তো রাশেদুল হক, তাইনা?’

– ‘হুম।’

– ‘আমি এখন থেকে রাশেদ নামেই ডাকব।’

তিনি হাসলেন, ‘তুমি খুব পাকা একটা মেয়ে।’

– ‘এ কথা আগেও বলেছেন। এখন যাই।’

– ‘এসো।’

অমৃতা ফিরতেই দেখল হৃদি সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। চোখ ভর্তি উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে। অমৃতাকে দেখতে পেয়ে সে সতর্ক গলায় বলল, ‘এদিকে আয়, দরকার আছে তোর সাথে।’

কথাটা বলে হৃদি ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়াল। ডাইনিং স্পেসে বিভাকে পাওয়া গেল। সে টেবিলে রাখা জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালছিল। দুই বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে ঈষৎ ঝংকার দিয়ে বলে উঠল, ‘রুদ্রর বাচ্চা আমারে মোটা বলে, চিন্তা করতে পারিস ওই চিকনা চামালের পেটে কত হিংসা?’

হৃদি ভ্রুকুটি করে বলল, ‘চামাল আবার কী জিনিস?’

বিভা ঢকঢক করে গলায় পানি ঢেলে নিয়ে হাতের উল্টো পাশ দিয়ে ঠোঁট মুছল, বলল, ‘চামাল হচ্ছে চামেলির পুং লিঙ্গ।’

হৃদি বিভার কথাটা খুব একটা পাত্তা দিল না। ডাইনিং টেবিলের ওপর পড়ে থাকা অমৃতার সেলফোনটার দিকে তাকিয়ে একটু চোখা ভাবে বলল, 'উকিল আপার মোবাইল কোথায় সেই খবর কি আছে?'

প্রশ্নটা শুনে অমৃতা বিচলিত হল না। বুকের সাথে দুহাত দিয়ে শাড়িটা জড়িয়ে রেখে খুব ধীরস্থির ভাবে এগিয়ে এসে টেবিল থেকে মোবাইলটা হাতে তুলে নিল, বলল, 'ওহ, ভুলে গিয়েছিলাম।'

হৃদি আশপাশটা একবার ভালো মত দেখে নিল। এই বাড়িতে ঝি চাকরের অভাব নেই। বড় বড় কামরা এবং মোটা দেয়াল বলে এক ঘরের কথা অন্য ঘরে শোনা যাবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কিন্তু চাকর বাকররা ডাইনিং স্পেসের চারপাশে কারণে অকারণে বিচরণ করে সর্বদা। তাই গোপন কথা বলার জন্য এই জায়গাটা অনুকূল নয় বলেই তার মনে হল। সে দুই বান্ধবীকে বলল, 'চল ছাদে যাই। কথা আছে।'

ছাদের ওপর কুয়াশা জেঁকে বসেছে। বাতাসে জোর নেই, তবে শীতের তীব্রতা আছে। পুল সাইডে একটা নীল রঙের কম পাওয়ারের বাতি জ্বলছিল। নীল বাতির নিচে এলোমেলো ভাবে কয়েকটা চেয়ার রাখা। হৃদি চেয়ার গুলোর একটাতে বসে পড়ে অমৃতাকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল। তারপর ঠেস দেওয়া গলায় বলল, 'কী? খুব রং লাগছে মনে, তাইনা?'

অমৃতা সরু চোখে তাকাল, 'মানে কী?

– 'কোথায় গেছিলি তুই?' ভয়ঙ্কর ঠান্ডা স্বরে প্রশ্ন করে হৃদি। বিভা এগিয়ে এসে হৃদির পাশের চেয়ারে বসল। কৌতূহল চাপাতে না পেরে বলল, 'কী হইছে?'

অমৃতা একটা লম্বা শ্বাস নিল সময় নিয়ে। তারপর হৃদির প্রশ্নের উত্তরটা দিল, 'লাইব্রেরি ঘরে।'

– 'সামি জিজ্ঞেস করলে কী বলবি?' হৃদির প্রশ্ন।

– 'সামিকে টানছিস কেন এখানে?' একটু রূঢ় ভাবে বলে অমৃতা

– 'সামিকে আমি টানছিনা। সামি নিজের চোখে দেখে ফেলছে তোকে আর তার বাবাকে ওই লাইব্রেরি ঘরের সামনে। এমনকি ঘরের ভেতর ঢুকতেও দেখছে।'

অমৃতা থমকালো। ডিম ডিম আলোটার ভেতর দিয়ে ওর মুখের রং পাল্টানোটা স্পষ্ট ধরা পড়ল বাকি দুই বান্ধবীর চোখে। ভয়ের মতো কী

যেন একটা উঁকি মেরে গেল দুচোখের তারায় ক্ষনিকের জন্য। একটা ঢোঁক গিলল সে। বলল, 'কীভাবে?'

– 'আমরা তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম গোল বারান্দায় লাইব্রেরির দরজার সামনে তোরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছিস। তারপর তালা খুলে ভেতরে ঢুকলি। ঢুকে দরজা আটকে দিলি।'

বিভা চোখ কপালে তুলে বলল, 'সর্বনাশ! দরজা আটকায়ে একলা ঘরে কী করছিস তোরা? হায় ভগবান! লোকটা তোর গায়ে হাত দেয়নায় তো?'

অমৃতা ঝেঁঝে উঠল, 'ধুর, বাজে কথা বলিস না!

বিভা বলল, 'বাজে কথা না মোটেও। পুরুষ মানুষকে তুমি সুযোগ দিবা। আর সে সুযোগ নিবেনা, এটা কখনো সম্ভব?'

অমৃতা অত্যধিক কড়া গলায় বলল ' উনি মোটেও ওরকম না। ফালতু কথা বলার আর জায়গা পাস না।

– 'উনি কী রকম তা তুই এই দুইদিনে বুঝে গেলি তাইনা? সব পুরুষ মানুষই এক। মেন উইল বি মেন!' বিভার স্পষ্ট উক্তি।

হৃদি একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বিভাকে বলল, 'ন নাহ, আমার মনে হয়না উনি অতটা মিন। আর যাই করুক না কেন অন্তত গায়ে হাত দেয়ার মত বাজে কাজ উনি করবেন না।'

অমৃতা তার কণ্ঠে কড়া ভাবটা বজায় রেখেই বলল, 'কারো সম্পর্কে কিছু বলার আগে ভেবে চিন্তে বলবি। তোদের চাইতে অনেক বেশি মানুষজনের সাথে মিশি আমি, ঠিক আছে? পুরুষ মানুষ কী রকম হয় তা আমার খুব ভালো মত জানা আছে। উনি অন্য সবাব মত না। সবাই একরকম হয় না। তোর অভিজিৎ কী রকম? তুই যে এতকাল উনার সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকলি উনি কি কখনো অনুমতি ছাড়া তোর গায়ে হাত দিছে?'

– 'অভিজিতের কথা আলাদা।'

অমৃতা দৃপ্ত কণ্ঠে বলল, -'আমার উনার কথাও আলাদা।'

– ‘তুই লাইব্রেরিতে কেন গিয়েছিলি?’ হৃদির প্রশ্ন।

– ‘কাজ ছিল।’

– ‘সামিকে কী বলবি?’

– ‘বলা যাবে কিছু একটা।’   কথাটা বলে অমৃতা বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

বিভা বলল,’তোর উচিৎ সাবধানে চলা অমৃতা। সামির জায়গায় ওই দৃশ্যটা যদি সামির আম্মা দেখে ফেলত। তাহলে কী হত?’

– ‘কী আবার হত? আরে আজব আমি কি ডাকাতি করতে যাচ্ছিলাম নাকি? তোদের প্রব্লেম টা কী বলতো? সবসময় আমার সাথে এরকম করিস কেন?’ কথাটা বলতে বলতে অমৃতা বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। মনে হচ্ছে বিভা আর হৃদির সঙ্গটা এই মুহূর্তে তার ভালো লাগছেনা।

বিভা বলল, ‘এরকম করছি বিকজ উই লাভ ইউ। আমরা তোর ভালো চাই।’

– ‘ফাইন। লিসেন, ইফ ইউ লাভ মি, দেন ট্রাই টু রেস্পেক্ট মাই লাভ এন্ড মাই ফিলিংস। ওকে?’

কথাটা বলে অমৃতা ঘুরে গেল। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ল হঠাৎ। ফিরে তাকাল, বলল, ‘ব্লাউজ বানাস কোথায় তোরা? কোন টেইলরের কাছে? একদিনের মধ্যে বানিয়ে দিতে পারবে?’

দুই বান্ধবীর চোখের তারা ঝিলিক দিয়ে উঠল সুতীব্র কৌতূহলে। হৃদি অনুসন্ধানী স্বরে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

অমৃতা হাতে ধরা শাড়িটার দিকে একবার তাকাল। একটু দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল তাকে মুহূর্তের জন্য। চোখে খেলে গেল মৃদু কুণ্ঠা।

– 'আমি শাড়ি পরব!'

দুই সখী বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং চলতশক্তি রহিত! কয়েকটা মুহূর্ত কাটল শব্দহীনতায়। হৃদির মুখ তখন কিঞ্চিৎ হা। বিভার ডাগর দুটি চোখ পূর্ণব্যাদিত।

'কী বললি তুই?' কণ্ঠনালী দিয়ে অনেক কষ্টে শব্দ গুলো বের করল হৃদি।

অমৃতা স্পষ্ট ভাবে বলল, 'আমি শাড়ি পরব।'

বিভাকে দেখে মনে হল সে তার চোখের সামনে মৃত মানুষকে জ্যান্ত হয়ে যেতে দেখল এই মাত্র। তীব্র বিস্ময়ে হাবুডুবু খেতে খেতে সে কোন রকমে বলল, 'অমৃতা পরবে শাড়ি? আমি কি স্বপ্ন দেখতেছি?'

– 'তোরা যখন টেইলরের কাছে যাবি, আমাকেও নিয়ে যাস।' গম্ভীর গলায় বলল অমৃতা। তারপর আর দাঁড়াল না সে। গটগট করে হেঁটে সিঁড়িঘরে চলে আসল। কয়েকটা থমকানো মুহূর্ত কেটে যাবার পর হৃদি বলল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছেনা।'

বিভা হঠাৎ বসা থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে রসিক গলায় বলল, 'ইয়েস, অনেক দিনের শখ ছিল অমৃতাকে সাজাবো। এবার আমার আশা পূরণ হবে। ইয়েস··· ইয়েস!' কথাটা বলে সে তিড়িং বিড়িং করে কয়েকটা লাফ দিয়ে দিল। হৃদি কঠিন ভাবে বলল, 'জি না, আমি সাজাবো। আমার অনেক দিনের শখ।

– 'লাত্থি খাবি, ছেমড়ি। আমি সাজাবো।'

– 'না আমি!' হৃদি উত্তেজনার বশে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

– 'আমি!'

– 'না আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলছি। তবে তোর কি মনে হয়, অমৃতাকে ওই লোক বলছে শাড়ি পরতে?'

– 'হতে পারে।'

– 'তুই বুঝতে পারতেছিস কী ভয়ংকর বিপদ আসতেছে সামনে?'

– 'অমৃতাটা এবার গেছে। শি ইজ লিটারেলি ফলিং ফর হিম।'

– 'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছেনা যে অমৃতা শাড়ি পরবে।' –যাই হোক, অমৃতাকে আমি সাজাবো। তুই না।' হৃদি বদ্ধপরিকর।

– 'অসম্ভব, আমি সাজাবো। মনে মনে শপথ নিয়ে ফেলছি।'

হৃদি খুব সিরিয়াস ভাবে বলল, তোর শপথের গুষ্টি কিলাই। অমৃতাকেই জিজ্ঞাসা করা হোক। সে কার কাছে সাজতে চায়।'

– 'তবে তাই হোক!' নাকের পাটা ফুলিয়ে, সদর্পে বলে বিভা।

ফোয়ারার জল ঝিরঝির শব্দ তুলে অবিরত ঝরছে। স্ট্রিং লাইটের রোমান্টিক আলোয় চারপাশ বেশ মনোরম। সেই মনোরম আলোয় চিকচিক করছে ঘাসের ডগায় জমে থাকা বিন্দু বিন্দু শিশির কণা। কৃষ্ণচূড়ার ডালের ফাঁকে ফাঁকে ঘাপটি মেরে আছে ঘোলা কুয়াশা। হিমগন্ধী বাতাসে মৃদু দুলছে বাগানের ডালিয়া আর কসমসের সতেজ পাঁপড়ি।

মাঘ মাসের পরিষ্কার আকাশটার দিকে মুখ তুলে চেয়ে সামি বেশ সময় নিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। নিমেষেই তার চোখের সম্মুখে ক্ষনিকের জন্য একটি ধূম্রজাল তৈরী হল। সেই ধূম্রজালের ভেতর দিয়ে সে আকাশকে দেখল এগিয়ে আসতে। আকাশ সামির পাশের চেয়ারটা হাত দিয়ে টেনে নিয়ে বসল ওর পাশে, লঘু গলায় বলল, 'কী অবস্থা?' কথাটা শুনতে লাগল, 'কী বস্তা?'

– 'এইতো। রুদ্র কোথায়?'

– 'ওর আম্মার সাথে ফোনে কথা বলে। তুই কী করস একা একা?

– 'বিড়ি টানি।'

– 'মুড অফ?'

– 'ধুর শালা আমার আবার মুড!'

আকাশ তীক্ষ্ণ চোখে দেখল একবার পাশে বসা বন্ধুকে। সামির গায়ে একটা কালো জিনসের জ্যাকেট। গাল ভর্তি দুদিনের দাড়ি। চোখে একটা উদাস উদাস ভাব। তবুও সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। আকাশ জানে, তাদের বন্ধুদের মধ্যে সামিই সবচাইতে সুদর্শন এবং স্মার্ট। তবে এ নিয়ে সামির মধ্যে কখনোই কোনো অহংবোধ বা হামবড়া ভাব ছিল না। বিত্তবান ঘরের ছেলে হয়েও তার চলাফেরা অতি সাধারণ ছাপোষা মানুষের মত। নিজের উপযুক্ততা সম্পর্কে এই আত্মভোলা ছেলেটি ছিল সর্বদাই বড্ড অসচেতন। সামির এই নিরহংকার পরিপাটি মনটার জন্যেই, ওর প্রতি ভালোবাসার

পাশাপাশি আকাশের রয়েছে এক ধরণের শ্রদ্ধা। এই ছেলেটাকে সে চেনে ছোট্টবেলা থেকে। আর চেনে বলেই কদিন ধরে একটা বিষয় সূক্ষ্ম ভাবে টের পাচ্ছে সে। টের পাচ্ছে যে, তার বন্ধুটি আসলে খুব একটা ভালো নেই। ভালো থাকার চেষ্টা করা আর বাস্তবিক ভালো থাকার মধ্যে আছে বিস্তর ফারাক। অবিরাম ভালো থাকার মিথ্যা চেষ্টা করে যাবার চাইতে ভালো না থাকাও ঢের ভালো। ভালো থাকার চেষ্টা করে যাওয়া শুধু চেষ্টা নয়, ওটা একটা যুদ্ধ। আর এ কথা কে না জানে, যে জগতের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ হল, নিজের মনের বিরুদ্ধে করা যুদ্ধ।

আকাশ একটা দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল, বলল, 'কাহিনী কী বল তো?'

–কীসের কাহিনী?'

– 'তোরে কেমন জানি আপসেট দেখাইতেছে। তানিশা হৃদির সাথে কথা বলতে মানা করছে। এইজন্যে?'

সামি ধোঁয়া ছাড়ে মুখ দিয়ে। তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'আরে নাহ, হৃদি আমার ফ্রেন্ড। আমার ফ্রেন্ডের সাথে আমি কথা বলব কি বলব না সেই বিষয়ে মতামত দেবার তানিশা কে?'

– 'তাহলে মুখ বানায়ে বইসা আছস ক্যান?'

সামি চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আকাশের মুখোমুখি বসল। ওর চোখে চেয়ে একটু দ্বিধা নিয়ে বলল, 'তোর কী মনে হয়? যা হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে?'

– ‘তোর মন কী বলে? তানিশাকে ভালোবাসিস তুই?’

– ‘ধুর ব্যাটা, ভালোবাসা এতো সোজা নাকি?

– ‘আচ্ছা ভালো না বাসলি, ভালো লাগে তো, তাইনা?’

– ‘হ্যাঁ তা তো লাগে!’

– ‘তাহলে প্রব্লেম কী?’

– ‘প্রব্লেমটা অন্য জায়গায়।’

– ‘কোন জায়গায়?’

সামিকে একটু অপ্রতিভ দেখাল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। আশেপাশে সতর্ক একটা নজর বুলিয়ে নিল সে। ত্রিসীমানায় কেউ নেই। সে কণ্ঠস্বর নিচে নামিয়ে বলল, ‘ডুয়ার্সের ওই ঘটনাটার পর থেকে… আমার… মানে আমি না এরপর থেকে অন্য কোন মেয়েকে সহ্য করতে পারতেছিনা। নট ইভেন বিভা।’

– ‘এটার মানে কী? ইট ডাজন’ ট মেক এনি সেন্স।’

সামি একবার ঢোঁক গিলল, বিপন্ন গলায় বলল, ‘আচ্ছা খুলেই বলি, তানিশা কাছে আসলেই দোস্ত ডুয়ার্সের মেয়েটার কথা মনে পড়ে।

আকাশ হতভম্ব হয়ে গেল, ‘ডুয়ার্সের মেয়েটা বলতে তুই কী বুঝাচ্ছিস? ওইটা তো হৃদি ছিল।

– ‘হ্যাঁ আমি জানি ওটা হৃদি ছিল কিন্তু যে মেয়েটাকে আমি কিস করছিলাম সেই মেয়েটা কোন ভাবেই হৃদি ছিল না।’

– 'সামি, পাগলের মতো কথা বলিস না।'

– 'প্লিজ বোঝার চেষ্টা কর।'

– 'ওই মেয়েটা হৃদিই ছিল।'

– 'হৃদি ছিলোনা। ইম্পসিবল।

– 'তুই দেখি দিন দিন একটা আস্ত গাধায় পরিণত হচ্ছিস!'

– 'বোঝার চেষ্টা কর, ওটা হৃদি হতেই পারেনা। আমার মনে হইছিল ওই মুহূর্তটা আমার লাইফের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত। মনে হইছিল যে সেই মেয়েটার জন্যই আমি মনে মনে এতকাল অপেক্ষা করে ছিলাম। বিভাকে আমি ভালোবাসি ঠিক, কিন্তু ওই মেয়েটা যেন ভালোবাসার চাইতেও বেশি কিছু। মেয়েটা যেন আমারই একটা অংশ। আমার একান্ত নিজের!

আকাশ ব্যথিত চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সামির দিকে। এই ছেলেটার হয়েছে কী? তার কথাবার্তা এমন অসংলগ্ন কেন? সে চিন্তিত গলায় বলল,'দোস্ত শোন। এনগেজমেন্টটা পিছায় দে। আর কয়টা দিন সময় নে তুই। চিন্তা ভাবনা করে দ্যাখ।
'

সামি মাথা নাড়ে, 'নাহ, আব্বা আম্মা কষ্ট পাবে। বাবাকে হয়তো ম্যানেজ করা যাবে সাম হাও। বাট মা কষ্ট পাবেরে। মাকে কষ্ট দিতে পারব না। এমনিতেই একটা বছর দূরে ছিলাম। মা অনেক কষ্ট পাইছে এই এক বছর।

সেই সময় মাঘী কুয়াশার সফেদ আস্তর ভেদ করে ধীর পায়ে অমৃতাকে হেঁটে আসতে দেখা গেল বাগানের দিকে। ফোঁয়ারার পাশে বসে থাকা দুই বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল সে। ভ্রু নাচিয়ে বলল, 'তোদের ব্রোম্যান্স শেষ হইছে?'

মনে পড়ল সামির। একটু আগে সে তার বাবার সাথে অমৃতাকে লাইব্রেরি ঘরে যেতে দেখেছিল। এটা এমন কোন বিশেষ ঘটনা নয়, তা সে জানে। কিন্তু কোন এক বিচিত্র কারণে ঘটনাটা তার মনে দাগ কেটে গেছে। বাবা তার বন্ধুদের খুব একটা পছন্দ করেন না, সেই খবর সে রাখে। আকারে ইঙ্গিতে, এ কথা সে কথায় প্রায়শই তিনি তার বন্ধুদের প্রতি অভক্তি এবং অসম্মানটা না চাইতেও প্রকাশ করে ফেলেন। তবে গত কয়েকদিন যাবৎ বাবার ব্যবহারে সে একটি আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। সে অনুভব করেছে বাবা যেন তার বন্ধুদেরকে ঠিক আগের মতো বক্র চোখে দেখছেন না। বন্ধুদের প্রতি তার মনোভাবটা যেন আগের চাইতে অনেক খানি সহজ এবং তরল। ব্যাপারটা টের পেয়ে ভালো লেগেছে সামির। তৃপ্তিতে মন ভরে গেছে। আজ হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে হল বাবার এই আচমকা পরিবর্তনের পেছনের কারণটা কি অমৃতা? অমৃতার কি প্রায়ই কথা হয় তার বাবার সাথে? কই সামিকে তো এ ব্যাপারে অমৃতা কখনো কিছু বলেনি? অথচ বললে তো সামি খুশিই হত। সে তো চায় তার বন্ধুদের সাথে বাবার সম্পর্কটা সহজ হোক। অমৃতার বাসায় গেলে অমৃতার বাবা হাসিমুখে সব বন্ধুদের সাথে কী সুন্দর গল্প করেন! অমৃতার বাবাকে দেখে কতবার সামির মনে হয়েছে, ইশ কতই না ভালো হত যদি তার বাবাও তার বন্ধুদেরকে এমন স্নেহের চোখে দেখতেন! কিন্তু মনে মনে সে জানতো যে বাবা কখনোই তার বন্ধুদেরকে অমন সহজ ভাবে মেনে নেবেন না। বাবা এবং মা, দুজনের ভেতরেই একটা ভীষণ রকমের অহংবোধ কাজ করে সর্বক্ষণ। বলতে নেই, নিজের বাবাকে নিয়ে সামিরও মাঝে মাঝে একটু আকটু গর্ব বোধ হয় বৈকি। কী নেই তার বাবার? শিক্ষা, খ্যাতি, বিত্ত, বৈভব সমস্ত দিক দিয়েই তার বাবা একশতে একশ! তার মাও বা কম কীসে? কিন্তু বাবা মায়ের যে জিনিসটা সামির সবচাইতে অপছন্দ ছিল তা হল মধ্যবিত্তদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। সে জানে তার বন্ধুরা মধ্যবিত্ত বলেই তার বাবা মা ওদের দাম দিতে চান না। আজকে সেই বাবা তার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের সাথে হেসে, সম্মান দিয়ে কথা বলছেন, এর চেয়ে বড় পাওয়া সামির জীবনে আর কী হতে পারে?

– ‘কোথায় ছিলি এতক্ষণ?’ স্বাভাবিক গলায় সামি প্রশ্ন করল, অমৃতাকে

অমৃতা একটুও নার্ভাস না হয়ে বলল, ‘গিয়েছিলাম তোদের লাইব্রেরীতে।’ উত্তরটা দেবার পর সে মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যিস হৃদি কথাটা জানিয়েছিল তাকে। নইলে সামির সামনে বেকায়দায় পড়তে হত তাকে।

– ‘লাইব্রেরীতে?’

অমৃতা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, বলল, ‘হ্যাঁ লাইব্রেরীতে। তুই জানিস তোর দাদার একটা চমৎকার লাইব্রেরী আছে?’

– ‘হ্যাঁ জানি, বাবা ছাড়া ওখানে আর কেউ যায়না। তুই হঠাৎ ওখানে গেলি কেন?’

সামির প্রশ্নের ধরণটা যেন কেমন ধারা! অমৃতা একটু অবাক চোখে চায় এতদিনের পুরনো বন্ধুটির দিকে। তার একটু একটু বুক কাঁপে। ভয় ভয় লাগে!

কে জানত? জীবনে এমন দিনও আসবে! সে চোখ নামিয়ে বলল, ‘উনার সাথে একটু কথা ছিল।’

– ‘কার সাথে?’

– ‘তোর আব্বার সাথে।’

– ‘তাই?’

– ‘হ্যাঁ,ঐযে··· ইশে··· ইউ এনডিপির এক ভদ্রলোক আমাকে একটা চাকরির অফার দিছে, বুঝছস? তো ভদ্রলোক উনার পরিচিত।’

সামি আবার প্রশ্ন করল, ‘উনিটা কে?’

– ‘তোর আব্বা।’

– ‘ও··· আব্বার পরিচিত?’

– ‘হ্যাঁ, তো ওই ব্যাপারে উনার সাথে কথা বলতে গেছিলাম।’

– ‘ও’ আলতো ভাবে বলে সামি। এই মুহূর্তে তার মনের মধ্যে একটা অব্যাখ্যেয় অনুভূতি হচ্ছে। একদিক দিয়ে এটা ভেবে ভালো লাগছে যে, তার পিতার সাথে তার বন্ধুদের দূরত্ব একটু একটু করে হয়তোবা ঘুঁচে যাচ্ছে। আবার একই সাথে এটাও মনে হচ্ছে যে, অমৃতা তো তার বন্ধু। বাবার সাথে চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলার আগে অমৃতার কি উচিৎ ছিল না সামিকে একটাবার তথ্যটা জানানো? ব্যাপারটা ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার মতো হয়ে গেল না? নিজের ভাবনায় নিজে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে সামি। এতটা টিপিক্যাল সে কবে থেকে হল? অশান্তির আগুন জ্বলছে বুকের ভেতর। সবকিছু কেমন এলোমেলো, অগোছালো আর বিধ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে। কোথাও এক রত্তি শান্তি নেই। ধুর ছাই, ভালোই তো ছিল এই নয়টা মাস। কোন কুক্ষণে যে সে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিতে গেল?

আকাশ বলল, ‘ইউ এন ডিপির চাকরি তো ভালো। চান্স নিয়া দেখতে পারিস।’

– ‘হুম’ বলল অমৃতা অন্যমনস্ক ভাবে। একটা অস্বস্তির কাঁটা বুকের মধ্যে খচখচ করছিল অবিরত। সামির আব্বাকে ব্যাপারটা কি জানিয়ে রাখা উচিৎ যে সামিকে সে বলেছে লাইব্রেরি ঘরে চাকরির ব্যাপারে কথা বলতে গিয়েছিল? হ্যাঁ মনে হচ্ছে জানিয়ে রাখা উচিৎ। সামি এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে যেন তিনি অপ্রস্তুত না হয়ে পড়েন।

বিভা, হৃদি আর রুদ্র পৌঁছে গেল খানিকক্ষণের মধ্যেই। হৃদি দৌড়ে এসে অমৃতাকে বলল, ‘আগে থেকে বলে রাখলাম তোকে কিন্তু আমি সাজাবো।’

বিভা হৃদিকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিয়ে হড়বড় করে বলল, ‘হবে না এসব। আমি সাজাবো তোকে। এটা আমার আজীবনের স্বপ্ন।’

আকাশ বিস্ময় ডুবি কণ্ঠে বলল, ‘মানে কী? অমৃতার বিয়া হইতাছে নাকি?’ অমৃতা দুই বান্ধবীর কান্ড দেখে মুচকি মুচকি করে হাসছিল। বিভা ঘোষণা দেয়ার গলায় বলল, ‘অমৃতা শাড়ি পরবে। সামির এনগেজমেন্ট এ।’

কথাটা মাটিতে পড়ার আগেই রুদ্র আর সামি হৈ হৈ করে উঠলো। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছে আকাশ। সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বেশ অনেকটা সময় চুপ করে থেকে সে আচ্ছন্ন গলায় বলল, ‘অমৃতা পরবে শাড়ি?’

অমৃতা হাসে, মৃদু ভাবে বলে, ‘পরলাম না হয় একদিন। সামির বিয়া বলে কথা!’

আকাশ অমৃতার দিকে অবিশ্বাস ভরা এক দৃষ্টি তাক করলো, ‘হঠাৎ তোর কী হইল অমৃতা? ইজ এভরিথিং অলরাইট?’

অমৃতা কিছু বলল না। মুখ নামাল নিচে। একটা বিষাদ ছোঁয়া নিশ্বাস পড়ল তার বুক থেকে। আকাশ আর রুদ্রর কাছ থেকে অনেক কিছুই লুকোনো হয়ে যাচ্ছে আজকাল। ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছেনা। তাদের বন্ধুদের মধ্যে তো এসব লুকোছাপা কখনো ছিল না। সব কিছু কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

৩৪

পরের দুটা দিন কাটলো ঝড়ের বেগে। এনগেজমেন্ট খেতে সামিদের গ্রামের বাড়ির আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। রোমেলা তার শ্বশুর বাড়ির দিকের গ্রাম্য লোকজনদের একেবারেই পছন্দ করেন না। তার শ্বশুররা ছিলেন তিন ভাই। তিন ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র তার শ্বশুর আব্বাই ঢাকা শহরে সেটেল্ড ছিলেন। বাকিরা সব গ্রাম্য চাষাভুষা। তাঁর স্বামী জন্মের পর থেকে ঢাকা শহরে বসবাস করলেও গ্রাম্য স্বজনপ্রীতি কোনো রকমেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি এখন অবধি।

রোমেলারা সব মিলিয়ে তিন বোন। তিন বোনের মধ্যে বড় জন থাকেন অস্ট্রেলিয়ায়। সামির এনগেজমেন্টে তিনি আসতে পারছেন না। তবে বিয়েতে অবশ্যই আসবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। তার ছোট বোন ঢাকার বারিধারায় থাকেন। এই দুবোন ছাড়া নিকটাত্মীয় বলতে তার আর তেমন কেউ নেই। গ্রামের লতাপাতার আত্মীয় স্বজনদের সাথে তিনি কোনো সম্পর্কই রাখেন নি। গরিব আত্মীয়রা কোনো কাজে আসেনা। উপরন্তু দুদিন পর পর শুধু হাত পাতার ধান্ধায় থাকে। তাঁর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় স্বজনদেরও এই হাত পাতার বাতিক আছে। এর মাঝে আবার জুড়ে বসেছে অসুস্থ ফুপু শাশুড়ি। অসুস্থ রোগীর জন্য আলাদা একজন কাজের লোক রাখতে হয়েছে। গ্রাম্য লোকজন সারা বাড়ি নোংরা করছে ইচ্ছে মতন, বাথরুম করে ফেলছে কাদা কাদা। এদের জন্য নিচের তলার চারটা গেস্ট রুম বরাদ্দ করা হয়েছে, তারপরেও এদের বাচ্চা কাচ্চারা সুযোগ পেলেই উপর তলায় উঠে আসছে। একটু আগে তার খালাতো ননদের তিন বছরের বাচ্চা দোতলার সিঁড়ির গোড়ায় পেশাব করে দিয়েছে। এসব কতক্ষণ সহ্য করা যায়? তার ছেলেটাও হয়েছে বাপের মতো। গ্রামের চাষাভুষা গুলোর সাথে তার মাখনের মতো ভাব। একটু আগে তিনি দেখেছেন পেছনের উঠোনে ছেলে তার গ্রাম থেকে আগত কাজিনদের নিয়ে ক্রিকেট খেলছে। বাপ ব্যাটা আছে বেশ আনন্দে। আর এদিকে সংসারের ঘানি টানতে টানতে তার হয়েছে মরণ দশা! কাজের লোক থাকলেই কি হয় নাকি? কাজে লোক চালানোও যে একটা কত বড় দায়িত্ব তা কজনে বোঝে?

এদিকে রাহাত যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশে। সামির এনগেজমেন্টের আগের দিন রাহাতের বাবা মা হৃদির বাসায় বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন। মোটামুটি একটা কথা পাকাপাকি হয়ে গেল যে এই ফেব্রুয়ারির কোনো এক শুক্রবারে ওদের আকদ হয়ে যাবে। রাহাতকে দেখেছিল হৃদি অনেক আগে, স্কুলে পড়ার দিন গুলোতে। সেই সময় রাহাত সুদর্শনই ছিল বলা চলে। কিন্তু এ কয়েক বছরে আমেরিকার বাতাস লেগে তার শরীর হয়ে গেছে দ্বিগুণ চওড়া। সে লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভালো। পেশায় ডাক্তার। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি হাসপাতালে প্র্যাকটিস করে। ভালো অংকের বেতন পায়। এমন পাত্র আজকাল বিয়ের বাজারে বিরল। তবে তার দোষ শুধু একটাই, বড্ড মোটা!

কিন্তু হৃদি কোনো আপত্তি করল না। চুপচাপ বাবা মায়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিল লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে। মোটা হলেই বা কী? মানুষের মনটাই আসল, বাইরের আবরণটা কিছুই না। বিভা পারলে সে কেন পারবেনা? হ্যাঁ হয়তো রাহাতও, অভিজিতেরই মতো ভালো মনের একজন মানুষ। হৃদিও ভুলে যাবে সামিকে। সংসার করবে মন দিয়ে। খুব মন দিয়ে!

অনেক রাত অবধি নিঃশব্দে কাঁদল সে। কেউ টের পেলোনা। টের পেলো শুধু তুলো ভর্তি বালিশ, আর বিছানার চাদর। আগামী কাল সামির এনগেজমেন্ট। উড়ো খবর পেয়েছে হৃদি, হয়তো আকদ হলেও হয়ে যেতে পারে। হয়ে যাক! ক্ষতি কী? হৃদির আর কিছুই এসে যায় না। সে তো যাচ্ছেই চলে, প্রবাসে!

সামির ফোনটা আসলো রাত তিনটায়। গত রাতেও সামি ফোন করেছিল অসংখ্য বার। সে ধরেনি। একটা সময় ফোন সুইচড অফ করে দিয়েছিল। আজকে কী করবে? আগত ফোন কল হৃদির কান্নার দমক বাড়িয়ে দিল। বুকের ভেতর অদম্য, অবাধ্য, প্রলয়ঙ্কর এক ঝড় বইছে। বুক কাঁপছে, হাত কাঁপছে, দমে পড়েছে টান।

অনেক গুলো রিং পড়ার পর সে ফোনটা ধরলো। কান্না থামাতে পারলোনা। থামানোর চেষ্টাও করলোনা। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'কেন ফোন দিচ্ছিস? কী সমস্যা?'

'কানতেছিস ক্যান?' শুরুতেই একটা ধমক দিয়ে ওঠে সামি।

– 'মনে চাইছে তাই কানতেছি। তুই এই মাঝরাত্রে কী চাস?'

– 'তোর এই যখন তখন কান্না করার স্বভাবটা পাল্টা। বিরক্ত লাগে।'

হৃদি শোয়া থেকে উঠে বসল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে বিছানার সাইড টেবিলে রাখা টিস্যুর বাক্স থেকে কয়েকটা টিস্যু পেপার বের করে নিল। চোখ মুছলো। নাক টানলো বার কয়েকবার। কেশে গলা পরিষ্কার করে ভারী ভাবে বলল, 'কী হইছে? ফোন দিছিস ক্যান?'

– 'তুই গতরাতে আমার ফোন ধরিস নাই ক্যান?'

– 'আমার ইচ্ছা।'

সামি দুর্বল গলায় বলল- 'কালকে আমার এনগেজমেন্ট। এরকম একটা সময়ে তুই আমার পাশে থাকবিনা?'

– 'ফালতু কথা বলিস না সামি, পাশে তো আছিই। পাশে আছি এটা বোঝানোর জন্য কি ফোনে কথা বলাটা জরুরি?'

– ‘আমার যখন তোকে লাগবে তখন যদি না পাই, তাহলে এই বালের পাশে থাকার মানে কী?’

– ‘আমাকে তোর কেন লাগতেছে? কীসের জন্য?’

এ প্রশ্নের কোনো তাৎক্ষণিক উত্তর দিতে পারল না সামি। কয়েকটা নীরব ক্ষণ বিষাদ মাখা জেলো বাতাসে সাঁতার কাটতে থাকল দুজনের মধ্যে, টেলিফোনের অন্তর্জালে। শীতকালের রাত বলে চারপাশে কোনো শব্দ নেই। রাস্তায় একটা নেড়ি কুকুর শুধু নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে তারস্বরে ডেকে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কেমন কান্নার মতো শোনাচ্ছে ওর ডাকটা। বুকের ভেতরটা চমকে চমকে উঠছে ওই ডাকে। কী কারণে অমন গলা ফাটিয়ে কাঁদছে খোদা মালুম!

হৃদি অধৈর্য ভাবে বলল, ‘কথা বলতেছিস না ক্যান?’

– ‘তোকে এতবার ফোন করলাম হৃদিতা, একটা বার ফোন ধরার প্রয়োজন বোধ করলিনা?’

– ‘কোনো দরকার ছিল?’

সামি বড় শ্বাস ফেলে। আস্তে করে বলে, ‘কথা বলতে ইচ্ছা করতেছিল, তোর সাথে!’

একটা সাধারণ বাক্য। অথচ কী অসীম এর শক্তি! এক নিমেষে কথাটা হৃদির চারপাশটাকে হোলির ময়দানে রূপান্তরিত করে দিল। জানালার বাইরে আটকে থাকা শীত শর্বরীর ধোঁয়াটে কুয়াশায় মুহূর্তের জন্য মিশে গেল রংধনুর সাত রং!

হৃদিকে চুপ করে থাকতে দেখে সামি বলল, 'আসলে তোর সাথে কথা বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে তো, এই জন্যেই হয়তো…'

হৃদি একটা বড় নিশ্বাস গোপন করল। হোলির ময়দানের সাত রং ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগলো। অভ্যাস, শুধুই কি অভ্যাস সামি? এর চেয়ে বেশি কিছু নয়?

– 'অভ্যাস?' শব্দটা উচ্চারণ করে হৃদি। টেনে টেনে স্পষ্ট ভাবে।

সামি বিভ্রান্ত গলায় বলে, 'অভ্যাসই মনে হয়।'

একটা নাম্বার সামির ফোনের ওয়েটিং লিস্টে ঢুকে টুংটুং করে ঘন্টা বাজাচ্ছিল। নাম্বারটা দেখে নিয়ে সামি বিরক্ত গলায় বলল, 'তানিশা ফোন দিচ্ছে।'

– 'তোর ফোন ওয়েটিং এ পাচ্ছে ও। এখন কী বলবি?'

– 'কী বলব আবার, যা সত্য তাই বলব।'

– 'এটা ঠিক হচ্ছে না সামি। মেয়েটাকে তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস। তোর উচিত ওর পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়া।'

– 'লেকচার দিস না তো। এখন লেকচার শুনার মুড নাই।'

– 'তোর নাকি আকদ হয়ে যেতে পারে কালকে? কথা কি সত্য?'

– 'আকদ মনে হয় পরশু দিন সকালে হবে।'

– ‘বেশ, এখন ফোন রাখ। তোর বৌকে আমার কথা বলিস না। বলিস যে অন্য কারো সাথে কথা বলতেছিলি।

– ‘আমি মিথ্যা বলতে পারব না। আর এখন আমি ফোন রাখবো ও না।’

– ‘রাখবিনা মানে? তানিশা ফোন দিচ্ছে তো!’

– ‘দিক। এখন আমি তোর সাথেই কথা বলবো।’

– ‘কী সাঙ্ঘাতিক কথা! মেয়েটা কষ্ট পাবে সামি। এরকম করিস না।’

– ‘তোর ডাক্তার কি দেশে আসছে?’

– ‘হ্যাঁ, আসছে তো। বিয়ের কথা মোটামুটি পাকা হয়ে গেছে।’

– ‘তাই?’

– ‘হুম, চলে যাবো দোস্ত, আমেরিকা।’

সামি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। তার মনটা অসম্ভব রকমের খারাপ। বিভা চলে গেছে, হৃদি চলে যাবে, চলে যাবে রুদ্রও! এ দুদিন ধরে তার সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ আরো বেড়েছে। কিছু ভাল্লাগেনার জগতে ওই নিকোটিনের ধোঁয়াটাই কোথেকে যেন একটু ভালো লাগার ছোঁয়া এনে দেয়। সে বুঝতে পারছে তানিশার ফোনটা তার ধরা উচিৎ। হৃদির সাথে রোজই কথা হয়। এনগেজমেন্টের আগের রাতে হৃদির সাথে ফোনে কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনো মানেই হয়না। যার সাথে বিয়ে হবে তাকে সময় দেয়াটাই এখন জরুরি এবং সেটাই নিয়ম। কিন্তু নিয়ম মেনে কি সব হয়? গত রাতে হৃদি যখন তার ফোন ধরছিল না, তানিশা তখন তার সঙ্গে ছিল, সেলফোনে। সেই থাকাতে লাভটা হয়েছে কী? তানিশা তো কোনো ভাবেই হৃদির অভাব পূরণ করতে পারেনি। মনে হচ্ছিলো হৃদিকে অন্তত একটা গুডনাইট বলতে না পারলে তার ঘুম হবে না। সামি হিসাব করে দেখেছে গত তিনশত সত্তরটা রাতের মধ্যে একটা রাতও হৃদিতাকে গুডনাইট না বলে সে ঘুমোতে যায়নি। এই তিনশত সত্তর দিনের অভ্যাস কি এতো সহজে কাটিয়ে তোলা সম্ভব?

– ‘কী করবি আমেরিকা গিয়ে?’ হঠাৎ বলে উঠল সামি।

– ‘জানি না।’

– ‘কী রকম জীবন চাই তোর?’

– ‘কী রকম জীবন?’ প্রশ্নটা যেন নিজেকেই নিজে করে হৃদি। চুপ করে ভাবে। আস্তে আস্তে বলে, ‘জানিস, আমার একটা ইচ্ছা জীবন চাই। এই ধর, ইচ্ছা হলেই কপালের মাঝখানে একটা টিপ পরব, কানের পাশে ফুল গুঁজব, বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিব, রিকশার হুড খুলে বৃষ্টিতে ভিজব, ইচ্ছা হলেই ভালোবাসার মানুষটার হাত ধরব, তার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমাব… ইত্যাদি, ইত্যাদি… ইচ্ছা গুলা অতি সাধারণ। কিন্তু এই অতি সাধারণ ইচ্ছা গুলোই কারো কারো জীবনে পূরণ করাটা অনেক বেশি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।’

– ‘তুই কি রবিনকে এখনো ভালোবাসিস?’ সামি বলে, গম্ভীর গলায়। এ কথা শুনে হৃদির ভেতরে অনেক দিন ধরে চেপে রাখা একটা প্রশ্ন হৃৎপিন্ড চিরে কণ্ঠনালী দিয়ে ঊর্ধমূখী হয়ে বেরিয়ে আসে, আপনাআপনি!

– ‘তুই কি বিভাকে এখনো ভালোবাসিস?’

সামি থমকে গেল। আচমকা এক অনির্বচনীয়, অনাহূত, এবং সম্পূর্ণ অচেনা বোধ তার সমস্ত চেতনাকে মুহূর্তের জন্য কেমন বিবশ করে তুলল। মস্তিষ্কের নিউরনে বিপবিপ করে কেউ একজন ছড়িয়ে দিল একটা বার্তা 1 বার্তাটি এমন যে, হৃদির একটা সময় রবিন ছিল, সামির ছিল বিভা। যখন বিভা ছিল না, রবিন ছিল না, তখন শুধুই তারা দুজনে ছিল, আর যখন শুধুই তারা দুজনে ছিল, তখন তারা ভালোই ছিল!

শুধু হৃদি আর সামি…!

তার হঠাৎ মনে হল হৃদি প্রবাসে চলে গেলে সে বোধহয় মরেই যাবে!

তানিশার ফোন কড়া নাড়ছে, তো নাড়ছেই। সামির ভাবনা গুলো ধীরেধীরে এলোমেলো হয়ে উঠছিল। কেমন একটা ভয় ভয় লাগছিল তার। মনে হচ্ছিল যেন ট্রেন থামতে যাচ্ছে ভুল স্টেশনে। সঠিক স্টেশনটা চোখের সামনে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে সে। এক্ষুনি সঠিক জায়গায় ট্রেনটা থামানো বড্ড জরুরি। কিন্তু কোনও এক পরাশক্তি প্রবল যাদুবলে তাকে স্থবির করে দিয়েছে, অশ্মীভূত করে দিয়েছে। সে কিছু বলতে পারছে না, নড়তেও পারছে না।

সে অনেক কষ্টে হৃদিকে বলল, 'তানিশা খুব বিরক্ত করতেছে। রাখি কেমন?'

– 'আচ্ছা।'

– 'গুড নাইট।'

– 'গুডনাইট।' সামি ফোন কাটলো। আজকে সে হৃদিকে গুডনাইট বলতে পেরেছে। যাক, আজকের রাতটা অন্তত গতরাতের মত নির্ঘুম কাটবে না। কিন্তু তারপর…?

জানালার পর্দার ফাঁক গেলে মাঘী সকালের স্ফটিক রঙা রোদ্দুর ঢুকে পড়েছিল বিভার শোবার ঘরে। ইচ্ছে মত চারিয়ে বেড়াচ্ছিল রোদটা, গায়ে জড়ানো নরম লেপের ওপর, বালিশে ছড়িয়ে থাকা দীঘল কালো চুলের ওপর। চোখের ঢাকনায় ওই স্ফটিক রোদ্দুরের দাপাদাপিতে শেষ রাতে পাওয়া আরাধ্য ঘুমটা ছুটি নিতে বাধ্য হল। জেগে উঠতেই পুজোর ঘর থেকে মায়ের গানের গলার আওয়াজ শুনতে পেলো সে, তার সাথে ঘন্টার ঢং ঢং। গায়ের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে সেলফোন হাতে নিল। রোজ

সকালে অভিজিৎ একবার ফোন দেয়। অফিস যাবার আগে। আজকে সেলফোনটা চেক করে দেখা গেল কোনো মিসড কল নেই।

কলিং বেল বেজে উঠল, সাত সকালে। টিং টিং করে একটা বিশ্রী বাজনা, তারপর এক নারী কণ্ঠের বলে ওঠা, প্লিজ ওপেন দ্যা ডোর। খুব বিশ্রী লাগে বিভার এই ডাকটা। ঘড়িতে কাঁটায় সকাল সাতটা। এতো সকালে কে আসলো? প্রশ্নটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটাও কানে চলে এলো। স্পষ্ট শুনতে পেলো মায়ের গলা, ওমা! জামাই বাবু দেখি! বিভা, এই বিভা! দেখে যা কে এসেছে!

বিভা চমকে ওঠে। কিশোরীর মতো মেতে ওঠে আহ্লাদে। খুশি বাজতে থাকে ঝনঝন করে, হৃদমন্দিরে! তীব্র হর্ষাবেশে ছেয়ে যায় তার ভিতর, বাহির সমস্তটা। চট করে উঠে পড়ে। আয়নায় নিজেকে দেখে নেয় নিমেষে। এক মুহূর্তও দেরি না করে তোয়ালে হাতে নিয়ে ছুটে যায় বাথরুমে। সাবানের ফেনা তুলে ভালো মতো চান করে। তারপর একটা লেবুপাতা রঙের সদ্য ভাঁজ ভাঙা শাড়ি পরে নেয়। ভেজা চুল ড্রায়ার দিয়ে শুকিয়ে নেয়। যত্ন করে সিঁদুর পরে সিঁথিতে। মনের আনন্দের ছাপ তার মুখে এসে পড়ে। এমন বাঁধ ভাঙা লাবণ্যের জোয়ার নিজের মধ্যে সে এর আগে কখনও দেখেনি! কে যেন কবে বলেছিল, প্রেমে পড়লে মেয়েরা সুন্দর হয়ে ওঠে। বিভা তাহলে প্রেমেই পড়েছে। অভিজিৎ নামের ওই স্বল্পভাষী, চশমা পরা, ভালো মানুষী চোখের অতি সাধারণ লোকটার প্রেমে পড়েছে সে!

বসার ঘরে অভিজিৎ বাবার সাথে কথা বলছিল। তার মুখে একটু ক্লান্তির ছাপ। শেষ রাতের ফ্লাইট ধরেছিল সে। রাতে ঘুম হয়নি। কিন্তু সেই রাত জাগার ক্লান্তিটা তার মুখ থেকে চকিতে পালিয়ে গেল, যখন লেবুপাতা রঙের শাড়ি পরা বিভা, মাঘী সকালের স্ফটিক রোদ্দুর মাথার চুলে মেখে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, স্নিগ্ধ চোখে সে

চেয়ে দেখল বিভাকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর মৃদু ভাবে বলল, 'আপনার বন্ধু যদিও দাওয়াত করেনি আমায়, তবুও চলে এলাম এনগেজমেন্ট খেতে।'

.

এনগেজমেন্টের অনুষ্ঠান হবে হোটেল ওয়েস্টিনে। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যেই সবার সেখানে উপস্থিত হয়ে যাবার কথা। দুপুরে সামির কতিপয় কাজিন এবং বন্ধু মিলে মেয়ের বাড়ি গিয়ে পানচিনির তত্ত্ব দিয়ে আসলো। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটা ডালা হয়েছে। এতগুলো ডালা বহন করার জন্য মানুষও লাগলো কমসে কম তিরিশ জনের মত। বন্ধুরা সবাই আসল, এমনকি অভিজিৎও আসলো। কিন্তু আসলো না শুধু হৃদি। তার নাকি মাইগ্রেনের ব্যথা উঠেছে। সামির কেন যেন মনে হল মাইগ্রেনের ব্যথাটা একটা বাহানা মাত্র। হৃদি তাকে এড়াতে চাইছে। এই ভাবনাটা তাকে ভেতরে ভেতরে চিন্তিত করে তুলল।

বন্ধুরা আর কাজিনরা যখন তানিশাদের বাড়িতে, সামি তখন বাবার সাথে জুম্মার নামাজ আদায় করতে মসজিদে যাচ্ছিল। মসজিদ কাছেই। হেঁটে যাওয়া যায়। দুজনের গায়ে খয়েরি রঙের পাঞ্জাবি। রোমেলা গত ঈদে আড়ং থেকে কিনে এনেছিলেন। বাপ ছেলের জন্যে একই রঙের, একই ডিজাইনের দুটি পাঞ্জাবি। একই ডিজাইনের পাঞ্জাবি পরা দুজনের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে, বাবা ছেলে বলে মনে হয় না। মনে হয় বুঝি বড় ভাই, ছোট ভাই।

বাপ ব্যাটা হাঁটতে হাঁটতে তখন মসজিদের কাছাকাছি চলে এসেছিল। সেই সময় হক হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'তোমাকে এরকম আপসেট দেখাচ্ছে কেন আব্বু? সব ঠিক আছে তো?'

সামি বাবার দিকে তাকালো। অনেক বয়স পর্যন্ত তার একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, তার বাবা পৃথিবীর সব সমস্যা সমাধান করতে পারে। গোটা দুনিয়ায় এমন কোনো জিনিস নেই যা তার বাবার সাধ্যের বাইরে। ক্রমে ক্রমে ধারণাটা পাল্টে গেছে। এখন সে জানে যে জীবনে কিছু সমস্যা আছে যেগুলো চাইলেই মানুষ সমাধান করতে পারে না। প্রকৃতি মানুষকে সেই বিশেষ সময় গুলোতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তার মানবিক সীমাবদ্ধতা। বাবার অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতা কোনো ভাবেই সামির মনোজগতে চলতে থাকা অবর্ণনীয়, ভাষাতীত, অব্যাখ্যেয় বিগ্রহের মীমাংসা করতে পারবে না। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়, যায় না শুধু কেনা মানব মনের প্রকৃত সুখ!

– 'ঠিক আছে বাবা। সব ঠিক আছে।' সামি বলল, ম্লান গলায়।

হক ছেলেকে ভালো মত দেখলেন। অভিজ্ঞ চোখে যাচাই করলেন নিজ পুত্রকে। বললেন, 'তুমি কি এই বিয়েটা মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করছ?'

সামি মুখ নামালো নিচে। বাবা হয়ে ছেলেকে এসব প্রশ্ন করা মানায় না। তবুও হক সাহেব সংকোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে প্রশ্নটা করেই ফেললেন, 'তুমি কি ওই মেয়েটিকে এখনো ভুলতে পারোনি?'

সামি অপ্রস্তুত হাসলো। তানিশাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তটা বাবা মা তার ওপরে চাপিয়ে দেননি। এটা সম্পূর্ণ তার একক স্বাধীন সিদ্ধান্ত ছিল। তাই এই সিদ্ধান্তের সুফল বা কুফল যাই আসুক না কেন তা সামিকে একাই বইতে হবে। এ সিদ্ধান্তের দায়ভার কোন ভাবেই বাবা মায়ের ওপর বর্তায় না। সে নিজে সুখী না হলেও চলবে। কিন্তু বাবা মায়ের থাকতে হবে চিন্তামুক্ত। সামি বাবার চোখে চেয়ে হাসলো, 'আরে না,

এসব কিছুই না। চিন্তা কর না তুমি। রাতে ঘুম হয়নি তো। তাই একটু শরীরটা খারাপ লাগছে।'

হক আর ঘাঁটালেন না ছেলেকে। কিন্তু তার মনটা খচখচ করতে থাকল।

৩৫

আকাশের বাসা থেকে কেউ যাবে না এনগেজমেন্ট এ। তারাকে খুব করে বলার পরেও সে রাজি হয়নি। আসলে তারার যে ওরকম বড়লোকের অনুষ্ঠানে যাবার মতো জাঁকজমক জামা কাপড় নেই এই সত্যটা তো আকাশকে বলা যাচ্ছে না। তাই, পরীক্ষার উছিলা দিয়ে দাওয়াতটা নাকচ করে দিল সে। ঝুমকির কদিন ধরে একটু জ্বরজ্বর ভাব আর সর্দি, কাশি। তাই সেও যেতে চাইল না।

ঠিক হল আকাশ আর রুদ্র হোটেলে যাবার সময় মনীষাকে তুলে নিয়ে যাবে ওর বাসা থেকে। ট্যাক্সি, সি এন জি বা উবার যে কোন একটা ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে যাবে মনীষার বাসায়। তারপর সেখান থেকে বিভার বাড়িতে। ওখানেই তিন বান্ধবী সাজগোজ করে তৈরী হচ্ছে অনুষ্ঠানে যাবার জন্য।

অমৃতাকে সাজানো নিয়ে হৃদি আর বিভার উত্তেজনা সীমাহীন! ঠিক হয়েছে অমৃতার মুখ সাজাবে বিভা এবং শাড়ি পরাবে হৃদিতা। মজার ব্যাপার হল শাড়ি পরা অমৃতাকে দেখতে তার মা এবং ছোট বোন এসে হাজির হয়েছে বিভাদের বাসায়। অমৃতার মা আনন্দ অশ্রু আটকে রাখতে পারছেন না। খানিক বাদে বাদে খুশিতে তার চোখ ভিজে উঠছে। অনেক বছর ধরে তিনি মনে মনে এই আশা পুষে রেখেছিলেন যে একদিন তার মেয়েটাও আর দশটা মেয়ের মত স্বাভাবিক হয়ে উঠবে, মেয়েলি হয়ে উঠবে। আজ এতদিন বাদে তার আশা পূরণ হতে যাচ্ছে। এই আনন্দ তিনি কোথায়

রাখবেন? মেয়েকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখার জন্য অমৃতার বাবাও আসতে চেয়েছিলেন বিভাদের বাসায়। কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভেবে শেষ মেশ ইচ্ছেটাকে ঢোঁক গিলে ফেলেছেন। তবে তিনি বাড়িতে বসে মেয়ের জন্য অপেক্ষা করবেন। যত রাতই হোক জেগে থাকবেন। তার মনে বড় আশা, তার মেয়েটি আজকের পর থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। আল্লাহ পাক তাদের বাবা মায়ের দোয়া কবুল করেছেন।

অমৃতার হয়েছে এক মস্ত জ্বালা। শাড়ি পরার পর থেকে তার কেবলই মনে হচ্ছে সবাই তার শরীর খানার দিকে ডবডবে চোখে চেয়ে আছে। কী যন্ত্রণায় যে পড়ল সে! সব মেয়েদের সাথেই কি এমন হয়? এই নিরন্তর দৃষ্টিবাণ সর্বক্ষণ সঙ্গে নিয়ে মেয়েরা চলাফেরা করে কী করে?

শুধু যে চোখের দৃষ্টি দিয়েই লোকে তার সৌন্দর্য শুষে নিচ্ছে তা নয়, মুখের ওপর অনেকে বলেও দিচ্ছে, 'কী সুন্দর তুমি!' অমৃতার এসব প্রশংসা শুনে অভ্যাস নেই। কেউ প্রশংসা করলেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। কান হয়ে উঠছে লাল। ধন্যবাদ দেয়া তো দুরের কথা, যে প্রশংসা করছে চট করে তার চোখের সামনে থেকে সরে যাচ্ছে সে। লোকে তবুও ক্ষান্ত হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই জানিয়ে দিচ্ছে যে অমৃতা কতটা সুন্দর, এবং শাড়িতে তাকে কতটা মানিয়েছে।

অবশ্য লোকেরই বা আর দোষ কী? সত্যিই তো তাকে লাগছিল দেখতে স্বর্গের অপ্সরীর মতো। তার ছোট ছোট বয়কাট চুল কোনো ভাবেই শাড়ির সৌন্দর্য লাঘব করতে পারেনি বরং ওই চুলের ধরণটা শাড়ির সাথে এনে দিয়েছে এক অন্যরকম আভিজাত্য। ধনুকের মতো বঙ্কিম ভ্রুযুগলের নিচের পুতুল চোখদুটিতে তার বান্ধবীরা আলগা পাঁপড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। সোনালী,রুপালি আর কালোর মিশেলে আই শেডো

দিয়ে এঁকে দিয়েছে চোখ। তারপর পরিয়েছে কাজল। গালে দিয়েছে ব্লাশন, আর পদ্মকোরকের ন্যায় পাতলা গোলাপি ওষ্ঠদ্বয়ে দিয়েছে লাল ম্যাট লিপস্টিক।

হাফ হাতা গোল্ডেন ব্লাউজের সাথে সাদা নেটের ওপর সোনালী সুতোর কাজ করা শাড়ি। সাদা নেটের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠছে চন্দন রঙের ফর্সা পেট। নিয়ম করে দৌড়োয় বলেই হয়তো দেহের গাঁথুনি ভারী চমৎকার। তার ছাব্বিশ বছরের ছিপছিপে লম্বা কায়া এখন পূর্ণ যৌবনময়। শাড়ি জড়ানো অঙ্গে নারীত্বের তীব্র উচ্ছ্বাস! সরু কোমরখানি যেন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে!

অমৃতা যখন সেজে গুজে বিভার শোবার ঘর থেকে বেরোলো, তখন ড্রইং রুমে অপেক্ষারত অবস্থায় ছিল রুদ্র, আকাশ, মনীষা, অমৃতার ছোট বোন এবং মা। অমৃতার পেছন পেছন বিভা আর হৃদিও এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের সবার সাজগোজ শেষ। কিন্তু আজকে ওদের কেউ দেখছে না। সবার চোখ গিয়ে পড়েছে অমৃতার ওপর। অমৃতার মায়ের চোখ ভিজে উঠেছে। তিনি আনন্দ অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন। দীপার চোখেও পানি।

আকাশ আর রুদ্র দুজনে অনেকটা ক্ষণ অবধি কোনো কথা বলতে পারল না। রুদ্রর চোখ মুখ দেখে মুগ্ধতাটা টের পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আকাশকে দেখাচ্ছে কিঞ্চিৎ বিব্রত। সে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না তার এ মুহূর্তে কী বলা উচিত, কী করা উচিৎ। বলতে কী, অমৃতার ভারী লজ্জা করছিল। জীবনে এই প্রথম বারের মতো সে জানল, যে লজ্জা কী রকম একটা ভয়ংকর জিনিস। শাড়ি পরে হাঁটা চলা করাও ভারী ঝামেলার কাজ। এর মাঝেই সে অস্থির হয়ে উঠেছে এই অদ্ভুত পোশাকটা সামলাতে গিয়ে।

অনেকটা ক্ষণ পরে আকাশ বলল, ‘নাহ, শাড়ি জিনিসটা তোর জন্য না। প্যান্ট শার্টেই বেশি মানায় তোরে।’

অমৃতা কিছু বলার আগেই অমৃতার মা বেশ প্রতিবাদী গলায় বলে উঠলেন, ‘একদম বাজে বকবেনা। আমার মেয়েকে শাড়িতে খুবই মানিয়েছে। তোমরা এসব কথা বললে ও তো আর কখনো শাড়ি পরবেই না!’

বিভা বলল, ‘আন্টি আকাশ মজা নিচ্ছে। আপনি মাইন্ড কইরেন না।’

শাড়ির চেয়ে প্যান্ট শার্টেই বেশি মানায় এই কথাটা শুনে অমৃতা আকাশের দিকে একবার ত্যাড়া চোখে তাকালো শুধু। মায়ের সামনে আর কিছু বলল না।

হোটেল ওয়েস্টিনে ওরা পৌঁছুলো সাড়ে সাতটায়। হলরুমে ঢোকার মুখেই বরকে পাওয়া গেল। বরের পরনে ছাই রঙের স্যুট, সাদা শার্ট, কালো টাই। গালে দাড়ি নেই। কোঁকড়া চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। স্মার্ট, সুদর্শন বরের ভূমিকায় সামিকে মানিয়েছে দারুণ। কনে পক্ষ দেখা মাত্র মুগ্ধ হতে বাধ্য! তার সামনে ফটোগ্রাফারদের ভিড়। ভিড়ের ভেতর দিয়ে তার মুখটা হঠাৎ হঠাৎ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আবার হারিয়েও যাচ্ছে নিমেষে। মিডিয়ার লোকজনও চলে এসেছে। গেটের সামনের ভিড়টার জন্য বন্ধুরা তাৎক্ষণিক ভাবে হলের ভেতরে ঢুকতে পারলো না। লিফটের সামনেই দাঁড়িয়ে রইল।

বিভা হালকা বেগুনি রঙের কাতান শাড়ি পরেছিল। পার্লারে গিয়ে চুল কার্ল করেছে সে। ওপরের দিকের চুল স্ট্রেইট আর নিচে কার্ল। চোখে স্মোকি আইশেডো। অভিজিতের পাঞ্জাবিটাও বেগুনি। আড়ং থেকে কিনেছে বিভা আজ দুপুরে, নিজের

শাড়ির সাথে ম্যাচিং করে। লিফটের সামনের করিডোরে দুই জন ফটোগ্রাফার আগত অতিথিদের ছবি তুলছিল বেশ অনেকক্ষণ ধরে। যে আসছে তাকেই দাঁড় করিয়ে ছবি তুলছে ওরা। বিভা অভিজিতের হাত টেনে ধরে এগিয়ে গেল ফটোগ্রাফারদের দিকে। খুব গম্ভীর ভাবে ফটোগ্রাফারদের একজনকে বলল, ‘ভাই আমার আর আমার বরের ছবি তুলে দেন তো। সুন্দর করে তুলবেন।

এরপর শুরু হল ছবি তোলার পালা। নানা ভঙ্গিতে একের পর এক ছবি তুলতে থাকলো বিভা তার বরকে পাশে নিয়ে। দু তিনটা ছবি তোলার পরেই অভিজিৎ বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বিভার উৎসাহ ক্রমবর্ধমান। তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা জীবন সে শুধুমাত্র ছবি তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে।

অমৃতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল হৃদি। লিফটের দরজার দিকে পিঠ দিয়ে। সাটিন শিফনের হালকা গোলাপি জমিনের ওপর মেরুন সুতোর কাজ করা শাড়ি পরেছে সে। থ্রি কোয়ার্টার হাতার ব্লাউজ। খোলা চুল। খুব একটা সাজগোজ করেনি। তার ধারণা গায়ের রংটা একটু চাপা বলে বেশি সাজগোজ তাকে মানায় না। আজকেও তার মুখে হালকা প্রসাধন। মেরুন রঙের গোল টিপ কপালের মাঝ বরাবর। চোখে কাজল। ব্যাস এটুকুই।

লিফটের দরজার বামপাশে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র, আকাশ আর মনীষা। মনীষা একটা নীল জামদানি শাড়ি পরেছে। মাথায় রজনীগন্ধার কাজরা। রুদ্র, আকাশের পরনে সাদা পাঞ্জাবি। বিভার বিরতিহীন ছবি তোলার অত্যাচারে পিষ্ট হয়ে যাওয়া অভিজিতের গোবেচারা মুখখানার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছিল ওরা দুজনে। বিভা সেই হাসি লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ‘তোমরা দুজন লুনুষ ব্যক্তি ব্যাক্কলের মত হাসতেছো কেন? হিংসা হয়?’

রুদ্র বলল,'আর কত ছবি তুলবি? তুই কি লাক্স সুপার স্টার? নাকি আজকে তোর বিয়া? তোর বর আরেকটু পরেই কাইন্দা দিবে।'

– 'এসব ফালতু কথা বলে আমার বরটাকে খারাপ বানাবি না। খবরদার!'

সেই মুহূর্তে লিফটের খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসলেন হক। নামকরা লোকদের ঘিরে সবসময় একটা ছোটখাটো ভিড় লেগে থাকে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। হক সাহেবকে ঘিরে আছে ছয় সাতজনের একটি দল। তাঁর গায়ে কালো স্যুট, সাদা শার্ট, সাদা কালোর মিশেলের টাই। হৃদি তাঁকে দেখা মাত্র সালাম দিল। তিনি মাথা নেড়ে সালামের উত্তর দিয়ে ব্যস্ত ভাবে হেঁটে এগিয়ে গেলেন সামনে। তাঁকে দেখতে পেয়ে সামনের ভিড়টা মুহূর্তের মধ্যে পাতলা হয়ে গেল। দলবল নিয়ে তিনি ঢুকে গেলেন ভেতরে।

হলরুমের সিলিং সাজানো হয়েছে রুপালি, সাদা এবং সোনালী পর্দা দিয়ে। পর্দাগুলো ফুলের পাঁপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে সিলিং জুড়ে। পর্দার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে ডিমের মত হলুদ লাইট। হলদে আলোয় ঝকঝক তকতক করছে চারপাশ। সাদা রঙের আর্টিফিশিয়াল ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে হলের প্রতিটি খুঁটি। মঞ্চের পটভূমিতেও একই রঙের পর্দা টাঙানো। বড় বড় ফুলদানিতে রাখা গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল। স্টেজের মাঝামাঝি সোনালী হাতল ওয়ালা দুটি রাজকীয় সোফা। গোল গোল খাবার টেবিলের ওপর সাজানো আছে তাজা গোলাপের তোড়া। প্লেট, ছুরি, কাঁটাচামচ, ন্যাপকিন। প্রতিটি প্লেটের সাথে রাখা একটি করে ছোট চকলেটের বাক্স। রুমের ভেতর হালকা শব্দে চালিয়ে দেয়া হয়েছে রবীন্দ্রসংগীত। সব মিলিয়ে বেশ মনোরম একটা পরিবেশ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হলরুমটি দেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভরন্ত হয়ে উঠল। বৌ চলে আসলো যথাসময়ে। সামি স্টেজে উঠে বসেল তানিশার পাশে। তানিশার পরনে দিল্লী থেকে আনা চার লক্ষ টাকার লেহেঙ্গা। লেহেঙ্গাটির রঙ ফিরোজার কাছাকাছি। গলায় থরে থরে সাজানো চারটি হীরের সেট। মাথায় সোনার মুকুট এবং টায়রা। এই জাঁকজমক সাজে তার চেহারা হয়ে গেছে সম্পূর্ণ অন্যরকম। জাঁকজমক দেখে মাথা ঘুরে যাবার মতো অবস্থা। স্টেজে বসে থেকে সামি বন্ধুদের খুঁজছিল চোখ ঘুরিয়ে। পেয়েও গেল। কাছেই একটা টেবিল দখল করে বসেছে সবাই। আজকে সে সবার থেকে আলাদা। ইচ্ছে থাকলেও বন্ধুদের সাথে গিয়ে এক টেবিলে বসা আজকের দিনটায় অন্তত কোনো ভাবেই সম্ভব না তার জন্য। স্টেজে বসে থেকে সে শাড়ি পরা অমৃতাকে দেখছে। নিজের চোখে না দেখলে এই দৃশ্য বিশ্বাস করতে পারতো না কোনোদিন। অমৃতার পাশাপাশি একে একে গোল হয়ে বসেছে আকাশ, রুদ্র, মনীষা, বিভা, অভিজিৎ, হৃদি। হৃদির মুখখানা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। পেছন থেকে শুধু দেখা যাচ্ছে পিঠময় ছড়িয়ে থাকা একরাশ কালো চুল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার হৃদির মুখটা দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। হৃদি এদিকে তাকাচ্ছে না কেন? সকাল বেলা সব বন্ধুরা বাড়িতে আসল, শুধু সে আসলো না। এমনকি সারাদিনে একটা ফোন পর্যন্ত করলো না। হৃদি এসব কী শুরু করেছে? সমস্যা কী তার? এই এড়িয়ে চলা ভাবটা সামির মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। খুব ভাব নেয়া শিখেছে আজকাল। সামির ইচ্ছে হলো এই মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ওকে ভালো মন্দ দুটা কথা শুনিয়ে আসে।

তার পাশে এখন তানিশার বাবা মা এসে বসেছেন। স্টেজের সম্মুখে পাঁচ ছয়জন ফটোগ্রাফার দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা ছবি তুলে যাচ্ছে তারা। তানিশা হেসে হেসে কানে কানে তাকে কী যেন একটা বলল। সে শুনতে পেল না কিছুই। এতো কোলাহলের মাঝে ডুবে থেকেও তার চারপাশে এখন নিদারুণ এক শব্দহীনতা। সাদা কালো ক্যানভাসে ছাওয়া চারিদিক। সবার মুখ নড়ছে, হাত পা নড়ছে, আশেপাশের প্রতিটি ছবি চলনশীল, বলনশীল শুধু নেই কোনো শব্দ, নেই কোনো রং। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে কয়েক গজ দূরে বসে থাকা খোলা চুলের মেয়েটির দিকে। সে বশীভূতের মত নামটা ধরে ডাকল একবার, 'হৃদি!'

তানিশা কিছু শুনতে পেল কিনা কে জানে। সামির দিকে একবার তাকালো সে। সামির চোখ ক্যামেরার দিকে নেই। ক্যামেরা ম্যান তাকে বার বার হাত নেড়ে, ডেকে, দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্ট করছে। সে শুনতে পাচ্ছে না কিছুই। তার চারপাশে এখন ধূসর, সাদা কালো, শব্দহীন চলচ্চিত্র। আর বেশিক্ষণ এরকম অবস্থা চলতে থাকলে উপস্থিত সকলের চোখে পড়বে বিষয়টা। কিন্তু তার আগেই খোদার মেহেরবানিতে হৃদি পেছন ফিরে তাকাল। সরাসরি চোখ রাখল সামির মুখের ওপর। ওই চোখে চোখ পড়া মাত্রই ম্যাজিকের মতো সামির কর্ণকুহরে প্রবেশ করল জাগতিক সব কোলাহল। চকিতে সাদা কালো চলচ্চিত্র রূপান্তরিত হল রঙিন ছবিতে। তার বুক থেকে একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসল। সে বুঝতে পারলো যে আজ সকাল থেকে ওই মুখটা এক নজর দেখতে পাবার জন্যেই তার মনটা কেমন কেমন করছিল। অনেক ক্ষণ তৃষ্ণার্ত থাকার পর এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খেলে যে তৃপ্তিটা হয়, তার ভেতরে এখন সেরকম একটা তৃপ্তি বোধ হচ্ছে।

বিভা আর অমৃতা রেস্টরুমে এসেছিল। এদিকটায় এখন ওরা ছাড়া কেউ নেই। বিভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির কুচি ঠিক করছিল। করতে করতে বলল, ‘আমাদের সামিকে দেখছিস? কী সুন্দর লাগতেছে?’

অমৃতা বিপন্ন গলায় বলল, ‘আমার তো ওর থেকে ওর বাবাকে বেশি সুন্দর লাগে! কী করব?’

বিভা ঝেঁঝে উঠলো একদম কথাটা শুনে, ‘অমৃতা এইসব কথা বলতে না তোরে মানা করছি? পুরাই পারভার্ট মনে হয় আমার তোকে, এসব শুনলে।’

অমৃতা একটা বড় শ্বাস ফেললো, ‘কিছু করার নাই দোস্ত। আমি ট্রাই করতেছি। পারতেছিনা।’ কী যেন চিন্তা করল সে, তারপর বলল, ‘আমি মনে হয় একটু খারাপই আছি। নইলে নিজেরে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না ক্যান?’

বিভা এ কথা শুনে তাকালো ওর দিকে। একটু নরম ভাবে বলল, 'খারাপ না মোটেও, তুই গাধা, বেকুব আর পাগল।' মুখে বলল বিভা, কিন্তু মনে মনে বলল, তুই অন্যরকম রে অমৃতা। একটু বেশিই অন্যরকম। এতো অন্যরকম না হলেও পারতি!

অমৃতা এবার প্রসঙ্গ পাল্টালো, 'বেশির ভাগ লোকজনের নজর খারাপ বুঝছিস? তোরা থাকিস ক্যামনে এভাবে? খারাপ লাগে না?'

– 'অভ্যাস হয়ে গেছে।' বিভার তখন শাড়ির কুচি ঠিক করা শেষ।

– 'আমার ভীষণ বিশ্রী লাগতেছে ব্যাপারটা। এরকম জানলে আমি শাড়িই পরতাম না।'

– 'এগুলা কোনো কথা না। এসব নিয়েই মেয়েদের চলতে হয়। আর তোমার ফিগার অনেক জোশ, তোমার উচিৎ প্রায়ই শাড়ি পরা।'

– 'হবে না আমার দ্বারা। আর যার জন্য পরলাম তার তো কোনো খবর নাই। একবার দেখলো না পর্যন্ত।

বিভা ধারালো ভাবে বলল, 'এটার মানে কী? তোমার কি ধারণা ছিল তোমাকে দেখা মাত্র উনি তুঝে দেখা তো নিয়ে জানা সানাম গান গেয়ে উঠে নাচতে নাচতে ছুটে আসবে?'

অমৃতা হেসে ফেলল, 'তুই একটা ফাজিল। গান গাওয়া তো দূরের কথা, এক নজর তাকালোই না!'

– ‘উনার এত টাইম নাই বুঝছ? ছেলের বিয়া বইলা কথা। তার উপর আসতেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রীরে তেল দিবে নাকি তোমারে দেখবে?’

অমৃতা একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলল, ‘হুম, দেখার সময়টুকু হবে বলে মনে হচ্ছে না।’

ঠিক সেই সময় দড়াম করে রেস্টরুমের দরজাটা খুলে গেল। ঝড়ের বেগে ভেতরে প্রবেশ করলো হৃদি। তার চোখ ভর্তি জল। মুখজোড়া থমথম করছে কান্না। দুই বান্ধবীকে দেখতে পাওয়া মাত্র সে কম্পনরত গলায় বলে উঠল, ‘আমি পারতেছিনা দোস্ত। সিরিয়াসলি আমি এসব আর সহ্য করতে পারতেছি না।’

অমৃতা আর বিভা থ বনে যাওয়া চোখে তাকিয়ে রইল হৃদির দিকে। হৃদি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, ‘ওর পাশে তানিশাকে আমার সহ্য হচ্ছেনা। আমার মনে চাইতেছে মইরা যাই। কী করব আমি? হায় আল্লাহ! কী করব?’

দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ করল চার পাঁচজন মেয়ের একটি দল। হৃদি তড়িঘড়ি করে বেসিনের কল ছেড়ে নিজের সারা মুখে জলের ছিটা দিতে শুরু করল। অমৃতা আর বিভা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ব্যথাতুর চোখ নিয়ে। তাদের মুখে কোনো কথা নেই।

.

তিন চারজন নামি দামী শিল্পী এসেছেন এ অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করার জন্য। গান শুরু হবার আগে উপস্থাপক ঘোষণা দিলেন যে বর কনের পরিবার এবং বন্ধু বান্ধবদের জন্য একটি বিশেষ সেগমেন্ট রয়েছে। বর অথবা কনেকে নিয়ে এক লাইনের মধ্যে কিছু বলতে হবে। একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে বর অথবা কনে সম্পর্কে মতামত, অনুভূতি বা সম্পর্কের গভীরতা। প্রথমে বর পক্ষের লোকজনদের ডাকা হল। সামির বন্ধুরাই এগিয়ে গেল নাচতে নাচতে। স্টেজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বরের চোখে চোখ রেখে বলতে হবে কথাটা। সবার প্রথমে আসলো আকাশ। সে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'সামি, আজকের পর থেকে কিন্তু তুমি স্বামী!'

হল ভর্তি মানুষজন হেসে উঠলো কথাটা শুনে। সে অবশ্য এখানেই থামল না। বলল, 'ওটা নকল কথা ছিল। এখন আসল কথাটা বলব।'

তানিশার কাজিনরা হৈ হৈ করে বলে উঠল, 'হবেনা হবেনা, একবারই চান্স!'

আকাশ কারো কথা কানে না নিয়ে বলল, 'সামি, ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড!'

সামি স্টেজের ওপর বসে থেকে ভারী সুন্দর হাসল আকাশের কথাটা শুনে। ঠোঁট নেড়ে স্পষ্ট ভাবে বলল, 'নোটেড!'

আকাশের পর পর আসল রুদ্র। সে বলল, 'সামি শোন, তুই আকাশের বেস্ট ফ্রেন্ড হতে পারিস, কিন্তু সবাই জানে যে, তোর বেস্ট ফ্রেন্ড হল রুদ্র, আকাশ না।' এটুকু বলে সে উপস্থিত দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'সামির বেস্ট ফ্রেন্ড কে?'

কয়েকজন উঁচু গলায় উত্তর দিল, ‘রুদ্র!’

সামি আর তানিশা দুজনেই খুব হাসতে লাগল এসব ছেলেমানুষি দেখে এরপর অমৃতার পালা। সে সামির চোখে চেয়ে বলল, ‘দোস্ত! আই উইল নেভার লেট ইউ ডাউন। আই প্রমিজ!’

সামির সরু চোখে তাকালো অমৃতার দিকে। ঠাট্টার স্বরে ছোট করে বলল, ‘রিয়েলি?’ আজকের সন্ধ্যায় সে অমৃতার বলা কথাটির মর্মোদ্ধার করতে পারল না। হয়তো কোনো একদিন ঠিক ঠিক পারবে।

বিভা ভরা মজলিশে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ‘সামি! তুই বেকুব ছিলি, বেকুব আছিস, বেকুবই থাকবি।’ কথাগুলো বলল সে খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে। সাধারণ লোকে ঠাট্টা হিসেবে নিলেও বন্ধুরা বুঝলো যে কথাগুলো বিভা ঠাট্টা করে বলেনি, মন থেকেই বলেছে।

হৃদি একেবারেই চাইছিল না এতো লোকের সামনে যেতে। কিন্তু সব বন্ধুরা কিছু না কিছু বলেছে। সে কিছু না বললে ব্যাপারটা ভারী দৃষ্টিকটু হয়ে যাবে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাঁচুমাচু মুখে সামনে এগিয়ে আসল। মাইক্রোফোনটা হাতে নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। কী বলবে? তার গলা দিয়ে তো কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না! যাকে সে নিজের করে পেতে চেয়েছিল, সেই মানুষটা আজ অন্যের হতে চলেছে। এই কষ্ট বুকে চেপে রেখে তাকে এখন হাসিমুখে সাধুবাদ জানাতে হবে। নব দম্পতির মঙ্গল কামনা করতে হবে। পারবে কি সে এতটা ভালো অভিনয় করতে?

তার চোখের নিচের কাজল লেপ্টে গেছে। সামি বুঝতে পারছে হৃদি এইমাত্র কান্নাকাটি করে করেছে। কোনো কারণে তার মন খারাপ। হৃদির কান্না নতুন কিছু নয়। তার স্বভাবটাই ছিঁচকাঁদুনে। কিন্তু আজকের এই আনন্দের দিনে সে কাঁদবে কেন? সামির বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল হৃদির ওই কান্না চাপা মুখটা দেখে। হৃদি, সামির দিকে তাকাল। তাকিয়েই রইল কয়েক সেকেন্ড। কেমন যেন অদ্ভুত ওর আজকের চাউনিটা। একটু বিব্রত বোধ করল সামি। তানিশা ওর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'এই মেয়ের কী হয়েছে?'

সামি উত্তর দিতে পারল না। তার কেন যেন খুব বুক কাঁপছে! হৃদি মাইক্রোফোন মুখের সামনে নিয়ে অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, 'সামি!... আই লাভ ইউ!...'

উপস্থিত সকল মানুষ এক মুহূর্তের জন্য চুপ হয়ে গেল। আকস্মিক ভাবে কোত্থেকে যেন এক ভয়ঙ্কর শীতল নীরবতা নেমে আসল। সবাই নিজেদের কথাবার্তা ভুলে গিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল হতভম্ব ভাবে। সামির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে লণ্ডভণ্ড! তানিশা স্তম্ভিত!

হৃদির গাল বেয়ে নামছে একটা জলের ধারা। সেই জলের ধারা হাতের উল্টো পাশ দিয়ে মুছে নিয়ে সে কাঁপা গলায় বলল, 'আই মিন, আই লাভ ইউ দোস্ত! ভালো থাকিস সব সময়!'

উপস্থিত লোকজনের মধ্যে কোলাহল ফিরে আসল। হৃদি দৌড়ে পালিয়ে গেল জায়গাটা থেকে। সব কিছু আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। শুধু সামির মুখে অনেকক্ষণ অবধি লেগে রইল একটি দিশাহারা, বিহ্বল ভাব!

হৃদি জায়গাটা থেকে প্রস্থান করার পরেও উপস্থিত অতিথিদের অনেকেই চমকটা কাটিয়ে উঠতে পারল না। একটি যুবতী মেয়ের কাঁদতে কাঁদতে বিয়ের বরকে সবার সামনে 'আই লাভ ইউ' বলে ফেলাটা কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। যদিও এ বিষয়টি মোটামুটি রকমের পরিষ্কার যে মেয়েটি বন্ধু হিসেবেই বলেছে কথাটা। তবুও কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। অনেকেই ফুসুরফাসুর করে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছে গোপনে। কনে পক্ষের মুরুব্বিরা মেয়েটির বিষয়ে উৎসুক হয়ে উঠেছেন। কে এই মেয়ে, কী তার পরিচয় এসব নানাবিধ সন্দেহ বিদ্ধ প্রশ্ন লোকমুখে ঘুরে ঘুরে হলরুমের বাতাসটাকে ভারী করে তুলছে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হল রোমেলার। একমাত্র ছেলের বিয়ে উপলক্ষে তিনি বেশ জবরজং একটা সাজ দিয়ে এসেছিলেন পার্লার থেকে। তার গায়ে লক্ষ টাকা দামের শাড়ি। গলায় কানে হীরের সেট। আজ সন্ধ্যে থেকেই তার মেজাজ বড় প্রফুল্ল ছিল। সব কিছু পরিকল্পনা মোতাবেকই হচ্ছে। তানিশার মতো একটি ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েকেই তিনি ছেলের বৌ হিসেবে চেয়েছিলেন। আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া যে আল্লাহ তার মনের আশা পূরণ করেছেন। তার জীবনে এখন আর কোনো অতৃপ্তি নেই। নিজের আত্মীয় স্বজনদের চোখে মুখে তিনি হিংসের ঝলক দেখতে পাচ্ছেন। কেউ ভাবতেও পারেনি যে ছন্নছাড়া, পাগলাটে স্বভাবের সামি শেষ অবধি বাবা মায়ের পছন্দে বিয়ে করতে রাজি হবে। আজকাল বাপ মায়ের আদেশ মেনে চলা ছেলে মেয়ে আছে নাকি দুনিয়ায়? পুত্র গরিমায় তাই তার ভেতরটা একদম রমরম করছিলো সারাটাদিন। কিন্তু এই হৃদি মেয়েটার সাহস দেখে তিনি অবাক না হয়ে পারলেন না। এতবড় একটা সিন ক্রিয়েট কেন করলো মেয়েটা? লজ্জা শরম বলতে কি কিছু নেই এর? বাবা মা কি কিছুই শেখায়নি? ছেলের মুখে তিনি একটি চরম অস্থির ভাব পর্যবেক্ষণ করছেন সেই ঘটনার পর থেকে। নিজের পেটে ধরা ছেলেকে তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। ছেলের চোখের দৃষ্টি পাল্টে গেছে। শেষ মুহূর্তে এসে কোনো অঘটন ঘটবেনা তো আবার? তার বুক কাঁপছে অনবরত। শরীর খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে বিপি হাই হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা নিয়ে তিনি কার সাথে কথা বলবেন বুঝে পাচ্ছেন না। তার স্বামী সর্বদা এত ব্যস্ত থাকেন যে হাতের নাগালে পাওয়াই মুশকিল। এই মুহূর্তে তিনি দলের নেতা কর্মীদের আপ্যায়ন করা নিয়ে ব্যস্ত। নেতা কর্মী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছে জনা দশেক বিদেশী বায়ার এবং ডেলিগেটস। অতএব নিজের ভেতরেই আপাতত দুশ্চিন্তাটা চেপে রাখলেন তিনি। পারত পক্ষে তানিশার বাবা মায়ের সামনে পড়লেন না। মনে হচ্ছে ঘটনাটা তাদের কাছেও দৃষ্টিকটু লেগেছে। ইচ্ছে করছে ওই মেয়েটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে হল থেকে বের করে দিতে। কত বড় সাহস মেয়ের! শ খানেক মানুষের সামনে তার ছেলেকে কিনা বলে আই লাভ ইউ? এইসব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের খুব ভালো ভাবে চেনা আছে তাঁর। এরা বড়লোক বাবার সাদাসিধে ছেলেদের ওপর টোপ ফেলার জন্য সর্বদা ওৎ পেতে থাকে। তিনি আর কিছুই চিন্তা করতে পারছিলেন না। রাগে, উত্তেজনায় আর দুশ্চিন্তায় তার মাথার রগ দপদপ করতে থাকল।

বন্ধুরা সব হলের একেবারে কোণার একটা টেবিল দখল করে বসেছিল। হঠাৎ করে সবার মধ্যে একটা কেমন স্থবিরতা চলে এসেছে। রুদ্র আর আকাশ দুজনেই কিছু একটা টের পেয়েছে। মনীষা, অভিজিৎ সঙ্গে না থাকলে তারা হয়তো বিষয়টি নিয়ে এখন আলাপ আলোচনা করত। কিন্তু ওই দুজন বাইরের মানুষের উপস্থিতির কারণে কোনো কথা খোলামেলা ভাবে বলা যাচ্ছেনা। সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে সামির জন্য। তার মুখটা দেখা মাত্র বোঝা যাচ্ছে যে বেচারার ভেতরে একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেই ঝড়ের দাপট বুকের মধ্যে চেপে রেখে তাকে ক্যামেরার সামনে বসে জোর করে হাসতে হচ্ছে। মিষ্টিমুখ করতে হচ্ছে। ব্যাপারটা যে ওর জন্য কতটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে তা অন্য কেউ না বুঝলেও বন্ধুরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারছে।

এই থমথমে পরিবেশের মধ্যেই হঠাৎ বিভা আবিষ্কার করল রুদ্র অভিজিতের কানে কানে হাসিমুখে কিছু একটা বলছে। অভিজিৎও হাসছে খুব। একেবারে দাঁত বের করে। বিভা ক্যাটক্যাট করে রুদ্রকে বলল, ‘এই, আমার বরের সাথে এতো কীসের

ফুসুর ফাসুর? তোকে না বলছি আমার ভালো বরটাকে খারাপ না বানাতে?' এটুকু বলে সে অভিজিৎকে প্রশ্ন করল, 'কী বলছিল ও তোমাকে? নিশ্চয়ই মেয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল?'

আকাশ ফোড়ন কাটল, 'আলবৎ মেয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল। মেয়ে ছাড়া কোন কথা হয় নাকি?'

রুদ্র আর অভিজিৎ তখন বিভার বেকুবি দেখে মিটমিট করে হাসছে। বিভা আগের চাইতেও রাগী গলায় বলল, 'খবরদার তোরা আমার জামাইকে লুনুষগিরি শিখাবি না।

এ কথা শুনে আকাশ উঠে এসে বিভার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে। বসল অভিজিতের পাশে। বলল,

– 'জামাই বাবু, লুনুষ না হতে পারলে জীবন বৃথা। বুঝতে পারতেছি বিয়ের আগে আপনার জীবনটা পুরাই ডালভাত ছিল, কোন সমস্যা নাই এখন আমাদের হাতে পড়ছেন। দুইদিনে ম্যাজিকের মতো পাল্টায় যাবে আপনার লাইফ। ফুলটাইম লুনুষগিরি করতে পারবেন।

বিভা তখন কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে ফোঁসফোঁস করে নাগিন নিশ্বাস ফেলছে। চেয়ে আছে আকাশের দিকে। মনে হচ্ছে আকাশকে পারলে সে গিলে খাবে। অভিজিৎ ওর রাগী গমগমে চেহারা দেখে হো হো করে হেসে ফেলল। রুদ্র বিভার দিকে তাকিয়ে দায়সারা ভাবে বলল, 'তুই দাঁড়ায় আছিস কেন? দূরে গিয়ে বয়। এখন ক্লাস চলবে। ক্লাস শেষ হইলে জামাইবাবুকে তোর কাছে রাইখা আসা হবে।'

এদিকে হৃদি টের পাচ্ছে যে একটা বড়সড় ভুল করে ফেলেছে সে। ভুলটা করে ফেলার পর থেকেই একদম বেকুব বেকুব লাগছে নিজেকে। প্রাণপণে চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। কিন্তু পারছেনা। খাওয়া দাওয়ার পালা শুরু করার আগে বর কনের প্যারেন্টস দের ডাকা হল নিজ নিজ সন্তানদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্যে। রোমেলা কিছুই বললেন না। তার এখন জনসম্মুখে বক্তব্য দেবার মত অবস্থা নেই। ওসব অভ্যাসও নেই তার। তিনি প্রথমেই প্রস্তাবটা নাকচ করে দিলেন। স্পিচ দিলেন হক। বেশ অনেকটা ক্ষণ ধরে তিনি মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে নিজপুত্র সম্পর্কে কথা বললেন। স্মৃতি চারণ করলেন। অমৃতা তার বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে শুনতে একটা সময় স্বগতোক্তি করে ফেলল, 'ইশ… কথা বলাটা যে একটা শিল্প তা উনার কথা শুনে বোঝা যায়। এতো সুন্দর করে কীভাবে কথা বলে মনুষটা?'

খানিক বাদে ইউ এন ডিপির সেই টেকো ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়ে গেল। ভদ্রলোক অমৃতাকে দেখার সাথে সাথে বলে উঠলো, 'মাই গড! তোমাকে তো দারুণ লাগছে!'

– 'কেমন আছেন?'

– 'আছি ভালোই। তুমি তো একবারও আসলে না আমার অফিসে!

– 'আসবো কোনো এক সময়। অত তাড়া কীসের?' বলল অমৃতা। কিন্তু তার দৃষ্টি আটকে গেছে কয়েক হাত দূরের একটা ছোট দলের দিকে। কোটের পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন বিদেশী ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলার সাথে কথা বলছেন তিনি। তাঁর মুখ হাসি হাসি। কথা বলার ভঙ্গিটি বরাবরের মতই চমৎকার।

টেকো ভদ্রলোক অনেক কিছু বলছেন হাত টাত নেড়ে। কিন্তু তার চোখ অমৃতার মুখের ওপর নেই। জুলজুল করে জ্বলতে থাকা চোখদুটি ঘুরে বেড়াচ্ছে অমৃতার বুকে,

পেটে, কোমরের খাঁজে। অমৃতা একটা সময় বলেই ফেলল, 'আপনি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলুন। শরীরের দিকে তাকাচ্ছেন কেন বার বার?'

টেকো লোকটার গাল ঝুলে গেলো। অপমানে থমথম করে উঠলো মুখ। তার কল্পনাতেও ছিল না যে মেয়েটা মুখের ওপর এরকম একটা কথা বলে দেবে। ঠিক সেই সময় চারটা চোখ মিলে গেল। দৈবাৎ! প্রথম নজরে তিনি ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। দ্বিতীয়বার তাকালেন। তাঁর মুখের কথা আটকে গেল। চোখের তারায় ঝিলিক দিল বিস্ময়! শুধুই কি বিস্ময়? বিস্ময়ের সাথে কি একটুও মুগ্ধতা মিশে নেই?

টেকো ভদ্রলোক কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'একজন জেন্টেল ম্যানের সাথে তুমি এভাবে কথা বলতে পারোনা।'

অমৃতার কানে কথাটা গেছে ঠিকই। কিন্তু উত্তর দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করল না সে। সেই মানুষটা তার দিকে তাকিয়েছেন, এবং তাকিয়েই আছেন। এখন দুনিয়া রসাতলে গেলেও তার কিছুই এসে যায়না। টেকো লোককে পেছনে ফেলে সে সামনে এগিয়ে গেল। মানুষটাও এক দু পা হেঁটে আসলেন। দুজনে দাঁড়ালো মুখোমুখি। বাতাসে কী একটা যেন মিশে গেল নিমেষে। নেশার মতো কিছু। রক্তে কেমন ঝিমঝিম ভাব!

তিনি অমৃতার চোখের দিকে চাইলেন সরাসরি, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। হ্যাঁ চোখের দিকেই চাইলেন, শরীরের দিকে কিন্তু নয়। এ জন্যেই অমৃতার ভালো লাগে। বড় ভালো লাগে এটা বুঝতে পেরে যে, লোকটা অহংকারী হতে পারে, বদরাগী হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই আর দশটা সাধারণ পুরুষের মতো কামুক কিংবা দুশ্চরিত্র নন।

কথা শুরু করার আগেই বাধা চলে আসে। এক মধ্যবয়স্ক মহিলা কোত্থেকে যেন উড়ে এসে, সালাম দিয়ে তাঁর সাথে কথা বলা শুরু করে দিলেন। প্রতিটা কথার শেষে একবার করে স্যার ডাকতে ভুলছেন না মহিলা। মহিলার কথা শেষ হতে না হতেই আরো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক হাজির হয়ে গেলেন। এই ভদ্রলোক রাজনৈতিক নেতা। টিভিতে প্রায়ই ইনাকে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে দেখা যায়। অমৃতা মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নড়ল না জায়গাটা থেকে। মানুষগুলো আঠার মতো লেগে আছে। ছাড়তেই চাইছেনা। টানা পাঁচ মিনিট পর জায়গাটা একটু ফাঁকা হল।

তিনি চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কী খবর অমৃতা? আছ কেমন?'

অমৃতা হাসল, 'আমি ভালো আছি রাশেদ! আপনি কেমন আছেন?'

রাশেদ কিছু বলার আগেই উটকো ঝড়ের ন্যায় এক দঙ্গল লোক উপস্থিত হয়ে গেল। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেল মুহূর্তের মাঝে। ক্যামেরাম্যান চলে আসল দুই তিনজন। কথা আর হলোই না। কথাগুলো হারিয়ে গেল হরেক লোকের ভিড়ে আর কোলাহলে। অমৃতার সতেজ, সুন্দর মুখখানা বাসি ফুলের মতো ম্লান দেখাতে লাগল। সরে পড়ল জায়গাটা থেকে। রাগে রি রি করতে থাকল সারা শরীর। আচ্ছা মুশকিল তো! শান্তিতে দুটা কথা বলার উপায় নেই। কী কথা আদতে বলার ছিল জানেনা সে, তবুও সেই অব্যক্ত, অবিদিত, আনকোরা, না বলা কথা গুলো লোহার হাতুড়ির মতো ঠকঠক আওয়াজ তুলে আঘাত হানতে লাগল বুকের পাঁজরে। কিন্তু সাচ্চা বিষয় হল যে, কখনো কখনো মানুষের মুখ কিছু না বললেও, চোখ বলে ফেলে অনেক কিছু! ভিড়ের মধ্যে বারে বারে দুই জোড়া চোখ লেগে যাচ্ছিল… থেমে যাচ্ছিল… কী যেন একটা বলে যাচ্ছিল। অমৃতা একটা খালি টেবিলের চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। এই টেবিলটা বর বৌয়ের জন্য রিজার্ভ করা। তাই এটায় আপাতত কেউ বসবে না। তিনি অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন তার ঠিক সামনের টেবিলেই, মুখোমুখি।

মুখোমুখিই কেন বসলেন? অমৃতার জন্যই কি? সম্ভাবনাটা মনে উঁকি দিতেই শিরশির করে মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে যায়। অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে অমৃতা। চেয়ে থাকেন তিনিও। আশেপাশে এতো লোক, এতো কোলাহল, তবুও যেন কেউ নেই। কিছু নেই। এক আশ্চর্য মধুময় আবেশ সমৃদ্ধ কুহেলিকায় স্তব্ধ চারপাশ! হঠাৎ কী যেন একটা হয়ে গেল। তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। অমৃতা টের পেল। নিঃশ্বাসটা ফেলার পর তিনি হাতে ধরা জল ভর্তি কাচের গ্লাসটার দিকে কিছুক্ষণ কুঞ্চিত ভ্রু নিয়ে চেয়ে রইলেন। অমৃতার মনে হলো মানুষটা এই মুহূর্তে তার কথাই ভাবছেন। কী ভাবছেন উনি?

অমৃতার ধারণা সঠিক। স্বচ্ছ জল ভর্তি ঝকঝকে কাচের গ্লাসটার দিকে চেয়ে থেকে তিনি ভাবছিলেন যে, কোন অমৃতাকে দেখতে বেশি সুন্দর? ঢোলা শার্ট আর প্যান্ট পরা টমবয় অমৃতা? নাকি এই শাড়ি পরা রমণীয় অমৃতা? এটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ থমকে গেলেন। এমন ছেলেমানুষী ভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়া কি তাঁকে মানায়? এই বয়সে? তাঁর ভেতরে রসবোধ চিরদিনই একটু কম। তিনি কাজ পাগল মানুষ। তাঁর জীবন বাঁধা পড়েছে শৃঙ্খলা এবং নিয়মের পরাকাষ্ঠায়। কর্মজীবন এবং সংসার জীবনের বাইরে তাঁর আলাদা কোনো জগৎ ছিল না কখনো। খুব অল্প বয়স থেকেই টাকার পেছনে ছোটা আরম্ভ করেছিলেন। সফলতা এসেছে অতি অল্প সময়ে। নারী চিন্তা করার মতো অবসর তাঁর কখনোই ছিলনা। এখন, জীবন তরী যখন শেষ বন্দরে নোঙর ফেলতে যাচ্ছে… ভাবতে ভাবতে তিনি নিজের মনে হাসলেন। মেয়েটি তাঁর পুত্রের বয়সী… বাচ্চা একটা মেয়ে!... তাঁর নিজের সাতাশ বছরের পুরোনো সংসার … আজ তাঁর একমাত্র পুত্রের বিয়ে! গা ঝাড়া দেবার মতো তিনি মনটাকে ঝাড়া দিয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। উঠে দাঁড়ালেন বসা থেকে। পদস্খলন তাঁর হয়নি আজ অবধি। না, এবারেও হবেনা!

ওই আচমকা প্রস্থানটা অমৃতার ভেতরে এক অপমান সূচক অসন্তোষের জন্ম দিল। জীবনে প্রথমবারের মতো শাড়ি পরার দিনটা তার মোটেও ভালো কাটছেনা। আসলে

কি, সব এই শাড়িরই দোষ। তার ভেতরে পিলপিল করে দলবদ্ধ পিঁপড়ার ন্যায় ফিরে আসছে সেই পুরোনো রাগ। মনে পড়ে যাচ্ছে কিশোরী বয়সে ঘটে যাওয়া বাজে ঘটনাটার কথা। পড়ানোর নাম করে রোজ বাড়িতে আসা বাজে লোকটার বিশ্রীভাবে গায়ে হাত দেয়া। ফিরে আসছে সেই ক্রোধ, সেই জিদ, সেই বিদ্বেষ! আবারও কিছু একটা লণ্ডভণ্ড করতে মন চাইছে। মনে চাইছে কোথাও আগুন লাগাতে। সেই বাচ্চা বয়সে অপমান সহ্য করতে না পেরে সে নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল কেটে এসেছিল। পাল্টে ফেলেছিল লেবাস। বিসর্জন দিতে চেয়েছিল নিজের ভেতরের নারী সত্তাকে। আজ এতদিন পর এই মানুষটার জন্য সেই হারিয়ে ফেলা নারীত্বকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল সে। বোকামি, বোকামি, চরম বোকামি! চারপাশটা অন্ধকার লাগছিল তার। লোকটা এরকম মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল কেন? অমৃতাকে কি মানুষ বলে মনে হয় না? রাক্ষুসে এক রাগ তার সমগ্র চেতনাকে পূর্ণগ্রাস করে নিতে চাইছিল। তার আর খাওয়া দাওয়াও হলো না সেই রাতে। চুপচাপ হলরুমের কোণার একটা চেয়ারে বসে রইলো সে। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ অবধি।

৩৬

আংটি বদলের পালা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। রাত দশটার দিকে অতিথিরা একে একে বিদায় নেয়া শুরু করল। বন্ধুরা যার যার বাড়ি ফেরার প্ল্যান করলেও সামি সেটা মানলো না। সে চায় বন্ধুরা যেন আজকের রাতটা তার বাড়িতেই কাটায়। তাছাড়া আগামীকাল সকাল দশটায় আকদ হওয়ার কথা, সুতরাং সকালে সবাইকে আর একবার আসতেই হবে। তাই শুধু রাতটা পার করার জন্য বাড়ি ফিরে কাজ নেই। অতএব বন্ধুরা সবাই চলল সামির বাড়ি। শুধু বিভা ছাড়া। বিভা, অভিজিৎ এবং মনীষা ফিরে গেল যার যার নিবাসে। আর বাকিরা চলল উত্তরা, বিয়ে বাড়িতে।

বন্ধুরা সামির আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। বিয়ে বাড়ি আত্মীয় স্বজনে গিজগিজ করছে। ড্রইংরুম ভর্তি একগাদা মানুষ। ফুল ভলিউমে গান বাজছে স্পিকারে। বাচ্চাদের কেউ

কেউ গানের তালে তালে নেচে যাচ্ছে। বিয়েবাড়ির আমেজ ষোলো আনাই আছে এখানে। বাড়ি ফিরে এসে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে বন্ধুদের আবিষ্কার করল সামি। বরকে দেখতে পেয়ে আত্মীয় স্বজনরা নানা রকম আহ্লাদীপনা শুরু করল। সামি কাউকে গ্রাহ্য না করে কোন ভূমিকা ছাড়াই নামটা ডাকল, 'হৃদি, একটু শুনে যা তো!'

হৃদির বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন কপালে নিয়ে উঠে আসল সে। বাকি বন্ধুরা দেখল ঘটনাটা। কেউ কিছু বলল না। সামির পেছন পেছন ছাদে উঠে আসল হৃদিতা। চারতলার ছাদটায় তখন অন্ধকার দাঁত চেপে বসেছে। সাদা কুয়াশার চাদর আলগা ভাবে জড়ানো আছে রাতের গায়ে। সুইমিং পুলের পার্শ্ববর্তী ঘাসযুক্ত অংশটুকুর রেলিং এর পাশে গিয়ে দাঁড়াল সামি। নিচতলা থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে, 'আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাইতে, চল পলায়ে যাই।' সেই গানের সাথে সারা বাড়ি কাঁপিয়ে নাচানাচি করছে ওর ফুপাতো, চাচাতো ভাইবোনরা।

হৃদি একটু পিছিয়ে পড়েছিল। সামি রেলিং এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল খানিক ক্ষণ। একটা সময় সিঁড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসল হৃদি। কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আবছা মুখের হৃদিকে হেঁটে আসতে দেখল সামি। অন্ধকারে ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না ঠিক মতো। বাতাসে খোলা চুল উড়ছে, উড়ছে শাড়ির আঁচল। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে নিজের পায়ের তলায় একটা ভূমিকম্প অনুভব করল সে। অনুভব করল বুকের ভেতরে এক অপ্রতিরোধ্য তুফান! এ যেন অবিকল ডুয়ার্সের সেই সন্ধ্যেবেলায় মেয়েটা!

'কী হইছে?' হৃদি বলল, অনেকটা ধমকানোর সুরে।

সামি কোন উত্তর দিল না। রেলিং এর পাশটায় রাস্তার হালকা আলো এসে পড়েছে। সেই আলোতে সামিকে আবছা চোখে দেখল হৃদি। কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে

ওকে। চেহারায় একটা ভারী খেপা আর উন্মত্ত ভাব। দেখলে কেমন যেন ভয় লাগে। হৃদিই আবার কথা বলল, ‘কী ব্যাপার? কথা বলিস না কেন?’

– ‘তুই হঠাৎ আই লাভ ইউ বললি কেন?’ অনুসন্ধানী গলায় প্রশ্ন করে সামি।

হৃদি চমকে উঠল প্রশ্নটা শুনে। আরক্ত হয়ে উঠলো মুখ। বিব্রত ভাবে বলল, ‘মানে কী? আমার ফ্রেন্ডকে আমি আই লাভ ইউ বলতে পারবো না?’

কথাটা শুনে সামি অদ্ভুত হাসি হাসলো। ওই হাসিটা হৃদির ভেতরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সত্যি, সত্যি, সত্যি! একদম তিন সত্যি, যে সে সামিকে এর আগে কখনো এমন অদ্ভুত হাসি হাসতে দেখেনি। আজকে এই ছেলের হয়েছে কী? সামি অদ্ভুত হাসিটা মুখে ধরে রেখেই বলল, ‘আমার তো হঠাৎ তোর মুখে আই লাভ ইউ শুনে মনে হইছে যে রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার। একদম বুকের এইখানে গিয়ে লাগছে!’ কথাটা বলতে বলতে সামি নিজের বুকের বাম পাশটায় হাত রাখল।

হৃদি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল, বলল, ‘কী সব ফালতু কথা!’

ওই পাশ ফেরানো মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল সামি, কিছুক্ষণ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবনে প্রথমবারের মত অনুভব করলো যে, এমন প্রবল ভাবে এর আগে কোনোদিন কোন মুখ তাকে টানেনি। অনেক অনেক সুন্দর মেয়ে দেখেছে সে। কিন্তু কারো সৌন্দর্যই তার বুকের ভেতরে এমন নিকষিত, বিশুদ্ধ ভালোলাগার জন্ম দিতে পারেনি কখনো। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল এই ভালোলাগাটাকে তার কাছে নতুন কিছু বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যে এই অনুভূতিটি যেন জন্ম জন্মান্তরের পুরোনো। আজকে শুধু নতুন করে আবিষ্কার করল যে, অনুভূতিটির উৎস কোথায়।

সে মোহাবিষ্টের মতো হৃদির হাতদুটো তুলে নিল নিজের হাতের মুঠোয়। দুর্বল ভাবে বলল, 'আজকে সারা দিনে একটাও ফোন দিস নাই কেন?'

– 'সময় পাইনাই।

– 'তখন কানতেছিলি কেন?'

– 'কখন?'

– 'যখন আমাকে ভালোবাসার কথা বললি? হোটেলে, সবার সামনে?' হৃদি কম্পিত বক্ষ নিয়ে কোনরকমে বলল, 'আমি তো এমনিই কাঁদি আমার কান্নার কোনো কারণ লাগে না।'

ফ্লুরোসেন্ট আলো এসে পড়া হৃদির আবছা মুখটার দিকে বেহেড চোখে চেয়ে থেকে সামি বলল, 'কেন যেন দুই তিনদিন ধরে খুব অশান্তি লাগতেছে, জানিস?'

– 'অশান্তি? কেন? কীসের অশান্তি তোর?'

সামি খুব সন্তর্পণে হৃদিকে নিজের বুকের অনেক কাছে টেনে নিয়ে আসল। তার গায়ে এখনো স্যুট আর টাই, হাতে তানিশার দেয়া আংটি। হৃদির মাথা ভর্তি নরম রেশমি চুলে সে আংটি ওয়ালা হাতটা রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'অশান্তিটা ঠিক কী কারণে তা জানিনা। তবে আমার একটা রোগ হইছে!'

– 'রোগ?'

হৃদি কাঁপছিল ভেতরে ভেতরে। সামি কাছে আসতেই ভালো লাগার ভোমরাটা কোত্থেকে যেন উড়ে এসে টুপ বসে পড়েছে মনের দেয়ালে। এখন শরীর জুড়ে, মন জুড়ে ক্রমাগত বেজে চলেছে সুখের দামামা!

– ‘সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ওই মেয়েটাকে কিস করার পর থেকে, অন্য কোন মেয়েকে আমার সহ্য হয়না। কী আজব কাণ্ড!’

হৃদি চুপ করে থাকে। বুক দুলছে উত্তেজনায়, ভয়ে এবং সুতীব্র এক কষ্ট কষ্ট সুখে!

সামি চাপা গলায় বলল, তোকে দেখতে হঠাৎ হঠাৎ সেই মেয়েটার মতো লাগে। এখনো লাগতেছে।’

এটুকু বলে সামি ওর মুখটা হৃদির মুখের খুব কাছে নামিয়ে আনে। তারপর অনেকটা ফিসফিস করে বলে, ‘মনে চাচ্ছে আবারো তোকে কিস করি, সেদিনের মতো!’ কথাটা বলেই সে চট করে একটা চুমু খেয়ে ফেলল হৃদির ঠোঁটে। নিমেষে রক্তের কণায় কণায় ছড়িয়ে পড়ল স্পর্শসুখের উন্মত্ততা। একটা তালা ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ শুনতে পেল সে। মনে হল যেন দীর্ঘ দিনের কোন অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ হল। নিশ্বাসে মিশে গেল তরতাজা বাতাস। হৃদির মনে হচ্ছিল এটা বাস্তব নয়, গভীর রাতের কোনো এক গভীর সুখস্বপ্ন। এখুনি বুঝি স্বপ্নটা ভেঙে যাবে। সে চায় না এই স্বপ্ন ভাঙুক। সে চায় এই একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতেই কেটে যাক তার একটা জীবন।

কয়েক মুহূর্তের বিভ্রম খেলে গেল দুজনের মধ্যে। তারপর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম সমস্তকে ভুলে গিয়ে ওরা পরস্পরের ঠোঁটে পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল অবিরত। যেন চুমুক দিয়ে পান করে নিতে চাইছে সমস্ত হৃদয়!

বেশ খানিকক্ষণ পরে সামি প্রমত্ত গলায় বলল, ‘আমারও একটা ইচ্ছা জীবন চাই হৃদি। ইচ্ছা হলেই তোকে চুমু খাওয়া যায়, এমন একটা জীবন!’

হৃদি এবার কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা কান্নাটা চোখের কার্ণিশে এসে বাধ ভাঙলো এবার। নিচে তখনো গানটা বেজে যাচ্ছিল,

'আজ ফাগুনী পূর্ণিমা রাইতে, চল পলায়ে যাই…'

সামির মস্তিষ্কের ভেতর কে যেন গানের কথাগুলো স্ট্যাপলারের পিনের মতো গেঁথে দিল। সে অস্ফুটে বলে উঠলো, 'চল পালাই!'

তীব্র এক বিদ্যুৎ অভিঘাতে চমকে উঠল হৃদি, 'কী বলতেছিস?'

সামি বুদ্ধিভ্রষ্টের হয়ে হৃদির হাত খামচে ধরলো, জোরালো গলায় বলল, 'ঠিকই বলতেছি। চল ভাগি। এখুনি!'

– 'তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সামি! কালকে তোর বিয়ে। আর আজকে তুই পালাবি?'

– 'বিয়ের আগের দিনই তো লোকে পালায়। জানিস না?' সামি বলল অনেকটা নির্বিকার গলায়।

– 'জীবনটা সিনেমা না।'

সামি ঘাসের ওপর অস্থির ভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, 'পালানো ছাড়া আর কোনো উপায় নাই। তানিশাকে আমি বিয়ে করতে পারবো না।'

– ‘এই কথাটা তোর আজকে মনে হইছে? বিয়ার আগের দিন?’ এবার হৃদির কণ্ঠস্বরে একটু কঠিন ভাব টের পাওয়া গেল।

– ‘হ্যাঁ আজকেই মনে হইল। আল্লাহর রহমত যে বিয়ার পরের দিন মনে হয়নায়। মনে হইছে বিয়ার আগের দিন। এইজন্যে শোকর আলহামদুলিল্লাহ!’

হৃদি এ কথার প্রত্যুত্তরে কিছু বলল না। দুশ্চিন্তা, ভয় এবং আনন্দ এই সমস্ত অনুভূতিতে মিলেমিশে তার ভেতরটা কেমন অবশ হয়ে আছে এই মুহূর্তে। হাতে পায়ে একটা শিরশিরে ভাব টের পাচ্ছে সে। বুক ধড়ফড় করছে প্রবল ভাবে। ঘটে যাওয়া ঘটনাটা এখনো তার শত ভাগ বিশ্বাস হচ্ছে না। সে কম্পনরত কণ্ঠে বলল, ‘পালানো কোনো সমাধান না। তুই তোর বাবা মায়ের সাথে কথা বল। উনারা বুঝবেন।’

সামি আঁতকে উঠল, ‘মাথা খারাপ? কোন মুখে কথা বলব আমি ওদের সাথে? মরে গেলেও কিছু বলতে পারব না।’

– ‘কিন্তু কিছু না বলে পালিয়ে গেলে তো উনারা আরো বেশি কষ্ট পাবেন!’

– ‘শোন, আম্মাকে এখন বিয়ে ভাঙার কথা বললেই কী হবে জানিস? আম্মা সঙ্গে সঙ্গে কান্নাকাটি করা শুরু করে দেবে। তখন দেখা যাবে তার কান্না দেখে আমি আর কিছু বলতে পারতেছি না। হয়তো আব্বা আম্মার মুখের দিকে তাকায়ে বিয়েটা করে ফেলতে হবে শেষ পর্যন্ত। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে পালায় যাওয়া। পালায় গেছি এটা জানার পর নিশ্চয়ই তানিশা আর আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না তাইনা? আমারও আর মুখ ফুটে আব্বা আম্মারে কিছু বলা লাগবে না।’

হৃদিকে বড়ই বিভ্রান্ত দেখাল। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘বুঝতেছিনা কী করা উচিৎ। এদিকে আমার রাহাতের সাথে বিয়ে ঠিক হয়ে গ্যাছে। আজকে তোর সাথে পালাইলে রাহাত কি আমাকে আর বিয়ে করতে চাইবে?’

এ কথা শুনে সামি বিস্ময়াপন্ন ভাবে তাকাল অন্ধকারে আবছা হয়ে থাকা হৃদির মুখখানার দিকে। হতভম্ব গলায় বলল, ‘মানে কী? রাহাতকে বিয়ে করার খুব শখ হইছে তর?’

হৃদি সামির প্রশ্ন শুনে এই ঘন ঘোর বিপদের মধ্যেও হেসে ফেলল, বলল, ‘তাহলে কাকে বিয়ে করব? কান কাটা সামিকে?’

সামি অপ্রতিভ হল। জীবনে এই প্রথমবারের মতো হৃদির সামনে দাঁড়িয়ে সে কিঞ্চিৎ স্নায়বিক চাপ অনুভব করল ভেতরে ভেতরে। একটু অপরাধীর গলায় বলল,’কেন,কান কাটা সামিকে বিয়ে করতে তোর আপত্তি আছে?’

হৃদি হাসে, তারিয়ে তারিয়ে বলে, ‘ভেবে দেখতে হবে। এখনই কিছু বলতে পারতেছি না।’

– ‘এসব কথা পরে হবে। এখন প্ল্যানটা শোন। আমি হাঁটতে যাচ্ছি বলে বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছি। কোনো ব্যাগ ট্যাগ নিব না। জাস্ট ওয়ালেট, মোবাইল, ক্রেডিট কার্ড এগুলো সঙ্গে নিব। তুই বাড়ি ফেরার নাম করে বের হয়ে যাবি আমার সাথে।’

– ‘তারপর? তারপর কী করব? কোথায় যাব?’ হৃদি প্রশ্ন করলো নিশ্বাস বন্ধ করে।

সামি দু পা এগিয়ে আসল সামনে। হৃদির হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় তুলে নিয়ে আস্তে করে বলল, 'তারপর আর কী? প্রতিবার তো ফানিমুনে যাই। এবার যাবো হানিমুনে!'

হৃদি একটা মৃদু ঝটকায় সামির হাত সরিয়ে দেয়। ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'ইশ শখ কত! আগে যা, কান কাইটা আয়।'

৩৭

অমৃতা দাঁড়িয়ে আছে লাইব্রেরি ঘরের সামনে। লোকটা ফিরে এসে বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি আর। সোজা চলে এসেছে লাইব্রেরিতে। অমৃতা জানে এই মুহূর্তে তার এখানে আসা একেবারেই উচিৎ কাজ হয়নি। কিন্তু আজকে যে তার নিয়ম ভাঙার দিন! কিশোরী বয়সের সেই বিদ্রোহী, বিপ্লবী মনটা আজ অনেকদিন বাদে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকে সে যা মনে চায়, তাইই করবে। কেউ বাধা দিতে পারবে না!

দরজায় করাঘাত করল সে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ভেতর থেকে খুলে গেল দরজাটা। তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালেন অমৃতার দিকে। হতভম্ব ভাবে চেয়ে থেকে বললেন, 'তুমি?'

অমৃতা পরিষ্কার গলায় বলল, 'ভেতরে আসতে দেবেন না?'

দরজা খোলা রাখা অবস্থায় তিনি কিছুক্ষণ ক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন অমৃতার দিকে। শ্রাবণ মাসের ভ্রুকুটিবক্র মেঘলা আকাশের মতো রাগে থমথম করছে তাঁর মুখ।

– ‘কিছু বলবে?’

– ‘এটার মানে কী? যা বলার বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই বলতে হবে?’ একগুচ্ছ অপমান চলকে উঠল অমৃতার চোখে মুখে।

তাঁর কপাল কুঞ্চিত হল। ঠোঁট টিপে গম্ভীর ভাবে তিনি কিছু একটা ভাবলেন। তারপর দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘এসো!’

অমৃতা ঢুকল ভেতরে। ঢুকতেই নাকে এসে ধাক্কা খেল আগরবাতির ঘ্রাণ। দেখল তাকিয়ে, ঘরের কোণে নিঃশব্দে জ্বলছে আগরবাতি।

দরজা আটকে দিলেন হক। কী মনে করে যেন জানালার পর্দাও টেনে দিলেন। হেঁটে গিয়ে বসলেন টেবিল সংলগ্ন রিভলভিং চেয়ারে

অমৃতা কিছুক্ষণ বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কী যেন ভাবল আপন মনে। মিনিট দুয়েক পর এগিয়ে এসে বসল টেবিলের উল্টো পাশের চেয়ারে। হকের মুখোমুখি। হক সাহেবের পরনে এখন কোট নেই, শুধু ফুল হাতা ফরমাল সাদা শার্ট আর টাই। ল্যাপটপ খোলা ছিল,সামনে। তিনি ডিম সাইজের ছোট একটা মাউজ হাতের আঙুল দিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে অমৃতাকে আগাগোড়া দেখে নিলেন একবার। দেখলেন অমৃতার গায়ের শাড়ি, হাতে ধরা ভ্যানিটি ব্যাগ, বাঁকা ভ্রুযুগল, ঘন পালক ঘেরা চোখ, পাঁপড়ির মতো দুটি লাল ঠোঁট, শিউলি ফুলের শুভ্রতা ছোয়া স্নিগ্ধ গাল… মেয়েটাকে আজকে যেরকম সুন্দর লাগছে এই সৌন্দর্যকে বলে বিপজ্জনক সৌন্দর্য। ডেঞ্জারাস বিউটি। তিনি এই বিপজ্জনক সৌন্দর্যের আশেপাশে থাকতে চাইছিলেন না। কমিউনিটি সেন্টারে থাকা অবস্থা থেকেই এড়াতে চাইছিলেন মেয়েটিকে। কিন্তু

শেষ অবধি তা আর হয়ে উঠল না। তিনি একটি অসন্তোষ জনক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। মেয়েটা তাঁকে বড্ড জ্বালাচ্ছে!

আচ্ছা, নিজ সন্তানের বয়সী কোন মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হওয়া কি খুব বাজে ধরণের অপরাধ? তাঁর ভেতরে একটা অপরাধবোধ কাজ করছে কেন? কেন থেকে থেকে মনে হচ্ছে যে তিনি কোন গর্হিত কাজ করছেন? এই মেয়েটি কি কোন ভাবে তার প্রতি আসক্ত? কিন্তু এটা কী করে সম্ভব? একজন যুবতী সুন্দরী মেয়ে কেন তার বয়সী একজন লোকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে? এতো ভীষণ অসম্ভব একটা ব্যাপার! তাঁর কি উচিৎ না মেয়েটিকে একটি রাম ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া? কিন্তু বিষয়টা হল যে, এই মেয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ তাঁর পুত্রের ব্যাপারে নানা ভাবে উপকার করে আসছে। এ কারণে তিনি মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই এ মুহূর্তে খারাপ ব্যবহার করতে তাঁর বিবেকে বাঁধছে। এমতাবস্থায় হাজার চাইলেও তিনি তার মনকে পুরোপুরি বিদ্রোহী করে তুলতে পারছেন না।

অমৃতার বুকের ভেতরে এতক্ষণ ধরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা পাগলাটে আগুনটা এখন নিভু নিভু। চোরা চোখে দেখছিল তাম্রবর্ণের গম্ভীর সুন্দর মুখের মানুষটাকে। ধীরেধীরে নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিল সে। হাতে পায়ে কেমন যেন ঝিম ঝিম ভাব। কোন সেনসেশনই সঠিক ভাবে কাজ করছে না। শুধু বুঝতে পারছে যে লোকটার সামনে বসে থাকতে তার ভালো লাগছে। শরীর এবং হৃদয় জুড়ে ক্রমাগত বেজে যাচ্ছে দ্রিমদ্রিম করে ভালোলাগার এক নিরবিচ্ছিন্ন বাজনা!

সে হঠাৎ কেমন ঘোর লাগা গলায় বলল, ‘রাশেদ, আপনি জানেন? আপনার মতো সুপুরুষ আমি জীবনে আর একজনও দেখিনি!’

চমকে উঠলেন হক। প্রথম কয়েকটা সেকেন্ড পূর্নব্যাদিত চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন শুধু। কিছু বলতে পারলেন না। পরমুহূর্তেই এক ভীষণ করাল ক্রোধ ঝংকার দিয়ে উঠল তার সারা মুখে। প্রচন্ড এক হুংকার দিয়ে বলে উঠলেন, ‘কী বললে?’

অমৃতা এই আচমকা হুংকার শুনে থমকে গেল ক্ষনিকের জন্য। বুকটা একদম কেঁপে উঠল তার। ধমক দিয়ে তার সাথে কেউ কথা বলে না। মা বাবা শেষ বার কবে শাসনের গলায় কথা বলেছে তা মনেও পড়েনা। সে বুদ্ধিমতী এবং বাস্তব জ্ঞান সম্পন্ন মেয়ে। পড়ালেখায় মনোযোগী, আত্মবিশ্বাসী এবং স্বাধীনচেতা মেয়েটিকে নিয়ে বাবা মায়ের ভাবনার তেমন কোনো কারণই ছিল না কখনো। শাড়ি, গয়না কসমেটিকস কিনে অযথা বাবার টাকা খরচ করার বাতিক নেই তার। এতো বয়স পর্যন্তও তার জীবনে আসেনি কোন প্রেম। ছোট বোন দীপাকে নিয়ে বাবা মা সর্বক্ষণ একটা নিদারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন। দীপা সুন্দরী, তার ওপর স্বভাব চঞ্চল। বাইশ বছর বয়সেই তার প্রাক্তন প্রেমিকের সংখ্যা তিন। মা তাই সারাক্ষণ দীপাকে নিয়ে একটা অতিমাত্রার দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে থাকেন। অপরদিকে মেয়ে হয়েও পরিবারের ছেলে সন্তানের মতো সাহসী এবং স্বাধীন হিসেবেই বেড়ে উঠেছে অমৃতা। স্বাধীনতার কোন অপব্যবহার সে আজ পর্যন্ত করেনি। তাই বাবা মায়ের শাসন করার প্রয়োজন পড়েনি কখনও। তবে একরোখা এবং জেদি হিসেবে আত্মীয়স্বজনদের মাঝে অমৃতার বেশ দুর্নাম আছে। সবাই জানে, যদি কোন জিদ চেপে বসে এই মেয়ের মাথায়, তবে সে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। যা করবে বলে একবার মনস্থির করে, তা করেই ছাড়ে। লোকে বলে, এই একরোখা ভাবটাই এমন অসাধারণ বুদ্ধিমতি মেয়েটির সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে একদিন।

আজ অনেক দিন বাদে এমন বিকট গর্জনের তোপের মুখে পড়ে অমৃতা একদম স্তব্ধ হয়ে গেল। কেঁপে উঠল তার লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট জোড়া। ঘন পালক ঘেরা কাজল দুটি চোখ মেলে ধরে সে থমকানো গলায় বলল, ‘বকা দিচ্ছেন কেন?’

হক বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখের তারায় দপদপ করে জ্বলছে তেজ। অমৃতা এই মানুষটার রাগের কথা অনেক শুনেছে এতকাল। আজকে দেখল নিজের চোখে! হেঁটে এসে হ্যাঁচকা টানে ঘরের দরজাটা খুললেন তিনি। বরফ শীতল গলায় বললেন, 'বাড়ি যাও।'

তীক্ষ্ণ এক বর্শার ফলা এসে বিঁধল অমৃতার হৃৎপিণ্ডে। চিলিক দিয়ে উঠল ব্যথা। হঠাৎ ঝাপসা হয়ে উঠল দৃষ্টি। কাচের টুকরোর মতো খান খান হয়ে ভেঙে যেতে লাগল চোখের সামনের দৃশ্যটা। বসা থেকে খুব ধীরেধীরে উঠে দাঁড়াল সে। হতভম্ব গলায় বলল, 'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?'

তিনি চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিলেন, – 'হ্যাঁ দিচ্ছি। তাড়িয়েই দিচ্ছি।'

– 'আমার দোষটা কী?'

– 'তুমি জানো না কাকে কী বলা যায়। ডিসেন্সি জিনিসটা তোমার মধ্যে নেই। নেই কোনো কমনসেন্স!'

অমৃতার দম আটকে আসছিল। হাতে পায়ে একটা কম্পন টের পাচ্ছে সে। শ্বাসনালীতে ঢুকে যাচ্ছে বাষ্প। ক্রমেই বেড়ে চলেছে বুকের ব্যথা।

– 'অমৃতা, প্লিজ বেরিয়ে যাও। আর কোনো দিন এই ঘরে এসো না তুমি।' অত্যন্ত কঠিন ভাবে কথা গুলো বললেন হক।

– 'আর কোনো দিন আসব না?'

– 'না।'

অমৃতা অনেকক্ষণ নড়ল না। যেমন ছিল তেমন ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। থেকে থেকে ফুলে উঠছে তার নাকের পাটা। চোখ দুটি অপমানে আর অভিমানে টলটলে। কিছুক্ষণের মাঝেই তার চোখের ভেতরের চাপা কান্নাটা ক্রোধে রূপান্তরিত হল। সে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, 'এখন তো আপনার প্রয়োজন শেষ। আপনার ছেলে আপনাদের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করছে। এখন আর আমাকে লাগবে কেন আপনার? তাড়িয়ে তো দেবেনই!'

হক ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ঠিক বলেছ।'

– 'ভীষণ স্বার্থপর আপনি।'

-'ঠিক।' একটা বড় নিশ্বাস চাপা দিয়ে বললেন হক।

অমৃতার মুখটা এবার ঘেন্নায় কুঁকড়ে গেল, 'আমি জানতাম আজকে এরকম কিছুই হবে। এজন্যেই আমি শাড়ি পরতে চাইনা। মেয়েদের পোশাক পরলেই আমার সাথে খারাপ কিছু হয়। সব এই শাড়ির দোষ!'

হক বিস্মিত চোখে তাকালেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটা পাগলের মতো কী বলছে এসব?

অমৃতার রক্তে রক্তে তখন আবারও ছড়িয়ে পড়েছে রাক্ষুসে রাগটা। শরীরের প্রতিটি কোষে কোষে তীব্র এক জ্বালা। সে আর একটিও কথা না বলে হনহন করে বেরিয়ে আসল ঘর থেকে। হক দরজাটা আটকে দিলেন সন্তর্পণে। তাঁর মাথা টনটন করছে

রাগে এবং উত্তেজনায়। এখন অবশ্য রাগের পাশাপাশি মেয়েটার জন্য কেমন যেন মায়াও হচ্ছে। আস্ত পাগল একটা। কী করবেন তিনি এই পাগলিটাকে নিয়ে? ধীরেধীরে হেঁটে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মনটা খুব খারাপ!

গোল বারান্দায় কোন আলো নেই আজ। আকাশে মাঘ মাসের ভরা পূর্ণিমার চাঁদ। কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মসৃণ নীল জোছনা। সাদা রং কুয়াশায় চারপাশ আবছা। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। অমৃতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অস্থিরচিত্তে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলল। একটা সিগারেট বের করে নিল। আগুন ধরালো লাইটার দিয়ে। অস্থির ভাবে টান দিল একটা। তার শরীর কাঁপছে থরথর করে। বীভৎস এক ক্রোধ তার সমস্ত চেতনা কেঁড়ে নিতে চাইছে। মস্তিষ্ক শূন্য। মনে হচ্ছে যেন রাগের চোটে নার্ভ গুলো সব ছিঁড়ে যাবে।

হঠাৎ সে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের উঠোনে। তারপর কাঁপতে কাঁপতে ব্যাগ থেকে লাইটার বের করে আগুন জ্বালালো। শাড়ির আঁচলের কোণা তুলে নিল এক হাতে। অপর হাতে ধরা লাইটারের জ্বলন্ত আগুনের লাল শিখাটা শাড়ির আঁচলের খুব কাছে নিয়ে আসল। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। ছড়িয়ে পড়ল শাড়ির কাপড়ে। সেকেন্ডের মধ্যেই আগুনটা শাড়ির আঁচলের কোণ থেকে উঠে আসতে লাগল উপরের দিকে। অমৃতা কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে চেয়ে রইল জ্বলতে থাকা আগুনের দিকে। আগুনের হলকা এসে লাগছে তার মুখে। কিন্তু সে নির্বিকার। সে যেন কিছুই দেখছেনা, বুঝতে পারছেনা।

হক সাহেব জানালা দিয়ে দৃশ্যটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ড চলে আসল গলার কাছে। এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ছুটে বেরিয়ে আসলেন তিনি ঘর থেকে। আগুনের শিখা আরেকটু হলেই ছুঁয়ে ফেলবে অমৃতার কাঁধ। হক নিশ্বাস নিতে ভুলে গেলেন। ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে এক টানে অমৃতার কোমরে গোঁজা

শাড়িটা খুলে ফেললেন। পুরো শাড়িটা খুলে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তৎক্ষণাৎ আগুন সমেত শাড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি গোল বারান্দার মেঝেতে। অমৃতা তখনো পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্ষু দুটি বিস্ফোরিত। মুখ রক্তশূন্য। হক বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে দেখলেন দূর থেকে কেয়ারটেকার সুলেমান ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। তিনি চকিতে তাকালেন অমৃতার দিকে। তার পরনে শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট। আগুনের কমলা রঙের হলকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার ফর্সা পেট আর বুকের অনেকখানি। তিনি প্রস্তরীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অমৃতার হাত টেনে ধরে ধমক দিয়ে উঠে বললেন,'ভেতরে যাও!'

অমৃতা নড়তে পারলোনা। বরং তার হাত পা কেমন ভর শূন্য হয়ে গেল। মনে হল যেন এখুনি কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়বে সে। সুলেমান দৌড়োতে দৌড়োতে গোল বারান্দার অনেক কাছে চলে এসেছে তখন। তার পরনে গেঞ্জি, প্যান্ট আর জুতো। মাফলারে গলা, মাথা ঢাকা। অমৃতা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নাড়ানো যাচ্ছেনা। উপায় না দেখে হক চট করে অমৃতাকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিলেন। ভেতরে যাবার আগে সুলেমানের উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে বললেন, 'সুলেমান! এই ঘটনা যেন কারো কানে না যায়!'

সুলেমান শাড়িতে জ্বলতে থাকা আগুন পা দিয়ে দাপাদাপি করে নেভাতে নেভাতে বলল, 'কারো কানে যাবেনা হুজুর!'

রুদ্র আর আকাশ ড্রইংরুমেই বসে ছিল। সামির চাচাতো, মামাতো ভাই বোনেরা অনেকক্ষণ যাবৎ একটি গানের সাথে নাচ তোলার চেষ্টা করছে। দুইজন ছেলে এবং দুই জন মেয়ে মিলে নাচার চেষ্টা করছে 'ফাগুনি পূর্ণিমা গানটায়। রুদ্র তাদেরকে একটি বিশেষ স্টেপ দেখিয়ে দিচ্ছে। সে শেখাচ্ছে, 'চল পলায়ে যাই' লাইনটা যখন গানে আসবে তখন ঠিক কেমন মুদ্রায় মেয়েটির হাত ধরে টান দিতে হবে এবং

মুখে কী রকম ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে হবে। সামির কাজিনরা রুদ্রর নৃত্য প্রতিভায় মুগ্ধ। তারা গভীর মনোযোগের সাথে রুদ্রর নাচের মুদ্রা এবং মুখের ভঙ্গিমা অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। আকাশ গালে হাত দিয়ে বসে দেখছে রুদ্রর কাণ্ড। আপাতত তার আর কোনো কাজ নেই।

সেই সময় হঠাৎ সামি আর হৃদির আবির্ভাব ঘটলো ঘরটায়। সামি এসেই বন্ধু দুজনকে বলল, 'অমৃতা কোথায়?'

আকাশ বলল, 'জানিনা, বলল চেম্বার থেকে ফোন আসছে। উপরে মনে হয়।'

সামি পকেট থেকে ফোনটা বের করে অমৃতার নম্বরে ডায়াল করল, বলল, 'কই ফোন তো বিজি না। গেছে কই?'

– 'আল্লাহ জানে কোন চুলায় গেছে। আমি কী জানি?' বিকারহীন গলায় বলল আকাশ।

হৃদি একদম চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ খেয়াল করলে দেখতে পেত তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম চিকচিক করছে। চোখের দৃষ্টি হয়ে আছে অস্থির। ভাগ্য ভালো যে কেউ তাকে লক্ষ্য করল না। সামি ফোনটা প্যান্টের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'হুম, বাইরে চল, হাঁইটা আসি।'

নাচ প্রশিক্ষণে ব্যাঘাত ঘটায় রুদ্র বেশ বিরক্ত হল। কুঁকড়ে যাওয়া মুখ নিয়ে সামিকে বলল, 'একটু দাঁড়া। বাচ্চা গুলা প্রায় শিখাই ফেলছে। আর একবার প্র্যাকটিস করলেই হবে। কালকে তোর আকদের অনুষ্ঠানের পর ওরা এই গানে নাচবে।'

সামি রুদ্রর শার্টের হাতা ধরার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘আরে নাচ পরে হবে। এখন হাঁটতে চল।’

রুদ্র সামির হাতের মুঠো থেকে নিজেকে বাঁচাতে কয়েক পা দূরে সরে গেল। মুখে বলল, ‘একটু ওয়েইট কর, নাচটা শ্যাষ হোক।’

রাগে গজগজ করতে করতে সামি এবার এক দৌড়ে এসে রুদ্রর খোলা চুলের মুঠিটা খামচে ধরল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, ‘শালা, কথা কানে যায়না? কইতাছি হাঁটতে যামু! আসছে আমার ডিসকো ড্যান্সার!’

রুদ্র মুখ দিয়ে উঃ আঃ শব্দ করতে করতে অনেক কষ্টে সামির হাত থেকে নিজের চুল গুলোকে রক্ষা করল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ‘মামা কী সমস্যা তোমার? হঠাৎ হাঁটাহাঁটির বাই উঠছে কেন?’

সামি আর কোনো কথা না বলে প্রস্থানোদ্যত হল। যেতে যেতে বলল, ‘আমি গেলাম, তোরা মনে চাইলে আয়।’

ওরা চারজন যখন বাইরে এসে দাঁড়ালো ঘড়িতে তখন বাজে কাটায় কাটায় এগারোটা। এই গলিটা কানা। এটাই রাস্তার শেষ বাড়ি। তাই সন্ধ্যের পর এদিকটায় লোকজন খুব একটা আসা যাওয়া করেনা। আজকে রাস্তা পুরোই খালি। সামনেই পাচিলের ওপারে ফাঁকা স্কুলের মাঠ। কোথাও কোনো সাড়া শব্দ নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেটের সামনে অতর্কিতে দাঁড়িয়ে পড়ল সামি। আকাশ বলল, ‘দাঁড়ায় পড়লি ক্যান? তুই না হাঁটবি?’

সামি প্রশ্নটা শুনে অত্যন্ত বিচলিত ভাবে কাশল একবার। দেখে মনে হল কিছু একটা নিয়ে সে দ্বিধায় পড়ে গেছে। অনেক কষ্টে বলল, 'ইশে··· '। আড়চোখে দেখল হৃদিকে। হৃদির চিবুক তখন গলা ছুঁয়ে ফেলেছে। দৃষ্টি নিবদ্ধ মাটিতে। আকাশ ধমকে উঠল, 'সমস্যা কী তোর? চুরি করছস নাকি কিছু? এরকম চুরের মত করতেছিস ক্যান?'

সামি আবার বলল, 'ইশে···'

রুদ্র এবার আচমকা লাফিয়ে উঠে সামির শার্টের কলার চেপে ধরল। দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, 'শালা আরেকবার ইশে বললে তোরে এইখানেই মাইরা পুঁইতা ফালামু আজকে। আমার সাধের নাচের ক্লাস বানচাল করছস তুই ইশে ইশে করার জন্য?

সামি রুদ্রর হাত থেকে নিজের শার্টের কলার উদ্ধার করতে করতে বিব্রত ভাবে বলল, 'আরে বলতেছি তো ছাড় আগে।'

রুদ্র ছাড়লো ওকে। কয়েক সেকেন্ড গড়ালো অস্বস্তিতে। তারপর হঠাৎ সামি ঝড়ের বেগে দু পা এগিয়ে এসে রুদ্রকে জাপ্টে ধরলো। অসহায় গলায় বলল,'দোস্ত, আমরা পালাইতেছি। প্লিজ হেল্প কর!'

রুদ্র, সামির এই আকস্মিক আক্রমণে একদম বেকুব বনে গেল। আকাশ চোখ দুটি ছানাবড়া করে বলল, 'পালাইতেছি মানে? হোয়াট দ্যা ফাক!'

সামি তখনো রুদ্রকে জড়িয়ে ধরে আছে। রুদ্র সামির বুকের চাপে পিষ্ট হতে হতে বলল, 'পালাবি তো পালা, আমার কী দোষ? আমারে ক্যান চাপতেছিস?'

সামি রুদ্রকে ছাড়ল। এক নিশ্বাসে বলল, 'দোস্ত আমি আর হৃদি পালাচ্ছি। তানিশাকে আমি বিয়ে করতে পারব না। তোরা এদিকটা ম্যানেজ কর।'

এক প্রবল বিস্ময় রুদ্র আর আকাশের মুখের কথা কেঁড়ে নিল। অনেকক্ষণ যাবৎ তারা শুধু বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল সামি আর হৃদির দিকে। কিছু বলতে পারল না। মিনিট দুয়েক পরে আকাশের মুখ থেকে যে কথাটি সবার প্রথমে বেরিয়ে আসলো, তা হল, 'তুই তানিশারে বিয়া না করলে পক্ষী দুইটার কী হবে? পক্ষীরাও তো আমাদেরকে বর্জন করবে!

রুদ্র নিজের এলোমেলো চুল গুলো হাতড়াতে হাতড়াতে অতি গম্ভীর গলায় বলল, 'হৃদি তুই যাওয়ার আগে আমার চুলগুলা আঁচড়ায় দিয়া যা দোস্ত। প্লিজ! সামির বাচ্চা আমার চুলের মুঠি ধইরা পুরা আওলায়ে দিছে।'

হৃদি আর সামি একে অপরের দিকে তাকাল। এই বান্দর গুলা এমন বিপদের সময়েও ঠাট্টা মশকরা করার ধান্ধায় আছে। সামি শীতল চোখে দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোদের মজা নেয়া শ্যাষ হইছে?'

রুদ্র হাত তুলে বলল, 'আরেকটু বাকি আছে।'

এটুকু বলে সে আকাশের দিকে ঘুরে তাকিয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'দোস্ত, কী কপাল নিয়া জন্মাইছিলাম ক দেখি? চল পলায়ে যাই গানে আমি নাচতেছি সেই তখন থেকে কিন্তু পলাইতেছে এই সামির বাচ্চা সামি! প্রথমে বিভা, তারপর হৃদি! আমাদের ভাগ্যে কিছুই নাই। এইটা খোদার কেমন বিচার?'

আকাশ রুদ্রর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার গলায় বলল, 'কী আর করবি! পোড়া কপাল!'

রুদ্র বলল, 'চল, আমরাও পলাই।'

– 'তুই পলাবি আমার সাথে?'

– 'হ, সামির বাচ্চা তোর সাথে আর অমৃতার সাথে কিসু করার আগে আমি চাই তোদের সাথে একটা সেট আপ দিতে। ও যেন এরপর আবার তোদের দিকে হাত না বাড়ায়। সেই ব্যবস্থা এখনই করতে হবে।'

সামি এবার বাধা দিয়ে বলল,'তোদের ঢং শ্যাষ হইছে?'

আকাশ বলল, 'আরেকটু বাকি আছে। গাইজ, তোমরা কি কেউ 'আমরা পালাইতেছি ' সিনেমাটা দেখছ?'

হৃদি এবার একটা বড়সড় খ্যাঁক দিয়ে উঠল, 'ফাইজলামি করার আর জায়গা পাস না? আমরা কত বড় একটা বিপদের মধ্যে আছি বুঝতে পারতেছিস?'

রুদ্র বলল, ‘আমার মাথার চুল আঁচড়ায়ে দে। তাহলে ফাইজলামি করা বন্ধ করব।

হৃদি এবার রাগে পাগল হয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল রুদ্রর ওপর। ওর এলোমেলো চুলগুলো নখ দিয়ে খামচে ধরল। চুল টানতে টানতে বলল, ‘কুত্তার বাচ্চা! তোর চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলব আজকে।’

সামি হৃদিকে থামালো। জরুরি ভাবে বলল, ‘থাম তো। শোন তোরা, আমরা যাচ্ছি। অমৃতা আর বিভাকে বলিস। এদিকটাও ম্যানেজ করিস। আমরা আজকে রাতে কারো ফোন ধরব না। কালকে সন্ধ্যার পর ফিরে আসব বাসায় ইন শা আল্লাহ। তোরা যে করেই হোক বিয়েটা ভাঙবি। আম্মা আব্বাকে বলবি এই বিয়ে আমার পক্ষে করা সম্ভব না।

আকাশ বলল,’দোস্ত যা করতেছিস ভাইবা চিনতা করতেছিস তো? মানে আমার মাথায় কিছু ঢুকতেছেনা!

– ‘অনেক ভাবছি। এখন আর ভাবার সময় নাই। তোরা শুধু দোয়া করিস।’ এই বলে সে হৃদির একটা হাত চেপে ধরল। তারপর হৃদির দিকে তাকিয়ে ধীরস্বরে বলল, ‘চল, আল্লাহ ভরসা। এখানে আমাদের বন্ধুরা আছে। চিন্তার কিছু নাই!’

২য় খণ্ডের সমাপ্তি